জয়ঢাক

৬১ তম সংখ্যা

৩৮ নং ইনটারনেট সংখ্যা

বর্ষা ২০১৭

প্রচ্ছদ পিয়ালী ব্যানার্জি

প্রচ্ছদের লোগোঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

জয়ঢাক

বর্ষা ২০১৭-৬১নং সংখ্যা ৩৮নং ইনটারনেট(১ম খণ্ড)

বিষয়	নাম	লেখক	পাতা
জয়ঢাকের দলবল	জয়ঢাকের দলবল		৩
সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল	সম্পাদক	৪
জয়ঢাকি বিজ্ঞাপন	বিজ্ঞাপন	তাপস মৌলিক	৬
ধারাবাহিক গ্রাফিক নভেল	দুর্জয়	দেবসেনা নন্দী, শ্রীময় দাশ	৯
ধারাবাহিক গ্রাফিক নভেল	তারানাথ তান্ত্রিক	দেবসেনা নন্দী, শ্রীময় দাশ	১৪
কমিকস	হতচ্ছাড়া ফাঁকিবাজ	ভাষান্তর সুমিত রায়	১৯
কমিকস	টোটা আর টিটো স্বাধীনতা দিবস	রুডলফ ডার্কস। অনুঃ তাপস মৌলিক	২৫
কমিকস	গোলকধাঁধায় ইতিহাস	সন্দীপন কর্মকার	৩৮
আজব খাতা	হুমোর ডায়েরি	তপোব্রত মুখার্জি	৪০
নভেলা	আবার যমধারার জঙ্গলে	দীপক দাস	৪২
প্রতিযোগিতার গল্প	বন্ধু	প্রকল্প ভট্টাচার্য	৫৩
প্রতিযোগিতার গল্প	আথেনিকার আগন্তুক	অয়ন রাহা	৫৭
গল্প	ইঁদুর বেড়াল	শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৬৭
গল্প	বাঘবন্দি মন্তর	শিশির বিশ্বাস	৭০
গল্প	সিন্নিপিসির গল্প	অনসূয়া খাসনবীশ	৭৩
গল্প	ফোচনের আরেক কীর্তি	পিয়ালী গাঙ্গুলি	৭৭
গল্প	অচেনা শহর	মো.শামীম মিয়া	৮০
গল্প	জাদু মামা ও ম্যাজিক পেন	সিন্থিয়া নাজনীন	৮৪
গল্প	কাকামণি	সিদ্ধার্থ সিংহ	৮৭
গল্প	মিউটেশন	সুবীর মণ্ডল	৯২
গল্প	লোকটা	রুচিস্মিতা ঘোষ	৯৮
গল্প	ফ্ল্যাট নম্বর ২০১	সত্যজিৎ দাশগুপ্ত	১০১
গল্প	রামনগরের খুনে	পার্থ মন্ডল	১১৫
গল্প	হুলোপ্যাঁচা ও অক্টোবরমাস	তপোব্রত মুখার্জি	১২৬
গল্প	ভূতের ভরসা	কিশোর ঘোষাল	১২৮
ভ্রমণ	ডারবানের গল্প-রেলরঙ্গ	দীপক গোস্বামী	১৩৯
ভ্রমণ	হাঁটছি	অর্ণব চক্রবর্তী	১৫৯
ভ্রমণ	নীল-সবুজের মাঝে	প্রদীপ্ত ভক্ত	১৬২
ভূতের আড্ডা	দেশবিদেশের ভূতেরা	ইন্দ্রশেখর	১৬৭
ভূতের আড্ডা	ভূতের বাড়ি-পার্ক স্ট্রিট গোরস্থান	সুজয় রায়	১৬৮
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক	১৭১
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	মাথা মে ট্রিক্স্‌- র‍্যান্ডম সংখ্যার	সূর্য্য ভট্টাচার্য	১৭৫
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	মহাবিশ্বে মহাকাশে- কোয়াসার	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৭
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	টেকনো টুকটাক-মুদ্রা থেকে নোট পর্ব ২	কিশোর ঘোষাল	১৮১
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	প্রতিবেশী গাছ-মন্দার	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়	১৮৬
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	আবিষ্কারের খোঁজখবর	রাজীব কুমার সাহা	১৮৯
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	সহজ বিজ্ঞান-আকাশে আলোর রোশনাই-মেরুপ্রভা	অরূপ ব্যানার্জি	১৯২

বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	সহজ বিজ্ঞান-চুম্বকের দোসরের গল্প	সুজিতকুমার নাহা	১৯৫
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	গ্রহের ফের	ঋজু গাঙ্গুলী	১৯৭
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	কেম্যাজিক-কাগজের ঠোঙায় চা	পান্নালাল গোস্বামী	২০৮
লোককথা	আলেকজাণ্ডার ও মৎস্যকন্যা	রমিত দে	২১০
বিদেশী গল্প	ইংরিজি গল্প-আগে আমার কথা শোন	জন ম্যাকলে। অনু অমিত দেবনাথ	২১৩
বিদেশী গল্প	রাশিয়ান গল্প-ইভান আর রূপমতীর কাহিনী	মূলঃপোলেভয়-এর স্কাজকি। অনুবাদঃ দেবজ্যোতি	২১৭
বিশ্বের জানালা	অচেনা ঈশান	মালিনী ভট্টাচার্য	২২৪
বিশ্বের জানালা	আঙ্কল স্যাম	সংহিতা	২২৬
বিশ্বের জানালা	পাহাড়ের কান্না-মেঘনা নদী	মীম নোশিন নওয়াল খান	২৩১
বিচিত্র দুনিয়া	একটি ঈগলের কাহিনী	অরিন্দম দেবনাথ	২৩৩
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	লাল কাকের গল্প	অভিরাজ দেবনাথ	২৩৭
ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর	২৪০
ধাঁধা মজা রহস্য	ড্রুড্‌ল	ইন্দ্রশেখর	২৪০
ধাঁধা মজা রহস্য	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর	২৪১
ধাঁধা মজা রহস্য	কীসের ফটো	সংগৃহীত	২৪২
ধাঁধা মজা রহস্য	দেশলাইকাঠির খেল	সংগৃহীত	২৪২
ধাঁধা মজা রহস্য	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর	২৪৩
ধারাবাহিক উপন্যাস	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস	২৪৪
ধারাবাহিক উপন্যাস	জাদু রাজ্য	মুরাদুল ইসলাম	২৪৮
ছড়ার পাতা	পারিশ্রমিক -রোয়াল্ড ডাহ্‌ল্‌	কৌশিক ভট্টাচার্য	২৬০
ছড়ার পাতা	রামটাম টাগ্‌গার এস এলিয়ট	আবু হোসেন	২৬১
ছড়ার পাতা	আয় বিষ্টি চমৎকার	রতনতনু ঘাটী	২৬২
ছড়ার পাতা	তরুণাট	তরুণকুমার সরখেল	২৬৩
ছড়ার পাতা	নতুন দিনের বার্তা	রওশন মতীন	২৬৪
ছড়ার পাতা	মেঘবৃষ্টি	প্রসেনজিত চক্রবর্তী	২৬৫
ছড়ার পাতা	মনের কথা	প্রিন্স মাহমুদ হাসান	২৬৬
ছড়ার পাতা	বৃষ্টির ছড়া	আহাদ আলি মোল্লা	২৬৭
ছড়ার পাতা	মোয়া ভারত	অমিতাভ প্রামাণিক	২৬৮
ছড়ার পাতা	ছুটি	সামসুন্নাহার ফারুক	২৬৯
ছড়ার পাতা	দুটি ছড়া	অংশুমান দাশ	২৭০
ছড়ার পাতা	কে বড়ো কে ছোটো	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭১
ছড়ার পাতা	বাঁধন ছাড়া	উত্তীয় কোলে	২৭২
কাতুকুতু	ডাক্তার-রোগী সংবাদ	সংহিতা	২৭৩
টাইম মেশিন	ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী	২৭৪
টাইম মেশিন	সীমান্তের অন্তরালে	সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী	২৮৫
ধারাবাহিক অভিযান	এভারেস্ট	এরিক শিপটন অনুবাদ বাসব চট্টোপাধ্যায়	২৯৭
জাতক কথা	বক জাতক	নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়	৩০৩
স্মরণীয় যাঁরা	রামচন্দ্র চ্যাটার্জি	অতনু প্রজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৬
খেলার পাতা	চেস বক্সিং	অরিন্দম দেবনাথ	৩০৮
এস গান শুনি	সুরঢাক	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	৩১১
বই পড়া-পুরোনো বই	বিশ্বের সেরা গল্প	পিয়ালি ব্যানার্জি	৩১৬
বই পড়া-নতুন বই	শিশির বিশ্বাসের বই	তাপস মৌলিক	৩১৭

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী

উমাদিদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা

তাপস মৌলিক

অন্নপূর্ণা, বিজ্ঞাপন,নতুন বই
কার্যনির্বাহী সম্পাদক- শব্দকল্পদ্রুম

জয়ঢাকের ইউনিকোড কম্পোজিটর টিম

মনস্বিনী

দেবপ্রিয়া

ঋত্বিক

মহুল

এই সংখ্যার আঁকিয়েরা

শিবশংকর ভট্টাচার্য

অর্ক

শিমুল

তন্ময় বিশ্বাস

অংশুমান

শ্রীময়

শ্রীময়ী

নির্মাণ সহায়তায়
রাজীবকুমার সাহা

জয়ঢাকি বোল

বর্ষার শুরুতে চলে এল নতুন জয়ঢাক। জুন মাসটা বেশ কিছু কারণে উল্লেখযোগ্য। তার কয়েকটা কথা এই সুযোগে বলে নেয়া যাক।

প্রত্যেক বছর জুন মাসের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে শুরু হয় টেনিস খেলার সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে সম্মানিত টুর্নামেন্ট উইম্বলডন। ১৮৭৭ সাল থেকে শুরু করে এই জুনে ১৪০ বছরে পা দেবে এই টুর্নামেন্ট। অল ইংল্যান্ড ক্রোকেট অ্যান্ড টেনিস ক্লাবের শুরু করা এ টুর্নামেন্টে প্রথমে হত শুধু ছেলেদের সিঙ্গল্‌স্ চ্যাম্পিয়নশিপ। সাহেবরা তখনও মেয়েদের এমন খেলাধুলোকে বেশি স্বীকৃতি দিত না। দিন বদলেছে তার পর। আজ এ টুর্নামেন্টে ছেলেদের ও মেয়েদের সিঙ্গল, ডাব্‌ল্ এবং মিশ্র ডাবল্ এর প্রতিযোগিতা হয়। ১৪০তম বছরে সে টুর্নামেন্টের শুরুর আগে জয়ঢাকের শুভেচ্ছা। শুরু হচ্ছে ছাব্বিশ জুন, সে খেলা দেখতে ভুলো না তোমরা।

জুনের চব্বিশ তারিখটা খুব ইন্টারস্টিং। ও দিনটা বিশ্ব 'অউব' দিবস হিসেবে পালন করা হয়। অউব মানে হল অজানা উড়ন্ত বস্তু। ১৯৪৭ সালের চব্বিশ জুন তারিখে ওয়াশিংটনের রেনিয়ার পাহাড়ের কাছে এরোপ্লেন চালাতে চালাতে কেনেথ আর্নল্ড নামে এক বিমানচালক একসঙ্গে নটা চাকতিকে আকাশে ভাসতে দেখেন। জিনিসগুলো মধ্যে একটা ছিল চাঁদের কলার মত, সামনের দিকে উত্তল, পেছনদিকে অবতল। অন্যগুলো পাতলা চাকতির মত দেখতে। আর্নল্ড জানান, জলের বুকে একটা পাতলা প্লেট বা সসার সসার ছুঁড়ে মারলে তা যেমন এলোমেলো ব্যাংবাজি খেয়ে ঘোরে ঠিক তেমন করে আকাশে ঘুরছিল জিনিসগুলো। এই সসার শব্দটা খবরের কাগজওয়ালাদের মনোমত হয়। তাঁরা এই অজানা উড়ন্ত বস্তু(অউব বা UFO) দের নাম দেন ফ্লাইং সসার। খবরটা দুনিয়াজোড়া বেশ একটা সাড়া জাগিয়েছিল। আর্নল্ডও বেশ একটু নামডাক পেয়ে যান। ওর পর থেকেই দুনিয়াজোড়া UFO খোঁজবার ফ্যাশান শুরু হয়। আর্নল্ডের সেই নয় চাকতি দেখবার দিনটা এখন বিশ্বজুড়ে অউব দিবস। তা চব্বিশ তারিখ একটু আকাশের দিকে খেয়াল রেখ। বলা যায় না আউব দিবসেই হয়ত তোমারও চোখে পড়ে গেল কোন ভিনগ্রহী অতিথির যানটা। অউব দেখবার ভুরিভুরি

ঘটনা আছে এর পর থেকে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মিথ্যে প্রমাণিত হলেও দুই একটা ঘটনবার এখনো ব্যাখ্যা সত্যিই মেলেনি। যেমন ধরো ১৯৫০ এ কানাডায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটা। ইভলিন ট্রেন্ট নামে এক মহিলা তাঁর খরগোশদের খাওয়াচ্ছিলেন। হঠাৎ আকাশে চোখ যেতে তিনি অবাক। সেখানে সন্ধের বাতাসে একটা ধাতুর চাকতি দিব্যি ভেসে আছে। তাড়াতাড়ি স্বামীকে ডাক দিলেন ইভলিন। ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে তাই দেখে ক্যামেরায় গুটি দুই ছবি তুলতে না তুলতেই হঠাৎ উধাও হল চাকতি। ইভলিনরা এ নিয়ে বিশেষ প্রচার চাননি। তবু লোকজন জেনে যায় ঠিকই। তাঁদের ছবিগুলো নিয়ে এরপর অনেক পরীক্ষাটরীক্ষা হলেও এখনো কিন্তু তাতে কোন জুয়াচুরির প্রমাণ মেলেনি। সঙ্গে সে ছবি রইল।

আরেকটা দুঃখের ঘটনার ঘটেছিল এই জুন মাসেই। ১৮৫৮ সালের এই জুন মাসে গোয়ালিয়রের যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এক যোদ্ধাকে কারবাইনের গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল এক ইংরেজ সেনা। ঘোড়সওয়ার সৈনিকের পোশাকে সাজা সেই বীর মেয়েটির নাম ছিল লক্ষ্মীবাঈ। এর তিনদিন পরে সেই যুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের মহাবিদ্রোহ। এদেশ ডুবে গিয়েছিল পরধীনতার অন্ধকারে। সে অন্ধকারের বুকে উজ্জ্বল হয়ে জেগে থাকে অজস্র মানুষের আত্মদানের ছবি। তার মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল ছবি রানি লক্ষ্মীবাঈকে প্রণাম জানায় জুনের জয়ঢাক।

ভালো থেকো তোমরা এই বর্ষায়।
ভালোবাসায়,
তোমাদের জয়ঢাকি দাদাদিদিরা

বিজ্ঞাপন

সহজ বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা

তৃতীয় সুর ষষ্ঠ সুর

একটি সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমন্ডিত সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ঝট করে যে কোনও বাজনা বাজাতে শেখো

ভর্তি চলিতেছে

খুব গরম পড়েছে বুঝি?
ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ো, চলে এসো উত্তর মেরু
আমরা স্লেজ কুকুরদের একটি সংস্থা
তোমায় সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব
তুন্দ্রা ট্র্যাভেলস
আইসল্যান্ড
জয়ঢাকিদের জন্য বিশেষ ছাড়
TM

বিজ্ঞাপন

শুধুমাত্র ভূতদের জন্য কম্পিউটার শিক্ষা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষদের নিত্যনতুন পদ্ধতিতে ভয় দেখানোর নানা কায়দার প্রশিক্ষণ ও প্রসারে নিবেদিত আমাদের প্রতিষ্ঠানে আজই ভর্তি হোন

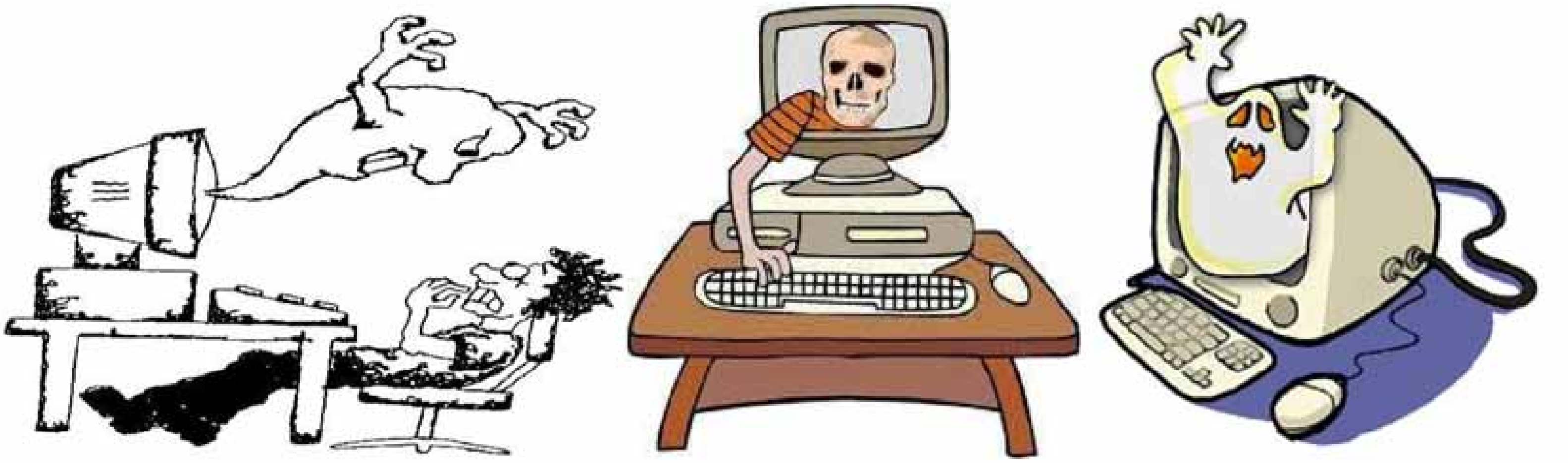

IIGT

Indian Institute of Ghost Technologies

এগিয়ে ভাবুন, এগিয়ে থাকুন

TM

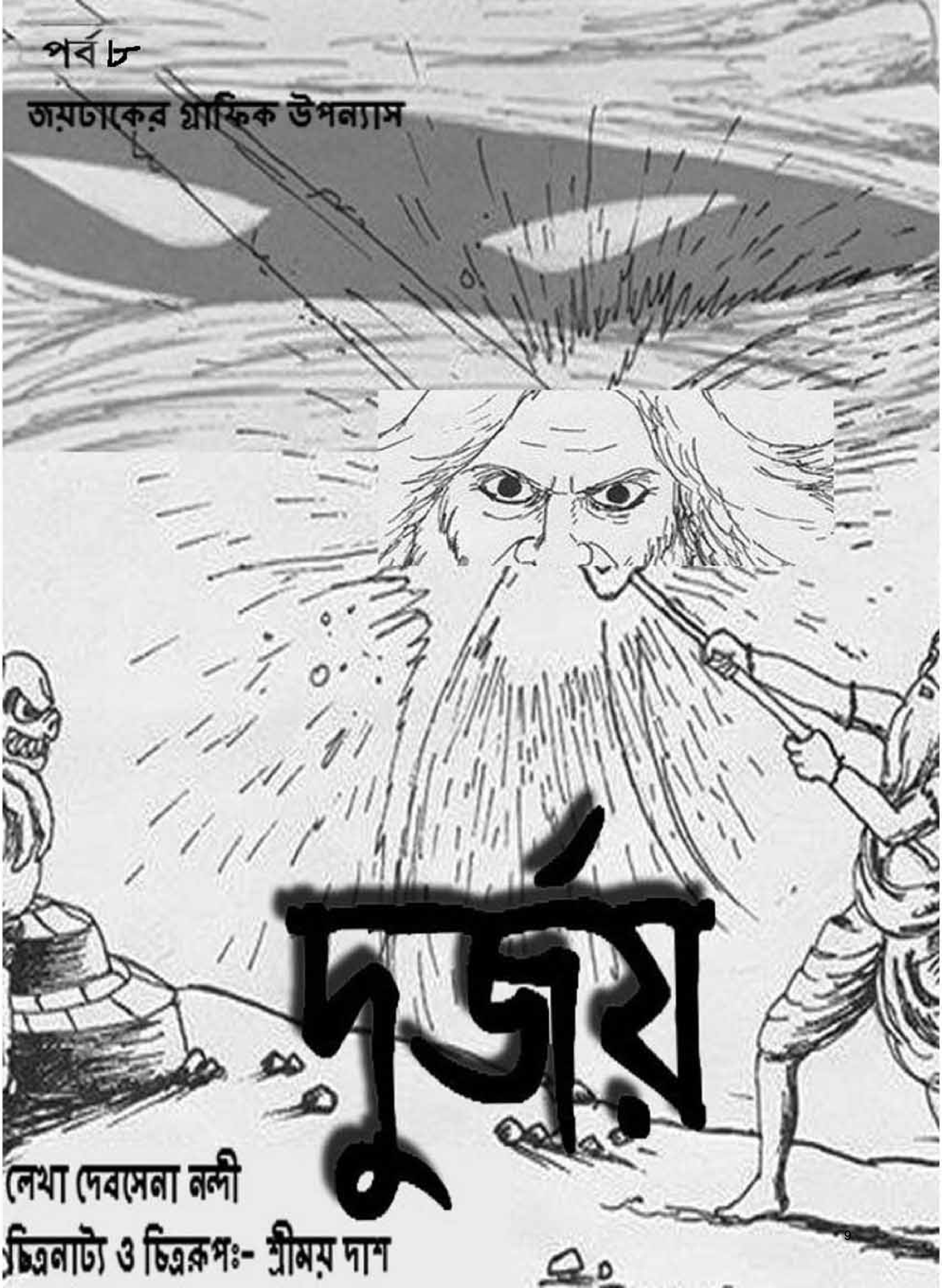
পর্ব ৮
জয়ঢাকের গ্রাফিক উপন্যাস
দুর্জয়
লেখা দেবসেনা নন্দী
চিত্রনাট্য ও চিত্ররূপঃ- শ্রীময় দাশ

শোনা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র ধ্রুপদই নাকি মায়াকালের মৃত্যুবাণ।
আর মৃত্যুবাণকে জীবিত রাখে না কোন শত্রুই।
আর আসল ব্রহ্মানন্দ তো আজ সকালেই আমার হাতে মারা গেছে।
মায়ানগরে স্বাগত!
!

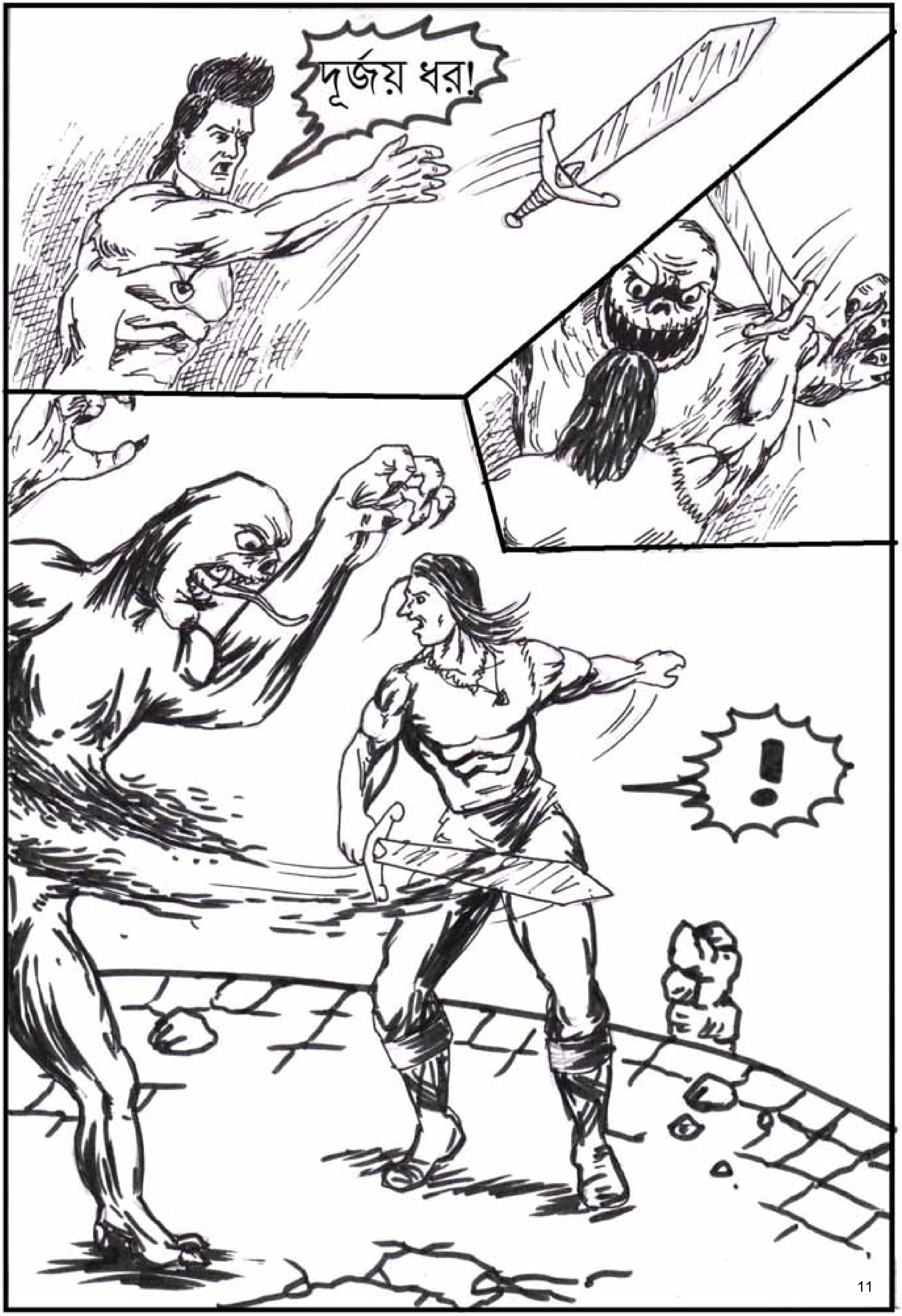
দূর্জয় ধর!
!

ফুফুফুউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউ.........
আগহহ!!
আঃ খক খক !!
আঃ......আহ!! মাথা ঘুরছে আমার !! দেখতে পাচ্ছি না কিছু!! কোথায় তোরা?
!!!
উ-উদিত কোথায় তুই? দ-দম আটকে আসছে আমার--গ-গ!
নিঃশ্বাস নিতে পারছি না

স্বাগতম ভ্রাতুষ্পুত্র !

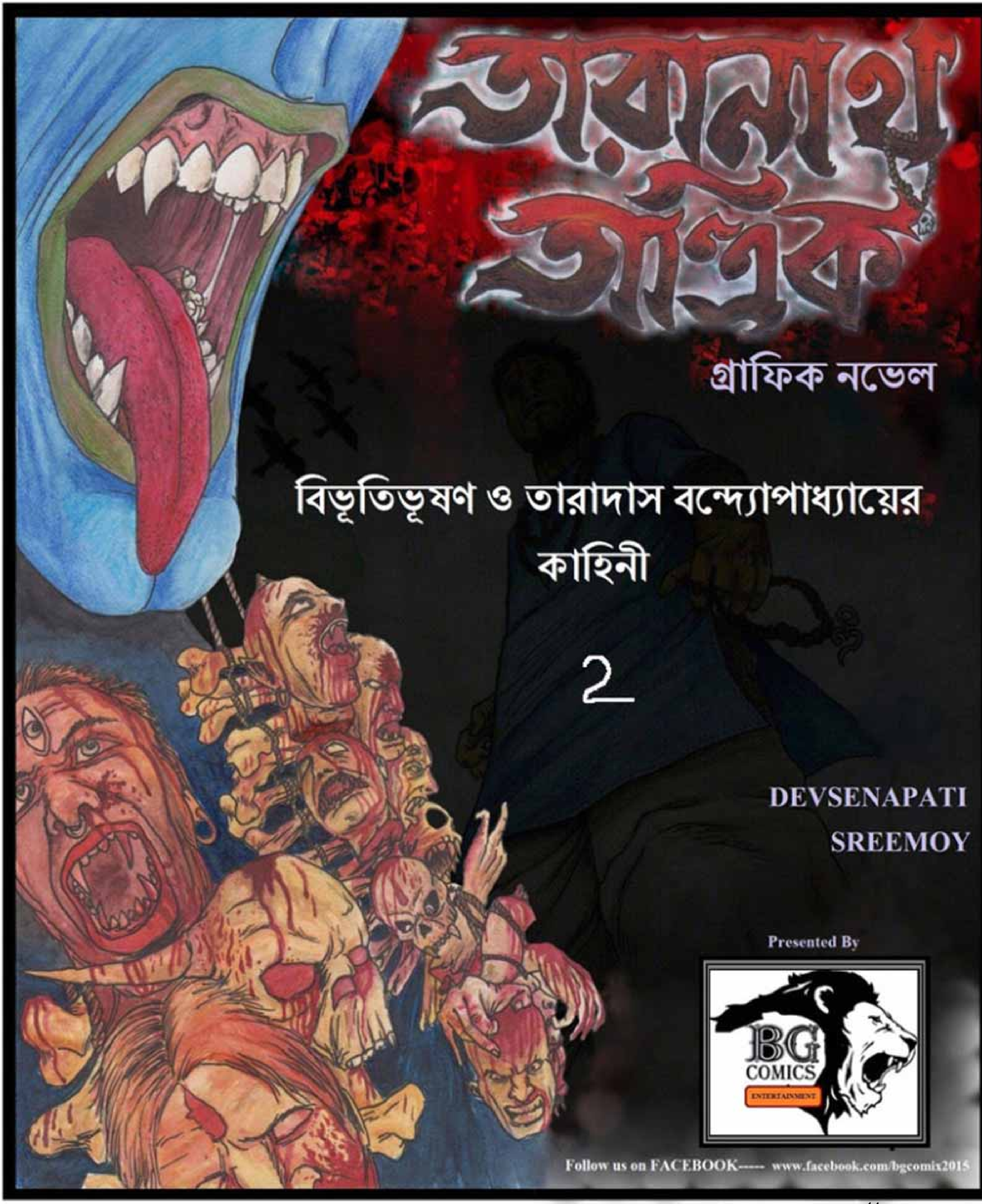
তারানাথ তান্ত্রিক
গ্রাফিক নভেল
বিভূতিভূষণ ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কাহিনী
2
DEVSENAPATI
SREEMOY
Presented By
BG
COMICS
ENTERTAINMENT
Follow us on FACEBOOK----- www.facebook.com/bgcomix2015

কে তুই?
আমি তারানাথ তান্ত্রিক, তুই কে বল?
খি খি খি খি খি খি
বেশ বলতে হবে না।
ওঁ প্রত্যালীঢ়া পদাঘোরা মুণ্ডমালা বিভূষিতা

অষ্টভুজা মহাঘোরা
ঘোরকৃষ্ণ ভয়ঙ্কর......
ভীমবল ভীমনেত্র......
ভীমনেত্র ভীমলোচন
করাল বদন...........
বল তুই কে?
বল !!
চ্-চিন্তা কোরো না তুমি.....
সব ঠিক হয়ে যাবে......
আ আ আ!!
আ আ!!
চলে যা
তুই !!

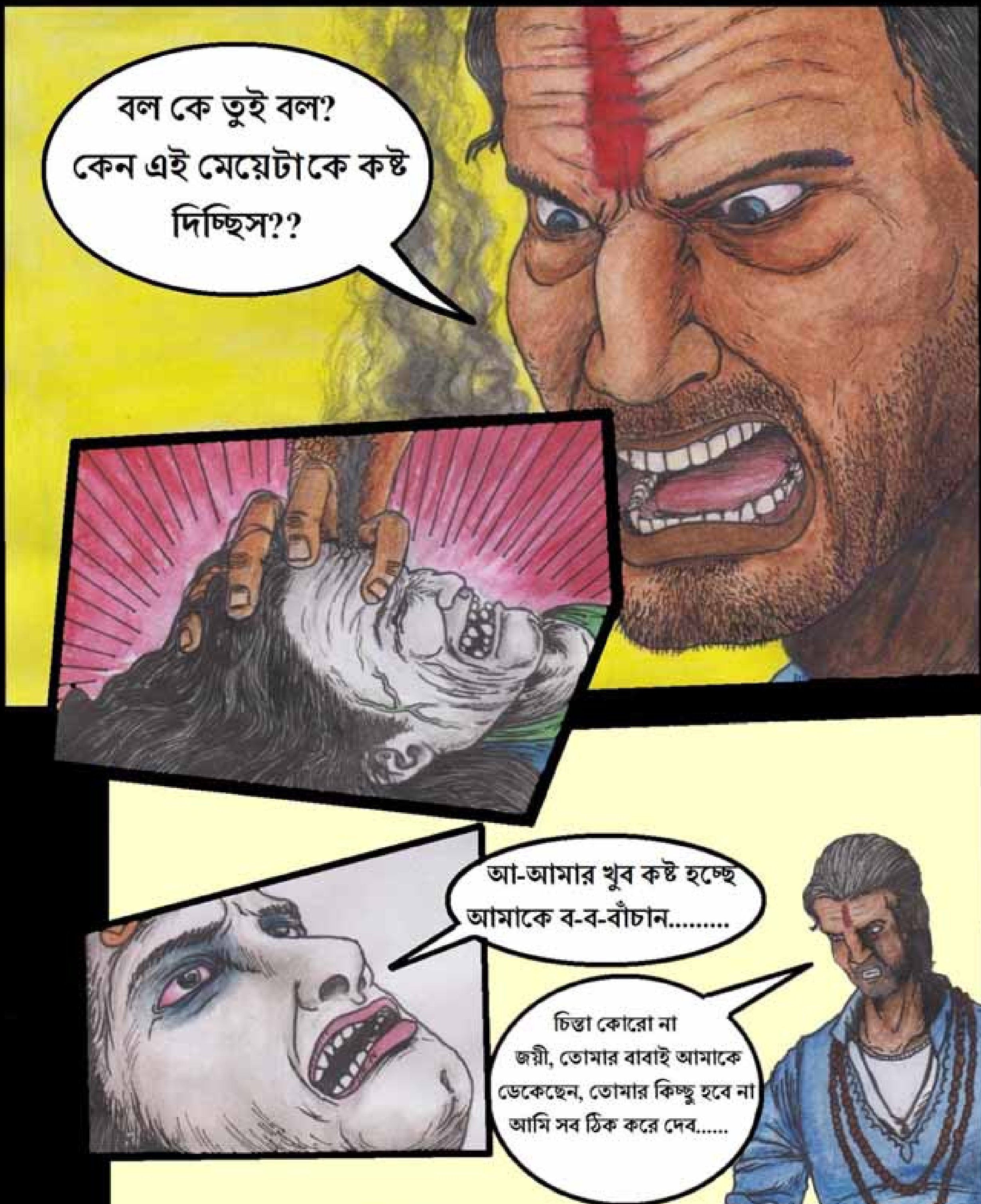
বল কে তুই বল?
কেন এই মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছিস??
আ-আমার খুব কষ্ট হচ্ছে
আমাকে ব-ব-বাঁচান.........
চিন্তা কোরো না জয়ী, তোমার বাবাই আমাকে ডেকেছেন, তোমার কিচ্ছু হবে না আমি সব ঠিক করে দেব......

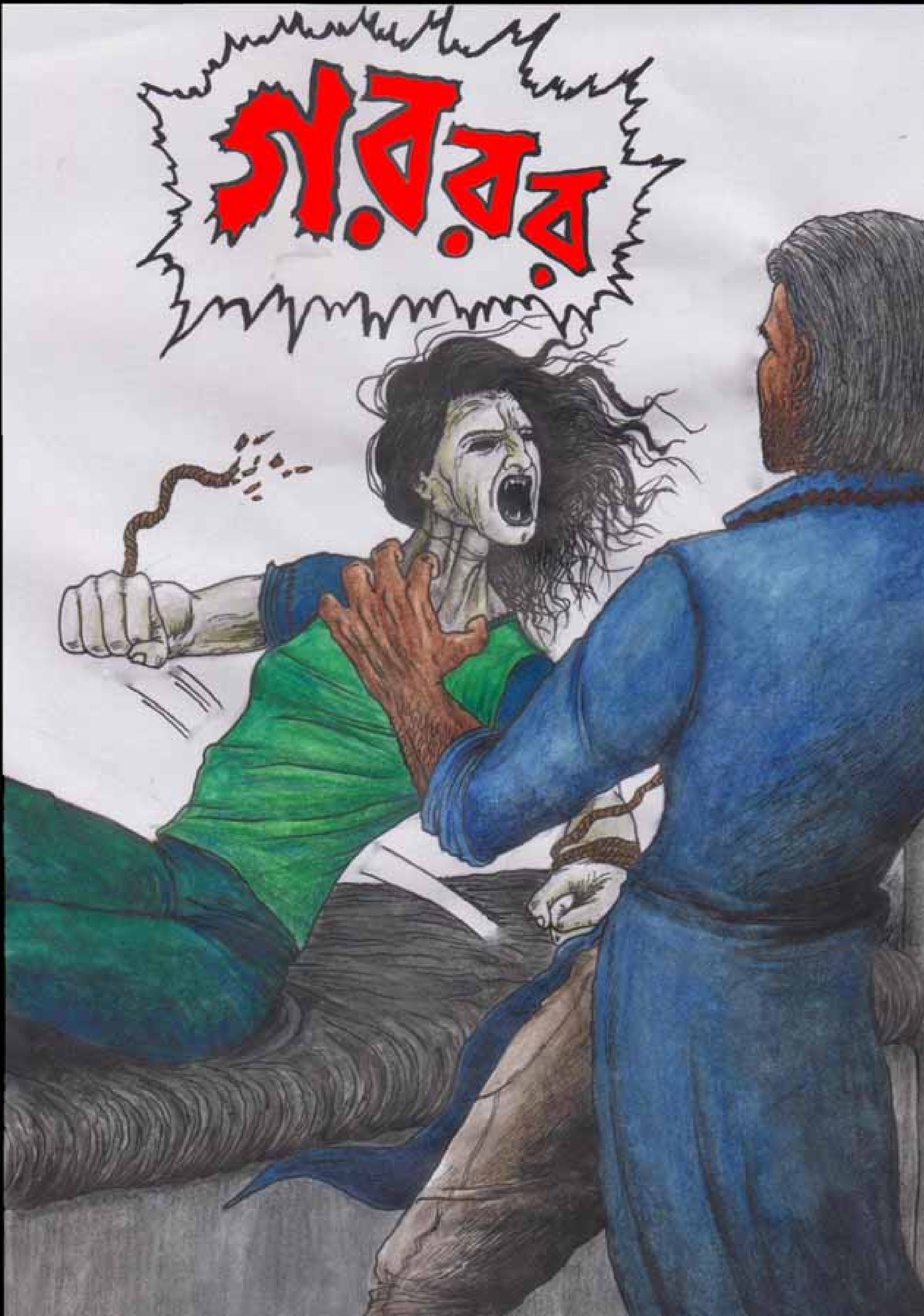
গররর

হতচ্ছাড়া
ফাঁকিবাজ
আরো! কি হচ্ছে এসব?
সামালকে! কাজ চলছে,
সবাই খুব ব্যস্ত!
SWOOSH!
হ্যাঁরে কেউ খেলবি
নাকি? উপস!
রাস্তা ছেড়ে দাঁড়া! যাচ্ছলে!
EVERY DOLLAR LENT MAKES ANOTHER DENT—IN THE AXIS!

ব্যাপারটা কি? সবাই এতো ব্যস্ত কেন?
ধেড়ে হাঁদা! জানিস না শীত আসছে?
হা হা হা! শীত আসছে? কি যে বলে মাইরি!
পাগল কোথাকার! এরকম চকচকে রোদ, আর নাকি শীত আসছে!
এতো তাড়াহুড়োর কি আছে? শীত আসতে এখনো অনেক দেরী!
যা বলেছিস, এরকম চমত্কার দিন কাজ করে নষ্ট করার জন্যে না!
এই যে সুয্যি! এবার আমার পালা, কেটে পড় দিকিনি!
হুমম! আচ্ছা!
বরফ পড়ছে!
WHOOEEEE
এহে, এবার কি হবে? শীতঘুম দিতে হবে, একটা জায়গা খোঁজার দরকার!
ঠিক তো, ঠিক তো! নইলে জমে যাবো তো!
BUY UNITED STATES WAR SAVINGS STAMPS AND BONDS!

চল ভোঁতকা ভালুকের গুহায় যাই!
হ্যাঁ, অনেক জায়গা আছে!
আহা! কি আরাম!
... দারুন!
এই জ্বালাতনের মানে কি? একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করছি ... বেরো এখান থেকে!
ব্র-র-র-র!
এবার কি হবে?
দেখ!
ক্যাঙ্গারুটা আমাদের পাড়ায় নতুন এসেছে!
তাহলে আর দেরী করছি কেন?
HO HUM!
খাসা জায়গা, তাই না?
সুন্দর গরম!
3
BE AN AMERICAN—BUY WAR STAMPS AND BONDS!

SAVE YOUR WASTE PAPER—HELP TO WIN THE WAR!

এহে হে! খাবার-দাবার নেই!
... থাকার জায়গাও নেই!
এবার কি হবে?
জানি না!
উহু-হু! কি খিদে!
উহু-হু-হু! কি ঠান্ডা! কেন যে সময় থাকতে কিছু করিনি!
এবার আমাদের কি হবে?
ভাবতেও ভয় লাগছে!
দেখ!
একটা বাড়ি!
ধর ধর!
পালাচ্ছে!
HA-HA-HA!
5
FOR VICTORY—SAVE FATS, WASTE PAPER AND OLD RUBBER!

When You Finish This Magazine, Send It to a Service Man!

টোটা আর টিটো

স্বাধীনতা দিবস

মূল কমিকসঃ রুডলফ ডার্কস

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

এই দ্যাখ!! কতবড়ো একটা কামান তৈরি করছি। কাল স্বাধীনতা দিবস। সূর্যোদয়ের সময় তোপ দেগে উদযাপন করব।
হুররে!! দারুণ হবে। যাই, টোটা আর আমি কাল সন্ধের জন্য বাজি কিনে আনি।
চায়নাটাউন চল, সবচেয়ে ভালো বাজি পাওয়া যাবে।

সাবধানে ফাটিও বাছারা, দেখো হাতে ছ্যাঁকা না লাগে!
হরেকরকম
চিনেপটকা
চকলেট বোম, দোদোমা, রকেট, কালিপটকা

তুবড়ি, রঙমশাল, ভুঁইচরকি, তারাবাজি
আতসবাজি
চিনেরা বেশ মজার মানুষ তো!
সাবধান!! বিস্ফোরক!
আর যদি না ফাটে তাহলে কিন্তু পয়সা ফেরত নিয়ে যাব, মনে থাকে যেন!
2

তোর ওই কামান পরিদর্শন রাখ এখন। ফটাফট আমার হাতে বাজিগুলো দে...
তুই যাই বল টোটা, কামানটা কিন্তু ক্যাপটেন খাসা বানিয়েছে! এলেম আছে বলতে হবে।
3

আজি এ শুভ লগনে... নতুন দিনের নতুন সূর্য উদিছে দেখ নভে... দেশের তরে প্রাণ দিয়াছেন যাহারা, তোপ দাগিয়া জানাই তাহাদের সেলাম...
মা গো, ভাবনা কেন... আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে...
বারুদ
বারুদ
4

জ জ জ
কামানগর্জনে শহরবাসী বুঝবে কত বড়ো দেশপ্রেমিক আমি, দেশের জন্য আত্মবলিদানে সদা প্রস্তুত...
সলতেয় আগুন দিয়েছিলি তো, টোটা?
কোনওদিন ভুল হয়েছে আমার, টিটো?
জ জ জ
জ জ জ
5

জ জ
গুড়ুম!!
6

দ্রিমি দ্রিমি দ্রাম ভ্যাপ্পোঁ পোঁ..
প্রণমি তোমায় কলম্বাস
ডিঙিয়ে সাগর জলোচ্ছাস
করেছ এ দেশ আবিস্কার
নমস্কার হে নমস্কার...
চির চির
চির
7

গুড়ুম!!
৪

এত সুন্দর তালমিল হবে কে ভেবেছিল! যেন দ্বিতীয় তোপ দাগা হল...
!*-?-!

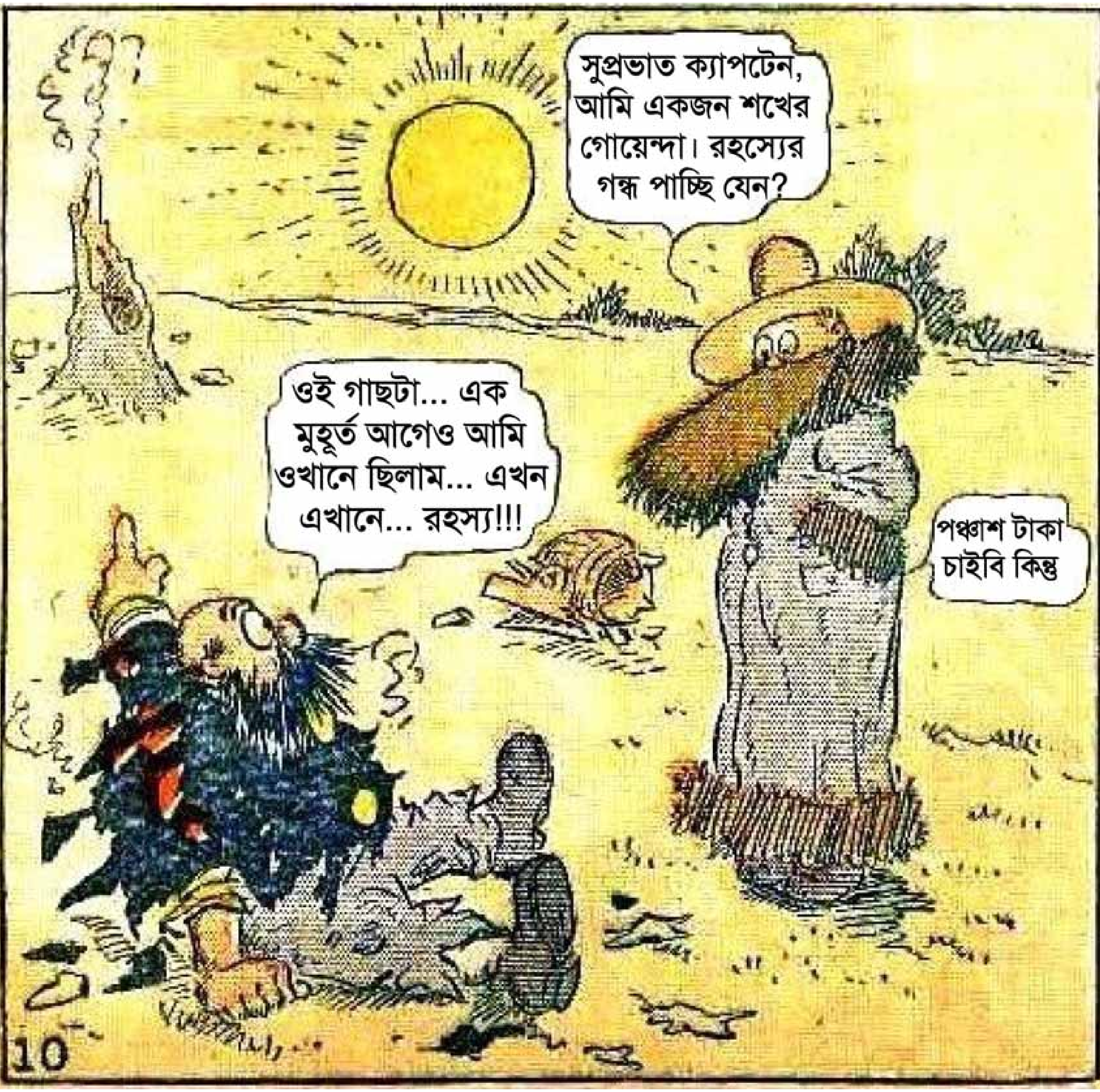
সুপ্রভাত ক্যাপটেন, আমি একজন শখের গোয়েন্দা। রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন?
ওই গাছটা... এক মুহূর্ত আগেও আমি ওখানে ছিলাম... এখন এখানে... রহস্য!!!
পঞ্চাশ টাকা চাইবি কিন্তু
10

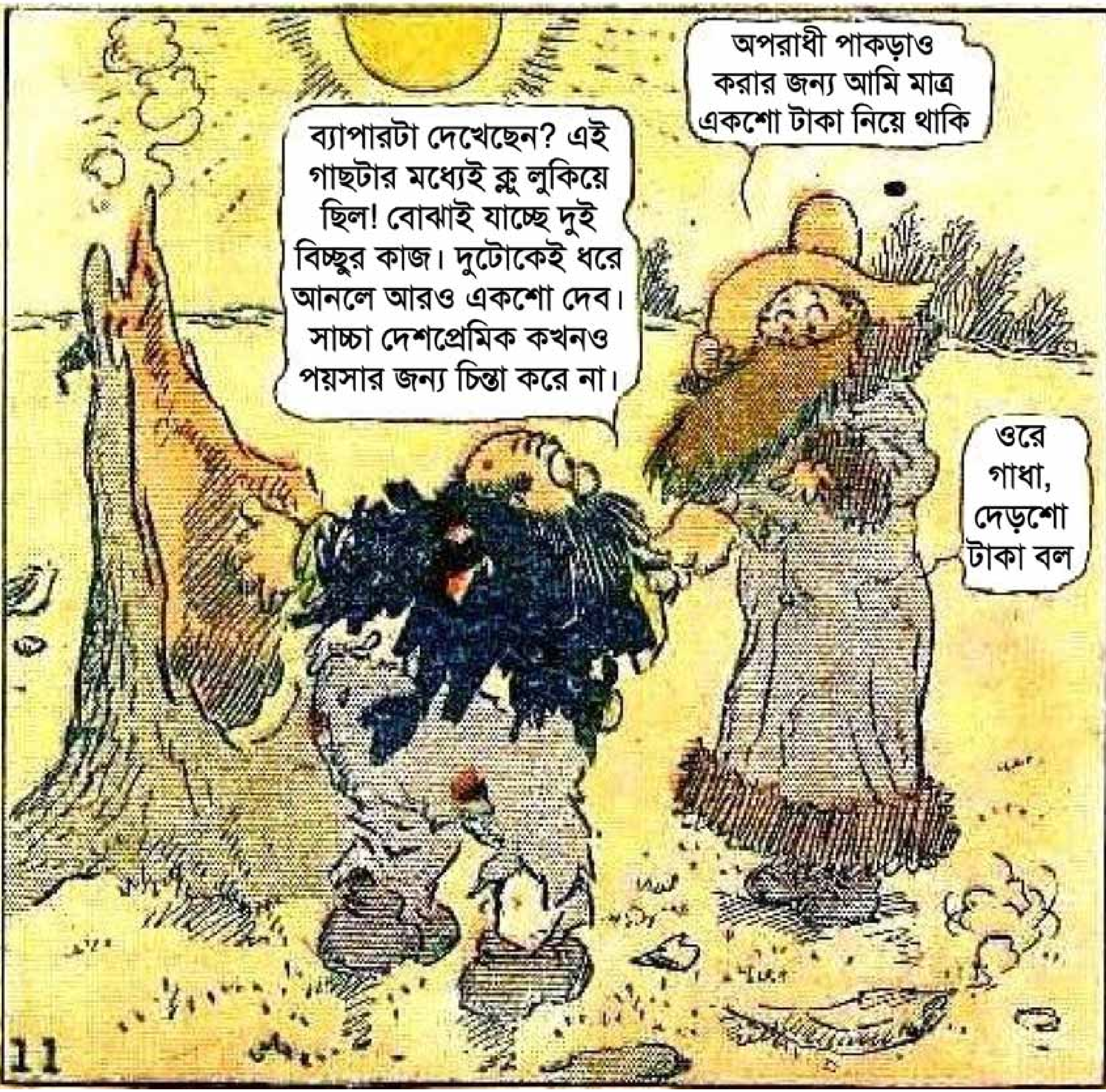
ব্যাপারটা দেখেছেন? এই গাছটার মধ্যেই ক্লু লুকিয়ে ছিল! বোঝাই যাচ্ছে দুই বিচ্ছুর কাজ। দুটোকেই ধরে আনলে আরও একশো দেব। সাচ্চা দেশপ্রেমিক কখনও পয়সার জন্য চিন্তা করে না।
অপরাধী পাকড়াও করার জন্য আমি মাত্র একশো টাকা নিয়ে থাকি
ওরে গাধা, দেড়শো টাকা বল
11

এই টাকা দিয়ে ফের সন্ধের জন্য বাজি কেনা যাবে... রকেট আর দোদোমা... চল আবার চায়নাটাউন যাই।
একজন নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি দেশসেবকের কিনা এরকম হেনস্থা!! ধুর ধুর, গোল্লায় গেছে দেশটা!
আজ্ঞে ওর অর্ধেক আমার। ভালোয় ভালোয় দিবি, নইলে ক্যাপটেনকে সব বলে দেব।
12

গোলোকধাঁধাঁয় ইতিহাস

গল্প ও ছবি - সন্দীপন কর্মকার।

স্যার।
উফ!
বলছিলাম কী আমার একটা প্রশ্ন ছিল।
প্রশ্ন?...... তোর?!........ তা শুনি কী প্রশ্ন?
ইয়ে মানে আমার বাবা আমায় ইতিহাস পড়ানোর সময়ে বলেছিলেন যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি শিম্পাঞ্জী ছিল?
আহা! আমি এখানে সমগ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। তোদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে নয়!
মানে?
আর মানে বুঝে কাজ নেই! নিজের জায়গায় চুপচাপ বস!

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

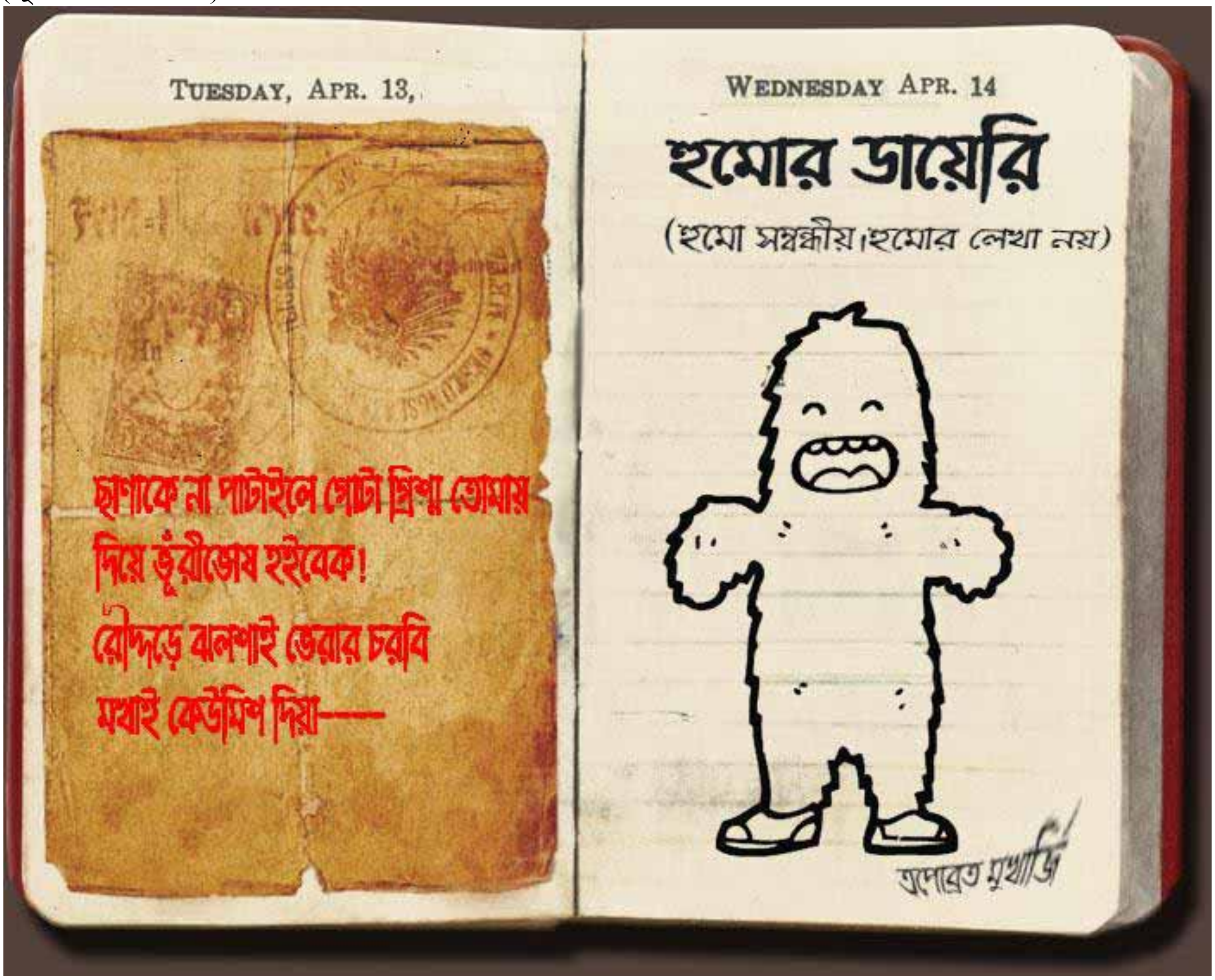

জানিনা বাপু কে কী বলবে, আমি এর মধ্যে আবার হুমোর চিঠি পেয়েছি। সে আসেনি বটে তবে আমার জন্য কিছু কড়া কড়া হুংকার নাকি পাঠিয়েছে। সে চিঠি যে উদ্ধার করেছে তার অবিশ্যি ছবি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে ভয় পাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে তার অর্ধেক চুল পেকে গেল আর বাকি অর্ধেক কাঁচাপাকা। সেই দুঃখে সে ন্যাড়া হয়ে গেল বলে আর ছবি দিলাম না।

যাক গে, চিঠিতে নাকি লেখা ছিল ছানাকে না পাঠালে গোটা গ্রীষ্ম আমায় দিয়ে ভুরিভোজ হবে। ও, এর মাঝে আবার শুনলাম হুমো কীভাবে খায়। করে কী, যার উপর রাগ, তাকে এনে আগে রোদ্দুরে ঝলসায় (হ্যাঁ, রোদ্দুরে), তারপর ভেড়ার চর্বি মাখিয়ে রাখে (ওদের ঘি নেই কিনা, ওইভাবেই ঘিয়ের কাজ সেরে নেয়)। তারপর প্রতি সকালে কিউমিসের সাথে (হ্যাঁ হে, এখানাও লেখা ছিল। ও খাবারটা আবার ওদের বিশেষ রুশী ফিরিওলা এসে পৌঁছে দিয়ে যায় নাকি! ব্যাপারই অদ্ভুত!) একটু একটু করে খায়।

তো, আমি তো বলেইছি যে এই ইয়েতিছানা এখানে এসে এমন মানুষ মানুষ হয়ে গেছে যে আর চেনাই যায় না। কিন্তু সে কথা দাদুকে কে বোঝাবে। ঘর ছাড়ুক আর যাই হোক, বংশের ছানা তো বটে! এই তো, সেদিন দেখি খচাখচ ছবি তুলছে। স্মার্ট ছানা। বিশেষ ইয়েতি ক্যামেরায় তোলা ছবি। এক ভেবলুর ছবি তুলেছিল, তাকে চেনাই গেল না এত দারুণ লাগছে! যাক, এ সব মানুষের কম্মো নয় বটে।

হ্যাঁ, তো যা বলার জন্য এখানে এসব লিখে যাচ্ছি তা বলি। আমায় গরম অব্দি সময় দিয়েছে। এখুনি আসতো, নেহাত একটু ঠাণ্ডা পড়ে গেল তাই আসছে না। ঠাণ্ডা হলে মানুষের সর্দি লাগে আর তখন তন্দুরি করলেও মানুষগুলো ঝোল ঝোল খেতে লাগে। হুমোরা আবার বেশি ঝোল খায় না। ওইজন্যে গরমকাল অব্দি আছি। তারপর...

যাক গে। এর আগে তো ভয়ে কদিন খাটের তলায় লুকিয়ে ছিলাম। তারপর মনে পড়ল,এই যাঃ, কীরকম দেখতে হুমোকে তা-ই তো লেখা হল না। হ্যাঁ হে, এদের অবশ্য বিশেষরকম দেখতে বটে। দুম করে সামনে পড়লে প্রথমে মনে হবে সান্তাক্লজ, তারপর মনে হবে সাদা-পাগড়ি মনমোহন সিং নয়তো? আরও সামনে এলে দেখবে, নাঃ, মনমোহন নয়, বরং বেশ ক্যাবলাথেরিয়ামের মত দেখতে। কেন যে একটু দূর থেকে ওরকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল সে কথা বুঝতেই পারবে না। অবশ্য বোঝার সময় দিচ্ছে কে? তোমায় সামনে পেলে সে আগে হাত, পা, নাকের ফুটো এসব দেখবে। হাত পায়ে মাংস থাকলে ভালো, শুধু হাড় হলে আরও ভালো। আর নাকের ফুটো দিয়ে এক্স-রে ফেলে হুমোরা মানুষ কেমন বুঝতে পারে। হুমোদের দেখলেই দেখতে পাবে (মানে যখন তোমায় ধরে ওরা উল্টেপাল্টে দেখবে আরকি) মাথার ঠিক মাঝখানে একটা বড় আব আছে। ওখানা ওদের এক্সরে মেশিন। অবশ্য তোমার হাত পা ভাঙলে তুমি বাতিল। ওই যেভাবে বার্ডফ্লু ওলা মুরগি বাতিল করে দেওয়া হয় তেমনি আরকি। তবে ওরা ঘাড় মটকায় না। তুলে নিয়ে শুধু টুপুস করে গড়িয়ে দেবে। তারপর এই শীতকালে ওদের নাতি নাতনি, মানে ওই ইয়েতিছানারা আরকি, তারা জ্যান্ত স্নোম্যান পেয়ে খেলবে। সে খেলার রকম আর বললাম না, শেষে লোকজন ভয় পেয়ে পাহাড়ে যাওয়াই বন্ধ করুক আর হুমোর পাশাপাশি আরও সব্বাই আমায় খুঁজে বেড়াক আর কি!

আসল কথা আরও একখান আছে, শোন বলি। যদি সব্বাই আমায় ভালোটালো বাসোটাসো, তবে সেই ছানাকে খুঁজেপেতে ধরে দিয়ে যাও তো বাপুসকল! ঘরের নাতিপুতি ঘরে যাক! কী কেলো করেছিলাম বল দিকিনি, এই বুড়োবয়েসে এখন ভেগে বেড়াতে হচ্ছে!... যাক গে, কথাখান মনে রেখো কিন্তু...

ক্রমশ

আবার যমধারার জঙ্গলে

দীপক দাস

এক

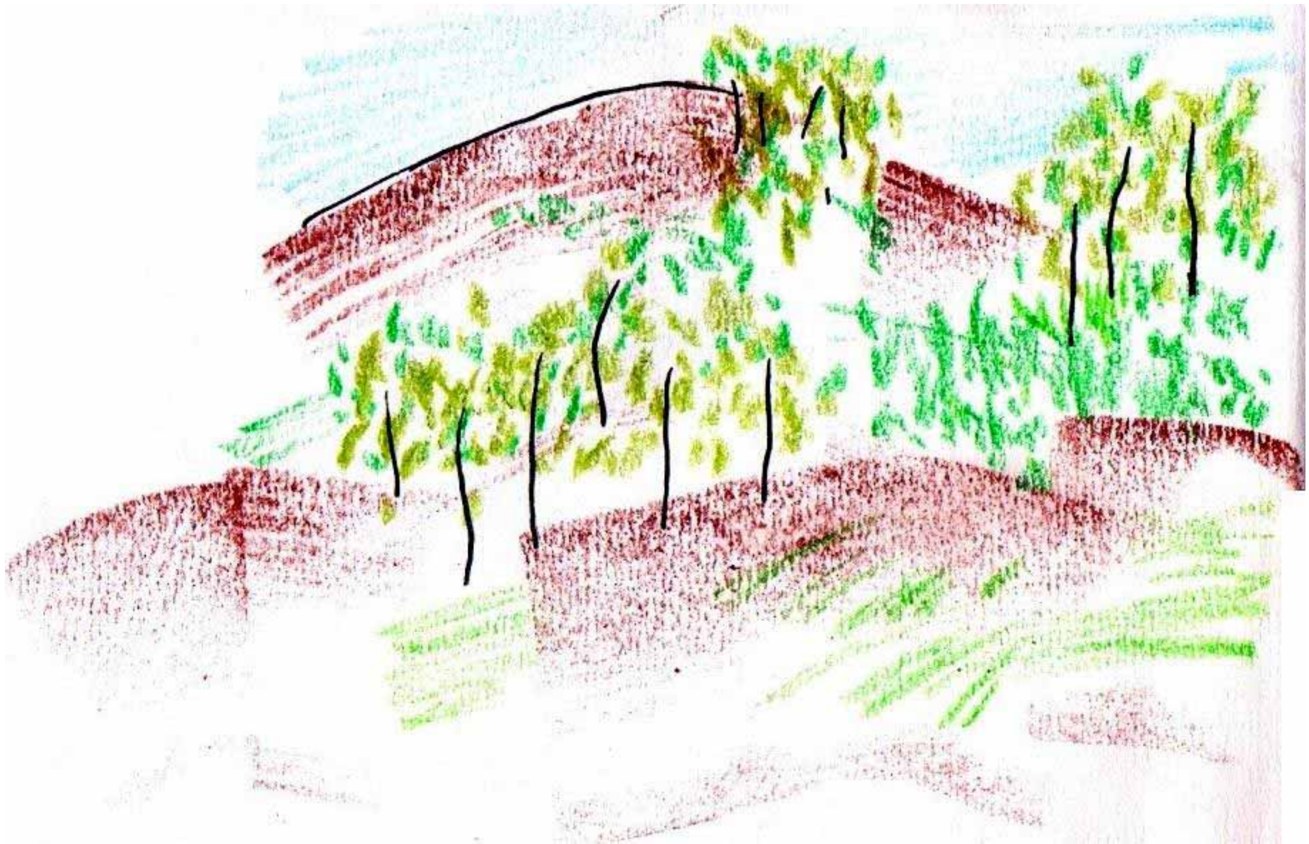

ইনবক্সে ক্লিক করতেই চমকে উঠলাম। অয়নদার মেসেজ! কী করে সম্ভব এটা? অয়নদা তো মাসতিনেক আগেই হারিয়ে গিয়েছে! যমধারার জঙ্গলে আমরাই তো সেই হারানোর সাক্ষী। বা আমরাই দায়ী। পিসিমণি তো তাই মনে করে। বুকটা একটু দুরুদুরু করছিল। ভয়ে ভয়েই অয়নদার মেসেজ বক্সে ক্লিক করলাম। ইনবক্সে লেখা, 'ফ্লাই ক্যাচারের বিজ্ঞানসম্মত নাম জানিস?'

এ তো অয়নদা ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না! সেই বৈশিষ্ট্য। পক্ষীবিশারদ এই পিসতুতো দাদাটি কিছুতেই কোনও পাখির চেনা নাম বলতে চায় না। জিজ্ঞাসা করলে খটোমটো একটা বৈজ্ঞানিক নাম বলে মুখটা গম্ভীর করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখে। নয়তো আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে।

দুই সহোদর বাড়িতে নেই। ফোন করলাম শুভকে। শুভ জানাল, ও বড়গাছিয়ায় জেরক্স করাতে গিয়েছে। এখন অনলাইন হতে পারবে না। ইন্দ্রকে ফোনে ধরলাম। ও বলল, 'দাঁড়াও, দেখে বলছি।'

কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্রর ফোন। ওর ইনবক্সেও অয়নদার হেঁয়ালি ভরা মেসেজ। জানতে চেয়েছে, পার্পল সানবার্ড নামে কোনও পাখি ইন্দ্র চেনে কি না? ইন্দ্রও ভীষণ অবাক। অয়নদার হেঁয়ালির উত্তর দেওয়া যায় এখনই। গুগলে সার্চ করলেই এক নিমেষে বেরিয়ে আসবে উত্তর। কিন্তু হেঁয়ালি নয়, আমরা চিন্তিত মেসেজগুলোর উৎস নিয়ে। তাহলে কি অয়নদা হারায়নি? বা হারিয়ে গেলেও আবার ফিরে এসেছে? লুকিয়ে থেকে আমাদের সঙ্গে মজা করছে? দলের সকলকে ফোন করে দিলাম, 'বিকেলে নবারুণ মাঠে চলে আয়।'

মাঠেই পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। ওটা অয়নদাই। আমরা দলে আটজন। তাদের মধ্যে চারজনের ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট আছে। চারজনকেই অয়নদা ইনবক্স করেছে। সবই পাখিসংক্রান্ত জিজ্ঞাসা। তার মানে অয়নদা ফিরে এসেছে। বাড়িতে বসে আমাদের সঙ্গে মজা করছে। ঠিক হল, এরকমই বিকেলে খেলতে বেরিয়ে আমি, শুভ আর দীপু টুক করে একবার পিসির বাড়ি ঘুরে আসব। ট্রেনে বেশিক্ষণ লাগে না। পাতিহাল থেকে কোনা গোটা সাতেক স্টেশন। সন্ধের আগেই বাড়ি ফেরা যাবে। মা কিছুই বুঝতে পারবে না। অনুমতি নিতে গেলে মা আর যেতেই দেবে না।

পরদিন গেলাম অয়নদাদের বাড়ি। পিসিমণি আমাদের তিনজনকে দেখে মোটেও খুশি হয়নি। মুখ দেখে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে বেশ। তার মানে এখনও পিসিমণি মনে করে, অয়নদা হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমরাই দায়ী। কী আর করা! এটাই হয়। খবরের কাগজে তো পড়ি, ঘুরতে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুর্ঘটনায় কোনও বন্ধু মারা গেলে বাকিদের কী দুর্দশা হয়। মৃত বন্ধুর বাবা-মা খুনের মামলা দায়ের করে চোখের জলে নাকের জলে করে ছাড়েন বাকিদের। কোনও বন্ধু স্বেচ্ছায় বাড়ি ছাড়লেও বিপদ। কাছের বন্ধুদের বিরুদ্ধেই অপহরণের মামলা। পিসিমণি তো সেখানে শুধু মুখটা গোমড়া করে আছে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে অবশ্য সম্পর্কের পাট চুকিয়ে দিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। জঙ্গল থেকে হারিয়ে যাওয়া ছেলের তিনমাস খোঁজ না মিললে খারাপ কিছুই ধরে নেয় বাবা-মা। পিসিমণির ব্যবহারে মন খারাপ হয়নি আমাদের।

তবে আমাদের উত্তর পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অয়নদা ফেরেনি। ফিরলে পিসিমণি সেই উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারত না। আমরা ফিরে এলাম।

বাকিরা আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল। অয়নদা ফেরেনি শুনে মনমরা হয়ে গেল সকলে। ব্যাপারটি কী ঘটছে, ভাবছি। কৃষ্ণ বলল, "ফেসবুকে লগ ইন করে দেখ না, আর কোনও মেসেজ এসেছি কি না?"

ফেসবুক খুললাম। ইনবক্সে দুটো মেসেজ। একটা অয়নদার। ওর মেসেজ পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর তাকালাম সঙ্গীদের দিকে। ওদের মধ্যেই কি কেউ ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছে? না হলে অয়নদা বা অয়নদার হয়ে মেসেজ করা কেউ জানল কী করে, আমরা ওর বাড়ি গিয়েছিলাম?

আমার মুখ-চোখ দেখে বাকিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সকলে 'কী হয়েছে, কী হয়েছে' বলতে বলতে কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু আমি টুক করে পেজটা মিনিমাইজ করে দিলাম। একটু পরীক্ষা করে নেওয়া যাক। ওদের বললাম, "তোরা এক এক করে ফেসবুক লগ ইন কর। দেখা যাক অয়নদা তোদের কী বার্তা পাঠিয়েছে।"

যাদের ফেসবুকে প্রোফাইল আছে তারা তাই করল। মেসেজ পড়ে আমারই দশা হল ওদের। সকলের ইনবক্সে একই মেসেজ, 'কী রে, আমাদের বাড়ি গেলি?' লেখার শেষে শয়তানি হাসি মার্কা একটা ইমোজি। বোঝাই যাচ্ছে, একটা মেসেজই কপি-পেস্ট করা হয়েছে সকলের ইনবক্সে।

এবার তাহলে কী করণীয়? ভাবছি। হঠাৎ মনে হল, কৃষ্ণ উঠে এসে ওর ফেসবুক লগ ইন করেনি। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম। ফোনে কীসব খুটখাট করতে করতেই কৃষ্ণ জানাল, ও নাকি ওর ফোনেই দেখে নিয়েছে। ওকেও একই মেসেজ দিয়েছে অয়নদা। আমরা সকলে কৃষ্ণের মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। ও ফোন থেকে মুখ না তুলেই বলল, "একবার ইনবক্স করে দেখ না, অয়নদা অনলাইনে থাকলে উত্তর দিতে পারে। সরাসরি কথা হলে ওটা অয়নদা না অন্য কেউ বোঝা যাবে।"

আমি ইনবক্সে লিখলাম, 'তুমি কি অয়নদা? যদি হও তাহলে এত রহস্য করছ কেন? জান না, তোমাকে হারিয়ে আমরা কী কষ্টে আছি?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেসেজটা যে দেখা হয়েছে সেই চিহ্ন ফুটে উঠল। তার পরক্ষণেই দেখা গেল, কেউ কিছু একটা টাইপ করছে।

ইনবক্সে মেসেজ ঢুকল। তাতে লেখা, 'আমি কে জানতে চাও? তাহলে যমধারার জঙ্গলে আবার যাও। উত্তর আছে সেখানেই।'

দলের সকলেই আমার ঘাড়-মাথার উপর দিয়ে উঁকি মেরে চ্যাট দেখছিল। শুধু কৃষ্ণ ছাড়া। ও মোবাইলে খুটখাট করেই চলেছে। আমাদের দলে ওরই একমাত্র স্মার্টফোন আছে।

মেসেজ দেখে শুভ বলল, "তাহলে এখন উপায়? অয়নদা তো যমধারায় যেতে বলছে! কিন্তু ওখানে যাচ্ছি বললে কারও বাড়ি থেকে ছাড়বে না।"

শুভ ঠিকই বলেছে। যমধারা পর্বের পরে আমাদের সকলের বাড়িতেই কমবেশি সমস্যা তৈরি হয়েছিল। যদিও কিছুদিনের মধ্যে অভিভাবকেরা বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের কোনও দোষ নেই। তাছাড়া অয়নদাকে গুম করার পেছনে আমাদের কোনও স্বার্থ থাকতে পারে না, সেটা বোঝা বড়োদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যমধারার নাম উচ্চারণ করলে ওরা আটকাবেই। উপায় বের করল ইন্দ্রই। বলল, "অয়নদাকে সমস্যার কথাটা বল।"

ইনবক্স করলাম। উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গেই। প্রথমে একটা ভ্যাংচানো মিনিয়নসের ইমোজি। তারপরে উত্তর, 'এটা কোনও সমস্যা! কোনও বন্ধুর নাম করে বেরিয়ে এস।'

"কী রে, কী করবি?" দলের কাছে জানতে চাইলাম।

বাবলা কিছু একটা বলতে চাইছিল। তার আগেই দীপু বলে উঠল, "একটা জিনিস খেয়াল করেছ? অয়নদা বা যেই হোক না কেন হঠাৎ তুই থেকে তুমিতে চলে গিয়েছে।"

সত্যিই তো! এটা খেয়াল করিনি তো আমরা! তার মানে কি এটা অয়নদা নয়? ওকে কেউ বা কারা আটকে রেখে ফাঁদ পাতছে আমাদের জন্য? রাজা বলল, "ফাঁদ পাতলেও আমাদের যাওয়া উচিত। অয়নদাকে আটকে রাখা হয়েছে আর আমরা ঘরে বসে থাকব? তাছাড়া ফাঁদ পাতার সম্ভাবনাই বেশি। যে ইনবক্স করছে সে কিন্তু মোবাইল থেকে নয় কম্পিউটার বা ল্যাপি থেকে ফেসবুক করছে। তার মানে ঘরে বসে নিশ্চিন্ত মনে আমাদের নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু কেন? সেটা আমাদের জানা উচিত।"

তাহলে কী করে বাড়ি থেকে বেরনো যাবে? আমার মধ্যম সহোদর প্রস্তাব দিল, "আমরা যেমন মাঝে মাঝে ঘুরতে বেরোই সেইরকম বেরিয়ে সোজা বাঁকুড়া চলে যাব।"

আমার মধ্যম সহোদরটি মুখ খুললেই আমরা মজা পাই। এমন অবাস্তব সব তত্ত্ব-যুক্তি খাড়া করে যে তা নিয়ে মাসখানেকের জন্য অনাবিল মজার রসদ মেলে। ধেপুর প্রস্তাবে রে রে করে উঠল শুভ, "তোমার বিরাট বুদ্ধি! আটজনের বাড়ির লোককে চিন্তায় ফেলে রহস্য উদ্ধারে যাবে। উলুবেড়িয়া টপকাতে পারবে? বাড়ির লোক পুলিশে খবর দেবে। চ্যানেলগুলো সারাক্ষণ আমাদের ছবিসহ সেসব ব্রেকিং নিউজ করে দেখাবে। আর সাঁতরাগাছি বা উলুবেড়িয়ায় পুলিশ আমাদের ট্রেন থেকে ঘাড় ধরে নামিয়ে নেবে।"

ঝাড় খেয়ে ধেপু চুপ করে গেল। কিন্তু বাড়িতে বলে বেরনোর উপায় কী? দীপু বলল, "কচি আর ঋতুর বাড়ি যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পড়তে পারি। বলব, ওদের দু'জনের পরপর জন্মদিন।"

কচি আর ঋতু দীপুর বন্ধু। কচির ভাল নাম শুভ। কিন্তু দলে একটা শুভ থাকায় ওকে আমরা কচি বলে ডাকি। ওর বাড়ি সোনারপুর আর ঋতুর বাড়ি বহরমপুর। দু'চারদিন সময় লাগবে বাড়ি ফিরতে। আমি বললাম, "অয়নদার ঘটনার মাসতিনেকের মধ্যে আবার একসঙ্গে বেরোতে গেলে বাড়ির লোকের সন্দেহ হতে পারে। তুই ওদের ফোন করে সতর্ক করে দে। বাড়ি থেকে ফোন করলে ওরা যেন বলে ওদের জন্মদিনে আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে।"

"আমরা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও তো বাড়ির লোক ফোন করতে পারে!"

ইন্দ্রর সংশয়ে আমি বললাম, "সে করতেই পারে। কিন্তু আমরা সেই সুযোগ দেব না। সবাই নিয়মিত ব্যবধানে পরপর যে যার বাড়িতে ফোন করব। তাতে বাড়ির লোক নিশ্চিন্ত থাকবে। অন্য কোনও সন্দেহ করবে না। কিন্তু তার আগে কবে আমাদের যেতে হবে সেটা জেনে নিতে হবে।"

আমি ইনবক্স করলাম, 'আমাদের কবে যেতে হবে?' উত্তর এল, 'পরশুদিন। আর একটা কথা, পুলিশে খবর দিয়ে লাভ নেই। তাহলে রহস্যের সব সমাধান আবার যমধারার জঙ্গলে হারিয়ে যাবে।'

পুলিশে খবর দেওয়ার কথাটা মাথাতেই আসেনি। অয়নদাকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাতেই খুশি ছিলাম আমরা। উত্তরটা দেখে নিয়ে দীপুকে বললাম, "কচি আর ঋতুকে ফোন করে দে।"

দুই

ট্রেন সাঁতরাগাছি ছেড়েছে কিছুক্ষণ আগে। হেলেদুলে এগোচ্ছে। মাথার উপরে একটা রেলসেতু। হাওড়া-আমতা লাইন। আমাদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা। আগেরবারে বাঁকুড়া যাওয়ার সময়ে আমরা প্রচুর আনন্দ করেছিলাম। কিন্তু এবার চুপচাপ সকলেই। কী হচ্ছে আর কী হতে চলেছে কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ঝুঁকিটা অনেকখানি নিয়ে নিয়েছি আমরা। আগেরবারে সঙ্গে অয়নদা ছিল। সে আমাদের বড়ো। এবারের দলে সবচেয়ে বড়ো আমি। পুরো দলের সব দায় আমার। চাপটা বুঝতে পারছি।

ইন্দ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। ট্রেনে সক্কাল সক্কাল ঝালমুড়ি উঠেছে। আগেই দেখেছি, ও বারবার আড়চোখে সেদিকে তাকাচ্ছে। শুভও একফাঁকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে বসে আছে। গম্ভীর পরিবেশ দেখে নিজে থেকে কিছু বলছে না। ইন্দ্র বোধহয় থাকতে পারছিল না। কিন্তু ওর বলার আগেই কৃষ্ণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "ইনবক্স, ইনবক্স।"

ও ফোনটা আমার হাতে দিল। অয়নদার ইনবক্স, 'ট্রেন ছাড়ল? তোমার ফোনে নেট প্যাক ভরা আছে তো? নাকি এবার এস.এম.এস.-এ কথাবার্তা হবে?' এই বার্তা কৃষ্ণের জন্য। কারণ, আমাদের বাকি তিনটি ফোনে ফেসবুক খোলা যায় না। নেটের ব্যবস্থা নেই। লোকটি অয়নদা বা যেই হোক, আমাদের সম্পর্কে সবই জানে দেখছি।

কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী রে, নেট প্যাক আছে তো?"

ও বলল, "দু'দিন চলে যাবে।"

সেটা ওই রহস্যময়কে জানিয়ে দিতে বললাম। তারপর ঝালমুড়ি ডাকলাম। ইন্দ্র আর শুভর অবস্থা খুব খারাপ।

ট্রেনে আর কিছু ঘটেনি। কোনও বার্তাও আসেনি। ঝালমুড়ি খেয়ে ইন্দ্র আর শুভ ঘুমিয়ে পড়েছিল। জানলার ধারে বসে বাবলা আর ধেপু গল্প করছিল। দীপু, রাজা চুপ করে বসে আছে। দলে ওরাই সবচেয়ে ছোটো। হয়তো মনে মনে টেনশন করছে। কৃষ্ণ মোবাইল রেখে শান্ত হয়েছে। আর আমি আগাগোড়া ভেবে চলেছি। এতগুলো ছেলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঠিক করলাম?

বাঁকুড়া স্টেশনে নেমে বুঝতে পারছিলাম প্রকৃতির প্রবল টানাটানি। ওদের বসতে বলে আমি এগিয়ে গেলাম শৌচালয়ের দিকে। দেখি, পেছন পেছন প্রায় পুরো পল্টন চলেছে। স্টেশনের বেঞ্চে বসে আছে শুধু রাজা, বাবলা আর কৃষ্ণ। মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে দেখি, বাবলা আর রাজা ঝিমোচ্ছে। কৃষ্ণর টিকির দেখা নেই। ব্যাগপত্তর পায়ের কাছে জড়ো করা। কেউ নিয়ে গেলে কিছু করার নেই। শুভ ওদের ভয় দেখানোর জন্য একটা ব্যাগ আস্তে করে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করতেই বাবলা মাথা তুলল। ওকে গোল করে ঘিরে আছি দেখে কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে বলল, "ঘুমোইনি। চোখ বুজে বসেছিলুম।"

দীপু ব্যঙ্গ করে বলল, "তা তো দেখতেই পেলুম।"

কৃষ্ণ কোথায় জানতে চাইলাম আমি। ততক্ষণে রাজাও চোখ মেলেছে। ও বলল, "পরোপকার করতে গিয়েছে।"

"মানে?"

রাজা জানাল, "একজন এসে একটু সাহায্য করার কথা বলল। কৃষ্ণদা তার সঙ্গে গেল।"

"কতক্ষণ আগে?"

"তোরা যাওয়ার দু'তিন মিনিটের মধ্যেই।"

আমি বললাম, "এতক্ষণ পরোপকার করে পুণ্যফল ভোগও নিশ্চয় হয়ে গিয়েছে। ওকে ফোন করে ডেকে নে। অনেকটা পথ কিন্তু এখনও।"

আমি আমার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলাম। অন্যেরাও যে যার ব্যাগের দখল নিচ্ছিল। তখনই ইন্দ্র বলল, "ফোন সুইচড অফ বলছে।"

শুনেই রাগ হল আমার। নিশ্চয়ই ফোনের চার্জ শেষ। সারাক্ষণ ফোনের পেছনে পড়ে থাকলে এরকমই হয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে। দীপু, শুভ আর বাবলাকে প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক ঘুরে আসতে বললাম। ইন্দ্র ফোনে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরে এল। কৃষ্ণর দেখা নেই। আমাদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। ঠিক তখনই আমার ফোনে একটা এস.এম.এস. এল। অজানা নম্বর। তাতে লেখা, 'কৃষ্ণ আমাদের কাছে আছে। চিন্তা নেই। যাই ঘটুক না কেন, তোমরা যাতে বাঁকুড়া ছেড়ে পালাতে না পার সেই ব্যবস্থাটা করে রাখলাম।'

তার মানে তো অপহরণ। বাঁকুড়ায় পা দিতে না দিতেই একজন উবে গেল! শুভ বলল, "বড়দা, একটা জিনিস ভেবে দেখ। এই দিনেরবেলা লোক গিজগিজ করা স্টেশন থেকে অপহরণ করা কি সোজা কথা?"

চুপ করে রইলাম। শুভর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু কৃষ্ণ নেই, ওর ফোন বন্ধ আর এস.এম.এস.-এর বক্তব্য মেলালে তো অসম্ভব বলে মনে হয় না। ওকে বললাম, "কী হতে পারে, কী হওয়া সম্ভব সেটা ভেবে আর লাভ নেই। কৃষ্ণ যে আমাদের সঙ্গে নেই সেটা তো সত্যি।"

ধেপু হঠাৎ বলল, "দাদা, ধর যে লোকটা সাহায্য করার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সে হয়তো স্টেশন ওয়াগান টাইপের কোনও গাড়িতে কিছু তুলে দিতে বলেছিল। কৃষ্ণ যেই উঠেছে ওমনি নাকে ক্লোরোফর্ম দেওয়া রুমাল চেপে ধরেছে।"

আমার মধ্যম সহোদরটি একসময় গোয়েন্দা স্বপনকুমারের ভক্ত ছিল। ও সেই পঠিত বিদ্যা প্রয়োগ করছে। আমি মুখে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করার ইশারা করলাম।

কিন্তু এখন কী কর্তব্য? দীপু কী একটা বলতে যাচ্ছিল আমার মোবাইলটা টুং করে বেজে উঠল। আবার এস.এম.এস.। এবার স্পষ্ট নির্দেশ, 'স্টেশনে বসে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। গন্তব্যের দিকে রওনা দাও। আর হ্যাঁ, পুলিশে না যাওয়ার কথাটা নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না?' বুঝতে পারলাম, বাঁকুড়ায় পা দিয়ে আমরা অন্য কারও ফাঁদে পা দিয়ে দিয়েছি।

নির্দেশিত গন্তব্য বলতে তো যমধারার জঙ্গল। আরণ্যক গেস্ট হাউস।

তিন

আরণ্যক গেস্ট হাউসের ম্যানেজার তাপসদা দেখলাম আমাদের মনে রেখেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু খবর আছে নাকি দাদা? আবার এলেন?"

তাপসদার প্রশ্ন শুনে সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে শুরু করল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "না না, দাদার জন্য মন খারাপ লাগছিল। তাই আবার এলাম। পুলিশ তো হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমরা একবার দেখি।"

ঘর ফাঁকাই ছিল। ডর্মিটরিটা নিলাম।

এলাকাটা খুব সুন্দর। কাছে পাহাড়। গেস্ট হাউসের কাছে জঙ্গল। কাছাকাছি সুন্দর গ্রাম। প্রবল প্রকৃতির মধ্যে থেকেও তা দেখার মন নেই আমাদের। মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা নিয়ে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করা যায় না। মনটা যে মোবাইলে পড়ে আছে! ঘন ঘন মোবাইল দেখছি, সেই অদ্ভুত লোকটা বা অয়নদার কোনও নির্দেশ এল কি না। কাজ না থাকলে যা হয়। তার আগে যে যার বাড়িতে ফোন করে দিয়েছি। কৃষ্ণর বাড়িতে ইন্দ্র ফোন করেছে। বলেছে, আমরা পৌঁছে গিয়েছি। কৃষ্ণ আর সহ্য করতে পারছিল না। এসেই বাথরুমে ছুটেছে। বাড়ির লোক চিন্তা করবে বলে ও ফোনটা করে দিল।

খাওয়াদাওয়ার পরে শুয়ে শুয়ে ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ 'লেগেছে লেগেছে' চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘুম চোখে দেখলাম ইন্দ্র ওর ফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। ফোনটা কানে দিতে শুনি, একটা যান্ত্রিক স্বর। কেউ ফোন কেটে দিলে এই কথাগুলো সিস্টেম থেকে জানানো হয়। ইন্দ্রকে ফোনটা দিয়ে বললাম, "লেগেছিল হয়তো। কিন্তু বুঝতে পেরে কেটে দিয়েছে। কিন্তু কার ফোন লেগেছিল?"

ইন্দ্র বলল, '"কৃষ্ণর ফোন।"

যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে তার ফোন খোলা! সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র উত্তর দিল, "আর খোলা নেই।"

ব্যাপারটা কী হচ্ছে! "সম্ভবত কৃষ্ণ কিডন্যাপারদের নজর এড়িয়ে ফোনটা হাতে পেয়েছিল। কিন্তু ওদের চোখে পড়ে যাওয়ায় ফোনটা আবার কেড়ে নিয়ে সুইচ অফ করে দিয়েছে।" ধেপুর মতো দীপুরও গোয়েন্দা গল্প পড়ার পোকা নড়ে উঠেছে।

আমি কিছু বলার আগেই বাবলা বলে উঠল, "তাই যদি হতো তাহলে তো কৃষ্ণ আগে ফোন করত। কিন্তু ফোন তো ইন্দ্রদা চেষ্টা করতে করতে লেগেছে।"

কথার যুক্তি আছে। সকলেই চুপ করে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আধা চিৎকার করে উঠল ধেপু। কোনও কিছু মাথায় এলে ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ধেপু উত্তেজিত স্বরে বলল, "বুঝতে পেরেছি। কৃষ্ণকে কেন কিডন্যাপ করেছে জানিস? ওর ফোনে তো নেট আছে। যে নম্বর থেকে এস.এম.এস. আসছে ট্রু কলারে সার্চ করলেই তো সেটা কার নামে নেওয়া হয়েছে জেনে যেত। তাই ওকে আগে সরিয়ে দিয়েছে।"

শুভ ধেপুকে বলল, "মেজদা, মাথা ঠান্ডা কর। কৃষ্ণকে যদি কিডন্যাপ না করত তাহলে তো ওই রহস্যময় নম্বরের মেসেজ করার দরকারই হত না। ফেসবুকে যোগাযোগ করত।"

ধেপু চুপ করে যায়। আমার হঠাৎ মনে পড়ে, অয়নদা যে লোকটার কীর্তি দেখাতে আমাদের যমধারায় এনেছিল তার বাড়ি তো কাছাকাছি গ্রামে। কী যেন নাম গ্রামটার? চন্দনপিঁড়ি। এখন তো ফোনে কোনও নির্দেশ আসছে না। ওই গ্রামে একবার খোঁজ নিলে হয় না? লোকটা যদি ফেরে? বা ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে? তাহলে অন্তত বোঝা যাবে, আমাদের নাচানো লোকটা অয়নদা না অন্য কেউ। তাছাড়া বিকেল হয়ে এসেছে। খোঁজখবর নিয়ে ফেরার সময়ে সামনের বাজার থেকে খেয়ে ফিরব।

বাজারের কাছে এসে একবার থমকাতে হল। চন্দনপিঁড়ি গ্রামটা কোনদিকে যেন? একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। হাঁটা শুরু করেছি। হঠাৎ ইন্দ্র বলল, "তোমরা যাও। আমি এই বাজারটায় মিশে থেকে নজর রাখি।"

এত টেনশনের মধ্যেও আমার হাসি পেল। সকলেই যে যার মতো মাথা খাটাচ্ছে। আর বেশিরভাগ পদক্ষেপই কোনও গোয়েন্দা গল্প বা থ্রিলার সিনেমার অনুকরণ। মুখে বললাম, "তুই এখানে মিশতে পারবি না। চারদিকটা দেখ। তোর সাজপোশাক, তোর কথা, হাঁটা সবই তোকে আলাদা করে রেখেছে। এখন ঘুরতে আসা লোকের ভিড় নেই। সহজেই নজরে পড়ে যাবি।"

ও তবুও নাছোড়। বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। যে বা যারা আমাদের সঙ্গে ধরাধরি খেলছে তারাও নিশ্চয় এখানকার লোক নয়। তোমরা গ্রামের দিকে গেলে। তারপর ওরা যদি পিছু নেয় আমি আড়াল থেকে ঠিক বুঝতে পারব।"

আমাদের দলের অলিখিত নিয়ম, অনিচ্ছুক ঘোড়াকে রেসের মাঠে না নামানো। তাতে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। ওকে রেখেই আমরা এগিয়ে গেলাম।

চন্দনপিঁড়ি আসলে একধরনের পাথর। এখানে পাথরের কাজ বিখ্যাত। ওই গ্রামের বহু লোক পাথরের কাজ করেন। সেই জন্যই বোধহয় গ্রামের এমন নাম। বেশি দূর নয়। মিনিট দশেক হেঁটেই পৌঁছে গেলাম গ্রামে। ওই ভদ্রলোকের কী যেন নাম? এলকট মুঁড়া। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এলকট মুঁড়ার ঘরটা কোনদিকে?"

লোকটা থমকে দাঁড়ালেন। আমাদের ছ'জনকে ভালো করে দেখলেন। তারপর হাত তুলে অপেক্ষা করার ইশারা করে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল উত্তেজিত লোক আমাদের ঘিরে ধরলেন। কী বক্তব্য? একজন মাতব্বর গোছের বলল, "আবার আসেচু? আমাদের একটা লোককে হারায়ে দিয়েও সুক হয় নাই? আজ তুদের ছাড়বেক লাই৷ আগুয়ে যা।"

বিপদের আঁচ পেয়েই আমার সঙ্গীরা একে অপরের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে মারমুখী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোনও সিনেমায় দেখা ভঙ্গি। প্রায় গোটা একটা পাড়ার লোকের বিরুদ্ধে লড়ে জেতাটা সিনেমায় সম্ভব। বাস্তবটা বেশ কঠিন। সেটা মুহূর্তেই টের পেলাম। আমাদের রণং দেহি ভাব দেখে লোকগুলো যেন আরও ক্ষেপে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপরে। সঙ্গীদের তৈরি করা গোলচক্কর মার্কা চক্রব্যূহে ঢুকে পড়লেন একাধিক অভিমন্যু। একজন পাঞ্জা কষিয়ে ধরলেন আমার কাঁধটা। বুঝতে পারলাম, আমার বোরোলিনের শরীরে এঁর একটা থাবড়াতেই গালের একপাশের অনেকগুলো দাঁত ঝরে যাবে। লোকটাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, "আপনাদের লোকের সঙ্গে আমাদের দাদাও হারিয়েছে। ওকে খুঁজতেই এসেছি।"

কিন্তু লোকটার একটাই কথা, আমাদের দাদার জন্যই ওদের লোকটা হারিয়েছে। বাবলা বোধহয় রেগে হাত চালিয়েছিল। ওর জামাটা ফড়ফড় করে ছেঁড়ার আওয়াজ পেলাম। তারপর ঠাস করে একটা চড়। ধেপু চেঁচাচ্ছে। রাজা আমার মতোই বোঝানোর চেষ্টা করছে। দীপু আর শুভর সঙ্গে প্রবল ধস্তাধস্তি হচ্ছে। আমার চোখে জল। ওদের কষ্টে নয়। অবুঝ লোকটা আমার কোনও কথাই শুনতে রাজি হল না। পেটে গুপ করে ঘুষি মেরে দিল। খুব লেগেছে। আমি ধপ করে পড়ে গেলাম।

আর কয়েক ঘা খেলে বোধহয় ট্রেনের ভেন্ডারে শুয়ে শুয়ে ফিরতে হত। হঠাৎ কোথা থেকে দেবদূতের মতো একটা পুলিশের জীপ এসে পড়ল। চটপট তিন-চারজন পুলিশ আর সিভিক ভলান্টিয়ার জীপ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমাদের উদ্ধার করলেন। তারপর আমাদের জীপে ঠুসে দিয়ে এলাকা ছাড়লেন। কে বলে সবকিছু মিটে যাওয়ার পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়!

বাজারের কাছে জীপ থেকে আমাদের নামিয়ে দিলেন অফিসার। সমঝে দিলেন, আমরা যেন বেপাড়ায় গিয়ে আর মাতব্বরি না করি। কেন আমরা সেখানে গিয়েছিলাম আর কেন মারামারি লেগেছিল, অফিসার সেসব জিজ্ঞসা না করায় আমরাও চুপ করে ছিলাম।

গেস্ট হাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুটা এগিয়েছি, ছুটতে ছুটতে ইন্দ্র এল। মার খেয়ে ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ছেলেটা এতক্ষণ ছিল কোথায়? ও নিজেই তার উত্তর দিল, "তোমরা তো চলে গেলে। আমি যেখানে ঠেলাগাড়িতে চিংড়ির চপ বিক্রি হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখছি। অনেকক্ষণ পরে দেখলাম একটা পুলিশের জীপ গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার খিদে পেয়ে গিয়েছিল। চিংড়ির চপ কিনে খাচ্ছিলাম। তখনই দেখি জীপটা ফিরে এল। তোমরা নামলে। আমি তো লুকিয়ে পড়েছিলাম।"

ওর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গেল, ও কেন আমাদের সঙ্গে যায়নি। চিংড়ির চপ খাবে বলে। বাকিদেরও খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? দুপুরের পরে মার ছাড়া তো আর কিছু খাইনি!

ওদের গেস্টহাউসে ফিরতে বলে আমি আবার বাজারে ফিরে গেলাম।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পরে মেসেজ এল। রীতিমতো ধমক দিয়ে লেখা, 'পাকামিটা একটু কম করলেই ভালো। সাতজন একসঙ্গে হয়েছ মানেই ফেমাস ফাইভ বা পঞ্চপাণ্ডবের মতো রহস্য সমাধান করে ফেলবে? মেরে সাতজনকে অষ্টাবক্র করে দেয়নি সৌভাগ্য। কাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার সময়ে যমধারার জঙ্গলে চলে যেও। সব জেনে যাবে।'

চার

ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হয়ে গেল। বেরোতে হবে। সকলকে তৈরি হয়ে নিতে বললাম। দীপু বলল, "দেখ বড়দা, ইন্দ্রদা ঠিক এইসময়েই চা খেতে বেরিয়ে গেছে। ওর কিছুতেই তর সয় না।"

আমি বললাম, "তোরা তৈরি হয়ে নে। ও এলেই বেরিয়ে পড়ব।"

সকলে তৈরি অনেকক্ষণ। কিন্তু ইন্দ্রর আর দেখা নেই। এবার রাগ হচ্ছিল। ছেলেটার খিদে সহ্য হয় না কিছুতেই। ফোনে ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফোন বন্ধ। চার্জে বসানো আছে? সকলে খুঁজল। না, ফোন নিয়েই বেরিয়েছে। আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। আবার একজন! এবার তাহলে কি পুলিশে যাওয়া দরকার? তখনই এস.এম.এস.-টা ঢুকল, 'কৃষ্ণ বড্ড ইন্দ্রদা ইন্দ্রদা করছিল। তাই ওকেও ডেকে নিলাম। তোমাদের যেখানে যাওয়ার কথা যাও। না হলে দু'জনকে ফেরত পাওয়া মুশকিল।'

আমি বসে পড়লাম বিছানায়। দলের সকলেই ভয়ে জড়োসড়ো। ইন্দ্রকে এতজনের মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে গেল কী করে? সেটা সম্ভবই নয়। তাহলে? ইন্দ্র চা খেতে বেরোতেই ওকে পাকড়াও করেছে? হলেও হতে পারে। গেস্ট হাউসের আশপাশটা এখনও নির্জন। কেউ টেরটিও পাবে না। কিন্তু এখন কী করা? যাব যমধারার জঙ্গলে? যেতে বোধহয় হবেই। দলের দু'জন ওদের জিম্মায়। কথা না শুনে উপায় কী!

ধেপু যেতে চাইছিল না। রাজা ধমক দিল, "পাগল নাকি তুই? দেখছিস ভরা স্টেশন থেকে কৃষ্ণদা হাওয়া, এতগুলো লোকের মাঝখান থেকে ইন্দ্রদাকে তুলে নিল। আর তুই একা এই নির্জন গেস্ট হাউসে থাকলে তোকে আগেই তুলে নেবে।"

ধেপু বেরলো। ইচ্ছে ছিল, যমধারায় যাওয়ার আগে বাজারে গিয়ে সকালের চা-জলখাবার খেয়ে আসব। এখন আর কারও খাবার ইচ্ছেটাই নেই।

জঙ্গলের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। দুটো গাড়ি নজরে এল। মানে আরও পর্যটক এসেছেন। আমরা এগিয়ে গেলাম। জঙ্গলে ঢোকার ঠিক আগে ধেপু বলল, "আমি এখানে আছি। তোরা যা।"

বাবলাও বলল, "আর ভালো লাগছে না। আমিও মেজদার সঙ্গে দাঁড়াচ্ছি।"

বুঝতেই পারলাম, ভয়ে আতঙ্কে ওদের পা আর চলছে না। পাহাড়ে ওঠার ধকল নিতে পারবে না। আমরা চারজন এগিয়ে গেলাম। আমি, শুভ, রাজা আর দীপু। যেতে আমাদের হবেই। যমধারায় ঢোকার আগেই এস.এম.এস.-এ নির্দেশ এসেছে, 'চন্দ্রশর্মার শিলালিপির কাছে যাও।'

শিলালিপিটা একেবারে পাহাড়ের টঙের কাছে। এগিয়ে গেলাম।

যমধারা নামের ঝর্নার কাছে দুটো লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে একবার তাকাল। পর্যটকই হবে। আমরা এগোলাম। পাহাড়ের ধাপে পা রাখতেই চোখে পড়ল, চুড়োর দিকে দুটো লোক দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। চারজনের পা-ই থমকে গেল। পুরোটাই তাহলে আমাদের কব্জা করার ছক? আমাদের টোপ দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে। এখন আর ফেরার পথ নেই। পুরোপুরি ঘেরবন্দি। চড়াইয়ের দিকে পাহাড় টপকানো সহজ নয়। আমরা পারব না। তাছাড়া ওখানে দুটো লোক। ফিরে যাব? নীচে যমধারার কাছে দু'জন আছে। ওদের ঘায়েল যদি করতেও পারি তাহলে আবার গাড়ির কাছে বাধা পাব। গাড়িতেও তো লোক আছে দেখলাম। গাড়ির লোকেদের ঘায়েল করেও তো লাভ নেই। পাহাড়ের দু'জন ততক্ষণে নেমে আসবে। এতক্ষণ লড়ে পারব না। তাছাড়া ওদের কাছে অস্ত্র থাকলে লড়াইটা যমধারার কাছেই শেষ হয়ে যাবে। তার থেকে ওঠাই ভাল।

পাহাড়ের ধাপে চলার পথে একটা পাথরের ওপরে চকখড়ি দিয়ে লেখা 'স্বাগত'। বাকিরাও দেখল লেখাটা। "আমাদের জন্য?" দীপু জানতে চাইল।

আমি বললাম, "জানি না।"

এখানে অবশ্য চকখড়ি দিয়ে, পাহাড় কুঁদে নানা লেখা পর্যটক বা স্থানীয় মানুষের স্বভাব। আগেরবারেও দেখেছি। এবারেও স্থানীয় ভাষায় লেখা চোখে পড়ল। আগেরবার সেসব নিয়ে সকলে কত আনন্দ করেছি। মনে পড়ছিল। একসময় শিলালিপির কাছে পৌঁছলাম। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নির্দেশ ছাড়া কিছু তো করার নেই। হঠাৎ টি-শার্টে টান পড়ল। পেছন ফিরে দেখি, শুভ আস্তে আস্তে টানছে। চোখাচোখি হতে ও আঙুল দিয়ে একটা পাথর দেখাল। পাথরের গায়ে বড়ো বড়ো করে চক দিয়ে লেখা, 'যেখানে দেখিবে ছাই'।

এর মানে কী? আমি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতে ও দুই পর্যটকের একজনের প্যান্টের দিকে আঙুল তুলল। দেখতে পেলাম, প্যান্টের একটা পকেটে চকের দাগ। দেখে মনে হতেই পারে ওই লোকটাই এতক্ষণ চক দিয়ে পাথরে লিখছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে চকটা পকেটে পুরেছে আর তাতেই দাগ লেগেছে। তাহলে ফাঁদে পড়লাম? প্রথমে লড়ার কথা মনে হল। তারপর ভাবলাম, দেখি না কী করে। শুভকে ইশারায় শান্ত করলাম।

কিন্তু লোকদুটো করছেটা কী? ক্যামেরায় ছবি তুলছে। একটা ফিতে নিয়ে শিলালিপি ঘিরে রাখা জালটা মাপছে। আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী করছেন আপনারা?"

চকের দাগ বলল, "গুপ্তধন খুঁজছি।"

এই কথাটা আগেরবার ধেপু বলেছিল। বুঝতে পারলাম লোকদুটো মজা করছে আমাদের সঙ্গে। চুপ করে গেলাম। কিন্তু এবার করণীয়টা কী? আরও আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলাম। মোবাইল বের করে বারবার দেখলাম কোনও এস.এম.এস. এল কি না। তারপর আমরা নামতে শুরু করলাম। বোঝাই যাচ্ছে, ওই লোকটি বা অয়নদা আমাদের নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু এমন খেলার মানেটা কী? কিছু তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে!

নীচে নেমে যমধারার কাছের লোকদুটোকে দেখতে পেলাম না। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধেপু-বাবলাকেও দেখতে পেলাম না। গেল কোথায়? তখনই রাজা চিৎকার করে উঠল, "বড়দা, গাড়ি, গাড়ি।"

দুটো গাড়িই তখন স্টার্ট নিয়েছে। একটা গাড়ির জানালা দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে প্রবলভাবে নড়ছে। বোঝাই যাচ্ছে, গাড়িতে দারুণ ধস্তাধস্তি হচ্ছে। একঝলকের জন্য একটা মাথা বেরিয়ে এল জানালা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কেউ মাথাটা চেপে গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। ওটা ধেপুর মাথা। আমরা দৌড়তে শুরু করলাম। কিন্তু দারুণ গতিতে গাড়িদুটো বেরিয়ে গেল। ওই গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বৃথা। আমরা থামলাম। আর রাজা ধপ করে বসে পড়ল। ওর চোখ ছলছল করছে। কান্না জড়ানো গলায় বলল, "মাকে গিয়ে কী বলবি?"

মাকে গিয়ে কী বলব জানি না। ইন্দ্র, কৃষ্ণ বা বাবলার বাড়িতেই বা কী বলব? সকলের বাড়ির লোক আমার ওপরে কত ভরসা করে!

হঠাৎ শিলালিপির কাছের লোকদুটোর কথা মনে পড়ল। ওরাও নিশ্চয় একই দলের। ওদের ধরতে পারলে কিছু একটা সূত্র বেরোবে। আমরা আবার দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকলাম। কিন্তু পাহাড়ের কাছে গিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। লোকদুটো গেল কোথায়? এদিক দিয়ে ছাড়া তো নামার রাস্তা নেই! লুকিয়ে পড়েছে? এখন আবার ওপরে উঠে খোঁজার অবস্থায় নেই আমরা। নীচে লুকিয়ে অপেক্ষা করব? ওরা যদি ওপরেই লুকিয়ে থাকে তাহলে সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছে। জঙ্গল না থাকলে ওখান

থেকে ওরা এক বর্গকিলোমিটার এলাকায় নজরদারি চালাতে পারত। আমাদের নিশ্চয় নজর রাখছে। লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। ফিরে যাওয়াই ভালো। গিয়ে পুলিশে খবর দিতেই হবে। আর ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

ফিরে আসছি, হঠাৎ রাগে ক্ষোভে শুভ পাথর ছুঁড়তে শুরু করল উপরের দিকে। দেখাদেখি দীপুও। দু'জনকে ধরে নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম।

যমধারা ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এসেছি। একটা এস.এম.এস. ঢুকল। সেই শয়তানটা! লিখেছে, 'তাহলে রইল বাকি চার। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম ওই নম্বরে। কিন্তু ফোনটা বেজেই গেল। কেউ ধরল না।

গেস্ট হাউসে পা দিয়েই আমরা তাপসদার কাছে গেলাম। "থানাটা কোথায়?"

তাপসদা জানতে চাইলেন, "থানাপুলিশ কেন? আবার কী হল? দলের বাকিরা কোথায়?"

আমি বললাম, "কোনও সমস্যা নেই। আপনি শুধু কী করে যাব বলে দিন।"

তাপসদার ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘরের দিকে যাচ্ছি, গেস্ট হাউসের গেটের কাছে একটা জীপ থামল। নামলেন আমাদের উদ্ধার করা সেই অফিসার আর দুই কনস্টেবল। আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। অফিসার এসে আমাদের বললেন, "তোমাদের সকলকে একবার থানায় যেতে হবে।"

"থানায় কেন?" আমরা অবাক।

অফিসার বললেন, "কেন আবার? বেপাড়ায় দল পাকিয়ে ঢুকে গোলমাল করার জন্য।"

ঠিক তখনই তাপসদা বলল, "ওরা থানাতেই যাচ্ছিল।"

এবার অফিসার অবাক। "থানায় কেন?"

আমি বললাম, "আমাদের দলের চারজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।"

শুনে অফিসার চোখ গোল্লা করে বললেন, "কিডন্যাপ! বাব্বা, বেশ তালেবরদের দল দেখছি। আবার কিডন্যাপের গল্প! চল হে, জীপে ওঠ। তোমাদের তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে।"

জীপে উঠে আবার অফিসার ব্যঙ্গ করতে শুরু করলেন, "তোমাদের কিডন্যাপের গল্পটা কেমন ফেঁদেছ একটু শুনি?"

আমি আদ্যোপান্ত বললাম। থামতেই এক কনস্টেবল বললেন, "স্যার, ছেলে বেশ রুস্তম হবে বড়ো হলে।"

শুনে অফিসার হাসতে হাসতে বললেন, "না হয়ে যায় না। ভরা বাঁকুড়া স্টেশনে দিনেরবেলায় কিডন্যাপের গল্প ফেঁদেছে।"

অফিসারের জীপ কাঁপানো হাসিতে যোগ দিলেন ড্রাইভার-কনস্টেবলেরাও।

চন্দনপিঁড়ি থেকে আমাদের উদ্ধারের পরে পুলিশের উপরে যেটুকু আস্থা জন্মেছিল আবার সেটা নষ্ট হয়ে গেল।

পাঁচ

থানার সামনে জীপ থামতেই লাফিয়ে নামলেন অফিসার। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "নামতে আজ্ঞা হোক রুস্তমবাবু।"

শুনে মনে হচ্ছিল, একটা ঘুষি মেরে দিই ওঁর মুখে।

থানায় বোধহয় কোনও অনুষ্ঠান আছে। সামনের খোলা চত্বরে টেবিল-চেয়ার পাতা। এক অফিসার সেখানে ঘুরে ফিরে দেখছেন। আমরা অফিসারের পেছন পেছন অফিসে ঢুকলাম। অফিসার-ইন-চার্জ লেখা ঘরটার দিকে এগোচ্ছি, তখনই কে যেন বলে উঠল, "বড়দা, এসে গেছ?"

খুব পরিচিত স্বর। মুখে বোধহয় কিছু আছে। তাই গলাটা একটু অন্যরকম লাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ইন্দ্র। হাতে শালপাতার একটা প্লেট। সেটা মুখের কাছে নিয়ে খুব মন দিয়ে শিঙাড়ায় কামড় বসাচ্ছে। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও কাছে এসে একটা শিঙাড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, "দারুণ! খেয়ে দেখ, গরম আছে।"

ওর বলার ভঙ্গি দেখেই মেজাজ গরম হয়ে গেল। স্থান কাল ভুলে চিৎকার করে উঠলাম, "খাওয়া ছাড়া তোর মাথায় অন্যকিছু ঢোকে না?"

ইন্দ্র একটুও পাত্তা দিল না। বরং দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, "রেগে যাচ্ছ কেন? তোমাদের জন্যও আছে।"

এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। শুধু চিংড়ির চপ খাবে বলে আমাদের সঙ্গে চন্দনপিঁড়িতে যায়নি। এখন সকালবেলা থানায় এসে গিলছে। একটা থাপ্পড় কষাব বলে হাত তুলেছিলাম। অফিসার ধরে নিলেন। তারপর ব্যঙ্গ করে বললেন, "থানার ভেতরে মারপিট! গ্রেফতার হবে যে রুস্তমভাই। চল চল, বড়োবাবুর ঘরে।"

বড়োবাবু কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। অফিসার বললেন, "স্যার, সেই গন্ডগোল পাকানোর পাণ্ডাকে তুলে এনেছি।"

বড়োবাবু হাসলেন। তারপর বললেন, "এস। দলের বাকিরা কোথায়?"

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। তখনই শুভ চেঁচিয়ে উঠল, "অয়নদা!"

চমকে উঠেছিলাম। শুভর চিৎকারে আমাদের দিকে পেছন ফিরে বড়োবাবুর সঙ্গে কথা বলা লোকটাও ঘুরে তাকাল। আর তখনই আমার গলা দিয়েও একই চিৎকার বেরলো, "অয়নদা!"

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটতেই মাথাটা গরম হতে শুরু করল। এরকম কেউ করে! আমার চোখে-মুখে বোধহয় রাগের ছাপ পড়ছিল। অয়নদা হাসতে হাসতে কাছে ডাকল। কাছে যেতেই ধরে বসাল পাশের চেয়ারে। তারপর ওর বলিষ্ঠ হাতে কাঁধটা শক্ত করে ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "এসব তো গল্পে পড়িস। নিজের জীবনে কেমন লাগে সেই অভিজ্ঞতা কোনওদিন পেতিস? একধাক্কায় কতটা বড়ো হয়ে গেলি বল তো?"

বড়োবাবু ততক্ষণে আমার অবশিষ্ট সঙ্গীদের বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

রাগটা পড়তে শুরু করলেও সবটা পড়েনি। তাই গম্ভীর গলায় বললাম, "তোমার এইসব কাণ্ডের মানে কী এবার খোলসা কর। তার আগে যাদের যাদের তুমি তুলে নিয়েছ, তাদের দয়া করে ডাক।"

অয়নদা উঠে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল চারমূর্তিকে নিয়ে। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই আমার মেজ সহোদর ভয়ে ভয়ে বলল, "দাদা, আমার কোনও দোষ নেই। অয়নদা জোর করে তুলে নিয়ে এল।"

আমি ওর হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলাম। দিতেই ভাইয়ের ভয়টা কেটে গেল। ও ফিক করে হেসে উঠল।

অয়নদা ওর শয়তানির কাহিনি শুরু করতে যাচ্ছিল। ওসি সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, "আগে কিছু খাবার ব্যবস্থা কর ভাইদের জন্য! সকাল থেকে তো ছুটিয়েছ।"

সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। আমরা আপত্তি করলাম না। খেতে খেতে অয়নদার শয়তানির কাহিনি শুনতে শুরু করলাম।

অয়নদা বলল, "বুঝলি, শয়তানিটা মাথায় খেলে গিয়েছিল চন্দনপিঁড়ি গ্রামের এলকট মুঁড়ার বাড়িতে যাওয়ার পরে। এই এলকটকেই সেদিন রাতে জঙ্গলে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করতে দেখেছিলাম ('যমধারার জঙ্গলে' দ্রষ্টব্য)। আর দেখেছিলাম, ওর কাছে একটা পাথরের মূর্তি আছে। ওই মূর্তিটাই জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুজো করে।

"তারপর থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে এলকটকে অনুসরণ করেছি। ওর সঙ্গে কথা বলেছি। আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন দেবতা, মারাং বুরুদের প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়েছি। ও তারপর আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। ওর বাড়িতে গিয়েই দেখতে পেয়েছিলাম আরেকটা মূর্তি। দুটো মূর্তি ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, সেগুলোর পায়ের কাছে আবছা কিছু লেখা রয়েছে।"

শুভ চিৎকার করে উঠল, "গুপ্তধনের সংকেত!"

অয়নদা প্রবলভাবে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, "আরে, না না। তোরা যে গুপ্তধনের কথা ভাবছিস তার সংকেত নয়। তবে ওই লেখার মূল্য গুপ্তধনের মণিমুক্তোর থেকে কম কিছু নয়। আমি এলকটকে জিজ্ঞাসা করলাম, মূর্তিদুটো ও কোথায় পেয়েছে। ও বলল, চন্দ্রশর্মার শিলালিপির কাছে। কীভাবে পেল জানতে চাইলে এলকট একটা গল্প বলল।

"ও একদিন চন্দ্রশর্মার শিলালিপির কাছে শিকার খুঁজছিল। বুনো খরগোশ, কাঠবেড়ালি। খুঁজতে খুঁজতে শিলালিপির উপরের দিকে অনেকটা উঠে গিয়েছিল। ওখানে লোকের যাতায়াত খুব কম। সেদিন ওই জায়গায় হনুমানের খুব উৎপাত। দুটো দলের মধ্যে মারামারি চলছিল। এলকট দেখেছিল একটা হনুমান তাড়া খেয়ে সুট করে পাথরের ফোগলের মধ্যে ঢুকে গেল। তাড়া করা হনুমানটাও সেটার পিছু নিল। কিছুক্ষণ পরে দুটোই পাহাড়ের আরও চুড়োর দিক দিয়ে বেরোল। এলকট বুঝল, এখানে কোনও সুড়ঙ্গ আছে। ও কাছে গেল। ফোগলটা খুব ছোটো। মানুষ গলতে পারবে না। সুড়ঙ্গের অন্য মুখটা কেমন সেটা দেখতে ও সেই চুড়োয় উঠে গেল। ওই চুড়োয় লোকজন একেবারেই যায় না। তবে ওদিকের সুড়ঙ্গের মুখটা কিছুটা চওড়া। আর সেই সুড়ঙ্গে উঁকি দিয়েই ও একটা মূর্তি পড়ে থাকতে দেখে। সেটা বের করে। এলকটের মনে হয়, মারাং বুরু যেন ওর কাছে ধরা দিয়েছে। ও মূর্তিটা নিয়ে চলে আসে। তারপর শুরু হয় ওর তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা।"

"তাহলে আরেকটা মূর্তি ও কোথা থেকে পেল?" বাবলা বলে।

"আরে বলছি বলছি। একটু হাঁফ ছাড়তে দে!" বলে হাসে অয়নদা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বলতে শুরু করে, "এলকটের মনে হয়েছিল, অনেক দেবতা ওই সুড়ঙ্গে আছে। ও নিয়মিত ওখানে যেতে শুরু করে। রোজ একটু একটু করে সুড়ঙ্গের মুখটা বাড়ায়। একদিন ঢুকতে পারে ওর ভেতরে। কিন্তু ঢুকে ও হতাশই হয়। ওখানে আর মাত্র একটা দেবতা পড়েছিল। বাকি সব পাথর। সেই পাথরগুলোয় কীসব লেখা। এলকটের কথা শুনে আমি বুঝতে পারি, প্রাচীন কিছু নির্দশন থাকতে পারে ওই সুড়ঙ্গে। একটু কৌশল করি। ওকে বলি, ওই সুড়ঙ্গে প্রচুর দেবতার বাণী আছে। দেবতারা উদ্ধার করতে বলছে মনে হয়। ও সরল মানুষ।

আমাকে বিশ্বাস করে। দু'জনে একদিন চুপি চুপি যাই। ওই সুড়ঙ্গে আর কোনও মূর্তি ছিল না। কিন্তু গোটা সাতেক শিলালিপি ছিল। ভালো করে দেখে বুঝতে পারি, দু'একটা প্রস্তরলিপি ভেঙে গিয়েছে। আসল লিপির সংখ্যা তিনটের বেশি হবে না।

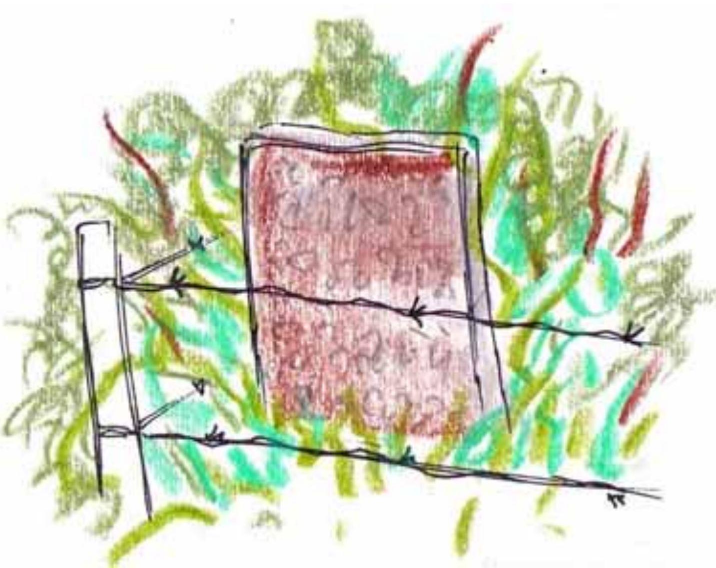

"লিপিতে কী লেখা আছে সেটা পড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি একটা টুকরো সঙ্গে নিয়ে আসি। এলকট জানতে চাইছিল, ওই পাথরের টুকরোয় কী লেখা আছে? আমি বলেছিলাম, কোনও মন্ত্র লেখা থাকতে পারে। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া বিশারদ মহীন কামিল্যার সঙ্গে আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর পরিচয় ছিল। বন্ধুকে ধরে মহীনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। উনি শিলালিপি পরীক্ষা করে বললেন, কোথায় পেলেন? এ তো গুপ্তযুগের কোনও প্রশস্তির অংশ বলে মনে হচ্ছে। মহীনবাবুই বললেন, দিল্লিতে আমার বন্ধু সত্য দুবে গুপ্তযুগ বিশারদ। উনি এ বিষয়ে আরও বিশদে বলতে পারবেন।

"দিল্লি যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। তার আগে এলকটকে বোঝালাম, দিল্লিতে এক বুড়ো সোখা আছে। সে এই মন্ত্রগুলো পড়ে শিখিয়ে দেবে। তোমাকেও দিল্লি যেতে হবে। আর মূর্তিদুটোও নিতে হবে। কীভাবে পুজো করতে হয় সেটা ওই সোখা জানে। এলকট রাজি হতে আমি মুখ গম্ভীর করে তোদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। একটু অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তোদের। তোরা আমার টোপ গিলে চলে এলি যমধারায়। তার আগে পুলিশ লাইনে খোঁজ লাগিয়ে এখানকার থানার অফিসারের পরিচিতকে খুঁজেছি। পাইনি। তখন আমার পরিচিত পর্বতারোহী এক পুলিশ অফিসারের সাহায্য চেয়েছি। ওঁর নাম তোরা খবরের কাগজে দেখে থাকবি। উনি অনুরোধ করায় এখানকার ওসি সাহায্য করতে রাজি হন। যাঁর সামনে তোরা এখন বসে আছিস।

"তোরা অবশ্য একটু মুশকিলে ফেলেছিলিস। যমধারার জঙ্গলে অভিযানের রাতে দলবেঁধে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে। ভেবেছিলাম, পুরো পরিকল্পনাটাই মাটি। তোদের কাউকে নিয়ে হাসপাতালে না ছুটতে হয়! ছেড়ে রেখে যেতেও পারছিলাম না। যদি কিছু হয়। ভোররাত পর্যন্ত পাহারা দিতে হল। ভোরের আলো ফুটতে আমরা এলাকা ছেড়েছিলাম। অবশ্য একজনকে রেখে গিয়েছিলাম। তিনি লুকিয়ে লক্ষ রাখছিলেন তোদের। কেউ অসুস্থ হলে কায়দা করে আবির্ভূত হতেন।"

আমি বললাম, "তুমি আর এলকট দু'হাতে ভর দিয়ে যেভাবে যমধারার ওই পাহাড়ে উঠে গেলে! অজ্ঞান না হয়ে উপায় আছে?"

অয়নদা হেসে বলল, "আমি মার্শাল আর্ট শিখেছি দীর্ঘদিন। তোদের মনে নেই? তারপর শোন। দিল্লিতে তিনমাস ধরে রইলাম আমি আর এলকট। ওই ইতিহাসবিদ গবেষণা করে জানালেন, লিপিটি গুপ্তযুগের। তার সঙ্গে এলাহাবাদ প্রশস্তির মিল আছে। আর লিপিতে লেখা, শত্রুদের হাত থেকে কুলদেবতাকে রক্ষা করতে ওই পাহাড়ের কন্দরে তাঁদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে। মজার কথা কী বল তো? ওই মূর্তিদুটো কিন্তু কুলদেবতা নন। ওগুলো স্থানীয় আদিবাসীদের মূর্তির আদলে তৈরি। কুলদেবতাকে রক্ষা করতে ওই আবরণ তৈরি করা হয়েছিল। ওদের আবরণের মধ্যে আছেন তাঁদের দুই রূপ - একটি শান্ত, আরেকটি রুদ্র। আরও গবেষণা চলছে। বাকি লিপির পাঠোদ্ধার চলছে। চন্দ্রশর্মার রাজত্ব কীভাবে শেষ হল তার লিখিত ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে। সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন সত্য দুবে। ইতিহাসের অন্য একটা পরত খুলবে আশা করা যায়।"

অয়নদার জন্য আমার গর্ব হচ্ছিল। কিন্তু এমন একটা কাজের মধ্যে আমাদের সঙ্গে মজা করার মানে কী? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে আবার আমাদের জন্য রহস্য সিনেমার চিত্রনাট্য তৈরি করলে কেন?"

অয়নদা বলল, "তোরা তো সব গোয়েন্দা গল্পের পোকা। পড়তেও ছাড়িস না। আবার পড়া শেষ হলে বলিস, এসব কি সম্ভব! তোদের হাতেকলমে দেখিয়ে দিলুম। আর তোরা এত বড়ো একটা ঘটনার সাক্ষী থাকবি না তা কি হয়? তবে যমধারার জঙ্গলে প্রথমবারের পরীক্ষায় ফেল করলে তোদের বাদ দিতে হত।"

"তুমি ভরা স্টেশনে কৃষ্ণদাকে কী করে তুলে নিলে বল?" শুভ জানতে চায়।

ওর প্রশ্ন শুনেই কৃষ্ণ হো হো করে হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে, "যাকে আমরা খুঁজতে এসেছি সেই যদি আচমকা সামনে এসে বলে, কী রে কৃষ্ণ, কচুরি খাবি নাকি? তাহলে আর কিডন্যাপের রইলটা কী!"

কথার ধরতাই দেয় অয়নদা। বলে, "দেখ, গল্প-সিনেমার মতো করে অপহরণ করতে গেলে পিটুনি খাওয়ার হেবি চান্স। তার থেকে সুযোগ বুঝে এক একজনের সামনে এসে দাঁড়ালেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। বাঁকুড়া স্টেশনে একজনকে দিয়ে কৃষ্ণকে ডাকিয়ে নিয়ে তোদের কাছ ছাড়া করলাম। তারপর সামনে এসে দাঁড়াতেই কৃষ্ণ অবাক। ওকে গোটা পরিকল্পনাটা বোঝাতে হল।

কিন্তু গাধাটা প্ল্যান চৌপাট করে দিয়েছিল আরেকটু হলে। ওকে ফোন ঘাঁটতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু কোন ফাঁকে ও ফোন খুলে গেম খেলতে শুরু করেছিল। আর তখনই ইন্দ্রর ফোন। জোর করে ফোন কাড়তে হল।"

"গেস্ট হাউস থেকে ইন্দ্রদাকে অপহরণ করলে কী করে?" দীপু জানতে চায়।

অয়নদা হেসে বলে, "আমি কিছুই করিনি। ও নিজেই এসে ধরা দিয়েছে। ভোরবেলা কৃষ্ণকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলাম। কৃষ্ণ আতঙ্কের গলা করে ইন্দ্রকে ফোন করে বাইরে আসতে বলেছিল। ইন্দ্র বেরিয়ে আসতেই আমি ওর সামনে দাঁড়ালাম। ব্যস! একই কায়দায় বাবলা আর ধেপুকে তুলেছিলাম। গাড়িতে মুখ ঢেকে শুয়েছিলাম। ধেপু আর বাবলা পাহাড়ে উঠল না। আর আমিও ড্রাইভারকে দিয়ে ওদের গাড়ির কাছে ডাকালাম। ওরা গাড়ির কাছে আসতেই মুখের ঢাকা খুললাম। ধেপুটা চমকে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কোনওরকমে আটকে, সব বলে ওকে থামানো গিয়েছিল। পরে ও কিন্তু অপহৃত হওয়ার অভিনয়টা ভালোই করেছিল।"

অয়নদা থামতেই আমি ইচ্ছে করে রাগ রাগ চোখে ধেপুর দিকে তাকালাম। ও চোখ নামিয়ে নিল। অয়নদা আবার বলল, "শোন, তোরা কিন্তু সবসময়েই নজরদারিতে ছিলিস। সেজন্যই চন্দনপিঁড়ি গ্রামে ঠিক সময়ে তোদের উদ্ধার করা গিয়েছে। না হলে পিটিয়ে তোদের তক্তা করে দিত।"

বাবলা জানতে চায়, "ট্রেন ছাড়ার পরেই কী করে মেসেজ পাঠালে?"

অয়নদা রহস্য করে বলল, "টাইম-টেবিল দেখে।"

বাবলা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। অয়নদা বলল, "খুব সহজ ব্যাপার। রূপসী বাংলা ক'টায় ছাড়ে সেটা জেনে নিলাম। তার মিনিট দশেক পরে ফোন করলাম। ওই ট্রেনটা লেট থাকে না।"

"আর তোমাদের বাড়ি গেছি কী করে জানলে?" দীপু জানতে চায়।

অয়নদা বলল, "সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে। আমি ফিরেছি কি না এটা পরীক্ষা করতে আমাদের বাড়ি তোদের যেতেই হত। কারণ, আমাদের বাড়িতে এসব কিছুই জানে না। ফলে ফোনও করেনি তোদের। তোরা অবশ্য ফোন করে খোঁজ নিতে পারতিস। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই কিন্তু ট্রেন ছাড়া বা আমাদের বাড়ি গেছিস কি না জানতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেওয়া বার্তা পাঠিয়েছিলাম।"

ওর কথা শেষ হতেই এক কনস্টেবল একজনকে নিয়ে ঘরে ঢুকে ওসিকে বললেন, "স্যার, এলকট এসেছে। মিডিয়ার লোকজনও এসে গিয়েছে।"

অয়নদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এলকটদাদা, এরা আমার ভাইয়েরা।"

আমরা নমস্কার করলাম। অয়নদা ওসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বলল, "স্যার, এবার বাকিটা সামলে নিন। আমরা চললাম।"

তখনই আমার রাজার কথা মনে পড়ল। রাজা কোথায়! অয়নদা বলল, "ওকে তুলে আনিনি তো আমরা।"

তাহলে গেল কোথায়? ওর কাছে তো কোনও ফোনও নেই। একবার গেস্ট হাউসে ফোন করে দেখব? ফোন করতে গিয়ে দেখি টাওয়ার নেই। ওসি সাহেব ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করতে বললেন। করলাম। তাপসদা ফোন ধরলেন। জানতে চাইলেন, আমরা কোথায়। বললাম। উনি বললেন, "আপনার ভাই কাউকে খুঁজে না পেয়ে কান্নাকাটি করছে। আমার এখান থেকে কারও ফোন লাগছে না।"

আমি ফোন রাখতেই সবাই জানতে চাইল, কী হয়েছে? বললাম, "পুলিশ যখন আমাদের তুলে আনে তখন ও বাথরুমে ছিল। বেরিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।"

থানা থেকে বেরিয়ে দেখি সাংবাদিকদের ভিড়। দেখেই অয়নদা বলল, "তাড়াতাড়ি পা চালা।"

দ্রুত পা চালিয়ে থানাচত্বর ছাড়লাম। এত তাড়াহুড়ো কেন? অয়নদা বলল, "সাংবাদিকদের এড়াতে। দেখছিস না, কেমন বিকেলবেলায় সাংবাদিক সম্মেলন করানো হচ্ছে। যাতে ব্যাটারা যমধারায় বুম হাতে নিয়ে ঝামেলা পাকাতে না পারে। ওরা কাল যখন যাবে ততক্ষণে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের লোকেরা পুলিশ দিয়ে এলাকা ঘিরে ফেলব।"

"কিন্তু তোমারই তো ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তুমি না থাকলে এই ইতিহাসের খোঁজ পাওয়া যেত?" শুভ জানতে চাইল।

"পাগল নাকি! তারপর গোটা মাস আমার পেছনে পড়ে থাকুক মিডিয়া। ইন্টারভিউয়ের পর ইন্টারভিউয়ে ঘ্যানঘ্যান করে একই প্রশ্নের দিতে দিতে কাজকর্ম শিকেয় উঠুক। তাছাড়া আমি কে? আসল লোক তো এলকট। কিন্তু ওকে প্রশ্ন করে সাংবাদিকেরা কিছুই জানতে পারবে না। ও শুধু তন্ত্রমন্ত্রের কথাই বলবে। মারাং বুরু, বুড়ো সোখা ইত্যাদি। কী মজা!"

ছবিঃ অংশুমান

জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতা ২০১৬- সপ্তম স্থান

(তাতিয়ানার মোবাইলঃ ২য় পর্ব)

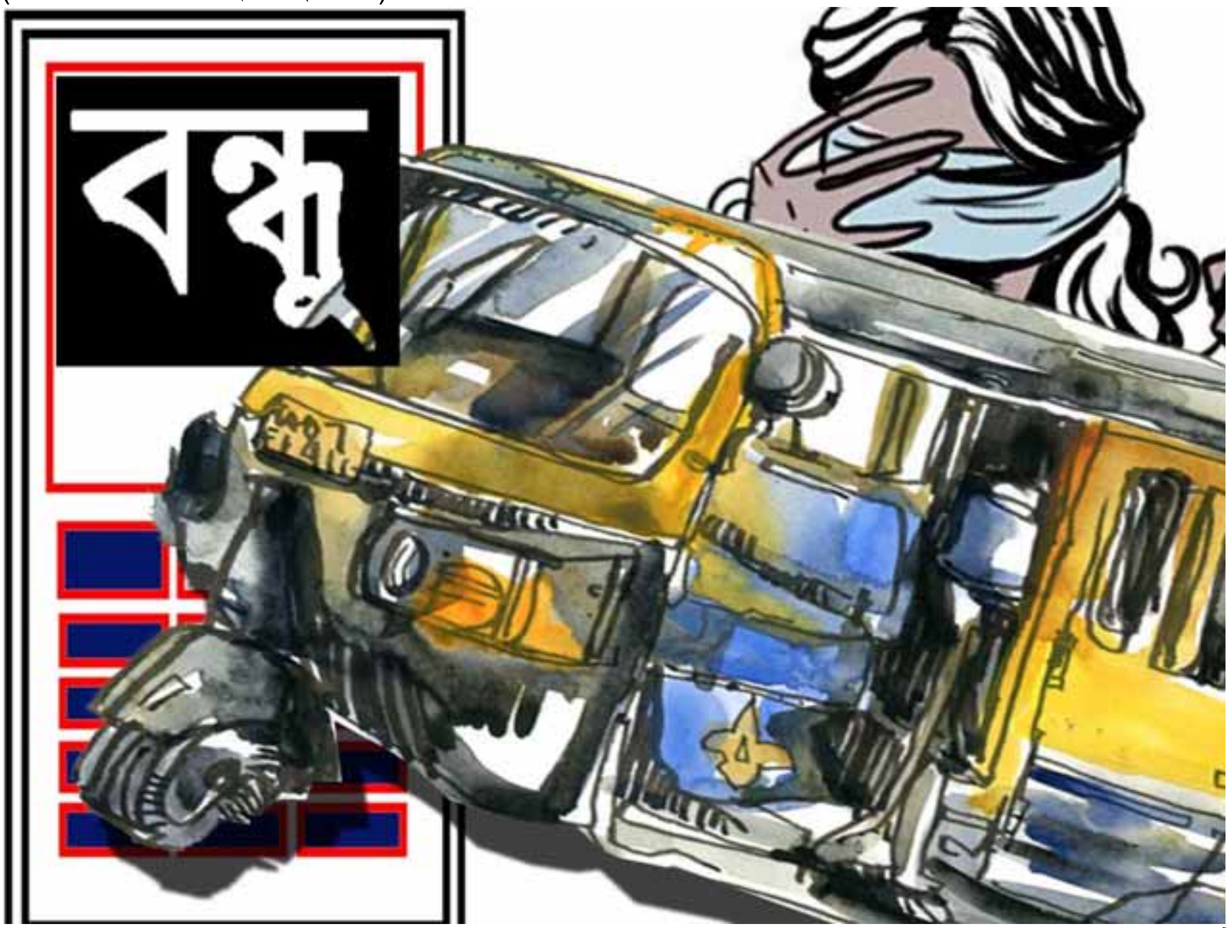

প্রকল্প ভট্টাচার্য

খুচরোটা নিয়েই শেয়ার অটোটা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না।

টিউশন থেকে ফেরবার সময় স্টপেজ থেকে বাড়ি, এইটুকু রাস্তাই তাতিয়ানার অনেকটা মনে হয়। আজ আবার রাস্তার আলোগুলোও জ্বলছে না। বাড়ি গিয়ে তাকে কিছু জরুরি নোট টুকে নিতে হবে। নানান ঝামেলায় পড়াশোনা অনেকখানি পেছিয়ে গেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল সে। হঠাৎই যেন মাটি ফুঁড়ে একটা কালো স্কর্পিও এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল আর মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির দরজা খুলে দু'জন লোক তাকে চেপে ধরল। তাতিয়ানা ভয়ে চিৎকার করতে যাবে, তার আগেই একজন তার মুখে একটা কাপড় চেপে ধরল... কেমন অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ... তারপর তাতিয়ানার আর কিছু মনে নেই।

হুঁশ ফিরতে সে দেখল একটা অচেনা পরিবেশ... সামনে কালো পোশাক পরা কয়েকজন মুশকো লোক, একজন তার মুখ জল ছেটাচ্ছে। সে চোখ খুলতেই তারা স্বস্তির নিঃশাস ফেলল যেন। আস্তে আস্তে খেয়াল করল, ঘরের মাঝখানে একটা ইজিচেয়ারে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। সামনে একটা টেবিলে একজন সুপুরুষ যুবক বসে আছেন। চোখে চোখ পড়তেই মিষ্টি হেসে তিনি পরিষ্কার ইংরাজিতে বললেন, "এইভাবে আপনাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত!"

তাতিয়ানা ভীষণ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারছিল এখন তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তাই এতক্ষণ জোর করে মুখে ভয়ের ছাপ পড়তে দিচ্ছিল না। কিন্তু যুবকের কথা শুনে ওই অবস্থাতেও তাতিয়ানার হাসি পেল। এরা কারা সে জানে না, কিন্তু ভদ্রলোক যে নয়, সেটা বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে। তাদের আবার ক্ষমাপ্রার্থনা!

ধীরে ধীরে সে বলল, "কেন এনেছেন আমাকে এখানে?"

"কারণটা আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন।"

"আমার মোবাইলটার জন্যে কি?"

যুবকের মুখে হাসি ফুটল।

"আপনি বুদ্ধিমতী। হ্যাঁ, শুধুমাত্র আপনার মোবাইলটা পেলেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

"ওটা আমার ব্যাগে আছে। দয়া করে বের করে নিন আর আমায় ছেড়ে দিন।"

এবার যুবকের মুখ কঠিন হল।

"আপনি বুদ্ধিমতী ঠিকই, কিন্তু আমাদের অতটা বোকাও ভাববেন না। আপনার ব্যাগ আমরা ইতিমধ্যে তল্লাশি করেছি। মোবাইলটা সেখানে নেই।"

এবার তাতিয়ানার অবাক হওয়ার পালা। স্পষ্ট মনে আছে টিউশন থেকে বেরিয়ে সে বাড়িতে ফোন করেছিল, তারপর ব্যাগে... হ্যাঁ, ব্যাগেই রেখেছিল। ব্যাগেই রাখে সে, অনেকে বারণ করা সত্ত্বেও।

"আমি কিন্তু যতদূর মনে করতে পারছি..."

"দেখুন মিস তাতিয়ানা, আপনার সঙ্গে গল্প করবার সময় আমার নেই। আপনাকে আধঘন্টা সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে আপনি মনে করে জানান যে মোবাইলটা কোথায় লুকিয়েছেন। আমাদের লোক আপনার বাড়িতেও নজর রাখছে। ওটা আপনি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, সে খবর আছে আমাদের কাছে। যদি ভালোয় ভালোয় ওটা আমার হাতে তুলে না দেন..."

যুবকের শীতল স্বরে হুমকির ছাপ স্পষ্ট।

"বিশ্বাস করুন, ওটা আমার ব্যাগেই ছিল! আচ্ছা, আপনি ফোন করেই দেখুন না, আমার নম্বর..."

একচিলতে হাসি ফুটল যুবকের মুখে।

"আপনার নম্বর আমি জানি। ফোনও করেছি, কিন্তু সুইচড অফ বলছে। যাই হোক, আপনি যদি সহযোগিতা না করেন, তাহলেও সেটা খুঁজে বার করবার উপায় আমাদের জানা আছে। কিন্তু তার ফল আপনার পক্ষে, আপনার পরিবারের পক্ষে ভালো হবে না। এবার আপনার যা ইচ্ছা!"

এটুকু বলেই নিমেষে যুবক উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, পেছন পেছন বাকিরা। অসহায় তাতিয়ানা তাকিয়ে দেখল শুধু, তারপর দরজাটা বাইরে থেকে চাবি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ পেল। একা হতেই তার মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা ভিড় করে এল। কতক্ষণ আগে এসেছে সে? বাড়িতে বাবা মা চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই... দাদাও। দাদা তাকে বার বার বলেছিল মোবাইলটা সাবধানে রাখতে। এমনকি এটাও বলেছিল যে মোবাইলটা ব্যবহার না করতে, অন্য একটা মোবাইল কিনে নিতে আর ওটা সুরক্ষিত রাখতে। তাতিয়ানা রাজি হয়নি। সে জিনিসপত্র হারায় না, বেশ গোছানো স্বভাবের। তাছাড়া, মোবাইলটা তার খুব প্রিয়। আরও একটা কারণ আছে। তার কেবলই মনে হয়, গ্রহান্তরের ওই বার্তাগুলো তারই জন্যে, তার কোনও বন্ধু পাঠায়। একদিন না একদিন সে ঠিক বুঝতে

পারবে সেই বার্তাগুলোর অর্থ। অচেনা, অজানা বন্ধুর সাহচর্য হারাতে চায় না বলেই সে কখনোই কাছছাড়া করত না মোবাইলটা। কিন্তু তার জন্যে এমন বিপদে যে পড়তে হবে...

কিন্তু মোবাইলটা গেল কোথায়! এই লোকগুলো যদি সেটা পেয়ে যেত, তাহলে তাকে ছেড়েই দিত। ব্যাগে ভরে সে অটোতে উঠল, তারপর... হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো তাতিয়ানার মনে পড়ল, অটোতে তার পাশেই একজন বসেছিলেন, ব্যাগটা প্রায় তাঁর কোল ঘেঁষেই ছিল। নামবার সময় একটু টান দিয়েই... তাহলে কি... তাহলে কি সেই সময় মোবাইলটা পড়ে গেছিল... না, নির্ঘাত ওই লোকটা তুলে নিয়েছিল ফোনটা! মাথায় আসতেই তাতিয়ানা ভাবল লোকগুলোকে জানিয়ে দেবে। কোনওভাবে যদি ওরা লোকটাকে ধরতে পারে...

তাতিয়ানা জোরে "হ্যালো, কেউ আছেন!" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

সেই যুবক ঢুকে এসে বলল, "হ্যাঁ বলুন।"

"আসলে, আমার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে। যে অটোতে আজ এলাম, তার মধ্যেই।"

"বাঃ! এতদিন অটোতে যাতাযাত করছেন কিছু হয়নি, আর আজই চুরি হল? তাও ঠিক আমরা আসবার আগেই!" লোকটার মুখে বিদ্রুপের হাসি।

"বিশ্বাস করুন, সেটাই হয়েছে!"

"আপনার সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে মিস তাতিয়ানা। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমরা এখন আপনার বাড়িতে তল্লাশি নেব, তারপর আপনার বাবা, মা এবং দাদাকেও বন্দি করতে বাধ্য হব। আশা করি ওঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন আর মোবাইলটা আমাদের হাতে তুলে দেবেন!"

"না, আপনারা এমন কাজ করতে পারেন না!" চেঁচিয়ে বলল তাতিয়ানা।

"আমরা কী পারি আর কী না পারি সে সম্পর্কে আপনার কোন ও ধারণা নেই, মিস তাতিয়ানা। যদি থাকত, তাহলে এতক্ষণে জানিয়ে দিতেন কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন আপনার মোবাইলটা। যাই হোক, আমাদের দুর্ভাগ্য যে আপনি সহযোগিতা করছেন না। বাধ্য হয়েই আমরা আপনাকে একটা ইঞ্জেকশন দেব, এর ফলে আপনি সহজে আর মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না।"

সত্যিই একজন মুশকো লোক একটা সিরিঞ্জ নিয়ে তার দিকে এগোতে লাগল।

তাতিয়ানা এবার সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মায়ের মুখটা মনে পড়ল আর সে সজোরে "ও মা বাঁচাও!" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের দরজাটা সজোরে ভেঙে ফেলে কিছু পুলিশ এসে ঢুকল, বন্দুক তাক করে বলল, "সক্কলে হাত মাথার ওপর তুলুন!"

তারপর যেন স্বপ্নের মতো সব ঘটে গেল। অনিমেষবাবু দৌড়ে এসে মেয়ের বাঁধন খুলতে লাগলেন, তন্ময় আর একজন পুলিশ কনস্টেবল তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। হতচকিত লোকগুলোর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায়ও ছিল না, কোনও অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগই পেল না তারা।

বাড়ি ফেরবার পথে তাতিয়ানা ঘটনাটা জানতে পারল। তার মোবাইল ফোনটা অটোতেই পড়ে গেছিল। সে নেমে যাওয়ার সাথে সাথেই একটা অ্যালার্ম বাজতে শুরু করায়, অটোওয়ালা খেয়াল করে যে তার ফোনটা অটোতেই পড়ে আছে। তাতিয়ানাকে ওই পাড়ায় সকলেই চেনে, তাই তার ফোন ফেরত দেওয়ার জন্যে অটো নিয়েই তার দিকে এগোতে থাকে, আর দূর থেকে দেখতে পায় ওকে কিছু লোক কালো গাড়িতে করে নিয়ে গেল। নিজের প্রাণের মায়া না করে সে তাতিয়ানাকে বাঁচাতে অটো নিয়ে ফলো করে, আর এদের বাড়িটা চিনে নেয়। এদিকে মেয়ের দেরি দেখে অনিমেষবাবু ওর

মোবাইলে ফোন করলে অটোওয়ালা তাঁকে সব জানায়, তিনি তখনই পুলিশ নিয়ে আসেন ওকে উদ্ধার করতে! তারপর কী হল সে তো তাতিয়ানা জানে।

তন্ময় খোঁজ নিয়ে জানাল, ওই মুশকো লোকগুলো নাকি বিদেশী অপরাধী। তাতিয়ানার মোবাইলের খবর পেয়ে সেটা চুরি করতে এসেছিল। ওটা নিয়ে তারা রিসার্চ করত নাকি।

বাড়ি ফিরতে তাতিয়ানার মা আনন্দে কেঁদে ফেলে ব লেলেন, "সত্যি, ওই অটোওয়ালা সময়মতো সাহায্য না করলে যে কী হতো! ওই তোর সত্যিকারের বন্ধু রে!"

তাতিয়ানা হাসে। অটোওয়ালা তাকে উদ্ধার করেছে, অনেক উপকার করেছে সত্যিই, কিন্তু কে যে তার আসল বন্ধু, সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

ঠিক যে মুহূর্তে মোবাইলটা অটোতে পড়ে গেছিল, তখন সেই অ্যালার্মটা কী করে বেজেছিল! কে বাজিয়েছিল সেটা!

রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তাতিয়ানা তার মোবাইলটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে, তারপর ফিসফিস করে বলে, "ধন্যবাদ, বন্ধু!"

মোবাইল স্ক্রিনটা একবার ফ্ল্যাশ করেই আবার অফ হয়ে যায়, নিজে নিজেই। ঠিক যেন বলে ওঠে, "থ্যাঙ্কিউ! গুড নাইট!!"

গ্রাফিক্‌স্‌ ইন্দ্রশেখর

জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতা ২০১৬ ষষ্ঠস্থান

অয়ন রাহা

১

নভেম্বরের শেষ। ঘুমচাদরে মুড়ি দিয়ে হালকা শীতের আমেজটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে শেষ রাতের কলকাতা। অথচ ঘুমের লেশমাত্র নেই ‘ইটিইরো’- র সদর দপ্তরের পাঁচতলার বিশাল হলঘরটার মানুষগুলোর চোখে। তাদের দৃষ্টি দেওয়ালজোড়া বিশাল মনিটরটার দিকে। কপালের রেখাগুলো জানিয়ে দিচ্ছে তারা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠিত। যেন রয়েছে অনন্ত অপেক্ষায়।

ডানদিকের দ্বিতীয় সারির একদম কোণের চেয়ারে বসে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ডঃ নবারুণ খাসনবীশ। পাশ থেকে তাতিয়ানা ফিসফিসিয়ে বলল, ‘আর টেনশন সহ্য হচ্ছে না স্যার! আপনার কি মনে হয় ওরা উত্তর দেবে?’

‘ধৈর্য ধরো তাতিয়ানা...’ বলে চুপ করে গেলেন খাসনবীশ।

আসলে উত্তরটা নিজেরও জানা ছিল না তাঁর। স্মৃতির কোষগুলো হঠাৎই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল সাত বছর আগে। কীভাবে তাতিয়ানার মোবাইলে আসা একটি রহস্যময় মেসেজের মাধ্যমে সবকিছুর সূত্রপাত। তখন অবশ্য তাতিয়ানা ক্লাস টেনের বাচ্চা মেয়ে। তারপর খাসনবীশের সেই রিসার্চ পেপার নিয়ে নাসায় হইচই ও সেখানকার কমিটিতে যোগদানের প্রস্তাব। অবশ্য শেষ মুহূর্তে মন পরিবর্তন করে নাসা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন খাসনবীশ। বন্ধু ডঃ চন্দ্রশেখরের অনুরোধে ইটিইরো-তে যোগদান। ভারতের বিখ্যাত স্পেস রিসার্চ সংস্থা ইসরো-র একটি গোপন শাখা এই ইটিইরো। পুরো নাম ‘এক্সট্রাটেরিস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিসার্চ অর্গানাইজেশন’। মহাজগতে প্রাণের অস্তিত্ব সন্ধানের লক্ষ্যই এই সংস্থার লক্ষ্য। আজ এখানে যে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরা জড়ো হয়েছেন তার পিছনে খাসনবীশের অবদানও কিছু কম নয়।

‘স্যার, স্যার... দেখুন’, তাতিয়ানার কণ্ঠস্বরে হুঁশ ফিরল খাসনবীশের।

স্ক্রিনে ভেসে আসছে একের পর এক মেসেজ। যদিও অক্ষরগুলো পৃথিবীর চালু কোনও ভাষার নয়। কিন্তু তার জন্য অসুবিধাও হচ্ছে না কারুর। কারণ একটি বিশেষ সফটওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি তর্জমা করে দিচ্ছে।

শেষে যখন সেই বিশেষ বার্তাটা ফুটে উঠল পর্দায়, উল্লাস আর হাততালিতে ফেটে পড়ল বিশাল হলঘর। তাতিয়ানা অবশ্য এই বিশেষ বাক্যটির মানে ইংরেজি অনুবাদ না পড়েও বুঝতে পেরেছিল,

'আমরা আসছি তোমাদের পৃথিবীতে!'

নানা দেশের বিজ্ঞানীরা সবাই খাসনবীশকে ঘিরে ধরে ভাসিয়ে দিলেন অভিনন্দনের বন্যায় । বয়স্ক বিজ্ঞানীরাও শিশুদের মতো আনন্দ করছিলেন। গর্বে মনটা ভরে যাচ্ছিল তাতিয়ানার।

২

'ওয়াও, কাকিমা! বড়িপোস্তটা জাস্ট অসাম!' চৈতালির গলায় উচ্ছ্বাস।

'এই জন্যই তোকে খাইয়ে শান্তি। এরা তো খেয়ে কখন ও বলবে না কেমন রান্না হল', তাতিয়ানার মায়ের গলায় ভালোবাসামাখা অনুযোগ।

'আহা, তুমি তো ভালো রাঁধোই... তা আবার রোজ রোজ বলতে হবে নাকি', হা হা করে ওঠেন তাতিয়ানার বাবা অনিমেষবাবু।

সেদিন রাত্রে তাতিয়ানাদের বাড়িতে ডিনার টেবিলে জোরদার আড্ডা চলেছিল । তাতিয়ানা, ওর বাবা, ডঃ খাসনবীশ, স্কুলের বন্ধু চৈতালি, দাদা তন্ময়কে নিয়ে দারুণ একটা গেট-টুগেদার। অনেকদিন বাদে চৈতালি এসেছে কলকাতায়। চৈতালি এখন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করে হায়দ্রাবাদের নামজাদা এক মালটিন্যাশনাল ফার্মে। তাতিয়ানাকে একরকম জোর করেই ইটিইরো-তে জয়েন করিয়েছেন খাসনবীশ স্যার।

'তাহলে ওরা শেষ অবধি নামবে পৃথিবীতে?' জিজ্ঞাসা করলেন অনিমেষবাবু।

'প্রাথমিকভাবে তো সম্মতি দিয়েছে। তবে ওদের কিছু শর্ত আছে। সেটা কালকে হয়তো জানাবে', খাসনবীশ বললেন।

'মনে আছে, তোর ফোনে যেদিন প্রথম মেসেজটা এল সেদিন কীরকম ঘাবড়ে গেছিলি?' তন্ময়ের কথায় মৃদু হাসল তাতিয়ানা।

'স্যার, আপনি ঐ মেসেজগুলোর মানেটা উদ্ধার করলেন কী করে?' চৈতালি প্রশ্ন করল।

খাসনবীশ বললেন, 'সংক্ষেপে বলি। আসলে প্রথম দিকের মেসেজগুলো আসত দু'ভাবে। ভাষায় ও ছবিতে। ভাষাটা ছিল একেবারেই অজানা। এর সাথে প্রাচীন গ্রিক লিপির সামান্য মিল থাকলেও দুটো কিন্তু পুরোপুরি এক ছিল না। আমার সন্দেহ হয়েছিল হয়তো এটি আরও পুরানো কোনও ভাষা যার সাথে গ্রিক লিপির কোনও সংযোগ আছে। এমনও হতে পারে গ্রিক, সাসানিড সহ নানা প্রাচীন ভাষার আদি ভাষা এটাই। কিছু মেসেজে অক্ষরের বদলে ছিল সাংকেতিক ছবি। ছবিগুলো অদ্ভুত। দুর্বোধ্য। হেঁয়ালিময়। তবে আমি আন্দাজ করছিলাম ছবিগুলি মহাকাশ নক্ষত্রমণ্ডলীর হতে পারে। আমার মন বলছিল হয়তো কোনও ভিনগ্রহের সভ্যতা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে... এই নিয়েই আমি একটা পেপার লিখি। পুরোটাই হাইপোথিটিকাল । কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে সত্যতার অনেক রসদও ছিল । নাসা সেজন্যই আমাকে ডেকেছিল। যদিও ইটিইরোতে চলে এলাম। গবেষণাও চলতে লাগল... কিন্তু কোথাও যেন অঙ্কটা মিলছিল না। শেষ অবধি ঘটনাটার মোড় ঘুরে গেল আমার সাথে দিমিত্রির আলাপ হবার পর থেকে...'

'দিমিত্রি!! সে এবার কে?' তর সইছিল না চৈতালির।

'বলছি, বলছি! দিমিত্রি গ্রীসের এক ধনকুবের ব্যবসায়ী । তেলের খনি থেকে ব্যাঙ্ক, কী নেই তাঁর। কিন্তু এসবের বাইরেরও ভদ্রলোকের অন্য এক পরিচয় ছিল । দিমিত্রি একজন প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রাহক। বহু প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান স্পনসর করেছেন। ভূমধ্যসাগরের আনাফি দ্বীপে তাঁর বিশাল এস্টেট। সেখানেই নিজস্ব সংগ্রহশালা। দিমিত্রি একটা আর্টিকল পড়ে একদিন আমাকে ফোন করেন । আমাকে সাহায্য করতে চান। বলেন ওর সংগ্রহে এমন কিছু প্রাচীন গ্রিকলিপি রয়েছে যা কিনা সরকারি মিউজিয়ামেও নেই। হয়তো সেগুলো দেখে আমার কিছু সূত্র মিলতে পারে। নিজের খরচায় আমাকে নিয়ে গেলেন গ্রীসে।'

একচুমুক জল খেয়ে এবার বলতে লাগলেন খাসনবীশ, ‘দিমিত্রির কথাটা ভুল ছিল না। আনাফি দ্বীপের মিউজিয়ামে ওঁর বিশাল সংগ্রহ মাথা ঘোরানো। নিছক খেয়ালি বড়োলোক নন দিমিত্রি। প্রাচীন গ্রিক ভাষা আর ইতিহাসে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। আমি দিমিত্রির সংগ্রহে থাকা লিপিগুলি নিরীক্ষণ করতে থাকি। একদিন হঠা ৎই একটি গ্রিক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া একটি বেদিতে খোদাই করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র লিপির মধ্যে আমাদের মেসেজে পাওয়া অক্ষরগুলির সাথে মিল খুঁজে পাই। মন্দিরটি ছিল মিনোয়ানদের...’

খাসনবীশ তাতিয়ানার দিকে ইশারা করতেই সে বলতে শুরু করল, ‘মিনোয়ান কারা সেটা একটু বলি। প্রাচীন গ্রিক কাহিনিগুলোতে এক আশ্চর্য সভ্যতার হদিস পাওয়া যায়, যাদের মিনোয়ান বলা হত। এখন থেকে প্রায় ৬০০০ বছর আগে মিনোয়ানরা ক্রিট দ্বীপে গড়ে তুলেছিল নসস নামের বিশাল এক শহর। সেখানকার রাজা মিনোস বিখ্যাত ছিলেন তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্য। মিথোলজি বলছে পরবর্তীকালে তিনি পাতালের মৃতদের তিন বিচারকের একজন হিসাবে নির্বাচিত হন। রাজা মিনোস তৈরি করিয়েছিলেন এক আশ্চর্য রাজপ্রাসাদ। যে প্রাসাদে ছিল এক অদ্ভুত গোলকধাঁধা। নিজের পুত্র অর্ধেক-মানুষ - অর্ধেক-ষাঁড় - জাতীয় দানব নরখাদক ‘মিনোটর’-কে বন্দি করে রাখা ই ছিল রাজার উদ্দেশ্য। মিনোয়ানদের সর্বোচ্চ দেবতা ছিলেন এক সর্পদেবী। যিনি আদতে গ্রিক দেবী ইউরিনোমের এক পুরানো সংস্করণ। প্রাসাদের পাশেই ছিল সেই সর্পদেবীর মন্দির। এই মন্দিরটির কথাই স্যার বলছিলেন।’

‘সাবাস তাতিয়ানা’, আবার শুরু করেন খাসনবীশ, ‘মিনোয়ানদের ভাষা উদ্ধার করতে শরণাপন্ন হই মিনোয়ান লিপিবিশারদ ডঃ আন্দ্রেজের। উনি কিছুদিন পর যে রিপোর্ট দেন তাতে মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। মিনোয়ান মন্দিরগাত্রে লেখা লিপি আসলে সেই সর্পদেবীর গুণকীর্তন। এই দেবী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন আকাশ থেকে। তাঁর স্বর্গীয় রথে চেপে। রাজা মিনোসের অনুরোধে দেবী তাঁদের দেবলোকের বিদ্যা শিক্ষা দেন। এবং তার বদলে তাঁরা পৃথিবী থেকে নিয়ে যায় অমূল্য ধন।’

‘আশ্চর্য গল্প তো...’ তাতিয়ানার মায়ের গলায় বিস্ময়।

খাসনবীশ বলতে থাকেন, ‘আমি মিনোয়ানদের নিয়ে আরও অনেক গবেষণা করি। আমার স্থির ধারণা হয় এই সর্পদেবী আসলে ভিনগ্রহী যারা সেইসময় পৃথিবীতে এসেছিল। গ্রিক মিথোলজির সাথে ওরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জের বিশেষ যোগ রয়েছে। খুব সম্ভবত এরা সেখানকার কোনও গ্রহের বাসিন্দা ছিল।’

‘ওরিয়ন, মানে আমরা যেটাকে কালপুরুষ বলে জানি?’

‘ঠিক তাই। দেবলোকের বিদ্যা বলতে বো ঝানো হয়েছে মিনোয়ানদের ভাষা, যা থেকে পরে গ্রিক ভাষা এবং নানা প্রাচীন ভাষার উদ্ভব। মিনোয়ানদের আরও নানা বহুমূল্য জ্ঞানের ভান্ডার দিয়ে যায় তারা, যা পরে গ্রিকদের সমসাময়িক সভ্যতাগুলির থেকে অনেক এগিয়ে দেয়। কিন্তু তারা পৃথিবী থেকে কী অমূল্য ধন নিয়ে গেছিল সেটা আমি বুঝতে পারিনি।’

তন্ময় বলে উঠল, ‘ফ্যাসিনেটিং... কিন্তু আপনি কী করে ওদের সাথে যোগাযোগ করলেন?’

‘আমি মিনোয়ানদের ভাষাটা রপ্ত করতেই আস্তে আস্তে মেসেজগুলির মানে পরিষ্কার হয়ে যায়। ওরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছিল। আমাদের থেকে ঐ সভ্যতা অনেক উন্নত। ওরা বুঝতে চাইছিল মানবজাতি এই ৬০০০ বছরে কতটা এগিয়েছে। ওরা বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের সাথে সংযোগ করতে চেয়েছিল। আমাদের প্রযুক্তি এই এস-এম-এস - গুলি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। বেশ কিছু র্যারন্ডম মেসেজ ওরা পাঠিয়েছিল, যার মধ্যে তাতিয়ানা একজন যার মোবাইলে ধরা পড়ে ব্যাপারটা। হয়তো আরও অনেকের কাছেই গেছিল। সবাই ব্যাপারটা য় গুরুত্ব দেয়নি। এরপর ব্যাপারটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায় বিজ্ঞানীদের কাছে। ইটিইরো, নাসা - সহ বিশ্বের নানা দেশের তাবড় মহাকাশবিজ্ঞানীরা একজোট হয়ে কাজ করতে শুরু করে ন। মহাকাশে ওদের উদ্দেশে পাল্টা বার্তা পাঠানো হতে থাকে। যদিও আমাদের বিজ্ঞান এমন উন্নতি করেনি যে অতি দ্রুত অন্য

নক্ষত্রপুঞ্জে তরঙ্গের আকারে বার্তা পাঠানো যাবে। এমনিতে আলোর গতিবেগের চেয়েও বেশি গতিতে পাঠালেও বহু বছর লাগার কথা সেখানে পৌঁছতে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল এই ভিনগ্রহীরা এতটাই উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী , তারা কোনও উপায়ে আমাদের বার্তা দ্রুত গ্রহণ করতে সক্ষম। এবং বাস্তবে সেটাই হল। ওদের সাথে যোগাযোগ হল। এটুকু জানতে পারলাম আথেনিকা নামক একটি গ্রহে ওদের বসতি। বেশ কয়েক বছর কথা চালাচালির পর আজ আমরা আথেনিকানদের থেকে জবাব পেলাম যে ওরা পৃথিবীতে আসছে...'

'মানে এই প্রথমবার এলিয়েন দর্শন পাব আমরা... উফ ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে', উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে চৈতালি।

'অত নাচিস না। কে জানে কেমন কিম্ভুত দেখতে। আর যদি কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকে। তবে?' তাতিয়ানার মা চৈতালিকে থামিয়ে বলে উঠলেন।

'মা তুমি এত চিন্তা করো না! ওরা আমাদের থেকে এতটাই এগিয়ে , ইচ্ছা করলেই ওরা এতদিনে অনেক কিছু করতে পারত। কিন্তু তা তো করেনি,' বলল তাতিয়ানা।

'কিন্তু নবারুণবাবু, ওরা এতটা পথ পাড়ি জমাবে কী করে?' তাতিয়ানার বাবার গলায় বিস্ময়।

'এরকম আরও অজস্র প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। সত্যি বলতে সেটা আমাদের সময়ের বিজ্ঞানের পক্ষে বোঝা দুষ্কর। দেখা যাক ওদের থেকে যদি কিছু শিখতে পারি।'

'অনেক এলিয়েন হয়েছে ... এবারে আমার বানানো চকোলেট আইসক্রিমটা খেয়ে ফেলো দেখি,' আলোচনা থামিয়ে হাতে ট্রে নিয়ে হাজির হয় তাতিয়ানার মা।

আইসক্রিম খেতে খেতে চৈতালি বলে উঠল, 'আচ্ছা এলিয়েন ব্যাটাগুলোকে কাকিমার হাতের রান্না খাওয়ালে কেমন হয়?'

হাসিতে গমগম করে তাতিয়ানাদের ডাইনিং রুম।

৩

আথেনিকা গ্রহ। বহু আলোকবর্ষ দূরের ওরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জের সেই গ্রহ যেখান থেকে একসময় পৃথিবীতে এসেছিল সেখানকার উন্নত সভ্যতার প্রাণীরা। যারা বিশ্বের মানুষদের থেকে সব দিক থেকেই অনেক এগিয়ে।

নতুন অতিথিদের এই সম্ভাব্য আগমন বার্তা আক্ষরিক অর্থেই কাঁপিয়ে দিল সমগ্র বিশ্বকে। চতুর্দিকে সাজো সাজো রব। সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেল সর্বত্র একই আলোচনা। তর্ক-বিতর্ক-মতামত-আশঙ্কা-প্রত্যাশা সবমিলিয়ে জমজমাট সোশাল মিডিয়া। ধুলো ঝেড়ে কল্পবিজ্ঞানের বইগুলো নতুন করে পড়তে শুরু করল মানুষ। সাইফাই সিনেমার কাটতি তুঙ্গে। মোবাইলে একের পর লঞ্চ করতে লাগল নানা এলিয়েন-অ্যাপ।

এর সঙ্গে যোগ হল রকমারি গুজব। বিশেষ করে তারা কীরকম দেখতে, কী করে, কী খায়, এরকম বহু ব্যাপারে ভয়ানক সব গায়ের রক্ত জল করা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন রকমের ভুয়ো ছবিও প্রকাশ হতে লাগল। যেমন একটি বহুল প্রচারিত ভুয়ো ছবিতে দেখা গেল এলিয়েনগুলো মানুষ ধরে খাচ্ছে। সত্যাসত্য বিচার না করেই সেইসব ছবি চালাচালি হতে লাগল।

আমাদের দেশেও নানা মজাদার কান্ড ঘটতে লাগল। কিছু জ্যোতিষবিদ বুধের চলন, বৃহস্পতির তুঙ্গে থাকার গণনার পাশাপাশি আথেনিকাকেও সঙ্গে জুড়ে নিল। ইউ পি'র স্থানীয় একটি রাজনৈতিক দলের বিধায়ক তো আবার এলিয়েনদের তাঁদের দলের হয়ে ভোটে দাঁড়াবার ঘোষণা পর্যন্ত করে দিলেন। এলিয়েনদের সংবর্ধনা দিতে চেয়ে সরকারের কাছে শ'য়ে শ'য়ে আবেদনপত্র জমা পড়তে লাগল। বানানো, অতিরঞ্জিত সব খবরের জেরে মানুষ চূড়ান্ত বিভ্রান্ত হতে লাগল।

তাতিয়ানার বাবা - মায়ের অবস্থা সবচেয়ে কাহিল হয়ে পড়ল। টিভি, সংবাদপত্রের দৌলতে তাতিয়ানাকে সবাই তখন চেনে। বিচিত্র সব আবদার আসতে লাগল ওদের বাড়িতে। ওর মা সব

লিস্ট করে রেখে দিতে ন। রাতে কাজ সেরে ফিরলে তাতিয়ানার হাসির খোরাক যোগাত সেই সব অদ্ভুত অবাস্তব দাবিদাওয়া। যেমন, বুম্বার বাবা তাঁর অঙ্কে ফেল করা ক্লাস সেভেনের ছেলের জন্য একটি এলিয়েন প্রাইভেট টিউটর রাখতে চেয়েছিলেন। পাপানদা তাঁর গঙ্গাফড়িং মার্কা চেহারায় মহম্মদ আলির মতো ঘুসির জোর কীভাবে আনা যায় তার গোপন ফরমুলা জানতে চাইল এলিয়েনদের কাছ থেকে। শুধু শুধু আর এই বিদঘুটে তালিকা প্রলম্বিত করে লাভ নেই।

অবশ্য এমন কিছু মানুষও ছিল যারা পুরো ব্যাপারটাকেই স্রেফ আন্তর্জাতিক ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিল।

৪

তবে এসব থেকে বহু যোজন দূরে থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে যাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা।

এরকমই এক বিকেলে জাপানের একটি নির্জন দ্বীপের মানমন্দিরে আলোচনায় বসেছিলেন বেশ কিছু বিজ্ঞানী। ছিলেন মস্কোর স্পেস রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর ডঃ পাভেল, নাসার বিজ্ঞানী মাইকেল মিলার, নোবেলবিজয়ী প্রাণীবিদ সিনজি উসামি, ডঃ খাসনবীশ এবং আর ও কয়েকজন। ওঁদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যাতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক না থাকে।

খাসনবীশঃ ‘আথেনিকানরা কেন আসছে তার প্রধান কারণটা জেনে নিতে পেরেছি আমরা। পৃথিবীর প্রাণী আর উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায় তারা। উসামি ব্যাপারটার সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন...’

উসামিঃ ‘আথেনিকানদের মূল উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে বিশেষ করে কিছু খাদ্যশস্য এবং প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা। ওদের উদ্দেশ্য মূলত দুটি। এক, ওরা একটা মহাজাগতিক সংগ্রহশালা বানাতে চায়, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত জীবের নমুনা সংরক্ষিত থাকবে। আর দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ কারণে ওদের ওখানে বহু প্রাণী ও শস্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে ওদের খাদ্যের ভাঁড়ারে টান পড়তে চলেছে। ওদের খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই পৃথিবীর প্রাণীকুলের মতোই। তাই এখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায় ওরা।’

মিলারঃ ‘আর একটা উদ্দেশ্যও ওদের আছে, যেটা নাকি ওরা শেষ মুহূর্তে জানাবে। এ সম্পর্কে কিছু কি আন্দাজ করছেন আপনারা?’

ডঃ পাভেলঃ ‘মনে হয় এমন কিছু দাবি করবে না যা আমাদের পৃথিবীবাসী দিতে অপারগ। অবশ্য ওরা যদি জোর করে তবে কিছু করার নেই। আমাদের রাজি হওয়া ছাড়া গতি নেই।’

খাসনবীশঃ ‘আমার মনে হয় না আথেনিকাবাসীরা তেমন কিছু চাইবে।’

মিলারঃ ‘আচ্ছা, আমরা না হয় ওদের সমস্ত দাবি মেনে নিলাম। কিন্তু তার বদলে আমরা কী পাব?’

উসামিঃ ‘দেখুন, ওদের কাছ থেকে আমাদের প্রচুর কিছু শেখার আছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মহাকাশবিদ্যা কী নয়...। সত্যি বলতে ওদের কর্মকাণ্ড মহাজাগতিক। কিন্তু আমরা তো এখনও আমাদের সৌরজগত ছেড়েই বেরোতে পারলাম না। ওদের সাহায্য পেলে...’

খাসনবীশঃ ‘আমরা বেশ কিছু বার্তা পাঠিয়েছিলাম ওদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সরাসরি না বলেনি। কিন্তু মনে হয় না ওরা কিছু সাহায্য করবে বলে।’

মিলারঃ ‘কেন?’

খাসনবীশঃ ‘ওরা কিছুটা দার্শনিক গোছের উত্তর দিয়েছে। বিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করলে পতন অনিবার্য, মানেটা অনেকটা এরকম। এর থেকেই বুঝেছি ওরা সাহায্যে রাজি নয়।’

ডঃ পাভেলঃ ‘এখনও অবধি আমাদের তো এটুকুও জানায়নি ওরা দেখতে কেমন... ওদের গ্রহটা কেমন... বোধকরি ওরা নিজেদেরকে গোপনে রাখতে চায়।’

উসামিঃ ‘সেটা আমারও ধারণা। আচ্ছা ওরা কবে আসবে কিছু বলেছে?’

খাসনবীশঃ ‘সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ। আগামী মাসে সব জানিয়ে দেবে। তবে আমাদের কাজের অগ্রগতি আগে দেখতে চায় ওরা।’

উসামিঃ ‘ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমাদের পুরো টিম কাজ করছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে আশা করি।’

মিলারঃ ‘আপনার উপর আমাদের অগাধ আস্থা। হাজার হোক এটা পৃথিবীর সম্মানের প্রশ্ন । আমাদের পারতেই হবে।’

বৈঠক ছেড়ে বেরিয়েই যে যার মতো লেগে পড়েন কাজে। ওরা জানেন, এই প্রথমবার আধুনিক বিশ্বের সাথে বহির্জগতের অন্য কোনও সভ্যতার সংযোগ হতে চলেছে। এই সুযোগ যে মানুষের সামনে নতুন এক সম্ভাবনার দোর খুলে দেবে না, তা কে বলতে পারে?

৫

সূর্যের চারিদিকে পাক খেতে পৃথিবী ক্লান্তিহীন। একই তালে ঘুরে চলে ঘড়ির কাঁটাও। দেখতে দেখতে চলে আসে সেপ্টেম্বর।

ক’দিন ধরেই কলকাতাসহ ভারতীয় উপমহাদেশের আবহাওয়া ছিল মেঘলা। কোথাকার উটকো নিম্নচাপ এসে ঢেকে রেখেছিল আকাশ।

কিন্তু সেই বিশেষ দিনটার কথা ভুলতে পারবে না কেউ। দিনটা ছিল মহালয়া। পুজোর গন্ধে মাতোয়ারা বাংলা। সকাল সাতটা নাগাদ আচমকাই মেঘলা ভাব কেটে গিয়ে শরতের নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ল। যারা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখবে বলে আকাশের দিকে তাকাল তাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল এক আশ্চর্য বিস্ময়।

নীল আকাশের মধ্যে যেন ঝুলছিল বিশাল একটুকরো জমি। ঠিক চাঁদের মতো গোল নয়। আবার উড়ন্ত চাকির মতো চ্যাপটাও নয়। অদ্ভুত কুয়াশাচ্ছন্ন। ধূসর।

কেউ ভিরমি খেল। কেউ ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকোল । মাসি-পিসিরা শাঁখ বাজাতে লাগল। ওয়াকিবহাল যারা তারা চটপট ক্যামেরা বাগিয়ে ধরল। উঠল সেলফি তোলার ধুম। সোশাল মিডিয়ায় হ্যসট্যাগ #সেলফিউইথসসার। আর মুহূর্তে টিভি চ্যানেলগুলোয় সমবেত কোরাস, এলিয়েনরা এসে গেছে।

আথেনিকাবাসীর সহসা আগমনে আবিশ্ব আমজনতা তখন এলিয়েনময় । তাতিয়ানারা অবশ্য অবাক হয়নি। বৈজ্ঞানিক মহল আগেই জেনে গেছিল ওরা ঢুকে পড়েছে সৌরজগতে। কিন্তু ওরা দৃশ্যমান ছিল না। অবিশ্বাস্য তাদের যানের গতি। ঠিক যান না বলে ছোটোখাটো চলমান গ্রহ, বা বড়োসড় গ্রহাণু বলা যেতে পারে। ওরা আপাতত নিজেদের যানটিকে স্থাপন করেছে পৃথিবীর চারপাশে এক নিজস্ব কক্ষপথে। কৃত্রিম উপগ্রহের মতো।

তবে সত্যি বলতে বিশেষজ্ঞগ ণ দিশেহারা। বহু প্রশ্ন উঠে আসছে। কিন্তু জানার উপায় নেই। কারণ আথেনিকানরা প্রচন্ড গোপনীয়তা বজায় রেখেছে। তারা পৃথিবীবাসীর কাছে থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছে। তাদের প্রযুক্তির ক্ষমতাও যেন যাদুকরী । যেন আশ্চর্য কোন ও কুয়াশার পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছে নিজেদের। শক্তিশালী টেলিস্কোপ বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কোন ওটিই ঐ অদ্ভুত যানটির উপরিভাগের ছবি তুলতে পারছে না।

কিন্তু তারপর? কী অপেক্ষা করছে পৃথিবীর ভাগ্যে?

এমনকি বিজ্ঞানীদেরও কোনও আভাস দেয়নি আথেনিকাবাসী। পরবর্তী মেসেজের জন্য দমবন্ধ করে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও গতি নেই।

পাক্কা ২০টি ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অবশেষে কাঙ্ক্ষিত বার্তাটি এল। প্রথমেই তারা সৌরজগতের সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা পৃথিবীর মানবজাতিকে তাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঠিক চারদিন পর রাত্রি ন 'টায় একটি ছোটো যান নামবে পৃথিবীর মাটিতে । জায়গাটিও নির্বাচন করে দিয়েছে আথেনিকানরা। সেটি লাদাখের এক দুর্গম এলাকা। আথেনিকানদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সেখানেই হস্তান্তর করতে হবে। ঐ অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখতে বলেছে । কীভাবে জিনি সগুলি সংগ্রহ করা হবে সেটা তাদের দায়িত্ব।

বাছাই করা বিজ্ঞানীদের একটি দল তড়িঘড়ি রওনা দিল লাদাখের পথে। তাঁদের মধ্যে খাসনবীশও ছিলেন।

তাতিয়ানা বিমানবন্দর অবধি একসাথে গেল। গাড়িতে কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে।

'স্যার, ওরা কী আমাদের কারুর সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে চায় না?'

'মনে তো হচ্ছে না। এমনকি ওরা রাতের বেলাকে বেছে নিয়েছে সাক্ষা ৎকারের জন্য। তাও একটি জনমানবহীন জায়গায়। সেখানে কোনও প্রকার বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো বা ক্যামেরার প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে বলেছে আথেনিকানরা । হয়তো আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না।'

'কিন্তু কেন? আগে তো ওরা পৃথিবীতে মানুষের সাথে মিশেছিল।'

'সে তো ছ-হাজার বছর আগের পৃথিবী। মানুষের হাতে তখন এত মার ণাস্ত্রও ছিল না। এখনকার মানুষজাতি কেমন সেটা হয়তো আগে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। কিংবা হয়তো আরও অন্য কোনও কারণ আছে, সেটা আমরা জানি না।'

'আচ্ছা স্যার, আমরা যে ওদের থেকে অনেক পিছিয়ে। আমরাও যে ওদের কাছ থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশা করি সেটা নিশ্চয়ই ওরা জানে। কিন্তু তাও কেন ওরা এমন দূরে সরে আছে?'

'সে প্রশ্ন তো আমাদের সবারই ', হালকা হেসে ঘাড় নাড়লেন খাসনবীশ। একরাশ চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। মনে হচ্ছে কোথাও অঙ্কটা মিলছে না।

বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিল ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমান । বিজ্ঞানীদের উড়িয়ে নিয়ে গেল লাদাখের দিকে।

দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান- সহ বিশ্বের তাবড় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা একত্রে বৈঠকে বসেছে ন। নজরে রাখছে ন পুরো ঘটনাক্রম। আর সেই সঙ্গে প্রস্তুতও হয়ে রয়েছেন যদি খারাপ কিছু ঘটে। যেন পুরো পৃথিবীতে একটাই বিশাল দেশ।

৬

লাদাখের সেই জনহীন প্রান্তরে স্পেসিমেনগুলি গুছিয়ে রেখে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাইকেল মিলার, প্রাণীবিদ সিনজি উসামি এবং খাসনবীশ। খাসনবীশ এই জায়গায় আগে কোন ওদিন আসেননি। আকাশটা ছিল পরিষ্কার। রাশি রাশি তারার মাঝে খাসনবীশের হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল। মহাজগতের মাঝে নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র আর অসহায় মনে হচ্ছিল।

আচমকা চোখের সামনে একটি চোঙাকৃতি যান এসে নামল । এত বড়ো একটি যান আকাশ থেকে নামল অথচ কোনও শব্দ হল না। পরে অবশ্য খাসনবীশ জেনেছিলেন পৃথিবীর কোনও রাডারেও ধরা পড়েনি এর অস্তিত্ব। হালকা আলোয় আবছা দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তি নামল যান থেকে। যদিও দূর থেকে কালো অবয়ব দেখে মানুষের চেয়ে সরীসৃপের মতোই দেখতে লাগল তাকে ।

সাথে ছিল যন্ত্রমানব গোছের কিছু চেহারা । অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সবকিছু সেই চোঙাকৃতি যানে চালান করে দিল তারা। তারপর নিমেষে মিলিয়ে গেল ভোজবাজির মতো।

কোনও কথা নয় । না কোনও কুশল বিনিময়। শুধু যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করে চলে গেল আথেনিকানরা।

বাকিদের মতো খাসনবীশও খুব হতাশ হলেন। তিনি অনেক কিছু আশা করেছিলেন। কিন্তু কিছুই তো হল না! কলকাতায় ফিরে আসছিলেন আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে । এমন সময় বেজে উঠল তাঁর ফোনটা। 'ইটিইরো'র সদর দপ্তর থেকে।

উল্টোদিকে শ্রীবাস্তবের গলা, 'হ্যালো স্যার! এই মাত্র আমাদের কাছে একটি মেসেজ এল আথেনিকানদের থেকে। ওরা আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে সাহায্য করার জন্য। উপহারস্বরূপ ওরা আমাদের কিছু দিতে চায়।'

উত্তেজনায় ফুটছিলেন ডঃ খাসনবীশ, 'কি উপহার???... কিছু বলেছে ওরা?'

'ওরা আরও দু'বছর সৌরজগতে থাকবে। একজন পৃথিবীবাসীকে ওদের সাথে থাকার সুযোগ করে দিতে চায় এই দুই বছরের জন্য। আমরা রাজি কিনা জানতে চেয়েছে?'

'রাজি মানে ...আলবাত রাজি', খাসনবীশের গলায় যুদ্ধজয়ের উচ্ছ্বাস।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা আলোচনায় বসলেন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে । গোল বাঁধল অন্য জায়গায়, সব দেশই চায় নিজের দেশের লোককে পৃথিবীর প্রতিনিধি করে আথেনিকানদের কাছে পাঠাতে। তুমুল বিতণ্ডার পর ঠিক হল জীবনপঞ্জীসহ পাঁচ জনের একটি তালিকা পাঠানো হবে ওদের কাছে। ওরা যাকে বেছে নেবে সেই শেষ অবধি বিশ্বের প্রতিনিধি।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। বিভিন্ন দেশের সেরা সেরা নভশ্চরদের নিয়ে পাঁচজনের একটি তালিকা গেল আথেনিকানদের কাছে। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে সম্পূর্ণরূপে বাতিল হল সেই নামগুলি। আথেনিকানরা এদের কাউকেই সুযোগ দিতে চায় না তাদের কাছে নিয়ে যেতে।

ঠিক হল পৃথিবী থেকে আরও একটি তালিকা পাঠানো হবে। কিন্তু উত্তর দিল না ওরা। বরং ওরা ফিরে যাবার তোড়জোড় শুরু করছে বলে মেসেজ পাঠাল । বিজ্ঞানীরাও আবার ডুবে গেলেন চূড়ান্ত হতাশায়।

কিন্তু চমকের আরও বাকি ছিল।

আথেনিকানরাই শেষ অবধি বিশেষ একজনের নাম পাঠাল ওদের যানে আমন্ত্রণ জানিয়ে। খাসনবীশ যখন নামটা পড়ছিলেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এ নাম যে তাতিয়ানার।

৭

'এ কি ছেলেখেলা পেয়েছেন নাকি? না তাতিয়ানা কিছুতেই যাবে না', রাগে ফেটে পড়লেন তাতিয়ানার মা।

খাসনবীশ নিজে খবরটা পৌঁছে দিতে গেছিলেন তাতিয়ানার বাড়িতে। এমনকি তাতিয়ানাকেও আগে থাকতে ফোনে বলেননি। ওর বাবা-মা - কে ডেকে সবার সামনে আথেনিকানদের বার্তাটি পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তাতে কিছু শর্ত ছিল। যা সংক্ষেপে এইপ্রকার,

১। আগামী দু'বছর আথেনিকানদের অতিথি হয়ে থাকবে তাতিয়ানা। তাতিয়ানার সুরক্ষার সম্পূর্ণ ভার ওদের।

২। পৃথিবীর জলবায়ুর মতোই পরিবেশ প্রদান করা হবে তাকে। কোনওপ্রকার শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন তাকে হতে হবে না।

৩। তাতিয়ানাকে আথেনিকান সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করানো হবে।

৪। ঠিক দু'বছর বাদে তাতিয়ানাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে আথেনিকানরা। মাঝের এই সময়ে কোনওভাবে যোগাযোগ করা যাবে না ওর সাথে।

৫। এই দু'বছরের মধ্যে কখনও তাতিয়ানা যদি স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায় , তাকে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু আর ফিরে যাওয়া যাবে না।

৬। একমাত্র তাতিয়ানা নিজে সম্মতি দিলে তবেই আথেনিকানরা তাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাবে। তাতিয়ানার উপর কোনওপ্রকার চাপ বা জোর খাটানো যাবে না পৃথিবীর পক্ষ থেকে। আর, তাতিয়ানা যদি আসতে সম্মতি দেয়, তাহলেও তাকে কেউ জোর করে আটকাতে পারবে না।

কাগজে প্রিণ্টআউটটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শোনালেন ডঃ খাসনবীশ।

'নবারুণবাবু আমি আপনাকে তাতিয়ানার ব্যাপারে কোনওদিন না বলিনি। কিন্তু ওর বাবা হিসাবে আমি এই প্রস্তাবে একেবারেই সম্মত হতে পারছি না', একটু রাগত স্বরেই বললেন অনিমেষবাবু।

'দেখুন, বাবা-মা হিসাবে আমি আপনাদের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এটাও ভাবুন , ওদের না করাটা কি ঠিক হবে ? এটা মানবজাতির সম্মানের প্রশ্ন। তাতিয়ানার পক্ষেও ব্যাপারটা কতখানি গৌরবের', বোঝানোর চেষ্টা করলেন ডঃ খাসনবীশ।

'কিন্তু তাই বলে যাদের আমরা দেখিনি পর্যন্ত সেখানে ওকে পাঠাতে হবে ! ওরা তো বলেই খালাস। মহাকাশে যাবার কোনও ট্রেনিং আছে তাতিয়ানার? যদি ভালো মন্দ কিছু হয়ে যায়... ', তাতিয়ানার মা ফোঁস করে উঠলেন।

'স্যার, আমি যাব...', তাতিয়ানার শান্ত অথচ দৃঢ় স্বর ভেসে আসে।

'কি বলছিস তুই!!!' ওর বাবার গলায় বিস্ময়।

'বাবা, তুমি ছোটোবেলায় আমাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে তারা চেনাতে। মনে আছে আমাকে গ্যাগারিন, আর্মস্ট্রংদের গল্প শোনাতে ? আমি জিজ্ঞাসা করলে তুমি আমাকে বলতে আমি একদিন মেঘে চেপে ঐ তারাগুলো দেখতে যাব... আজ সেই দিন এসে গেছে বাবা। তুমি প্লিজ না বোলো না......। মা... মাত্র দু'বছরের তো ব্যাপার। আমার কিচ্ছুটি হবে না। তুমি ভয় পেয়ো না। শুধু তোমার হাতের রান্নাটা মিস করব', মা'কে জড়িয়ে ধরল তাতিয়ানা।

'সাবাস তাতিয়ানা! তুমি সত্যিই খুব সাহসী। আমি নিশ্চিত যে তুমি পারবে ,' ডঃ খাসনবীশের গলায় স্পষ্ট একটা চাপা গর্বের সুর।

স্যারকে একটা প্রণাম করল তাতিয়ানা। বাবা-মাকেও।

৮

সমস্ত ঘটনাটা খুব দ্রুততার সাথে ঘটে যাচ্ছিল। তাতিয়ানাকে নিয়ে লাদাখের পথে রওনা হল বিজ্ঞানীরা। তার আগে অবশ্য দিল্লিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের দেওয়া একটি বিশেষ ভোজসভায় তাতিয়ানাকে আসন্ন অভিযানের শুভকামনা জানানো হয়। বিজ্ঞানী আর নভশ্চরদের তরফ থেকে ওকে কিছু প্রয়োজনীয় টিপসও দেওয়া হল।

লাদাখের সেই জনহীন প্রান্তরে একা একা অপেক্ষা করছিল তাতিয়ানা। সামনে অজানা ভবিষ্যত। মা-বাবার কথা খুব মনে হচ্ছিল। আর ওর সুন্দর বাড়িখানা। মাত্র তো দু 'টো বছর, তারপর তো আবার আগের মতোই। এই ভেবেই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল তাতিয়ানা। একটু ভয়ও যে লাগছিল না তাও নয়। কিন্তু পৃথিবীর সামনে নতুন এক জগতের দুয়ার খুলে যাচ্ছে ওর মাধ্যমে, এটা ভেবেই নিজেকে অনুপ্রাণিত করছিল তাতিয়ানা।

বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন খাসনবীশ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা।

ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় নেমে এল একটি মহাকাশযান। এটি আগের থেকে অনেকটাই আলাদা। খুলে গেল দরজা। একবার পিছন ফিরে হাত নেড়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে মহাকাশযানে উঠে গেল তাতিয়ানা। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমন ভাবেই আকাশে মিলিয়ে গেল মহাকাশযান।

বহু দূরে বাংলার আকাশ অবশ্য ঢাকের বোলে কোলাহলমুখর তখন। রাতটা যে দশমীর।

গ্রাফিক্স্-- ইন্দ্রশেখর

শিবশঙ্কর ভট্টচার্য্য

জষ্টিমাস ষষ্ঠী পুজো। সকাল থেকে গনগনে রোদ্দুরের পর দুপুর নাগাদ ওপর ঝাম্‌টা বৃষ্টি, থামবার নাম নেই! মেনি ষষ্ঠীঠাকুরানীর বাহন। অন্যদিন মেনি "দূর ছাই", আজ ওর আদর দেখে কে! ঠাকুরমা পর্যন্ত ধানদুব্বো আজ ভেজা পাখার ষাট ষাট করে দিয়েছে!

লোকজনের হুল্লোড় শোবার ঘরের খাটের তলায় ঘুমোবার জো নেই আজ। খাওয়াদাওয়ার পর মেনি গেছে চিলছাদের আলসের তলায় জিরোতে। ক্ষীরের ভারে গোঁফ ঝুলে পড়েছে। আম, কাঁঠাল, পায়েসের আবেশে দু"চোখ ঢুলু ঢুলু। সর্বাঙ্গ এমন চট চট করছে যে আধঘন্টা ধরে চেটেও কুল পাওয়া যাচ্ছে না। কপালে আবার কি করে এক পোঁচ হাঁড়ির কালি লেগেছে, বিশ্রী দেখাচ্ছে! তাঁর ওপর জায়গাটা জিভের নাগালের বাইরে। গড়াগড়ি দিয়েও সুবিধে হয়নি। মন খারাপ করে মেনি বসেছিল। এর মধ্যে বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে। মেঘের ফাঁকে ফ্যাকাশেপানা একটু রোদ্দুর। এ"রকম দিনে খ্যাঁকশেয়ালদের বিয়ের ধুম পড়ে যায়। হোকগে বিয়ে! বিরক্ত মেনি পায়ে পায়ে আলসের ওপর সবে একটু রোদ পিঠে বসে চোখ বুজেছে, ফের এক পশলা ছাগল-তাড়ানী বৃষ্টি!

দৌড় দৌড়। সোজা ভাঁড়ার ঘরের চৌকির তলায়। লোম ফুলিয়ে গা ঝাড়া দিতে দিতে মেনির কান খাড়া হল। ফিক করে কে যেন হাসল না? নাঃ কোথায় কে? মনের ভুল। খানিক ইতিউতি চেয়ে ফের চাটাচাটি শুরু করতেই সুরেলা গলায় কে যেন বললে,

"একে বেড়াল কালো
তায় গাঙ সাঁতারে এলো,
তায় ছাই গাদাতে শুলো
একগুনো বিড়াল রূপে তিনগুনো হল।"

তবে রে! নিমেষে মেনির শরীর টান টান, চোখজোড়া আগুনের ভাঁটা। গলার আওয়াজটা চেনা চেনা ঠেকছে! এ হল দেড়ে ব্যাটার নতুন নাতবৌ কুটনিটার ফিজলেমী। সুন্দরী বলে দেমাকে পা পড়ে না। ছুঁড়ি যেন সং! ঠারে ঠোরে কথা শোনায় মেনিকে।

ভাঁড়ার ঘরের কাঠের সিন্দুকের তলায় ছোট্ট ফাঁক। তাঁর ফাঁকে গোলাপী ঠোঁট নড়ে উঠল ফের, "রাগ করলি?"

"নাঃ, আহ্লাদে গলে গেলাম তোর ছড়া শুনে, ন্যাকা।"

"আহা, আয় না, দুটো মনের কথা বলি।"

"বয়ে গেছে আসতে।"

মেনির রাগের কথায় হি হি হাসছে কুটনি। গা জ্বলে যায়। ফাঁক দিয়ে ভারি মোলায়েম এক জোড়া নীল মার্বেল চোখ দেখা গেল।

"হাঁড়ি চাটতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি।"

ঘাড়ের লোম ফুলে উঠেছে। গলায় গর গর করছে রাগ।

"তোর তাতে কী!"

"নাঃ, একা একা খেলি কিনা। আমার ছানাগুলো এখনও শুকিয়ে রয়েছে।"

" আহা রে! " ছানাগুলোর কথা ভেবে একটু নরম ভাব মেনির। ইঁদুর বৌটার আবার স্বর ফুটেছে।

"যাক্গে! আমিই বা কত তোকে ভাগ দিতে পারছি বল? ওমনি বলছি। তাছাড়া হাঁড়িতে মুখ দিয়ে কী পিটুনিটাই না খাস তুই। খারাপ লাগে।"

ফের বজ্জাতি। লেজ একবার এদিক একবার ওদিক, গলার স্বর ফ্যাঁস ফ্যাঁসে, শরীর টান করে বসল মেনি।

"কে বললে পিটুনি খেয়েছি।"

"গায়ের ওই পুরনো দাগগুলো কীসের শুনি? ঠাকমা বুড়ি আলপনা এঁকে দিয়েছে বুঝি আদর করে?"

"তাতে তোর গা জ্বলছে কেন?"

"চুরিটাও করতে শিখলি না রে! আমার কাছে আসিস শিখিয়ে দেবখন।"

মেনির চোখ চক্ চক্, লেজ ডাইনে বাঁয়ে নড়ছে, কান জোড়া মাথার দুপাশে সাঁটা।

"দোরটা খোল, শিখতে যাই।"

দুষ্টু ইঁদুর বৌটা হেসেই কুটিপাটি। হাসিটা কিন্তু ভারি মিঠে।

"অত বোকা নই রে! সেদিন নতুন ছোঁড়াটাকে বাবু নিয়ে এল ফুট-ফরমাশ খাটবার জন্য, পরদিনই বাসনকোসন নিয়ে হাওয়া! বোকা, বোকা! ছাপোষাদের দোর খুলতে হয় হিসেব করে।"

"হুঁ, বুদ্ধি যত আছে তোর মগজে?"

"গণেশ ঠাকুরের বাহন যে রে।"

"আমিও বানের জলে ভেসে আসিনি। ষষ্ঠীঠাকরুনের সাক্ষাৎ শিষ্যা!"

"দূর বোকা মেয়ে, গণপতিঠাকুরের সাথে কার তুলনা! দুগ্‌গা মা দুই ছেলেকে বললেন, যাও দুনিয়া দেখে এস। কার্তিক ঢাল-তলোয়ার বেঁধে, ময়ূরে চড়ে বছর পার করে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে। গণপতি ঠাকুর করলেন কি? গোলগাল শরীরে হেলতে দুলতে মাকে একবার প্রদক্ষিণ করেই ব্যাস! হয়ে গেল দুনিয়া দেখা! কী বুদ্ধি!"

রাগটাগ ভুলে মেনি গল্প শুনছিল। বলার ঝোঁকে ইঁদুর বৌটাও খিড়কি দোর খুলে অনেকটা বাইরে। হঠাৎ খেয়াল হতেই ফের ওপার। হেসে গড়াগড়ি!

"হয়েছিল আর কি! এক্কেবারে তোর থাবার নাগালে চলে গেছলাম। নুলো বাড়ালি না যে বড়ো? ও মেনি রে তুই কি ভালো হয়ে গেলি রে?"

মেনি খেয়াল করেনি প্রথমটা। ফোঁস করে উঠল, "খারাপটা ছাড়া তো চোখেই পড়ে না তোর। তাছাড়া এত ক্ষীর, দই ছেড়ে তোকে খেতে বয়ে গেছে আমার। মুখ নষ্ট!"

খিড়কি দোর খুলে সটান সামনে হাজির ইঁদুর বৌ।

"সত্যি খাবি না তো?"

"বিশ্বাস হয় না বুঝি?"

"কী করব, স্বভাবটা তো ভালো বুঝিনি এত দিন। থাকগে- আয় সই পাতাই। "

মেনির বেড়াল হলেও বয়সে ছেলেমানুষ আর ধেড়ে ইঁদুরদের কুটনিকেও ছোট্টটি বলা যাবে না। সই হিসেবে খুব বেমানান হল না দুজনে। মেনি খুঁজে পেতে নিয়ে এল একদলা ক্ষির আর দুব্বো বাঁধা একগাছি ষষ্টির সুতো, কুটনি নিয়ে এল বেনারসী শাড়ির এক চিলতে জরি। দুজনে দুজনার লেজে বেঁধে দিয়ে ঠাকুর সাক্ষী রেখে বলল, "আজ থেকে আমরা গঙ্গা জল।"

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

বাঘবন্দী মন্তর

শিশির বিশ্বাস

মস্ত চওড়া নদী। এক তীর থেকে অন্য তীরকে দেখায় যেন সরু একটা ধোঁয়াটে রেখা। নীল জল টলমল করে। বর্ষায় কিংবা ভরা জোয়ারে ঢেউয়ের দাপট এমন বাড়ে যে, মাতালের মতো টলতে থাকে বড় বড় নৌকো, লঞ্চ, স্টিমার। নদীর নাম তাই মাতলা। সুন্দরবনের সব চাইতে ডাকসাইটে নদী। এই মাতলা ধরে সোজা নেমে যাও দক্ষিণে। পৌছে যাবে একেবারে বঙ্গোপসাগরের মুখে। এইখানেই নদীর পূবদিকে সুন্দবনের যে অংশটা চোখে পড়বে তারই নাম মায়াদ্বীপ। সুন্দরী, গরান, কেওড়া আর হেঁতাল ঝোপের জমজমাট বন। সুন্দরবনের কুখ্যাত নরখাদকের মনের মতো আস্তানা।

অনেক দিন আগের কথা। এই মায়াদ্বীপেই ছোট একটা নৌকো নিয়ে কাঠ কাটতে এসেছিল মোল্লাখালি গাঁয়ের পেল্লাদ আর তার ভাই জটাই সর্দার। যে সে কাঠ নয়, খোদ তবলাকাঠ। যে সময়ের কথা বলছি, তখন তবলাকাঠের খুব কদর ছিল। দেশলাই কাঠি তৈরি হত কিনা। তাছাড়া এ কাঠ সুন্দরবনে পাওয়াও যেত খুব কম। অনেক খুঁজে পেতে মিলত এক আধটা। তা পেল্লাদ সর্দার আবাদের গু ণিন। কেউ বলে বাওয়ালী। মন্তর তন্তর ঝাঁড়ফুক জানে। খুদে একটা ডিঙি নিয়ে বনকে বন হাঁটকে বেড়ায়। সুতরাং তবলাকাঠের খোঁজ পেল্লাদ পাবে না তো কে পাবে? পেল্লাদের ভাই জাটাই আবার অন্য ধাঁচের। লম্বা চওড়া জোয়ান; মোষের মতো চেহারা। শরীরে মত্ত হাতির বল। মন্তরে তন্তরে মোটে বিশ্বাস নেই। বাদাবনে নেমে বাওয়ালীর দেওয়া মন্ত্রপূত কাপড়ের টুকরো তুলে কোথায় যে ফেলে দেয়! এতটুকু ভয়ডর নেই। ভাইয়ের আক্কেল দেখে পেল্লাদের তাই চিন্তার অন্ত নেই। একলা জটাইকে কখনো বাদায় যেতে দেয় না। সব সময় সঙ্গে থাকে।

ঠিক জোয়ারের মুখে মাতলার জল যখন হু হু করে শিষ খালের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে, দুজনে নৌকো ঢুকিয়ে দিল খালের মধ্যে। তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় নৌকো বেঁধে কুডুল হাতে দুজনে বাদায় নামল। খাল থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে তবলাগাছের জায়গা। পেল্লাদ দিন

কয়েক আগে একাই এসে দেখে গেছে। সুতরাং সেখানে পৌছুতে বিলম্ব হল না। বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়ানোছিটানো হেঁতাল ঝাড়। তারই মাঝে দূরে দূরে গোটাকয়েক বাবলাগাছ।

সুন্দরবনের ভেতর হেঁতালঝোপ সব সময়েই সন্দেহজনক। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল পেল্লাদ। বড় বড় নিশ্বাস নিল গোটা কয়। সন্দেহ তবুও যেতে চায় না। চারপাশটা যেন বড্ড বেশি নিস্তব্ধ। কিন্তু অত ভাববার সময়ও যে নেই। ভাটার আগে নৌকো নিয়ে গাঙে পৌছুতে হবে। দেরি হলেই সর্বনাশ। বিড় বিড় করে বাঘবন্দী মন্ত্র আউড়ে পেল্লাদ একমুঠো মাটি চারদিকে ছিটিয়ে দিল। শেষবারের মতো হুঁশিয়ার করে দিল জটাইকে।

তারপর দুজনে সুবিধামতো গাছের খোঁজে দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একটা গাছ দেখে পেল্লাদ সবে গোটা কয়েক কুড়ুলের কোপ বসিয়েছে হঠাৎ ওর বাঁদিকে আট দশ হাত দূরে একটা হেঁতাল ঝোপের ডগা সামান্য দুলে উঠল। আর মুহূর্তে ডোরাকাটা প্রকাণ্ড একটা মাথা বেরিয়ে এল।

ব্যাপারটা তৎক্ষনাৎ নজরে পড়ল পেল্লাদের। বাদার মানুষ। বাঘ নেহাত কম দেখেনি। কিন্তু এত কাছ থেকে এই প্রথম। কী প্রকাণ্ড মাথাটা। চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে। সাক্ষাৎ বাবা দক্ষিন রায়ের বাহন। বুকটা কেঁপে উঠল।

পেল্লাদের হাতের কুড়ুল ততক্ষণে থেমে গেছে শূন্যে। বাওয়ালী সুলভ কায়দায় সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি মেরে হেঁকে উঠল, 'হে-ই-ই খবরদার '

সে আওয়াজ পেল্লাদের নিজের কানেই কেমন হাস্যকর শোনাল। পেল্লাদ বুঝতে পারল তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর সেই মুহূর্তেই বিকট এক গর্জনে চারপাশে একরাশ লালা ছিটিয়ে বাঘটা বিদ্যুত-বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পেল্লাদের ওপর। থাবার আঘাতে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে হাতের কুড়ুলটা দিয়ে পেল্লাদ সজোরে আঘাত করল বাঘটার ওপর। কিন্তু কিছুই হল না। ধারাল ফলাটা বাঘের ঢলঢলে মসৃণ চমড়ার লেগে পদ্মপাতার জলের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়বার কোপ বসাবার সুযোগ পেল না পেল্লাদ। তার আগেই বাঘটা এক মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিয়েছে ওর ঘাড়ে। গোঙাতে গোঙাতে পেল্লাদ বৃথাই হাত পা ছুঁড়তে লাগল।

জটাই গাছ কাটছিল একটু দূরে। হঠাৎ দাদার চাপা চিৎকার আর সেই মূহূর্তেই বাঘের গর্জনে দারুণ চমকে ঘাড় ফেরাতেই তো তার চক্ষু স্থির। কী ভীষণ ব্যাপার! একটা প্রকাণ্ড বাঘ তার দাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় কামড়ে ধরেছে। গলাসুদ্ধ মাথায় প্রায় অর্ধেকটাই বাঘের মুখের মধ্যে!

অমানুষিক দৃশ্যটা জটাইয়ের মতো শক্ত মানুষকেও বুঝি প্রায় অসাড় করে ফেলেছিল। কিন্তু মুহূর্তে সামলে নিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটল অকুস্থলের দিকে।

হঠাৎ এই উটকো ঝামেলায় কামড় একটুও আলগা না করে সামান্য মুখ তুলল বাঘটা। ভাঁটার মতো চোখ দুটো জ্বলে উঠল। মুখ দিয়ে দ্বিগুন বেগে গর্-গর্ করে আওয়াজ বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে লালা ছিটোতে লাগল চারপাশে। তারপর ঘাড়টা নিচু করে ফের আগের কাজে মনোনিবেশ করল। ভাবটা এই রকম আর একটু রোসো বাপু। তারপর তোমার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

ততক্ষণে সেখানে পৌছে গেছে জটাই। মাত্র হাত দুয়েক দূরে কালান্তক যম সাদৃশ্য বাঘটা। দু'হাতে শক্ত মুঠোয় ধারাল কুড়ুলটা সটান শূন্যে উঠে গেল। এলোমেলো কতকগুলো ছবি ওর মগজের কোষে ঝিলিক দিয়ে গেল। দাদা বলেছিল, ধারাল কাটারি দিয়ে একবার বাঘের মাথায় কোপ বসিয়েছিল একজন। ঠং করে ছিটকে উঠেছিল কাটারিখানা। বাঘের কিছুমাত্র হয়নি। আর একবার এই রকমেরই এক পরিস্থিতিতে বাঘের মাথায় কুড়ুলের কোপ বসাতে ধারাল ফলাখানা বাঘের খুলিতে বসে এত জোরে এঁটে গিয়েছিল যে টেনেও তুলতে পারেনি। দ্বিতীয় কোপ বসাবার সুযোগ আর মেলেনি। বাঘটা থাবার এক আঘাতে ছিঁড়ে ফেলেছিল মানুষটাকে। জটাইয়ের কানের কাছে কে যেন ফিসফিসিয়ে গেল, বাঘের খুলি লোহার থেকেও শক্ত জটাই। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে আঘাত হানো। সময় নেই আর।

মুহূর্তে জানোয়ারটার কপালের ঠিক মাঝখানে কালো ডোরা বরাবর নিপুণ লক্ষ্যে সুতীব্র বেগে নেমে এল জটাইয়ের হাতের ধারাল কুড়ুলখানা। আর সেই এক আঘাতেই দারুন শব্দে বাঘের খুলি দুভাগ হয়ে গেল। কাটা কলাগাছের মতো বাঘটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সারা শরীর গোটা কয়েক মাত্র ঝাঁকুনি দিয়ে এক সময় স্থির হয়ে গেল। শুধু লেজের ডগাটাই অনেকক্ষন ধরে নড়তে লাগল তিরতির করে। কী ভীষণ জোরে জটাই কোপ মেরেছিল ভাবা যায় না। কিন্তু এত বড় সাফল্যেও আনন্দ কোথায়? বাঘটার সঙ্গে বাওয়ালী পেল্লাদও যে ততক্ষণে ইহোলোকের মায়া কাটিয়েছে।

আর দেরি না করে দুটো মৃতদেহ খাল পর্যন্ত বয়ে এনে নৌকোয় চাপিয়ে জটাই যখন গ্রামে পৌছাল, সারা গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়ল গাঁয়ে। গাঙের ঘাটে সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য!

জটাই এর পরেও বনে গেছে বহুবার। রশুল মিয়ার সঙ্গে সেবার যখন তার দেখা হয় তখন জটায়ের বয়স হয়েছে। মাথার চুল ধবধবে সাদা। শরীরে সেই আগের তেজ আর নেই। রশুল মিয়া বাওয়ালী শুনে হেসে বলেছিল, 'ওসব মন্তর তন্তর সব তোমাদের বুজরুকি, বুঝলে চাচা। আসল হল এই শরীর আর কলজের জোর। বাদার বাঘ এতেই বশ থাকে। মন্তরে নয়।'

গ্রাফিক্স্- সুতপা দাশ

অনসূয়া খাসনবীশ

"হাট্টিমা টিমটিম মানেই কি যাদের মাথায় খাড়া দুটো শিং? এ ভারি অন্যায় কথা। আমি এই এক হাট্টিমা দেখে এলাম।" বলে সিন্নিপিসি বেশ যেন রাগ করেছে এমন মুখ করল।

শীত, তাই মা লেপ-কাঁথা রোদে দিয়েছে। তার উপরেই পুঁটলি, চিন্টি, গিল্লুরা হুজ্জুতি করছিল। মা বড়ি তুলছিল। সিন্নিপিসির হাঁটুর ব্যথা, তাই চেয়ারে বসেছে। খাওয়াদাওয়া সেরে এই সময় সবাই একটু রোদে এসে বসে। পিসি এই দু'দিন হল এখানে এসেছে। তাই মায়ের কথায় পুঁটলি হাট্টিমা টিমটিম গান গেয়ে শোনাচ্ছিল পিসিকে। শেষ হতেই এই কথা।

"আরে, হাট্টিমারা তো এই দেশের লোকই নয়। আর তাদের মোটেই শিং ছিল না।" বলে পিসি।

গিল্লু তার তোতলা ভাষায় পিসিকে বোঝায়, "ও তো মিথ্যে কলে গান। হাত্তিমা তিমতিম তো নেই।"

পিসি চোখদুটো বড়ো বড়ো করে বলে, "কে বলেছে? জানিস হাট্টিমাদের গল্প? ওদের শিংয়ের গল্প? আর হাট্টিমারা মোটেই ডিম পাড়ে না। সে তো ওদের জুমানপুখি ছিল ডিমের মতো দেখতে।"

জুমানপুখি, শিং – গল্পের গন্ধ পেয়ে পিসির পায়ের কাছে এসে বসে চিন্টি। দেখাদেখি পুঁটলিও। গিল্লুর দাঁতে মাংসের টুকরো ঢুকেছিল। ছাদের কলের জলে কোনওরকমে কুলকুচো করে দৌড়ে এল।

"সে কী? বল বল। ও পিসি," সবাই মিলে চেপে ধরতে পিসি খসখসে হাত-পায়ে আর একটু খসখস শব্দ তুলে, চশমাটা খুলে বসল।

"তবে শোন। হাট্টিমারা এখন আমাদের মতোই থাকে। আমাদের মতোই কথা, আমাদের মতোই খাওয়াদাওয়া, আর জামাকাপড়। কিন্তু ওরা থাকত ভারতের পুবে যে মেঘালয়, তারও

পুবে যে জঙ্গল, তারও পুবে। কয়েকশো বছর আগে পুবের দুর্গম জঙ্গল পেরিয়ে তারা ভারতে আসে। তা হাট্টিমারা থাকত ঘন জঙ্গলে। এতই ঘন যে সচরাচর অন্য কোনও আদিবাসীরা সেখানে যেত না। ঘন জঙ্গল আরও ঘন হতে হতে যখন প্রায় পথ হারাবার মতো অবস্থা, ঠিক তখনই জঙ্গল হাল্কা হয়ে পাহাড় শুরু হয়। সেই পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝের জায়গায় পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে থাকত হাট্টিমারা। ছোটোখাটো গাট্টাগোট্টা চেহারা তাদের। কিন্তু গারোদের মতো তাদের চোখগুলো ছোটো ছোটো নয়। বেশ বড়ো বড়ো, এই পুঁটলির মতো। তবে তাদের ছেলেমেয়ে কারোর মাথায় বেশি চুল হত না। পাতার তৈরি একরকম টুপি তারা পরত যার দু'পাশে দুটো ছ্যাদা থাকত। সেই ছ্যাদার মধ্যে দিয়ে তারা তাদের গুটিকয়েক চুল বের করে রাখত। হাওয়ায় সে চুল উড়লে শিংয়ের মতো দেখাত। এই ছিল তাদের সাজ।

"আর ছিল জুমানপুখি। হাট্টিমাদের ভাষায় জুমান মানে পবিত্র আর পুখি মানে ডিম। জুমানপুখি আসলে ছিল তিন মানুষ লম্বা, ডিমের মতো আকারের একটা পাথর। রঙ ছিল টকটকে লাল। ঐ এলাকা কেন, কোশ কোশ দূরেও ঐরকম কোনও পাথর কস্মিনকালে কেউ দেখেনি। আজন্মকাল ধরে তারা দেখে আসছে পাহাড়ের চূড়ার ঠিক নীচে একটা প্রায় ঝুলন্ত আড়াআড়ি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে জুমানপুখি। যেন কোনও বাতাসের হাত তাকে ধরে আছে। ঝড়, জল কোনও কিছুতেই তার হেলদোল নেই। হাট্টিমাদের বিশ্বাস ছিল জুমানপুখির অলৌকিক ক্ষমতা

আছে। তাই তারা খুব ভক্তি করে পুজো করত এই পুখিকে। অনেকেই বলত, তারা নাকি গভীর রাতে জুমানপুখিকে পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠানামা করতে দেখেছে।

"হাট্টিমারা সাধারণত পাখি ধরত, পুষত। আর পাখির মাংসই খেত। আর সেই পালকে জামা বানিয়ে পরত। রাত্রিবেলা আগুন জ্বেলে তার চারপাশে তারা নাচগান করত। জুমানপুখির উৎসব হত প্রতি পড়ন্ত শীতে। দূর দূর থেকে আদিবাসীরা আসত। মেলা বসে যেত। বিয়ে হত।

আর তাতে জংলি লতাপাতা দিয়ে মাটির কালো হাঁড়িতে বনের পাখির মাংস রান্না করত হাড্ডিমারা। তাই খেতে সবাই ভিড় করত।

"একবার বুড়িমা মুজানচি স্বপ্ন পেল, লাল টুকটুকে জামা পরে লম্বা, একমাথা কোঁকড়া চুল এক সুপুরুষ তাকে বলছে, মুজানচি সবাইকে নিয়ে পশ্চিমে চলে যাও। আজ থেকে তিনদিন পর এখানে সব ধ্বসে পড়বে। পশ্চিমের বন পেরিয়ে রসা জমি আছে। সেখানে বস। আমি আবার আসব।

"মুজানচি সব্বাইকে ডেকে ডেকে এই কথা বলল। কেউ কেউ বিশ্বাস করল। কেউ কেউ হেসে বলল, বুড়িমা স্বপন দেখেছে। তারা গেল না। বাকিদের নিয়ে বুড়ি রওনা দিল। গিয়ে বসল সেই জমিতে। সেখানে তারা চাষ শিখল। আর তাদের চাষের জমির ঠিক মাঝে জুমানপুখির বেদি তৈরি করল গাছের কাঠ দিয়ে। কিন্তু সেই বেদি রইল শূন্য। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে তারা দেখল, সেই বেদিতে সেই লাল টকটকে জুমানপুখি এসে বসেছে। ভোরের সূর্যের আলো মেখে মনে হচ্ছে যেন তার গায়ে আগুন জ্বলছে। এমন ঘটনা কেউ কখনও ভাবেওনি। খুব ভক্তিভরে তারা পুজো দিল। আর কাঁদল, যারা তাদের সাথে আসেনি তাদের জন্য। অন্যান্য আদিবাসীরাও ভিড় করে পুজো দিতে এল। অনেক শীত সেখানে হাড্ডিমারা থাকল শান্তিতে। কিন্তু মুজানচি জানত এই শেষ নয়। দেবতা বলেছে আবার আসবে। এত শান্তিতে থাকতে থাকতে তার মনে হতে লাগল, দেবতা আর না দেখা দিলেই হয়তো ভালো হয়। সে বেদিতে যেত না আর ভয়ে। পাছে দেবতা স্বপ্ন দেয়। কিন্তু দেবতার কথা মিথ্যে হবার নয়। একবছর শুরু হল বৃষ্টি। সে বৃষ্টির তোড়ে সব ভেসেই যায় বুঝি। এত জল কেউ কখনও দেখেনি। সব শস্য নষ্ট হয়ে গেল। বাচ্চারা অসুস্থ হতে লাগল। মুজানচি না খেয়ে না দেয়ে জুমানপুখির পায়ে ধর্না দিল। তিনদিন তিনরাত সে ভিজেই চলল। তারপর দিন বৃষ্টি একটু বাঁধল। সবাই মিলে বুড়ির খোঁজে যেতেই দেখল পুখিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে সে। ভেজা গায়ে আগুনের মতো তাপ। চোখ লাল। সারামুখ ফোলা। অনেক কষ্টে সে বলল, "তোরা চলে যা এখান থেকে। জুমানপুখি আমায় বলেছে, পশ্চিমে, আরও পশ্চিমে। সেখানে আছে সোনার দেশ। নদীর ঐ ধারে। চলে যা, চলে যা। পশ্চিমে, আরও পশ্চিমে। দেবতা পথ বলেছেন। একপক্ষের মধ্যে তোরা চলে যা সবাইকে নিয়ে। পশ্চিমে। জুমানপুখি সহায় হোন। আমি রইলাম তার পায়ে।

মুজানচি বুড়িকে রেখে ভারী মনে সবাই চলা শুরু করল। যাবার সময় দেখতে পেল, বুড়ি তার দেবতার সাথে যেন কত সুখদুঃখের গল্প করছে। তাদের চলার পথে ভয়ংকর বন পড়ল, ভীষণ নদী পড়ল। সব পেরিয়ে তারা পৌঁছল সোনার দেশে। আমাদের এই দেশে। হাড্ডিমারা এখানে এসে থাকতে শুরু করল। এখানকার ভাষা শিখল, আর শিখল রান্না। তাদের দেখে এখন আর চেনাই যায় না হাড্ডিমা বলে। চুল তাদের এখনও তেমন বেশি না। তবে সেই রান্না। জুমানপুখির আশীর্বাদ। রান্না খেলেই বোঝা যায়।"

তিনজোড়া গোল গোল চোখ অপলক তাকিয়ে শুনছিল এতক্ষণ। এতক্ষণে চিন্টি বলে, "তাহলে কি হাড্ডিমারা এখনও আছে?"

পিসি বলে, "হ্যাঁ, আছে। এই বাড়িতেই আছে। কাউকে বলবি না বল, তাইলে বলি। হাড্ডিমারা দারুণ মুরগি রাঁধে।"

তিনজনে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, "নিমাইদা। বেঁটে, মোটা। চুলও নেই। নিমাইদা নিশ্চয়ই হাড্ডিমা।"

পিসি খুব চিন্তায় পড়ে গেল যেন। বলল, "কিন্তু হাড্ডিমারা খুব ঝাল ভালোবাসে।"

গিল্লু বলে, "হ্যাঁ তো , নিমাইদা খুব জাল দেয়। কেতেই পালি না।"

পিসি বলে, "তার আগে জিগ্যেস করতে হবে নিমাইদা মুজানচিকে চেনে কি না।"

যেমনি বলা, সক্কলে হই হই করতে করতে নীচে দৌড়ল।

সন্ধ্যে নেমে গেছে। পদ্মদি সেই কখন লেপ-কাঁথা তুলে নিয়ে গেছে। মা এতক্ষণ মিটিমিটি হাসছিল। ওরা নীচে নামতেই বলল, “তুমি পারও দিদি। আমায় বলবে তো।”

পিসি হাসতে হাসতে বলল, “নিমাইটা বড়ো ঝাল দেয়। এ ওর পুরনো অভ্যাস। বললে শোনে না। আমার আবার পাইলসের সমস্যাটা বেড়েছে কিনা। এবার বুঝুক।”

ছবিঃ শিমুল

পিয়ালি গাঙ্গুলী

ঠিক হল, স্কুল ছুটি পড়ার আগেরদিন স্টাফ-রুমে খাওয়াদাওয়া হবে। না, বাইরের কেনা খাবার নয়, নিজেরা রান্না করে। ফিসফিস করে আলোচনা চলছে। সহকর্মীদের মধ্যে বেশি ভাব-ভালোবাসা ম্যানেজমেন্ট পছন্দ করে না। তারা 'divide & rule policy'-তে বিশ্বাসী। কে কী রান্না করে আনবে সেটা দ্রুত ঠিক হয়ে গেল। বলাই বাহুল্য, ঝিমলির ঘাড়ে পড়ল পাস্তা। সত্যিই, পাস্তাটা অসাধারণ বানায় ঝিমলি। বাড়ি ফেরার পথে More থেকে ফ্রেশ ক্রীম, টোম্যাটো পিউরি এসব কিনে ঢুকল। এই গরমে হোয়াইট সসের পাস্তা তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে, তাই রেড সসের পাস্তা বানাবে বলেই দিয়েছে।

বাড়ি ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে বড়ো এক মগ কফি নিয়ে ঝিমলি কাজে নামল। সবজি কাটাকুটিটাই সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ। ইয়ার ফোনে একটা সুন্দর গান শুনতে শুনতে চপিং-বোর্ডে হাত চালাতে লাগল। ব্যস, শান্তিতে কাজ করার কি আর উপায় আছে? ঝিমলিকে রান্নাঘরে দেখেই ফোচনও পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল। কাজের সময় বড্ড বিরক্ত করে ছেলেটা। সে বুঝতেই পেরেছে ভালো কিছু রান্না হতে চলেছে। পিজ্জা, পাস্তা, চাউমিন, যত রাজ্যের জাঙ্ক-ফুড তার খুবই প্রিয়। আর ঝিমলি পাস্তা বানালে তো আর রক্ষে নেই। প্রায় পুরোটাই পারলে তিনি সাবাড় করে দেন। নেহাত ফ্রিজটা খুলতে পারে না এখনও, এটাই শান্তি। নইলে যে কী হত!

সন্ধেটা প্রায় কেটেই গেল পাস্তা বানাতে। ফোচন ততক্ষণে বুঝেই গেছে পাস্তা হচ্ছে। তাকে আর আটকে রাখা যাচ্ছিল না। প্রথমেই তাকে এক বড়ো বাটি করে দেয়া হল। নিমেষের মধ্যে চেঁটেপুটে পাস্তা হাওয়া। শেষ করেই আবার এক বাটির জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। এবার ঝিমলি এক ধমক লাগাল, "না, আর একদম হবে না। অনেকটা খেয়েছ।"

পরদিন সকালে তাড়াহুড়ো করে রেডি হয়ে পাস্তার কৌটোটা একটা বড়ো জুটের ব্যাগে ভরে ঝিমলি বেরিয়ে পড়ল। আজ উঠতে দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে ছ'টার Volvo-টা মিস হয়ে গেল। স্টাফ-রুমে ঢুকে

ব্যাগ, খাবারের ঝুলি টেবিলে রেখেই এসেম্বলিতে ছুটল। তারপর আর দম ফেলার সময় কোথায়? পরপর ক্লাস। তার মধ্যে কতরকমের অ্যাক্টিভিটি, খাতা দেখা, লেসন-প্ল্যান জমা দেয়া, কাজের কি আর শেষ আছে? মাঝে হয়তো ছুটে এসে একটু জল খাওয়া বা খাতাবই নিয়ে যাওয়া। নানারকম খাবারের গন্ধে স্টাফ-রুম সেদিন ম ম করছে। সবাই ছটফট করছে কতক্ষণে ব্রেক হবে।

ঘটনাটা ঘটে গেল টিফিনের ঠিক আগেই। টিফিনের আগের পিরিয়ডটা ঝিমলির অফ ছিল। তাই আগের ক্লাসটা শেষ হতে হেলতে দুলতে নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। হাতে একগাদা প্রজেক্টের বোঝা। স্টাফ-রুমের ফ্লোরে নামতেই দেখে সাংঘাতিক কান্ড। সব ক্লাস থেকে ছেলেমেয়েরা বাইরে বেরিয়ে হই হই করছে। চারদিকে হাসির রোল। সিকিউরিটি আর হাউস-কিপিং কর্মীরা ছুটোছুটি করছে। ঝিমলি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "What is the matter?"

পাশে দাঁড়ানো ছেলেমেয়ের দল জবাব দিল, "Ma'am, there's a cat in the classroom."

স্কুলের মধ্যে বেড়াল? যাক গে, তাও যদি হয়, এত ন্যাকামোর কী আছে? সকাল থেকে ক্লাস নিয়ে নিয়ে এমনিতেই ক্লান্ত, ঝিমলি বেশ খেঁচিয়ে উঠে বলল, "Stop behaving like idiots. It's only a cat, not a tiger." বলে গটমটিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

স্টাফ-রুমে ঢুকে দেখল অনেক টিচারই এসে জড়ো হয়েছেন। ঝিমলি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে গো?"

একজন সিনিয়র বললেন, "আরে, এইট কে-তে ক্লাস নিচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা বেড়ালের ডাক শুনলাম। তাকিয়ে দেখি একটা বেঞ্চের তলায় ভারি মিষ্টি গোলগাল এক সাদা বেড়াল বসে আছে। ব্যস, যেই না দেখা, ছেলেমেয়েগুলো সব হই হই করে সিট ছেড়ে বেরিয়ে হাসাহাসি, ঠ্যালাঠেলি শুরু করল। কেউ কেউ আবার ভয়ে বেঞ্চের ওপর উঠে পড়ল। জানিসই তো আমাদের স্টুডেন্টদের। ক্লাস না করার বাহানা চাই একটা।"

আরেকজন সতর্ক করে দিল, "এই চল চল, গিয়ে সবক'টাকে ক্লাসে ঢোকাই আগে। এক্ষুনি প্রিন্সিপাল নিচ থেকে ছুটে আসবেন।"

সবাই মিলে বেরিয়ে তখন গরুর পাল ঘরে ঢোকানো হল। ক্লাস শুরু হল। সিকিউরিটিরা তখনও বেড়াল ধরার চেষ্টা করে চলেছে। আমাদের মাথায় দুশ্চিন্তা। এখন না হয় ক্লাসে ঢোকানো হল, ব্রেকে এদের আটকাব কী করে? খাওয়াদাওয়া আজ মাথায় উঠল।

টিফিনের বেলটা বাজতেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। একে খিদে পেয়েছে, তার ওপর টেনশান - এই বুঝি ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে বেরোতে হয়। গোগ্রাসে গিলে চলেছে সকলে। টুকটাক হাসিঠাট্টা হচ্ছে। কিন্তু সেভাবে উপভোগ করতে পারছে না কেউই। ঝিমলি তখন মন দিয়ে ফিশ-চপ আর কফি খাচ্ছে। পরের পিরিয়ডটাও অফ আছে, তাই একটু রিল্যাক্সড। এমন সময় স্টাফ-রুমের দরজা ঠেলে, "এই দেখুন ম্যাম, ধরতে পেরেছি," বলে এক সিকিউরিটি মুখ বাড়াল। ঝিমলি মুখ তুলতেই মুখ থেকে ফিশ-চপটা পড়ে গেল। মনে হল, এক্ষুনি হার্ট-অ্যাটাক হয়ে যাবে। সিকিউরিটির হাতে বন্দী, কাঁচুমাচু মুখ করে তাকিয়ে ও যে ফোচন! ঝিমলিকে দেখামাত্রই এক লাফে ঝিমলির কোলে। ঝিমলি অপ্রস্তুত। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ফোচন কী করে স্কুলে এল ঝিমলির কিছুতেই মাথায় আসছে না। ঠিক দেখছে তো ও? নাকি ফোচনের মতো দেখতে এ অন্য কোনও বেড়াল? কিন্তু তাহলে লাফিয়ে ওর কোলে আসবে কেন? এসব ভেবে যখন ঝিমলির প্রায় মাথা ঘুরছে, ফোচন তখন মহা আনন্দে লেজ নাড়াচ্ছে আর ঝিমলির হাত চাটছে।

স্টাফ-রুম নিস্তব্ধ। অনেকেই হয়তো ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। ঝিমলির বেড়াল পরিবারের কথা সকলেই জানে।

“আসলে আমার বাড়িতে তো অনেক বেড়াল আছে, ওরা বোধহয় গন্ধ পায়। তাই লাফিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে নিরাপত্তার আশায়।” এই বলে ঝিমলি সিকিউরিটিকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করল।

“দিন ম্যাডাম, ওকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসি।”

ঝিমলি লাফিয়ে উঠল, “না না থাক। অসহায় প্রাণী একটা, ভয় পেয়ে গেছে, আমি ঠিক ওকে ছেড়ে দেব বাইরে।”

“কী বলেন ম্যাডাম? প্রিন্সিপাল জানলে আমার চাকরি চলে যাবে।”

ঝিমলির এবার প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। বেগতিক দেখে সবচেয়ে সিনিয়র টিচার ত্রিপাঠীস্যার উঠে সিকিউরিটির কাঁধে হাত রেখে বললেন, “তোর কোনও চিন্তা নেই, তোর চাকরি যাবে না। এই কথাটা এই স্টাফ-রুমের বাইরেই যাবে না। তুই খুব ভালো কাজ করেছিস। এই নে, মিষ্টি খা।” বলে একটা সন্দেশ তুলে দিলেন ওর হাতে।

সিকিউরিটি খানিক ইতস্তত করে চলে গেল।

ঝিমলির যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ছাড়তেই খেয়াল হল, আরে, ফোচন তো তার কোলে নেই! আবার কোথায় গেল ছেলেটা? ঘাড় ঘোরাতেই পুরো ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ফোচন পাস্তার টিফিন-বক্সে মুখ ঢুকিয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে পাস্তা খাচ্ছে।

“ওহ, তুই তার মানে পাস্তার লোভে আমার জুট-ব্যাগে চড়ে স্কুলে এসেছিস? শয়তান ছেলে, দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা,” বলে ঝিমলি কষে ফোচনের কানটা মুলে দিল। এতক্ষণের উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তা ভুলে স্টাফ-রুমের সকলে হো হো করে হেসে উঠল। সে যাত্রায় আর প্রিন্সিপালের কান অবধি পৌছয়নি ব্যাপারটা। তাই ঝিমলি আর সিকিউরিটি দু’জনেরই চাকরি বহাল আছে।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

মো. শামীম মিয়া

বাবা ঢাকা শহরে গেছেন, আসবেন সাতদিন পর তা ছোট্ট ইতি জানত। তবুও মাকে বার বার জিজ্ঞাসা করে, “মা, বাবা ঢাকা থেকে কখন আসবে?”

মা ইতির মনের অবস্থা বুঝতে পারে, ইতির মনটা বেশ খারাপ। কেননা, বাবাই যে ইতির একমাত্র খেলার সাথী। ইতিও যেন বাবার কলিজার একটুকরো মাংস। অভাব-অনটনের সংসার। জীবন বাঁচানোর তাগিদে ছুটতে হয় শহরে। ঢাকা যাওয়ার সময় বাবা ইতিকে বলে গেছেন, “বাড়িতে আসার সময় তোমার জন্য অনেকগুলো খেলনা নিয়ে আসব।”

ইতিও ঝটপট বলে দিয়েছে, “মাটির হাঁড়ি-পাতিল আনবা। আমি ভাত-তরকারি রান্না করব, তুমি আর মা খাবে।”

বাবা ইতির কপালে একটা চুমা দিয়ে চলে গেলেন। রাত হলেই ইতি ছটফট করত, কান্না করত। সহজে ঘুমায় না, রোজ রাতে নতুন একটা গল্প বলতেই হবে। মা বেশি গল্প জানত না। যা জানত সব বলা শেষ। মা ইতিকে সান্ত্বনা দিত, “তোমার বাবা ঢাকা থেকে অনেক অনেক গল্প শিখে আসবে। বাবা না আসা পর্যন্ত শুধু ঘুমাও আর ঘুমাও।”

সাতদিন হয়ে গেছে। বাবা আসবে বলে ইতি এখনও কিছু মুখে দেয়নি। যাকে দেখা পায় তাকেই বলে, “আজ আমার বাবা আসবে। আমার জন্য অনেককিছু আনবে।”

ইতি বাবার পথ চেয়ে বাড়ির সামনে বড়ইগাছটার নিচে বসে আছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল বাবা আসছে না। ইতি দৌড়ে একবার মার কাছে যায়, আরেকবার গাছটার নিচে আসে। সন্ধ্যা হয়ে এল তবুও বাবার খোঁজ নেই। সন্ধ্যার ঝাপসা আলোতে দূরদূরান্তে দুইটা লোককে দেখা যাচ্ছে। ইতি দৌড় দেয় লোকদুটির দিকে। কাছে গিয়ে দেখে, হ্যাঁ, তার বাবা এবং এক চাচা আসছে। ইতি বাবার কাছে গিয়েই

বাবাকে ঝাপটে ধরে আর বলে , "বাবা, তোমার জন্য সকাল থেকে ঐ বড়ইগাছটার নিচে বসে আছি তুমি আসবে বলে।"

বাবা ইতিকে কোলে নিয়েই চুমা খেতে লাগল। হঠাৎ চাচা বলল , "কী রে, কীভাবে আসলি? দেশের যে অবস্থা, তোর কোনও সমস্যা হয়নি তো?"

বাবা বলল , "অল্পের জন্য বেঁচে গেছি মিলিটারিদের হাত থেকে। ঢাকা শহরের করুণ অবস্থা। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের যেন সেখানেই সূচনা । একেকটা রাত যেন সেখানে ভয়াল কালরাত্রির মতো। পোড়া কাঠ আর লাশ, জননীর কান্না নিয়ে রক্তে রাঙা একেকদিনের নতুন সূর্য উঠছে।"

ইতি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আর শুনছে বাবার কথাগুলো। চাচা বলল , "এখানেও তো কম নয়।"

বাড়ির কাছে আসা মাত্রই চাচা বাবাকে বলল, "পরে কথা হবে।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

আঙিনায় বাবা আসা মাত্রই ইতি বাবার কোল থেকে নেমেই চটের ব্যাগটা খুলতে থাকে আর বলে, "বাবা, আমার জন্য কী কী এনেছ?"

বাবা বলল, "তুমি যা যা চেয়েছ, আমি তাই এনেছি মা। ঘরে গিয়ে সব বের কর।"

ইতি মাথা নাড়িয়ে চলে যায় ঘরে। বাবা ইতির মা 'র কাছে এসে বলে, "ইতির মা, দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা করছে বাঙালিদের । আমরা বাঙালিরাও পাকিস্তানিদের উচিত শিক্ষা দিবই।"

মা'র দু'চোখে তখন দু'ফোঁটা পানি টলমল করছিল। বাবা বলল , "ইতির মা, পাকিস্তানিরা আমাদের দেশকে তাদের আয়ত্তে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে। কিন্তু আমরা জনতা, ছাত্রসমাজ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবই।

"ইতির মা, আমার বাবা বলত , মানুষের যতগুলো অনুভূতি আছে তার মধ্যে সুন্দর অনুভূতি হচ্ছে ভালোবাসা। আর এই পৃথিবীতে যতগুলো ভালোবাসা আছে তার মধ্যে তীব্র ভালোবাসাটুকু হতে পারে শুধুমাত্র মাতৃভুমির জন্য। যারা কখনও নিজের মাতৃভূমির জন্য ভালোবাসাটুকু অনুভব করেনি তাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। ইতির মা, আমি সৌভাগ্যবান হতাম যদি যুদ্ধে যেতে পারতাম।"

ইতির মা জানত বাবা এই কথাই বলবেন । মা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল , "হ্যাঁ, আমি চাই তুমি যুদ্ধে যাও, দেশ-মাকে রক্ষা কর পাকিস্তানিদের হাত থেকে। রক্ষা কর দেশের লক্ষ লক্ষ মায়ের সম্মান। "

মা'র দু'চোখে দু'ফোঁটা জল চিকচিক করছিল। মা আরও বলল , "ইতির বাবা, আমার যদি উপযুক্ত একমাত্র সন্তান থাকত তাহলে আমি অনেক আগেই তাকে যুদ্ধে পাঠাতাম।"

বাবা বলল, "কীভাবে যুদ্ধে যাব জানি না। কার সাথে যাওয়া যায় বল তো ইতির মা?"

মা বলল, "রহমত নাকি যুদ্ধে যাবে। তুমি ওর সাথে কথা বল।"

বাবা ঘরে না গিয়ে গেলেন রহমতের বাড়ি । রহমত বাবার মুখে দেশপ্রেম ও অন্তরে দেশের জন্য ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন, "তুমি বাড়ি যাও। যেকোনও সময় আমরা যুদ্ধে যাব।"

বাবা মাথা নাড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে।"

এই বলে বাবা এলেন বাড়িতে। অনেক রাত হয়েছে। বাবা ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই দেখেন ইতি চুপটি করে বসে আছে বাবার অপেক্ষায়। বাবা বলল, "মা, তুমি ঘুমাওনি এখনও?"

ইতি বলল, "বাহ্ রে, তোমার মুখে গল্প না শুনে কি আমি ঘুমিয়েছি কখনও?"

বাবা ইতির কপালে চুমা দিয়ে বলল , "ঠিক আছে, তাহলে গল্প শোন। আজ তোমাকে নতুন একটা গল্প বলব। গল্পের নাম, অচেনা শহর। সেখানে তারাই যেতে পারে যাদেরকে সৃষ্টির্কতা পছন্দ করে। তবে একদিন সেই দেশের বাসিন্দা আমরা সবাই হব । যারা এই পৃথিবীতে ভালো কাজ করবে তারা সেখানে বিশাল বাড়িতে থাকবে, কোনওকিছুর অভাব থাকবে না।"

ইতি মনোযোগ সহকারে শুনছে বাবার কথা। বাবা বলল , "শহরটার চারদিক থাকবে ফুলে ফলে ভরা। যার যা মন চাইবে তাই পাবে। পরির মতো উড়তেও পারবে। সেই শহরে সবাই যখন যে যেথায় যেতে চাইবে সেথায় যেতে পারবে।"

মা পাশের রুম থেকে বলল, "ইতির বাবা, খেতে এস। সারাদিন তো কিছুই খাওনি। ইতিকেও নিয়ে এস।"

বাবা মা'র কথার উত্তর দেওয়ার আগেই শুরু হল ঠাস ঠাস গুলির শব্দ। মা দৌড়ে এলেন এ ঘরে । এসে ইতিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন আর বললেন, "ইতির বাবা, গ্রামে হয়তো মিলিটারি ঢুকে পড়েছে। ঘরের আলোটা নিভে দাও যাতে ওরা মনে করে এখানে কোনও মানুষ থাকে না।"

বাবা তাই করলেন। প্রায় দশ মিনিট পর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে । ইতির মা ইতিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে আছে। বাবা হাতে নিলেন ইয়াব্বড়ো একটা লাঠি। বাবা রাগী কন্ঠে বললেন, "কে?"

উত্তর এল মৃতকন্ঠে, "আমি রহমত, দরজা খোল।"

বাবা দরজা খুলে দিলেন। রহমত ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে বললেন, "আমাদেরকে এখনই যেতে হবে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানিরা।"

বাবা অনেক আগেই ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে । বাবা করুণ মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। মা দু'চোখের পানি মুছে বলল, "কিছু খেয়ে যাও। সারাটাদিন মুখে কিছুই দাওনি।"

বাবা কিছু বলার আগেই রহমত বললেন , "ভাবী, আমাদের সাথীরা বটতলায় অপেক্ষা করছে । গ্রামের পশ্চিমে গোলাগুলি হচ্ছে। আমাদের এখন যেতেই হবে।"

বাবা আর কোনও কথা না বাড়িয়ে তার গায়ের চাদরটা নিলেন । দেখলেন, ইতি ঘুমিয়ে গেছে অনেক আগেই। বাবা ইতির কপালে একটা চুমা দিয়ে কাঁদা কন্ঠে বললেন, "ইতির মা, ইতিকে দেখে রেখো।"

মা কথা বলা মাত্রই কেঁদে উঠতেন, তাই মাথা নাড়িয়ে বললেন ঠিক আছে। নিজের কষ্ট বুকে রেখে শুধু মা বললেন, "নিজের প্রতি খেয়াল রেখো।"

বাবা আর রহমত চলে গেল যুদ্ধের উদ্দেশ্যে। মা ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে নীরবে কাঁদছে। এদিকে ইতি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ভাসছে।

ইতি স্বপ্নে এসেছে সেই অচেনা শহরে । ঐ যে দূরদূরান্তে পরির মতো ডানাসহ বাবাকে দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে রহমত চাচাও আছে। ইতি দৌড়ে যায় সেখানে। বাবা, বাবা বলে ডাকছে। বাবা কেন যেন শুনছে না। রহমত চাচা, চাচা বলে ডাকলেও শুনছে না। ইতি বাবা এবং চাচাকে ধরতে চায়, কিন্তু ধরতে পারে না। বাবা আর রহমতচাচা এই ফুলের গাছ থেকে অন্য ফুলের গাছে যাচ্ছে । সবাই মিলেমিশে উড়ে বেড়াচ্ছে। কারও সাথে কারও ঝগড়া নেই। আমাদের দেশের মতো নেই গোলাগুলি। সবার মুখেই হাসি। ইতি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে এবং বাবার সাথীদের বলে, "আমার বাবাকে একটু ডেকে দাও না! কেউ কি আমার কথা শুনতে পারছ না?" হঠাৎ বাবা চোখের আড়ালে চলে গেল। ইতি বাবাকে আর খুঁজে পেল না।

হঠাৎ ইতি ঘুমের মধ্যে চিৎকার দিয়ে উঠল, "বাবা, আমায় ছেড়ে যেও না বাবা।"

মা পাশের রুম থেকে দৌড়ে এসে বলল, "কী হয়েছে, মা?"

ইতি চোখ মেলে দেখল অনেক আগেই সকাল হয়েছে। ইতি মাকে অচেনা শহরের কথা বলল। মা চোখে পানি আর রাখতে পারল না । কেননা, মা তো বুঝেছে বাবা অচেনা শহর বলতে কোন শহরের কথা বুঝিয়েছে। মা বুঝে গেছেন তার স্বামী হয়তো শহীদ হয়েছে, যদি ইতির স্বপ্ন সত্য হয়। দিনের পর দিন চলে যায়, বাবা আর ফিরে আসে না। ইতি আর মা সেই বড়ইগাছের নিচে বসে থাকে বাবার আশায়, বাবা আসবে বলে।

একদিন এই দেশটা স্বাধীন হল। সবাই লাল-সবুজ পতাকা নিয়ে আনন্দ-মিছিল করছে । ইতি মাকে হাতের ইশারায় বলল, দেখ মা, ঐ দেখ। লাল-সবুজ পতাকার মধ্যে বাবাকে দেখা যাচ্ছে। বাবা হাসছে। মা

বাকশূন্য অবস্থায় লাল-সবুজ পতাকার দিকে পাথর চোখে তাকিয়ে আছেন। তার চোখে ঝরনার মতো পানি ঝরছেই।

ছবিঃ তন্ময়

জাদুমামা ও ম্যাজিক পেন

সিন্থিয়া নাজনীন

টাক ডুমাডুম... টিং টং... প্রতিবারের মতোই পুজোর মরশুম ঘনিয়ে এসেছে। সেই সাথে দারুণ সব সাজপোশাক করে, এলাহি বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে একগাল হেসে টাব্বু, বুবুনদের মামার বাড়ির দরজায় হাজির সকলের প্রিয় বলাইমামা ওরফে 'জাদুমামা'। সাত বছর বয়স থেকে ম্যাজিকই মামার শখ। পড়াশুনোয় ইতি টেনে কোনও এক বুড়ো ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে মাত্র সতেরোতেই মামা পালিয়েছিল ইস্তানবুল। এখন মামা ছত্রিশ। মামা এলেই বাড়ির সামনের স্কুল লাইব্রেরির মাঠে রীতিমতো মঞ্চ খাটিয়ে বসে যায় রমরমা ম্যাজিক-আসর। এই যেমন হাতের ডুগডুগি ঘোরাতে না ঘোরাতেই মিলিয়ে যায়। আশেপাশে ফুটে ওঠে অপূর্ব সব রঙিন ফুল, ফল। দেওয়াল জুড়ে ভেসে ওঠে মনোহর অরণ্য পরিবেশের ছবি। সাথে মিষ্টি সুরেলা পাখিদের ডাক। ছোটোবড়ো সকলের কী হাততালি!

এবারেও একটার পর একটা দারুণ ম্যাজিক দেখাচ্ছে মামা। তবে আসল ম্যাজিক শুরু হল মধ্যবিরতির পর। আস্তিনের পকেট থেকে মামা বার করল ছোট্ট এক পেন, যার নাম 'ম্যাজিক পেন'। হাতে মাইক নিয়ে দর্শকদের ডাক দিল জাদুর মঞ্চে। বুবুনের ভাই টুকাই তো লাফাতে লাফাতে গেল। জাদুর নিয়ম অনুযায়ী টেবিলে রাখা বাক্স থেকে একটা চিরকুট বেছে নিয়ে না খুলেই পকেটে রেখে দিতে হল। তারপর যেই না হাতের পেন কাগজে ধরল, সরসর করে কয়েক লাইনে নিজে নিজেই লেখা হয়ে গেল পলাশীযুদ্ধের বিবরণ। টুকাইয়ের হাত শুধু কাঁপতে থাকল। উত্তরটা সে মাইকে পড়ে শোনাল। পকেটের

চিরকুট খুলে আগে থেকে লিখে রাখা প্রশ্নটা ও শোনাল, ‘পলাশীর যুদ্ধ কাকে বলে ?’ ব্যস! হাততালি আর হাততালি।

“এ তো আশ্চর্য ম্যাজিক! এর কোনও তুলনাই হয় না।”

‘‘কিন্তু, এ কী করে সম্ভব?”

একে একে বড়োরাও এল। নানানভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা হল। তবে প্রতিবারেই হাসিমুখো জাদুমামারই জয়। দর্শকের হাত শুধু পেন ধরে, আর পেন নিজে থেকেই সরসর করে উত্তর লিখে দেয়। চিরকুট খুললেই দেখা যায় উত্তরের সাথে মিলে গেছে আগে থেকে লিখে রাখা প্রশ্ন। দারুণ প্রশংসা পেল এই ম্যাজিক। সকলেরই মুখে একই আলোচনা, “কী করে সম্ভব?”

এসব দেখে দুষ্টু হাবুলবাবু পড়ল মহা ভাবনায়। পুজোর পরই তো পরীক্ষা। সারাবছর পড়াশুনো না করা আর দস্যিপনা করে বেড়ানো হাবুল কেবল ঐ পরীক্ষার সময়টাতেই তক্কে তক্কে থাকে কীভাবে ফন্দি এঁটে কম খেটেই পরীক্ষাকে উতরে দেওয়া যায়। তাই ম্যাজিকটা দেখে আসার পর থেকেই সে মনে মনে স্পষ্ট দেখছে, পেনটা সে যেই ধরছে, লেখা হয়ে যাচ্ছে পাতার পর পাতা পরীক্ষার খাতা। আর রেজাল্ট ? সব বিষয়েই একশোয় একশো দশ। মানে, দশ নম্বর করে ভালো লেখার জন্য বাড়তি বোনাস। একেই বলে কেল্লা ফতে! একগাল হেসে হাবুল ভাবল, নাহ্, এই পেন তাকে বাগাতেই হবে। যে করেই হোক।

অতএব, যেমন ভাবা তেমন কাজ। একদিন বুবুনদের মামাবাড়ি জাদু দেখার নাম করে গিয়ে কাউকে না জানিয়েই টেবিলে পড়ে থাকা ম্যাজিকপেনটা সে অন্যায়ভাবে নিয়ে চলে এল। বিদেশের এত বড়ো ম্যাজিশিয়ানও ব্যাপারটা ধরতে পারল না ? হি হি। নিজের এলেম দেখে সে খুবই হাসল। তবে আড়াল থেকে জাদুমামাও কি স্মিত হাসল?

স্কুল খোলার এক সপ্তাহ পরেই পরীক্ষা শুরু হল। হাবুলবাবু তো মহা আহ্লাদে খুব একটা না পড়েই পরীক্ষা দিতে দৌড়ে গেল। সাথে ম্যাজিক পেন আছে তো চিন্তা কী ? একে একে সবের টেবিলে পরীক্ষার খাতা এল। প্রশ্নপত্রের দিকে তো সে তাকালই না। তারপর, হেঃ হেঃ করে হেসে যেই না সে পেনটা খাতায় ধরেছে, ম্যাজিক পেন তো চলতে শুরু করল নিজের মতন। কিন্তু, আরে! উত্তর কোথায়? এ তো খাতা জুড়ে আঁকা হয়ে যাচ্ছে জাদুমামার চকচকে মুখ। পেন তো থামছেই না। আর থামল তো সেই ছবি ফিকফিকিয়ে হাসতে শুরু করল। হাবুল তো সব দুষ্টুমি ভুলে ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে শুরু করল। আর তক্ষুনি ছবি থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল। সাথে মোটা গলা ভেসে এল, “অ্যাই হাবুল, আমার পেনটা ফেরত দে তো। পেনটা দে!”

এই শুনে হাবুল ‘পে পে’ করে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান।

অসুস্থ হওয়ায় দুষ্টু হাবুলকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন হেডমাস্টার। ভয় তখনও কাটেনি হাবুলের। তবে নিজের ভুল সে বুঝেছে। বুবুন তাকে দেখতে এলে কাঁদো-কাঁদো গলায় হাবুল ম্যাজিক পেনটা ফেরত দিয়ে বলল, “জাদুমামাকে সরি বলে দিস ভাই। ইয়ে মানে, পেনটা সেদিন কীভাবে ভুলে চলে এসেছে। আর এই পেন দিয়ে লিখতে গিয়েই তো সব যেন কেমন গুলিয়ে গেল”

ফিক করে হেসে বুবুন বলল, “আমার মামা তো হিপনোথেরাপিও জানে রে। এমনকি দূর থেকেও হিপনোটাইজ করে দিতে পারে। তোর ঠিক কী হয়েছিল বল তো?”

দেখতে দেখতে বিদেশ ফেরার দিন চলে এল বলাইমামার। এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্লেনের দিকে যাওয়ার আগে বুবুন ও হাবুলকে একইরকম দেখতে দুটো পেন দিয়ে জাদুমামা বলল, “সততা ও পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। ম্যাজিক পেন বলে কিছু হয় না। ভালো করে পড়াশুনো করে যে পেন দিয়ে লিখবে সেই পেনই তোমাদের নিজ গুণেই হয়ে উঠবে ম্যাজিক পেন।” স্মিত হেসে পিঠ চাপড়ে ফিরে গেল মামা।

বাড়ি ফিরে পেনটা দেখতে দেখতে হাবুল ভাবছিল মামার বলে যাওয়া কথাগুলো। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল, এখন থেকে সে সত্যিই মন দিয়ে পড়াশুনো করবে। তাহলে জাদুমামার কথামতন সব পেনই তার হাতে হয়ে উঠবে ম্যাজিক পেন।

অবাক কাণ্ড! এরপর থেকে স্কুলের পরীক্ষাগুলোয় হাবুলবাবু বেশ ভালো করে পড়াশুনো করে সত্যিই ভালো রেজাল্ট করতে শুরু করল। এখন তাকে সবাই ভালোবাসে। কেউ তাকে দুষ্টু হাবুল বলে না।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

কাকামণি

সিদ্ধার্থ সিংহ

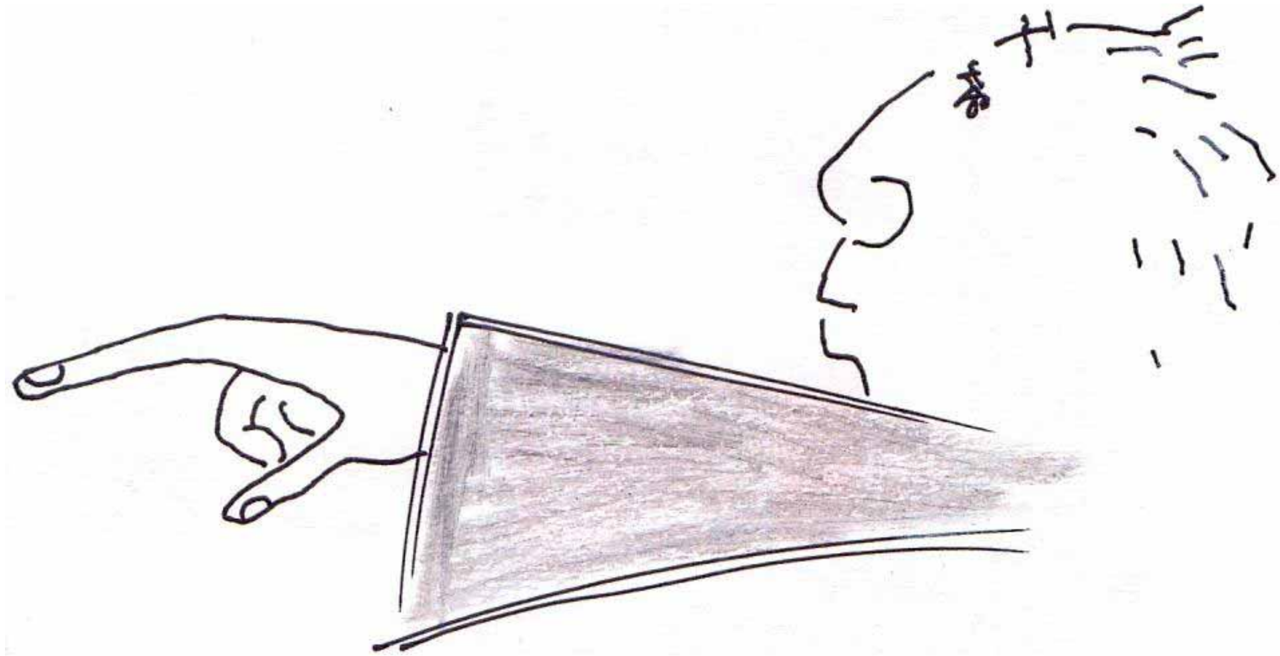

ছোটোবেলা থেকে কাকামণির কাছে ওই গল্পটা যে কতবার শুনেছি, তবুও এখনও আমরা ভাইবোনেরা এক জায়গায় হলে আর সেখানে যদি কাকামণি থাকেন তা হলে আর কোনও কথা নেই। ফের উঠবে সেই অদ্ভুত গল্প এবং আমরা এই বয়সেও মুগ্ধ হয়ে শুনব তাঁর কলেজ জীবনের প্রথম চাকরি করতে যাওয়ার সেই গা ছমছম করা গল্প।

কাকামণি তখন কলেজে পড়েন। হঠাৎ একদিন দাদুকে এসে বললেন, "কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলাম। এবং হবে কি হবে না, তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে ইন্টারভিউও দিয়ে দিয়েছিলাম। আর অবাক কাণ্ড, অতগুলো ছেলের মধ্যে থেকে একমাত্র আমিই নির্বাচিত হলাম এই চাকরির জন্য। লোভনীয় চাকরি। দারুণ জায়গা। সবরকমের সুযোগ-সুবিধা আছে। অসুবিধে যা, তা হল একটু দূরে। দূরে বলতে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে নয় ঠিকই, তবুও দূরেই। দেশের গণ্ডির বাইরে হলে তাকে তো দূরেই বলতে হবে, নাকি?"

দাদু তো কোনওরকমে রাজি হলেন। কিন্তু ঠাকুমাকে রাজি করানোই হয়ে উঠল দায়। ছোটোছেলে বলে কথা! শুরু হল গোসা, কান্নাকাটি, খাওয়াদাওয়া বন্ধ। এমনকি 'থাকবই না' গোছের কিছু একটা বলে রাগ করে কাদের বাড়িতে গিয়ে কাটিয়ে এলেন একটা গোটা দিন। এ বোঝায়, সে বোঝায়, কিন্তু কে শোনে কার কথা।

কাকামণিও তেমনি। তিনিও অভিমান করে শুরু করলেন অনশন। অনেক কথাকথি, অনেক চাপানউতোর, তারপর কাকামণি যেদিন মাথা ঘুড়ে পড়ে গেলেন তখন কোনও উপায় না দেখে ঠাকুমা মত দিতে বাধ্য হলেন। মত দিলেন মানে, প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুটো করে চিঠি দিতে হবে এবং প্রতি মাসে একবার করে বাড়ি আসতে হবে।

প্রতি মাসে! দুটো কেন, প্রতি সপ্তাহে সাতটা করে চিঠি দেওয়া যেতে পারে, তা বলে ওখান থেকে প্রতি মাসে বাড়ি! ওরা বছরে দু'বার বাড়ি যাতায়াতের খরচ দেবে ঠিকই, কিন্তু নিজের পয়সায় বাড়ি আসা মানে তো ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি। তিনমাসের মাইনে জড়ো করলেও এক পিঠের ভাড়া হবে কি না সন্দেহ। তবুও তখনকার মতো ঠাকুমাকে শান্ত করার জন্য

কাকামণি তো রাজি হলেন এবং খিদিরপুরের ডক থেকে জাহাজে চেপে পাড়ি দিলেন সেই অদ্ভুত দেশে।

কাকামণি জানতেন, পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে যার সঙ্গে আমাদের এই পৃথিবীর অন্য কোনও জায়গার সঙ্গে কোনও মিল নেই। বাসে বিক্রি হওয়া দু'টাকার একটা চটি বইয়ে নাকি কাকামণি একবার পড়েছিলেন, এমন একটা জায়গা আছে, সেখানকার প্রত্যেকটা মানুষের হাতের এবং পায়ের আঙুল ছ'টা করে। তাদের কাছে ওটাই স্বাভাবিক। কারও হাতে পাঁচটা আঙুল দেখলে তারা ভিরমি খায়। সেই বইতেই আবার আরেকটা জায়গার কথা পড়েছিলেন, সেখানে নাকি একটাও মেয়ে নেই। সবাই পুরুষ। এমন জায়গা হয়! নিশ্চয়ই হয়, না হলে 'জ্ঞানের আলো', 'জানবার কথা', 'জেনে রাখা ভালো' গোছের বইগুলোতে এগুলোর উল্লেখ থাকবে কেন? কিন্তু সেসব বইতে কাকামণি নাকি ওই দেশের কোনও উল্লেখ পাননি। অথচ ও দেশের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল, এ দেশের কথা সবার আগে লেখা উচিত ছিল ওই গ্রন্থপ্রণেতাদের। কাকামণি না গেলে আমাদেরও জানা হত না, অমন একটা অদ্ভুত দ্বীপ রয়েছে এই পৃথিবীতেই।

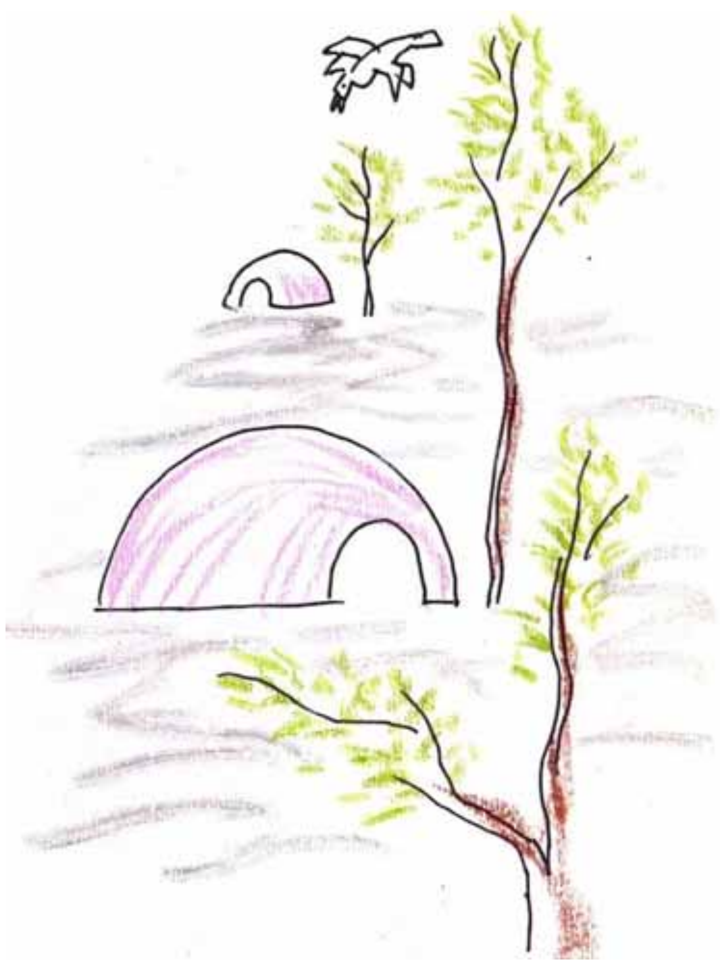

দেশটা অদ্ভুত। খুব ছোট্ট একটা দ্বীপ। সাবুর দানার মতো ধবধবে সাদা মাটি। সূর্যের আলোটা কেমন যেন নীলচে নীলচে। মাটিতে পড়ে ঠিকরে পড়ছে চারদিকে। বাড়িগুলো গোল গোল । গাছপালা খুব কম। তাও যা নজরে পড়ছে, তা এক-দেড় মানুষের বেশি লম্বা কোনওটাই নয়। একদম লিকপিকে কাণ্ড, ডালাপালা। পাতাগুলো গাঢ় পিত্তি রঙের। রাস্তায় একটাও কুকুর চোখে পড়ল না। শুধু খরগোশ আর গিনিপিগ। আকাশময় বদ্রিকা আর পরিযায়ী পাখি। লোকগুলো বেশ বেঁটে বেঁটে। কিন্তু হাতগুলো বেশ লম্বা। হাঁটু ছাড়ানো। হলদেটে ফরসা। মুখগুলো লম্বাটে ধরনের। খুব খুঁটিয়ে না দেখলে সবাইকে একইরকম লাগে। এসব তো ঠিকই আছে, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এখানকার লোকেরা সকলেই জন্মগত সূত্রে জ্যোতিষী। কেউ মানুষের মাথার একটা চুল নিয়ে নাড়চাড়া করে বলে দিতে পারেন, তার আজকের দিনটা কেমন যাবে। কেউ কারও ব্যবহৃত রুমাল দেখে বলে দিতে পারেন তার ভূত-ভবিষ্যৎ। কেউ কারও ছায়া দেখে নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন, তার শোয়ার ঘরের খাটটা কোনদিকে রাখলে ফের তার জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। কেউ শুধু কন্ঠস্বর শুনেই বলে দিতে পারেন, আগামী দশ বছরের যাবতীয় খুঁটিনাটি। কেউ আবার সদ্যোজাতর হাত-পায়ের গড়ন দেখে বলে দিতে পারেন, বাচ্চাটা ভবিষ্যতে কোন পেশায় যাবে এবং আশ্চর্যের বিষয় হল,

এঁদের নাকি এর জন্য কোনও চর্চাই করতে হয় না। এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার গুণ তাঁরা এমনি এমনিই অর্জন করে ফেলেন।

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে কাকামণি গিয়েছিলেন, সেটাও বড়ো অদ্ভুত। কাকামণির কাজ ছিল প্রতি সপ্তাহে ওখানকার অন্তত পনেরো জন অধিবাসীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের হাত বা পায়ের তালুর ছাপ সংগ্রহ করে দিল্লির মূল অফিসে পাঠানো।

থাকা টাকার ব্যবস্থা এখান থেকেই কোম্পানি করে দিয়েছিল। সেইমতো কাকামণি তো ওই দ্বীপে নেমেই শুরু করে দিলেন কাজ। প্রথম যে লোকটির সঙ্গে আলাপ হল, তিনি এগারোটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। সাতটি ভাষা খুব ভালো করে পড়তে পারেন আর চারটি ভাষায় লেখা, পড়া, বলা সবেতেই দারুণ তুখোড়। তো, কাকামণি তাঁর সঙ্গে ছেচল্লিশ মিনিটের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন এবং তারপর যখন তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা পড়লেন, লোকটা আচমকা কাকামণির কপালের কাছে নাক নিয়ে বেশ জোরে একবার ঘ্রাণ নিলেন এবং কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজেই লাফিয়ে উঠলেন। তুমি! তোমার তো সাহস কম না! তুমি এক্ষুনি এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাও।

কাকামণির তো থ। লোকটা বলেন কী! সবে চাকরি নিয়ে এসেছেন। এখনও আটচল্লিশ ঘণ্টাও কাটেনি। অথচ... লোকটা পাগল নাকি!

কিন্তু ততক্ষণে লোকটা এমন হই-হট্টগোল জুড়ে দিয়েছেন যে আশেপাশে লোক জড়ো হয়ে গেছে। কীসব বলাবলি করছে। ওদের কথা বলার ধরনটা যেন কেমন কেমন। কাকামণি ঠিক ধরতে পারছেন না। ধরতে না পারলেও এটা বুঝতে পারছেন যে, তাঁকে নিয়েই কথা হচ্ছে। কাকামণি একবার এর মুখের দিকে তাকান, একবার ওর মুখের দিকে। বোঝার চেষ্টা করেন উত্তেজিত হয়ে ওরা কী বলাবলি করছে।

এমন সময় একটা লোক কাকামণির হাতটা তুলে নিয়ে ঝপ করে জিভ দিয়ে একটু চেটে নিল। তারপর জিভটা কয়েকবার ভেতর-বার করে চোখ পিটপিট করে বলল, "চল, তোকে জড়িবুটির কাছে নিয়ে যাই।"

কাকামণির কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা কাকামণিকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। লোকটার গায়ে যে এত জোর, তা তার চেহারা দেখে মালুম করা শক্ত। হই হই করে পেছনে পেছনে আসতে লাগল বাকি লোকগুলো।

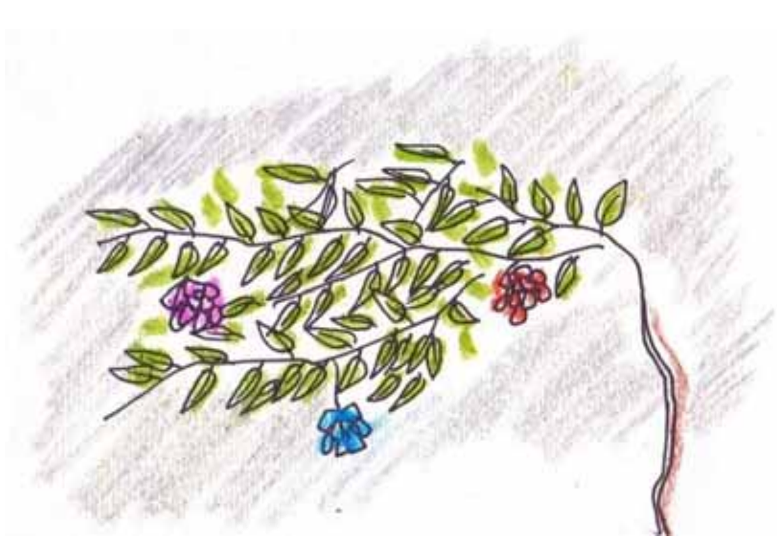

ওরা কাকামণিকে নিয়ে যেখানে হাজির হল, সেটা একটা মাচার মতো। সেখানে একটা লতানো গাছ। গাছ জুড়ে ঝিরিঝিরি পাতা। মাঝে মাঝে থোকা থোকা ফুল। কোনও থোকা লাল, কোনও থোকা সবুজ, কোনও থোকা বেগুনি। এক একটা থোকা এক একটা রঙের। প্রত্যেকটা রঙই একদম গাঢ়। লতানো গাছটা মাচা জুড়ে ছড়ানো। আর তার চারদিকে খা খা। ওরা কাকামণিকে তার সামনে দাঁড় করাতেই একজন ওই গাছের একটা লতানো ডাল তুলে কাকামণির গায়ে ঠেকাতেই সবক'টা ফুলই গাছ থেকে ঝরে পড়ল এবং লোকগুলো সকলেই প্রায় আঁতকে উঠে বিস্ফারিত চোখে কাকামণিকে দেখতে লাগল। যেন আজব

কিছু। পৃথিবীর অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসেছেন। আর যাঁর সঙ্গে কাকামণির প্রথম আলাপ হয়েছিল, তিনি বলে উঠলেন, "কীই? বললাম না, এই সেই লোক।"

কাকামণির কেন যেন হঠাৎ মনে হল, ওরা আচমকা মারমুখী হয়ে উঠতে পারে। তাই কোনওদিকে না তাকিয়ে কাকামণি ছুট লাগালেন। ছুট মানে কুকুরছোটা। আর তাঁর পেছনে হেই হেই করে ছুটতে লাগল ওই লোকগুলো। ওই লোকগুলোর দেখাদেখি রাস্তাঘাটের লোকজনও পিছু নিল। কাকামণি যত ছোটেন, ওরাও তত ছোটে এবং ক্রমশ বাড়তে থাকে তাদের দল। ছুটতে ছুটতে কাকামণি যখন আর পারছেন না, যেকোনও সময় মুখ থুবড়ে পড়তে পারেন, তখনই তার চোখে পড়ল, সামনেই একটা বিরাট ফুটবল। বিরাট বলতে বিরাট প্রায় আকাশছোঁয়া। সাত-আট তলার মতো সমান তো হবেই। কাকামণি পেছন না ফিরেও বুঝতে পারলেন ওই লোকগুলো তাঁর পিছু পিছু আসছে। একবার ধরতে পারলে যে কী হবে কে জানে! তাই ছুটতে ছুটতেই ভাবলেন, এর আড়ালে লুকোবেন কি না। সেইমতো ওই ফুটবলটার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একটু দম নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। ঠিক কোন জায়গাটায় দাঁড়ালে অনায়াসে ফাঁকি দেওয়া যাবে ওদের চোখকে? এদিকে ওদিকে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ল, ক'হাত দূরে একটা সুড়ঙ্গ। ঈশ্বর সত্যিই আছেন। না হলে এই সময়ে এমন একটা জায়গা তাঁর সামনে খুলে যাবে কেন! কাকামণি প্রাণ বাঁচাতে সেখানে ঢুকে পড়লেন।

ঢুকেই দেখেন, সুড়ঙ্গ কোথায়? এ তো অফিস। এখানে ওখানে টেবিল। টেবিল ঘিরে চারটে, ছ'টা, আটটা করে চেয়ার। আর সেইসব চেয়ারে লোকজন। সকলেই প্রায় বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন।

কাকামণি ঢুকতেই ওঁরা কাকামণির দিকে ফিরে তাকালেন। অনেকেই উঠে এসে কাকামণিকে ঘিরে ধরলেন। সকলেই বেশ শান্তশিষ্ট। সৌম্য চাহনি। একজন বললেন, "বোসো।"

কাকামণি অবাক। তাঁর মনে হল, লোকগুলো যেন তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। হতে পারে! এখানকার লোক তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। আগেই সব জেনে যেতে পারেন। তাই বসেই, কাকামণি যেদিক দিয়ে ঢুকছেন, সেদিকে আঙুল তুলে আমতা আমতা করে বলতে শুরু করলেন, "ওরা বলছে, তুমি এক্ষুনি দেশ ছেড়ে চলে যাও।"

সামনে লোকটা খুব ধীরে স্থির ভঙ্গিতে বললেন, "হ্যাঁ, তুমি চলে যাও।"

কাকামণি তখন মরিয়া হয়ে বললেন, "আমি নতুন চাকরিতে জয়েন করেছি। এখনও দু'দিন পুরো হয়নি।"

লোকটা বললেন, "জানি, এবং তুমি যে আসবে আমরা তাও জানতাম। তাই তোমার জন্যই আমরা আজ সকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি।"

"তার মানে?"

"মানে তুমি বুঝবে না। তুমি এক্ষুনি ফেরিঘাটে চলে যাও। ওখানে তোমার জন্য জাহাজ অপেক্ষা করছে। তুমি গেলেই ছাড়বে।"

কথাটা একজন বললেন ঠিকই, কিন্তু কাকমণির মনে হল কথাটা একজনের নয়, কথাটা ওঁদের সবার। এবং কথাটা সম্মোহনের মতো। কাকামণি যেন কেমন হয়ে পড়লেন। পায়ে পায়ে ওখান থেকে বেরিয়ে ফেরিঘাটে এসে দাঁড়ালেন। সেখান তখন ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে দিনেমার জাহাজ। কাছে যেতেই একজন দৌড়ে এলেন, "এই যে আপনার টিকিট। শিগগির উঠে পড়ুন।"

"আমার সবকিছু তো ওইখানে।"

"না। আমরা নিয়ে এসেছি।"

কাকামণির আর কিছু বলার ছিল না। উঠে পড়েছিলেন জাহাজে। যথারীতি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন ক’দিনের মধ্যেই। কাকামণিকে দেখে ঠাকুমার সে কী আনন্দ! চিঠি নয়, চিঠির বদলে স্বয়ং ছেলে এসে হাজির হয়েছে বাড়িতে। হই হই পড়ে গেল বাড়িতে। হই হই পড়ে গেল পাড়াতে। কিন্তু কেউ কেউ যে ভ্রূ কোঁচকায়নি, তা নয়। এ কী রে বাবা! গেল চাকরি করতে বিদেশে, আর গিয়েই ফিরে এল! এ কেমন চাকরি!

কী হয়েছে, সবাই জানতে চাইল ঘটনাটা। কাকামণিও বললেন। কিন্তু ক’জন বিশ্বাস করল সে কথা, বলা মুশকিল। তবে দাদু নাকি বলেছিলেন, যেমনি মা তেমনি তাঁর ছেলে। কেউই তার জেদ ছাড়বে না। একবার যখন বলে ফেলেছে যাবে, তখন যাবেই। তাই গিয়েছিল। কিন্তু গিয়েই মায়ের জন্য বোধহয় মনে কেমন করছিল, তাই ফিরে এসেছে। এখন কী বলবে, তাই ওইসব সাতপাঁচ গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

গল্প হোক বা সত্যি হোক, কেন জানি না, আমাদের কিন্তু দারুণ লাগত গল্পটা। আরও দারুণ লাগত, যখন কাকামণি বলতেন। সত্যি কথা বলতে কী, ওইভাবে আর কাউকে কখনও গল্প বলতে শুনিনি।

ছবিঃ অংশুমান

মিউটেশন

সুবীর

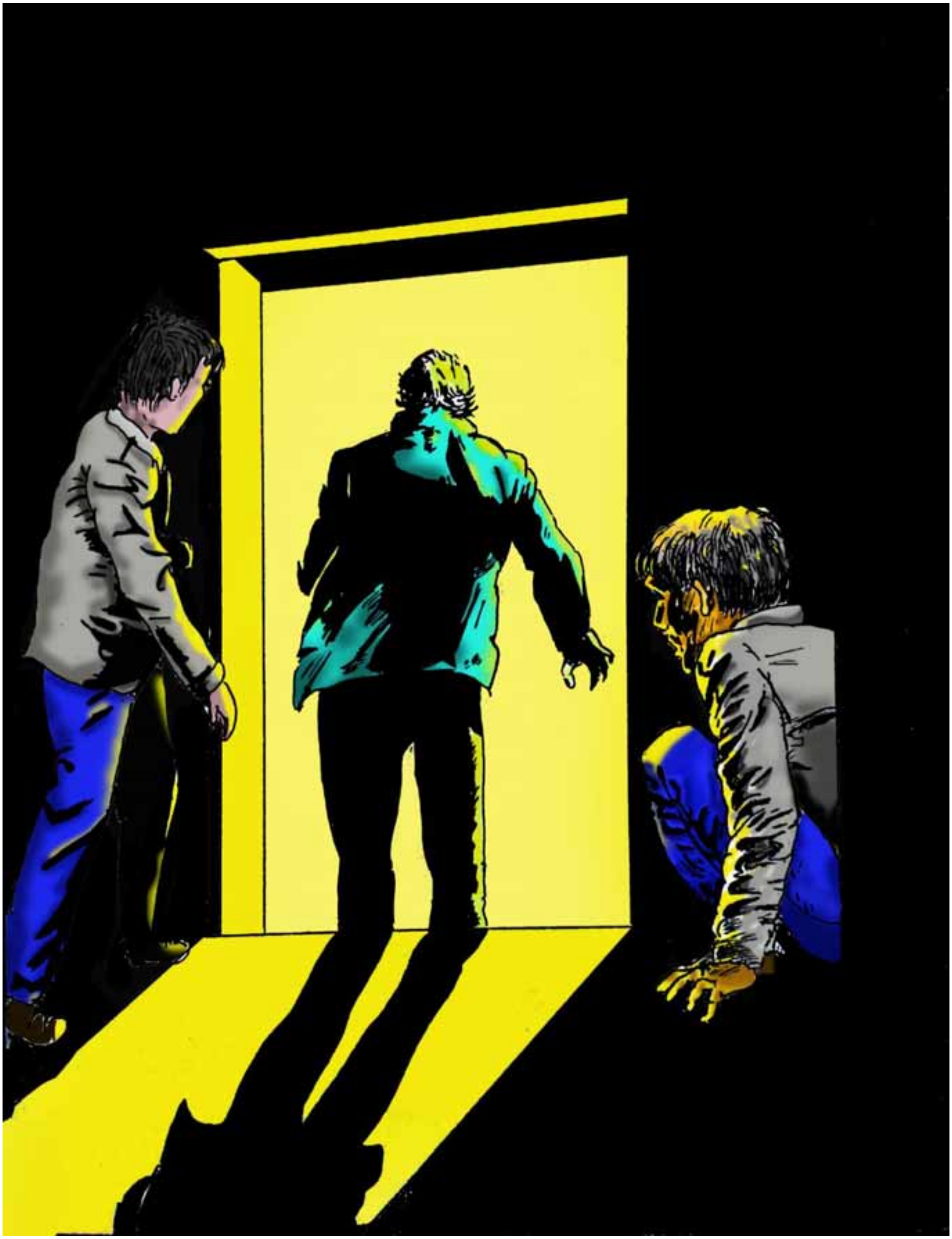

প্রতি শনিবারে মতো আজও আমরা সায়নদের দোতলায় জড়ো হয়েছিলাম। হঠাৎ সৈকত বলে উঠল, “দেখ, আমি কিন্তু স্যারের কথাটা বিশ্বাস করি না।”

“বিশ্বাস করিস না! আরে, এটা তো একটা ছোটো ঘটনা। আমি তো এর থেকেও বড়ো ঘটনা জানি।” সায়ন বেশ দৃঢ়ভাবেই কথাটা বলল।

“কোন ঘটনার কথা বলছিস বল তো?” এবার আমি মুখ খুললাম।

আমার দিকে তাকিয়ে সায়ন বলল, “ভুলে গেলি! আমাদের ইতিহাস-স্যারের কথাটা। তোকে তো সেদিনই দেখালাম।”

“ওহ! ওইটা?”

“এই, তোরা দু’জন কী আলোচনা করছিস? আমাকেও বল!”

সৈকতের ধমক খেয়ে সায়ন মুখ খুলল, “সেদিন টিফিন পিরিয়ডে সুমন আর আমি হেডস্যারের সাথে কী একটা দরকারে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দেখি তেতলার ছাদের দরজাটা খোলা। আমারা সোজা ছাদে উঠে গিয়েছিলাম।”

আমি বললাম, “ছাদে ইতিহাসের প্রণববাবু একা ছিলেন। টিফিন টাইম। বুঝতেই পারছিস বাইরে কেমন রোদের তেজ। তার মধ্যে উনি দু ’হাত দু’পাশে ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। জামাকাপড়ের বাইরে যেটুকু অংশ আছে সেখানকার সবুজ শিরাগুলো চামড়ার নিচে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এমনকি মুখ ও চোখের পাতায়ও এইরকমভাবে শিরাগুলো দেখা যাচ্ছে। আর ওনার চুলগুলো সব মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ওতেও কেমন সবুজ আভা।”

“ক্লোরোফিল, সালোকসংশ্লেষ।” সৈকত প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

“হুম, এখন আমাদেরও তাই মনে হয়। কিন্তু ওইদিন আমরা ভয়ের চোটে পালিয়ে এসেছিলাম। তারপর টিফিন আওয়ারে আমরা অনেকবার লুকিয়ে লুকিয়ে ওনাকে দেখেছি।”

“আসলে তখন তো জানতাম না যে ওরকম কেন হয়। আজ স্যারের ক্লাসে বুঝতে পারলাম।”

আমাদের এই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে আজ বিজ্ঞান পিরিয়ডে আজিতবাবুর ক্লাসে। তিনি ক্লাসে বলছিলেন, “আজ আমি যে কথা বলব এটি আমার ছোটোবেলার একটি ঘটনা। তোমাদের অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে তবে এটা কিন্তু একদম সত্যি ঘটনা।

“আমারা যখন ছোটো ছিলাম তখন এত হসপিটাল, নার্সিং হোম ছিল না। সবকিছুই অনেক দূরে ছিল। রুগি নিয়ে যাওয়ার সময় সে মাঝপথেই মারা যেত। সেই সময় বেশিরভাগ রোগের চিকিৎসা গ্রামের ওঝা বা গুনিনরাই করত। আমাদের গ্রামে ছিল রতন ওঝা। অন্য রোগের চিকিৎসা যাই করুক না কেন, রতন সাপে কাটা রুগির চিকিৎসা খুব ভালো করত। ওর সারা শরীরে অজস্র সাপে কাটার দাগ ছিল। আসলে শুধু সাপে কাটা রুগির চিকিৎসা করলে হবে! ওদের প্রধান কাজ তো সাপ ধরা। আর রতন ছিল এ কাজে ওস্তাদ লোক। কিন্তু কালের নিয়মে রতন একদিন সাপের কামড়েই মারা গেল।”

“কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য ব্যাপার কোথায় স্যার!” সৈকত বেশ জোরেই কথাটা বলল।

গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে স্যার আবার আরম্ভ করলেন, “এটা তো ভূমিকা ছিল। এরপরেই তো আসল ঘটনা শুরু হল।”

“রতনের এক ছেলে ছিল, হারান। বাপের মতো সেও বড়ো ওঝা হওয়ার স্বপ্ন দেখত। রতন যখন মারা যায় তখন সে দশ বছরের। কিন্তু ওই বয়সে কী তেজ! আসলে ছোটো থেকে সাপের সাথেই বড়ো হয়েছে তো। তাই তার সাপের ভয় একদম ছিল না। বাবার মৃত্যুতে ও বাবার মৃতদেহ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল, “যার কামড়ে ওর বাবার মরণ হয়েছে তাকে ও নিজের হাতেই মারবে।”

“মারতে পারল?”

রুনার প্রশ্নচিহ্ন মার্কা গোল গোল চোখের দিকে তাকিয়ে স্যার বললেন, "পারল, কিন্তু অদ্ভুতভাবে। ওই সাপকে খুঁজে হারান সেখানে গিয়েছিল যেখানে ওর বাবার মৃতদেহ পাওয়া যায়। অনেক খুঁজেও প্রথমদিন তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু হারান হাল ছাড়েনি। আবার গেল। এবার দেখতে পেল তাকে। কী বিশাল! কালো রঙের সাপ। হারানকে দেখে ফণা তুলে তেড়ে এল ওর দিকে। সাথে তীব্র হুইসেলের মতো হিস হিস ডাক। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। হারান পালাতেও পারল না। তার আগেই সাপটা ছোবল বসিয়ে দিল হারানের পায়ে।"

"হারান বেঁচেছিল?" রুনা যে ভয় পেয়েছে সেটা ওর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

"হ্যাঁ, বেঁচেছিল। কিন্তু ওর ওই পা-টা অসাড় হয়ে গিয়েছিল।"

"আর ওই সাপটা?" প্রশ্ন করল সায়ন।

"সাপটা হারানকে ছোবল দিয়ে নিজেই ছটফট করতে লাগল। পাক খাচ্ছে আর হিস হিস করে কী আওয়াজ! কিছুক্ষণ পরে সাপটা মরে গেল।

"ঘটনাটা সেই সময় অনেকে বিশ্বাস করেনি। একটা সাপ একজন মানুষকে কামড়ে নিজে মরে গেল! কেই বা বিশ্বাস করবে! কিন্তু আমার বাবা বিশ্বাস করেছিল। আসলে ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল, সেই বাগানের কাছ দিয়ে আমার বাবা জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ফিরছিল। হারানকে দেখে আর সাপের ওই ডাক শুনে বাবা বাগানে যায়। আর ব্যাপারটা দেখতে পায়। আমাদের ষাঁড়ের পিঠেই হারানকে শুইয়ে বাবা ওকে গ্রামে নিয়ে এসেছিল। পরে বাবার মুখ থেকেই ঘটনাটা আমি বিস্তারিতভাবে শুনেছিলাম।"

"ইস, ওই জন্য তোরা টিফিনের মাঝে মাঝে হাওয়া হয়ে যেতিস! আমি জিজ্ঞাসা করলে বলতিস, বাথরুম গেছি। আমাকে কেন বাদ দিলি তোরা?" সৈকতের চোখে জিজ্ঞাসা এবং রাগ দুটোই মিশে ছিল।

"আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "আসলে আমরা ভেবেছিলাম বেশি লোক জানাজানি হলে স্যার যদি রেগে যান! আর তাছাড়া তুই যা পেটপাতলা!"

"কী? আমি পেটপাতলা! তুই আমাকে এটা বলতে পারলি!" সৈকত তেড়ে মারতে এল আমায়।

সায়ন বাঁচিয়ে দিল। "আরে ছাড় না ওর কথা। তুই সোমবার আমার সাথে গিয়ে দেখে আসবি। এবার খুশি?"

সৈকত যে খুশি হয়েছিল সেটা ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। "বেশ," ও বলল, "তবে আমিও এইরকম একটা ঘটনা জানি। মনে হয় এই ঘটনার কারণও এক।"

"আর তুই আমাদের থেকে সেই ঘটনাটা লুকিয়ে রেখেছিস! ভালো। তবে আমাদের উপর এত হম্বিতম্বি করছিলিস কেন?

সৈকত অপরাধীর মতো মুখ বানিয়ে বলল, "না মানে, তোরা কি জানিস, আমাদের হেডস্যার নিঃশ্বাস না নিয়ে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে?"

"মানে! কী বলছিস তুই? এটা অসম্ভব ব্যাপার। আমরা বিশ্বাস করি না। তুই গুল দিচ্ছিস।" আমি আর সায়ন একসাথেই কথাটা বললাম।

"না রে। আমিও প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সেতুমামা যেদিন কথাটা বলল, আমার মনে হল একবার দেখা উচিত। তাই সেদিন রাতে লুকিয়ে স্যারের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

"কী দেখলি?"

"তোরা বিশ্বাস করবি না। স্যারের বাড়িতে কোনও খাট নেই। তার বদলে আছে একটা গদিওয়ালা বাক্স। রিনির দাদু মারা যাওয়ার পর যেমন বাক্স করে গোর দেয়া হয়েছিল, তেমন দেখতে। তবে ওটার থেকে একটু বড়ো। স্যার সেটাতেই রাতে ঘুমায়। আমি ওটার ঢাকা খুলে দেখেছি।"

“নিশ্চয়ই ওটার মধ্যে নিঃশ্বাস নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা আছে। ” আমি বেশ জোরের সাথেই কথাটা বললাম।

“না, নেই। কারণ, গত পরশু সকালে আমি নিজেই ওটার মধ্যে কিছুক্ষণ কাটিয়েছি।”

“কী বলছিস তুই! স্যার জানতে পারেনি?”

“না জানারই কথা। কিন্তু কীভাবে যে জানতে পারল কী জানি। কাল আমকে ডেকে বেশ ভালোমতোই ঝাড় দিল।”

“আচ্ছা তোরা ভেবে দেখেছিস, যে সাপের কামড়ে বাবা মরে গেল, সেই সাপ ছেলেকে কামড়ে নিজে মরে গেল? তোরা কেউ বলতে পারবি, এটা কেন হল? আমি বলে দিচ্ছি। এর জন্য দায়ী মিউটেশন।

“মিউটেশন হল একপ্রকার জৈবিক পরিবর্তন। সাধারণত জীববিদ্যার ক্ষেত্রে জিনসংক্রান্ত যে পরিবর্তনের কারণে বংশধরদের মধ্যে বংশানুক্রমিক পরিবর্তন দেখা যায়, সেটা হল মিউটেশন। আবার কিছু কিছু মিউটেশন আছে যেগুলো একেবারে অন্যরকম। আমাদের মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন হচ্ছে, মিউটেশন হচ্ছে তার কতকগুলি স্থায়ী । কতকগুলি টিকে থাকে না। তাই আমরা ওই উদাহরণগুলো দেখি না। এই যেমন- ”

বলে তিনি ব্যাগে রাখা একটা ইংরাজি দৈনিক বাইরে এনে তুলে ধরলেন এবং একটি হেডলাইনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

‘Magnetic Boy - The Russian Super Hero of the Future’

“ভেতরের খবর হল, রাশিয়ার KALYA KRUGLYACHUMKO সাতবছর পর্যন্ত একজন সাধারণ ছেলে ছিল। কিন্তু ২০১০ সালে একদিন তাদের অ্যাপার্টমেন্টে খারাপ রেফ্রিজারেটর থেকে সে একটা ইলেকট্রিক শক পায়। যার ফলে তার মধ্যে চৌম্বকত্ব তৈরি হয় ও সে ‘ম্যাগনেটিক বয়’তে পরিবর্তিত হয়। সাধারণত ধাতুর তৈরি চামচ, কয়েন এইসব ও আকর্ষণ করতে পারছে। তবে প্রতিদিন নাকি ওর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।”

পড়া শেষ করে তিনি বললেন, “ওই ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ার পর ছেলেটির মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে যার কারণে ও চুম্বকে পরিণত হয়েছে। এই মিউটেশন স্থায়ী হতে পারে আবার ক্ষণস্থায়ী হতে পারে।”

“আমাদের ভূগোলের দ্বিজেনবাবুও নিঃশ্বাস না নিয়ে অনেকক্ষণ ডুবে থাকতে পারেন।”

“তুই কী করে জানলি ?” সৈকত আর সায়ন দু ’জনেই আমার দিকে ঘুরে তাকাল। তাদের চোখে জিজ্ঞাসা।

“আসলে সেদিন বড়োমামার সাথে গোলদিঘিতে ছিপ ফেলতে গিয়েছিলাম। ওদিকেই তো দ্বিজেনবাবু থাকেন। উনি তখন স্নান করছিলেন। আমাদের ছিপ নিয়ে যেতে দেখে জলে ডুব দিলেন। আমরা অন্য পাড়ে গিয়ে বসলাম। মামা নিজের ছিপে মন দিলেন। আর আমি মাঝে মাঝে পুকুরের দিকে দেখছিলাম। কিন্তু ওনাকে জল থেকে উঠতেই দেখিনি।”

“সেদিন মামা একটাও মাছ পায়নি রে। খালি ফাতনা নড়ে ওঠে আর টানলে লবডঙ্কা। ঘন্টাখানেক পর যখন চলে আসছি তখন পুকুরের মাঝখানে ভুস করে কী যেন ঠেলে উঠল। চেয়ে দেখি দ্বিজেনবাবু। চিৎ সাঁতার দিয়ে ঘাটের দিকে আসছেন। সারা শরীরে একটা রুপোলি আভা।”

আমাদের আলোচনা আর বেশি এগোল না । সন্ধে হয়ে এসেছিল, তাই আমি আর সৈকত যে যার বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।

“আচ্ছা, তোমরা কেউ সুমাত্রার নিশাচর মানুষের নাম শুনেছ?”

আজ সোমবার। লাস্ট পিরিয়ডে অজিতবাবুর ক্লাসে স্যার হঠাৎ এই প্রশ্ন করলেন। আমরা একসাথে ‘না স্যার’ বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। তখন উনি বললেন, “আজ থেকে ৭৫০০ বছর আগে সুমাত্রায় একটা ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত হয়। সবকিছুই পুরু ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে। তৃণভোজী, মাংসাশী সব প্রাণীরাই সে ছাইয়ের নিচে চাপা পড়েছিল। আরশোলা, ব্যাঙ, টিকটিকির মতো কিছু প্রাণী আর হাতেগোনা কিছু মানুষ বেঁচে ছিল। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। অ্যাসিড বৃষ্টি ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য তারা গুহায় আশ্রয় নিল। এইরকম কিছু মানুষ এখনো সেখানে বেঁচে আছে।”

“তারা কি নিশাচর?” প্রশ্ন করল সায়ন।

“হ্যাঁ। দীর্ঘদিন গুহার অন্ধকারে কাটানোর ফলে এদের মধ্যে মিউটেশন হয়ে এরা নিশাচরে পরিণত হয়েছে। আর এদের মধ্যে তৈরি হয়েছে রোগ প্রতিরোধ করার অসাধরণ ক্ষমতা।”

এই তথ্যগুলো আমিও ভালোভাবে জানতাম না। সেদিন একটা পুরনো শারদীয় পূজাবার্ষিকীতে পড়লাম। উপন্যাসটির নাম ‘মাঝে মাত্র চব্বিশদিন’। লেখক অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী। লেখক অসাধরণভাবে এই ঘটনার বর্ণনা করেছেন।

ফেরার পথে সৈকত বলে উঠল, “আমিও একরকম নিশাচর মানুষকে চিনি।”

“তো কে সেই নিশাচর মানুষ?” সায়ন প্রশ্ন করল।

“অজিতবাবু।”

“মানে?” সৈকতের কথা শুনে আমি আর সায়ন দু’জনেই চমকে উঠলাম।

ও বলে চলল, “কাল রাতেই দেখলাম অজিতবাবু হেডস্যারের বাড়ি থেকে বেরোলেন।”

“তো, কাল তো চাঁদের আলোয় ভালোই রাস্তাঘাট দেখা যাচ্ছিল।” আমি বললাম।

“দেখা যাচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু তোরা তো জানিস, রাতের শেষ আর সূর্য ওঠার আগের কিছু মুহূর্ত খুব অন্ধকার হয়ে থাকে। অজিতবাবু সেসময় হেডস্যারের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। ওনার কাছে কোনও টর্চ ছিল না। আর ওনার চোখ সবুজ হয়ে জ্বলছিল।”

“তুই ওইসময় হেডস্যারের ঘরে কী করছিলিস?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“আরে, আমি তো হেডস্যারের বাক্স দেখতে গিয়েছিলাম।”

“ওই রাত্তিরে! ক’দিন পরে তুইও নিশাচর মানুষ হয়ে যাবি রে।”

অন্যদিন হলে সৈকত আমাকে কয়েক ঘা দিয়ে দিত। কিন্তু আজ দুপুরে প্রণববাবুর সালোকসংশ্লেষ দেখার পর কেন জানি ওর মনটা ভালো হয়ে ছিল। তাই আমার কথা শুনে ও হেসে ফেলল। ওর মুখে হাসি দেখে আমরাও হাসার সাহস করলাম।

সৈকত হাসতে হাসতেই বলল, “জানিস, আমার মনে হয় ভ্যাম্পায়াররাও নিশাচর মানুষ।”

“দূর! ওরা তো মানুষই নয়।” সায়ন বলল।

“কে বলল মানুষ নয়! ওরাও মানুষ। ওদের মধ্যে কোনও জৈবিক পরিবর্তন হয়ে ওরা ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হয়েছে।”

সন্ধেবেলায় মাঠ থেকে খেলে বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়ির কাছাকাছি প্রায় এসে গেছি এমন সময় রিনির সাথে দেখা। রিনি আমাদের পড়শি। ওদের আর আমাদের বাড়ি রাস্তার এপার আর ওপার। মানে মুখোমুখি। রিনি আমাকে দেখে মুখ ভেঙিয়ে বলে উঠল, “এই যে বীরপুরুষ, সন্ধে পর্যন্ত কোথায় ছিলি? বিকাল থেকে তোকে খুঁজছি।”

“কেন রে?”

আমার প্রশ্ন শুনে রিনি ফিক করে হেসে বলল, "আজ ছ'টা বেজে তেরো মিনিটে পূর্ণিমা লেগেছে। পুরো চাঁদ উঠবে। রাতে ছাদে আসবি? দু'জন মিলে একসাথে চাঁদ দেখব।"

ও পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখবে। আর আমাকে সঙ্গী হতে হবে? ভালো পাগল তো! আমি বলে দিলাম, "দেখ, তুই চাঁদ দেখবি, দেখ। আমি কিন্তু ঘুমাব। কাল মঙ্গলবার। সকালে আমার পড়া আছে। আমি তোর সাথে জাগতে পারব না।"

রিনির দিকে আর তাকালাম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে এলাম। আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাকে ও রাজি করিয়েই ছাড়ত।

বাড়ি ফিরে টিফিন সেরে পড়তে বসলাম। কিন্তু আমার মাথা থেকে ওই মিউটেশন ব্যাপারটা কিছুতে যাচ্ছিল না। খালি ঘুরে ফিরে ওটাই মনে পড়ছিল। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল।

"কী রে, শরীর খারাপ নাকি! তুই তো এভাবে ঘুমাস না কখনও। দেখি, কপালটা দেখি।"

মা নিজেই আমার কপালে হাত রাখল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "আজ কি পূর্ণিমা লেগেছে!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

মা বলল, "প্রতি পূর্ণিমায় তোর এই জ্বর আসাটা ভালো লক্ষণ নয়। আমাদের পরিবারে কারও এরকম হয় না। রাতের খাবার খেয়ে, একটা প্যারাসিটামল খেয়ে ঘুমা। জ্বর না কমলে কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

ঘুম যখন ভাঙল, তখন কত রাত কে জানে। কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। বাইরে কে যেন গান করছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি পাগলিটা ওদের ছাদে বসে আমাদের ঘরের দিকে মুখ করে গান করছে। কী গান বুঝতে পারলাম না, তবে সুরটা বেশ সুন্দর।

পায়ে পায়ে কখন ছাদে চলে এসেছি বুঝতে পারলাম না। পাগলিটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ধূসর কুকুর ছাদে বসে জোছনা মাখছে। আমাকে দেখে ওর মুখে হাসি খেলে গেল। তারপরেই একটা লাফ দিয়ে আমাদের ছাদে চলে এল। অন্য কেউ হলে হয়তো ভয় পেয়ে যেত। আমার কাছে কিন্তু এটা মামুলি ব্যাপার। আমিও চারপায়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর দু'জনে পাশাপাশি বসে একসাথে জোছনা মাখতে লাগলাম।

দূর থেকে আমাদের যদি কেউ দেখে ভাববে দুটো কুকুর পাশাপাশি বসে আছে। কারণ, মাঝরাতে কারোর ছাদে দুটো নেকড়ে পাশাপাশি বসে আছে, এইরকম পাগল ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারে না।

দূরে চেয়ে দেখি সায়ন আর সৈকতও আসছে। বেশ বড়ো বড়ো লাফ দিচ্ছে।

আচ্ছা, এই যে প্রতি পূর্ণিমা রাতে আমরা মানুষ থেকে নেকড়ে হয়ে যাই, চাঁদের আলোয় বসে একসাথে জোছনা মাখি, এটাও কি মিউটেশন!

অজিতবাবুকে একদিন সময় করে জিজ্ঞাসা করতে হবে। উনি বলবেন তো!

ছবিঃ তন্ময়

লোকটা

রুচিস্মিতা ঘোষ

রঞ্জনের আজ কিছু কাজ ছিল। ঠিক কাজ নয়, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা। তপন থাকে গড়িয়াতে। দীর্ঘদিন পর দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আড্ডা মারতে মারতে বেশ রাত হয়ে গেল।

বাস থেকে নেমে সে দেখল, মানুষজন ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। তবে কি কোনও গন্ডগোল? এদিক ওদিক তাকাল সে। কই, কোথাও কোনও গন্ডগোল নেই। এই যে মানুষের পায়ে এত ছলাৎ ছলাৎ, মুখে এদিকে ভয়ের লেশমাত্র নেই। বাস, ট্যাক্সি, অন্যান্য যানবাহন সব ঠিকঠাকই চলছে। সে ঠিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী, কিন্তু চারপাশের মানুষজনকে দেখে সে নিজের মধ্যেও কেমন একটা ছটফটানি টের পেল। তার মনে হল, তার মনের অতলে অনেকগুলো নাম না জানা পাখি এসে কিচকিচ শুরু করেছে।

রঞ্জন শান্ত প্রকৃতির, তার কোনও শত্রু-টত্রু নেই। এই ব্যস্ততা, উদ্বেগ তার ঠিক পছন্দ হল না। মা-র জন্য একটা ওষুধ কেনার ছিল। সে ভাবল আজই কিনবে, পরক্ষণেই ভাবল, কাল কিনলে কী হয়? তার এইসব ভাবনার মধ্যেই সে হঠাৎ দেখল চারদিক কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো দোকানগুলো সব বন্ধ হয়ে শহরটায় কেমন এক গ্রাম্য অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচলও কমতে কমতে এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না।

রঞ্জনের চশমা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেল। এই বৃষ্টির দিনে তো কুয়াশা থাকার কথা নয়। রাস্তার আলোগুলোও মনে হয় পাতলা নাইলনের কাপড় দিয়ে কেউ ঢেকে দিয়েছে। সে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছে আবার চোখে পরে নিল। সে এবার আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ কেমন ঘোলা রঙের। তারা দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে এল। তার ব্যাগে একটি ছাতা নিশ্চয়ই আছে। কারণ, রঞ্জন ঘর থেকে বেরোবার সময় মা অবশ্যই দেখে নেয় তার ব্যাগে ছাতা আছে কি না। আর না থাকলে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে একটা ছাতা এনে তার ব্যাগে ভরে দেয়। সে ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে দেখল ছাতাটা আছে। সে মাথার ওপর ছাতা খুলে ধরল।

তাহলে কি বৃষ্টির জন্য মানুষজন এত অস্থির হয়ে উঠেছিল? বৃষ্টির মাসে বৃষ্টি হবে, এ আর অস্বাভাবিক কী? রঞ্জন এই রহস্যের সমাধান করতে পারল না।

এখন বাস থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার পথে সে একদম একা। এটাও কি সম্ভব? সে একবার দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল। নাঃ! কেউ কোত্থাও নেই। এত অবাক লাগছে তার! কিন্তু আচমকাই সে দেখতে পেল, তার থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো! কোথা থেকে এল লোকটা! সে তো তখন থেকে তার আশেপাশে কোনও লোকজন আছে কি না তাই দেখে চলেছে। সে তো কাউকে আসতে দেখেনি। তার খুব ইচ্ছে হল সে লোকটার খুব কাছে গিয়ে দেখে সে মানুষটাকে চেনে কি না! তাহলে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। কিন্তু ছাতা দিয়ে লোকটা এমনভাবে তার মুখ ঢেকে রেখেছে যে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রঞ্জনের স্বভাবের সেই অদম্য কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। সে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা বোধহয় টের পেয়েছে। তখুনি কয়েক পা পিছিয়ে একটা ভাঙাবাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠল। এই ভাঙাবাড়ির মালিক কে রঞ্জন তা জানে না। অনেকদিন ধরে বাড়িটা এভাবেই পড়ে আছে। রঞ্জন একটু অবাক হল। লোকটা কি তাকে দেখে ভয় পেল? ভয় পাওয়ার মতো তো কিছু নেই। লোকটা এমন ভাব করছে যেন সে কিছুই দেখছে না। কিন্তু রঞ্জন আলবাত জানে লোকটাও তাকে লক্ষ করছে।

এ আবার কেমন অবস্থা! কলকাতা শহরে তো দাঙ্গা লাগেনি । ১৪৪ ধারাও জারি হয়নি। শুধু বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি পড়ছে। তাই বলে একজন লোক আর একজন লোককে দেখে ভয় পাবে! লোকটা কি ভাবছে রঞ্জনের মতিগতি ভালো নয়? সে তাকে খুন করবে? অবাক হবার কিছুই নেই। ভাবতেই পারে। আজকাল খুনোখুনি তো লেগেই আছে। রঞ্জন ঘড়ি দেখল। রাত এগারোটা। এমন কিছু রাত নয়। তবে বৃষ্টি আর নির্জন পরিবেশ রাতটাকে আরও গভীর করে তুলেছে। সে ভাবল নিকুচি করেছে। লোকটা কে, জেনে তার কী হবে! সে বরং জোরে জোরে পা চালিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। পরক্ষণেই ভাবল, লোকটাকে একা ফেলে সে চলে যাবে!

বৃষ্টি এত জোরে পড়ছে যে রঞ্জন ভিজে চুপসে গেছে। তার হাতঘড়ির কাঁচটা ঝাপসা হয়ে গেছে। চারদিকের নির্জনতা যেন বরফের মত ভারী। অথচ রঞ্জন যেতে পারছে না। এক জটিল পরিস্থিতি তাকে আটকে রেখেছে। লোকটার কথা ভুলতে পারছে না। লোকটার কি ঘরদোর কিছু নেই? সারারাত ছাতা মাথায়

এই ভাঙাবাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি লোকটার অন্য কোনও মতলব আছে? কারও আসার কথা তার সঙ্গে দেখা করার জন্য? অবৈধ কোনও লেনদেন?

রঞ্জন লোকটার সঙ্গে আলাপ করার জন্য কোনও অজুহাত খুঁজছিল। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ভাঙাবাড়িটার দিকে। একটু দূর থেকেই বলল, "ও দাদা, আপনার হাতে কি ঘড়ি আছে? এখন ক'টা বাজে বলতে পারেন?"

লোকটা তার হাতটা সামনে মেলে ধরল। সময় দেখে বলল, "সাড়ে এগারোটা।" বলেই চুপ করে গেল। রঞ্জন ভাবল, আচ্ছা লোক তো! রঞ্জনের মনে লোকটার সম্পর্কে এত প্রশ্ন জাগছে আর রঞ্জন সম্বন্ধে কি লোকটার মনে একটাও প্রশ্ন নেই? কিন্তু রঞ্জন নাছোড়বান্দা। জোর করে জিজ্ঞেস করে বসল, "আপনি যাবেন কোথায়?"

লোকটা প্রথমে জবাব দিল না। তারপর বলল, "নারকেল বাগান।"

"সে কি? সে তো অনেক দূর! যানবাহনও তো চলছে না। এতটা পথ আপনি হেঁটে হেঁটেই যাবেন?"

ঠিক সেই সময়ই আকাশ ফেটে বিদ্যুৎসহ এক ভয়ানক শব্দে বাজ পড়ল। রঞ্জন চমকে উঠল আর বিদ্যুতের সেই আলোর ঝলকানিতে দেখে ফেলল লোকটার মুখ। পুরুষমানুষের মুখে এমন মেয়েলি ভাব কেন?

এবার লোকটা নিজের থেকেই বলল রঞ্জনকে, "চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই।"

"আপনার নাম?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করল।

লোকটা হঠাৎ বিষম খেল। তারপর কাশতে থাকল। কাশি থামলে বলল, "আমার নাম মানস।"

এরপর তারা দু'জন হাঁটতে থাকল। বৃষ্টির জোর বেশ ভালোই। সঙ্গে হাওয়াও আছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে দু'জনকে।

রঞ্জন বলল, "বৃষ্টি যে থামছেই না। মা-র জন্য একটা ওষুধ কেনার ছিল। আজ আর হল না।"

লোকটা জবাবে কিছু বলল না। আবার সেই নীরবতা। অসহ্য লাগছে রঞ্জনের। অদ্ভুত তো লোকটা! প্রথমে তাকে দেখে ভয় পেল। আবার নিজেই যেচে তাকে এগিয়ে দিতে চাইল। এখন আবার কোনও কথাই বলছে না।

এদিকে রাত বাড়ছে। দু'জনেই ভিজছে। একসঙ্গে দু'জন লোক হাঁটছে অথচ কেউ কাউকে চেনে না। এই বৃষ্টি আর ঠান্ডার মধ্যে আর একটি মানুষের সান্নিধ্যে রঞ্জন কেমন যেন এক উষ্ণতা অনুভব করছে। এদিকে বৃষ্টির জলে জুতো ভারী হয়ে গেছে। প্যান্টের নিচের দিকটাও ভিজে ভারী। ওরা দু'জন ছাড়া রাস্তায় কোনও লোক চোখে পড়ছে না। নিঃসঙ্গ ভিজছে সব দোকানঘাট, ঘরবাড়ি। রাস্তার হলুদ আলোগুলো বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "এবার যেতে পারবেন তো?"

রঞ্জন বলল, "আর আপনি? নারকেল বাগান। সে তো এখনও অনেক দূর!"

রঞ্জনকে অবাক করে দিয়ে লোকটা বলে উঠল, "আমি তোকে মিথ্যে বলেছি রঞ্জন। আমি মানসীদি। মনে আছে তোর? দাসবাবুদের পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিলাম। আমি নারকেল বাগানে থাকি না। থাকি ওই ভাঙা পোড়ো বাড়িটায়। বলেই সে উলটোদিকে হাঁটা দিল।"

রঞ্জনের সমস্ত শরীর কাঁপছে ভয়ে আর উত্তেজনায়। দাসবাবুদের পুকুরের থেকে মানসীদির মৃতদেহ ওরা কয়েকজন ছেলে মিলে উদ্ধার করেছিল।

মানসীদি চলে যাওয়ার পর হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল। আশেপাশের বাড়িগুলোতে এখন আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে এখনও লোকজন জেগে আছে। সে স্তম্ভিত। একটু আগে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। তার পা সরছে না। সে দেখল দূর থেকে একটা মানুষ তারই দিকে হেঁটে আসছে। হাঁটার ধরনটা দেখেই রঞ্জন বুঝতে পারল, এত রাত হয়ে গেছে বলে তার বাবা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

গ্রাফিক্‌স্‌ ইন্দ্রশেখর

ফ্ল্যাট নম্বর ২০১

সত্যজিৎ দাশগুপ্ত

সন্ধে থেকে অনিদা এখনও পর্যন্ত চা খেয়েছে দু'কাপ। আর আমাকে দাবায় হারিয়েছে চারবার। পঞ্চম বোর্ড শুরু করেছি মিনিট তিনেক হয়েছে। এইমাত্র বিজুদা তিন নম্বর কাপটা দিয়ে গেল। আমি অবশ্য দু'কাপেই থেমে রইলাম। কারণ, একটু পরেই ইলিশমাছ আর খিচুড়ি খাব। বিজুদা চায়ের সাথে 'টা' হিসেবে মুগডাল ভাজা দিয়ে গেছিল। কালই অনিদার বাবা কিনে এনেছে। আমি তাতে ভাগ বসাতে এতটুকু লজ্জা করলাম না।

"এত খাস না। না হলে ইলিশমাছের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়েই থাকতে হবে। মুখে আর দিতে..."

অনিদার কথাটা হল না। কারণ, তার আগেই কলিংবেলটা বেজে উঠেছে। সাথে সাথে মুগডাল চিবোনো বন্ধ করে অনিদা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। যার মানে হল, এই অসময়ে আবার কে?

প্রশ্নটা যদিও অবান্তর নয়। রাত এখন মাত্র ন'টা। বৃষ্টি যেন কলকাতাকে ভাসিয়ে দিতে নেমেছে! যারা বৃষ্টি নেই, বৃষ্টি নেই বলে হা পিত্যেশ করে বেড়াচ্ছিল তারাই বৃষ্টি থামছে না বলে ছটপট করছে। যেমন বিজুদা। সেই থেকে খালি জানালার পর্দা সরিয়ে সরিয়ে দেখছে আর বলছে, "কইলকাতায় এইবার নিশ্চিত বন্যা!"

সন্ধে থেকে আমি অনিদার ফ্ল্যাটে। তাই মায়ের কোনও চিন্তা নেই। অনিদাদের পাশের ফ্ল্যাটটা আমাদের। জানি দরকার হলেই মা আমাকে টুক করে ডেকে নেবে। অবশ্য মায়ের এই কুছ পরোয়া নেহি গোছের আচরণের কারণ আমি জানি। সেই কখন থেকেই অনিদার মা আড্ডা জুড়েছে আমার মায়ের সাথে। ওদের আড্ডাটা যদিও বসেছে আমাদের ফ্ল্যাটে। আসলে ছেলেবেলার বান্ধবী বলে কথা। অনেকে তো ভাবে আমি আর অনিদা মাসতুতো ভাই। কেউ কেউ আবার আমাকে অনিদার নিজের ভাই বলেও জানে। একবার

তো একজন আমার নাম রণজয় বোস শুনে ব   লেছিলেন, "অনিরুদ্ধ সেন আপনার দাদা? কিন্তু সেন আর বোস, আলাদা টাইটেল কেন?"

অসময়ে দরজার বেলটা আমাদের খেলায় ব্যাঘাত ঘটালেও বিজুদা আমাদের উঠে গিয়ে দরজা খুলে কষ্ট করার হাত থেকে রেহাই দিল। আর সাথে সাথে হুড়মুড়িয়ে ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল পার্থদা। ওর অবস্থা দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অনিদা। সাথে আমিও।

"কী হল রে? এনি প্রবলেম?"

পার্থদা তখন বেদম হাঁপাচ্ছে। চোখদুটো কোন ও কারণে যেন কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। একে তো হাড় গিলগিলে চেহারা, তার ওপর একেবারে ভিজে চুপসে গেছে l ঠক ঠক করে কাঁপছিল বেচারা। ঘরে ঢোকার সময় দেখেছি ছাতাটা বাইরের দরজার গোড়ায় রেখে ঢুকতে l তবে এই বৃষ্টি কি ছাতায় মানে? রাস্তায় বেরোতে গেলে ভিজতেই হবে। গাব্বার পিচে বল বাউন্স করবেই। সেখানে টিকতে গেলে গায়ে বল খেতে হবে বইকি l

"আয়, ভেতরে আয়। " অনিদা পার্থদাকে ভেতরে নিয়ে এ   সে বিজুদাকে জল আনতে বলে দিল। নিজেকে সামলাতে প্রায় দশ মিনিট নিল পার্থদা। ও যখন জলের গ্লাসে শেষ চুমুক মারছে, তখন অনিদা ওর দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে খুব মোলায়েম গলায় জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে রে?"

কোনওরকমে দুটো ঢোঁক গিলে পার্থদা বলল, "খুন, অনিদা খুন!"

খুন! কথাটা শুনেই সোজা হয়ে দাঁড়াল অনিদা। কে খুন হল? কে করল? হঠাৎ করে খুনের কথা শুনে আমারও বুক ঢিপ ঢিপ শুরু করল।

পার্থদা তখন জানাল, যমুনা অ্যা পার্টমেন্টের ২০১ নম্বর ফ্ল্যাটে খুন হয়েছেন অ   জয় বর্মণ। কে খুন করেছে ও সেটা জানে না।

"অজয় বর্মণ? সেই ডাক্তার ভদ্রলোক?" জিজ্ঞাসা করল অনিদা।

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়ল পার্থদা।

এই ডাক্তার ভদ্রলোককে আমি চিনি। একবার জ্বর হওয়াতে ওঁর কাছে গেছিলাম। বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাট। মাঝারি উচ্চতায় রোগা ছিপছিপে গড়ন, লম্বাটে মুখে সরু সুতোর মতো গোঁফ। আর গায়ের রং শ্যামলা। এর বেশি আর ওঁর বর্ণনা দেবার মতো কিছু নেই। উনি যে ফ্ল্যাটে থাকেন, পার্থদা সেই বিল্ডিংয়েরই টপ ফ্লোরে থাকে। ও অনিদাকে কিন্তু ফোন করেই ডাকতে পারত। কেন নিজে এল, সেকথা অনিদা ওকে জিজ্ঞাসা করাতে ও জানাল, কোনও কারণে ফোনে পাচ্ছিল না। হতে পারে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কানেকশান প্রবলেম হচ্ছিল।

অনিদার জিজ্ঞাসা, "কখন খুন হলেন ভদ্রলোক?"

তাতে মাথা নেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পার্থদা বলল, "এই তো কিছুক্ষণ আগে l সন্ধে থেকেই আমার মাথাটা ব্যাথা করছিল। খুব গা গোলাচ্ছি ল। জ্বর জ্বর লাগছিল। তাই ভাবলাম , ডাক্তারকাকুর থেকে একটা ওষুধ নিয়ে আসি। কিন্তু ওঁর ফ্ল্যাটে ঢুকতেই দেখি..."

"কী দেখলি ঢুকে?"

"দেখি যে ডাক্তারকাকু ওঁর ঘরের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছেন! দেখেই মনে হল দেহে প্রাণ নেই।"

কথাটা শুনেই কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল অনিদার। তারপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে এবার বলল, "ঘরে তখন আর কেউ ছিল না?"

"হ্যাঁ, ছিল।" একবার নাক টেনে নিয়ে পার্থদা বলল, "চারজন ওঁর লাশটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।"

"চারজন?" শুনে মাথাটাকে পার্থদার দিকে সামান্য এগিয়ে দিয়ে প্রশ্নটাকে আরেকটু জোরালো করতে বলল, "কে কে?"

"ওঁর বাড়ির কাজের লোক অভয়দা, ওঁর কম্পাউন্ডার সুখেনদা, ওঁর এক ছাত্র আর ওঁর পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক।"

"হুম।" কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল অনিদা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আলতো করে চোখ জোড়া বুজে ঝট করে মাথাটা ডানদিকে হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল আমাকে কী করতে হবে। সাথে সাথে আমি সবকিছু গুছিয়ে নিলাম। অনিদা এর মধ্যে রেনকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে। জানি এখন আমাদের গন্তব্যস্থল যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট। তাই একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে আমিও রেনকোটটা গায়ে গলিয়ে নিলাম।

বৃষ্টির জোর এতটুকু কমেনি। আকাশ একেবারে ভেঙে প ড়তে চাইছে। বাইরে একটাও লোক নেই। রাস্তার লাইটগুলো জ্বললেও বৃষ্টির দাপটে দশ হাত দূরের জিনিসও আবছা দেখাচ্ছে। কানে শুধু ঝম ঝম শব্দ আসছে। মাঝে মাঝে গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ। রাস্তায় বেরিয়ে চারপাশটা দেখে ভয় করতে শুরু করল । কল কল, ছপ ছপ করে আরেকটা যে শব্দ কানে আসছিল ওটা পাশের আদি গঙ্গাটা র। ভয় হল সেটা না এবার

রাস্তায় উঠে আসে!

আমরা আমাদের হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের মেঘমালা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে সামনের গলিটা ধরলাম। গলিটার শেষেই হরিশ মুখার্জী রোড। সেখানেই যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট।

রাস্তার ধারেই একটা বস্তির পাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট। এই বৃষ্টির মধ্যেও বাইরে লোকজন জমে গেছে। একটা পুলিশের ভ্যানও চোখে প ড়ল। আমরা বিল্ডিং য়ের মেন গেট পেরিয়ে দু'পা এগিয়েছি, এমন সময় আমাদের পথ আটকে দাঁড়ালেন একজন হাবিলদার। অনিদা তখন ওঁকে বলল, "দেবাশিষ হালদার এসেছেন তো?"

অনিদার মুখে নিজের ওপরওয়ালার নাম শুনে মনে হয় একটু হড়কালেন হাবিলদার ভদ্রলোক। তবু ও ওঁর কপালে প্রশ্নের চিহ্ন দেখে অনিদা নীচ থেকেই ফোন করলেন দেবাশিষ হালদারকে। আসলে দেবাশিষ হালদার হলেন লোকাল থানার ওসি। অনিদার খুবই পরিচিত।

অনিদার ফোন আমাদের রাস্তা সাফ করে দিল। সোজা উঠে গেলাম দোতলায়। ডঃ বর্মণের দরজার সামনেও তখন লোকজনের ভিড়। বেশিরভাগ এই বিল্ডিং য়েরই। ভয়, কৌতূহল, উৎসাহ - একেকজনের মুখের ভাব একেকরকম। সবাই নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফিসফাস করে চলেছে।

অনিদার পরিচয় সবার জানা। তাই ওকে দেখেই সবাই রাস্তা ছেড়ে দিল। ফ্ল্যাটের বাইরের লম্বা ঘরটা ডঃ বর্মণ চেম্বার হিসেবে ব্যবহার করতেন। টেবিল, চেয়ার, ট্রলি সবই সাজানো রয়েছে ঘরটাতে। সামনে একটা কার্ডবোর্ড ফ্ল্যাটের অন্দরমহলকে বারমহলের থেকে আলাদা করেছে। টেবিলের ঠিক সামনেটাতে চিত হয়ে পরে আছেন ডঃ বর্মণ। মাথার নীচে চাপ চাপ রক্ত। চোখদুটো খোলা কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক। ঘরে ঢুকে অনিদা প্রথমেই মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে শুরু করল। মাথার পেছনদিকটা বেশ খুঁটিয়ে দেখে বলল, "কোন ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।"

পুলিশ অফিসার হলেও মিঃ হালদার একেবারে গোবেচারা মানুষ। অনিদা এই তদন্তে জড়িয়ে পড়াতে উনি যেন বেশ খুশিই হয়েছেন। অনিদা ঘরে ঢুকতে মনে হয়েছিল, ওর হেল্পটা যেন ভদ্রলোকের ভীষণ দরকার। এবার অনিদার কথা শুনে প্রায় নেচে উঠে বললেন, "যাক, খুনটা কী করে হয়েছে সেটা তো জানা গেল। কিন্তু অস্ত্রটা কোথায় সেটা এবার জানতে হবে।"

অনিদা তখনও মৃতদেহ পরীক্ষা করে চলেছে। মিঃ হালদারের কথা শুনে বলল, "সে তো হবেই।" তারপর ডঃ বর্মণের কপালের ডানদিকটা দেখিয়ে বলল, "কিন্তু তার আগে এটা দেখুন।"

অনিদার কথা শুনে মিঃ হালদারের মতো আমিও সাথে সাথে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়লাম।

"আঘাতের চিহ্ন মনে হচ্ছে?" বললেন মিঃ হালদার।

"কোথাও গুঁতো খেয়েছেন ভদ্রলোক।" বলল অনিদা।

আবিষ্কার করলাম, কপালের একটা ছোট্ট অংশ থেঁতলে ভেতর ঢুকে গেছে। জায়গাটা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে শুকিয়ে গেছে। অনিদা ততক্ষণে চেম্বারের প্রত্যেকটা অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। হাতে ওর আতস কাচ। আসলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস থেকে শুরু করে পেন ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা, পেন ড্রাইভ সবই নিয়ে এসেছিলাম আমরা। অবশ্য সব কেসেই নিয়ে যাই। পরীক্ষা করতে করতে অনিদা এবার টেবিলের সামনের একটা কোণে এসে থেমে গেল। আতস কাচটা সেটার একেবারে সামনে নিয়ে গিয়ে বলল, "এটা কী?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কীসের কথা বলছ?"

তাতে ও বলল, "রক্তের দাগ বলে মনে হচ্ছে। একেবারে তাজা।"

আতস কাচের মধ্য দিয়ে দেখে বুঝলাম, অনিদার সন্দেহ ঠিক। মাথাটা দু'বার সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মিঃ হালদারও অনিদার সাথে একমত।

এখানে রক্ত এল কী করে? প্রশ্ন টা করতে গিয়ে দেখি অনিদার ডান গাল বেয়ে একটা হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। আমি এবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে ও হাসিটা দু'গালে আরেকটু ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে ব্যাপারটা একটু আধটু ধরতে পারছি। লক্ষ করলাম, অনিদার কথাটা শুনে সুখেনদার গলার কাছটা কোনও একটা কারণে একবার ওঠানামা করল।

তাতে মিঃ হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ধরতে পারলে?"

অনিদা তখন কোনও একটা জিনিস দিয়ে আঘাত করার ভঙ্গী করে বলল, "মনে হয় ওঁকে কেউ একটা ভারী জিনিস দিয়ে মাথার পেছনদিকে আঘাত করে। সাথে সাথে উনি হুমড়ি খেয়ে পড়েন টেবিলের ওপর। মাথায় আঘাত লাগে ওঁর। তখুনি উনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে।" এবার চোখজোড়া সরু করে বলল, "হয়তো সাথে সাথে প্রাণ হারান ডাক্তারবাবু।"

এর মধ্যে অনিদার কথার মাঝে ডঃ বর্মণের ছাত্র আর কাজের লোক অভয়দা যে একবার করে চোখাচোখি করে নিল সেটা আমার নজর এড়াল না। জিনিসটা যে অনিদাও নজর করেছিল তা ও আমাকে

পরে বলেছিল। ব্যাপারটা কিন্তু আমাকে যথেষ্ট ভাবালো বটে। অনিদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কিছু বুঝতে পারলে?"

ভদ্রলোকের চোখ দেখে তো মনে হয় না উনি মারা যাবার আগে এতটুকু ভয় পেয়েছিলেন বা চমকেছিলেন।

অনিদার কথার মানে আমি জানি। তাই বললাম, "চেনাশোনা লোকই কি তাহলে এই কাজটা করেছে?"

"অন্তত নব্বই ভাগ নিশ্চিত।"

অনিদার কথাটা যেন আবার ধাক্কা মারল সুখেনদা, অভয়দা আর সেই ছাত্রকে। পাংশু মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওদের। ভাবলাম, ব্যাপারটা কী? এরা তিনজন মিলেই কি কান্ডটা করেছে? অনিদা এর মধ্যে ফ্ল্যাটের প্রতিটা ঘর ঘুরে দেখতে শুরু করেছে। আগেই বলেছি, ঢুকেই লম্বা ঘরটা ছিল ডঃ বর্মণের প্র্যাকটিসের ঘর। সেটা পেরোলে দুটো শোবার ঘর। সদর দরজায় তখনও বেশ ভিড়। এদের মধ্যে মাঝারি উচ্চতার পেটমোটা টাকমাথাওয়ালা একটা লোকের উৎসাহ যেন ছিল সবথেকে বেশি। একগুচ্ছ টেনশন নিয়ে ভদ্রলোক আমাদের পেছন পেছন ঘুরছিলেন। জিনিসটা বোধহয় বিরক্ত করছিল মিঃ হালদারকে। বেশ বিরক্তি নিয়ে উনি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন, "আপনি?"

সেই ভদ্রলোক তখন জোর করে মুখে একটা হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, "আমার নাম বিনয় লাহিড়ী।" তারপর আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, "পাশের ফ্ল্যাটেই থাকি।"

বিনয় লাহিড়ীর বিনয় মনে হয় না খুব একটা খুশি করল মিঃ হালদারকে। কারণ , উনি একই ভঙ্গিতে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পুলিশকে আপনিই খবর করেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

উত্তরটা শুনে অনিদা একবার ভদ্রলকের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ কী যেন দেখতে পেয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। জানালার সামনেই খাট। তার পাশে একটা ছোটো টুল আর তার ওপর একটা টেবিল- ল্যাম্প রয়েছে। টেবিলের ওপর রাখা বেশ কয়েকটা ডাক্তারি বই দেখে অনুমান করা যায় ডঃ বর্মণ বেশ রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। অনিদা তখন খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার ওপর পাতা গদিটাতে হাত বোলাতে বোলাতে কী যেন দেখছে। এবার ওই অবস্থাতেই আমাকে ডাকল, "জয়, একবার এদিকে আয়।"

"কী অনিদা?" আমি এগিয়ে গেলাম।

"দেখ, গদির কোনাটা কেমন ভিজে ভিজে। ও তখনও খাটের ওপর একইভাবে ঝুঁকে রয়েছে।"

সাথে সাথে আমিও ঝুঁকে পড়ে গদিটার ভেজা জায়গায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, "ভিজল কী করে? জল পড়েছিল নাকি?"

"মেঝেতেও তো জলের ঝাপটা। মনে তো হচ্ছে বৃষ্টির জল। হয়তো এই জানালা দিয়েই..." অনিদার কথায় আমি এবার মেঝের দিকে তাকালাম। মিঃ হালদারও তখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মেঝেটা দেখে মাথাটা বার দুয়েক সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে "হুম" বলে মুখ দিয়ে আওয়াজ করলেন।

অনিদা একবার সামনের জানালাটা খুলেই সাথে সাথে বন্ধ করে দিল। বাইরে তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ছাঁটটা জানালার দিকেই।

"জানালা দিয়েই মনে হয় জল ঢুকেছে।"

আমার কথা শুনে মাথা নেড়ে অনিদা বলল, "হুম, হতে পারে।"

মিঃ হালদার তখন বিনয় লাহিড়ীকে জেরা শুরু করেছেন। অনিদা এবার ওঁদের দিকে এগিয়ে গেল।

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, মিঃ লাহিড়ীকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?" অনিদার প্রশ্নটা মিঃ হালদারের উদ্দেশ্যে ছিল।

সাথে সাথে উনি অনিদাকে রাস্তা ছেড়ে দিলেন, "ওহ সিওর! ক্যারি অন! "

ভদ্রলোকের ভাবটা এমন যে 'আপনি করলে তো রক্ষা পাই মশাই'।

"আপনি কতদিন ধরে ডাক্তারবাবুকে চেনেন?" মিঃ লাহিড়ীকে প্রশ্ন করল অনিদা।

"প্রথম থেকেই। আমি আর ডাক্তারবাবু তো প্রায় একই সময়ে এখানে উঠি।" বললেন মিঃ লাহিড়ী। তারপর একটু চিন্তা করে একটা লম্বা 'হ্যাঁ' বলে বললেন, "তা আজ তিনবছর হয়ে গেল।"

"আপনি কখন ঘটনাটা জানতে পারেন?"

"কয়েকদিন আগে আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। আজ পাঁচদিনের কোর্স শেষ হতে রিপোর্ট দেব বলে এসেছিলাম। আর এসে দেখি এই ঘটনা! কী মর্মান্তিক! " বলতে বলতে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল মিঃ লাহিড়ীর।

"ঘরে তখন কে কে ছিল?"

"ওই তো, ওরা তিনজন।" বলে মিঃ লাহিড়ী কম্পাউন্ডার সুখেনদা, কাজের লোক অভয়দা আর ডাক্তারবাবুর ছাত্রর দিকে ইশারা করল। তারপর বলল, "এর পরই তো পার্থ আসে।"

"আর বিশেষ কিছু দেখেছিলেন?"

"ওই দৃশ্য দেখে আর কিছু দেখার মতো অবস্থায় ছিলাম না ভাই।"

"হুম। তা আপনি হঠাৎ এই সময় এখানে এলেন কেন?" এই প্রশ্নটা কেন জানি না অনিদা বেশ খেলিয়ে বলল।

ওর কথায় থতমত খেয়ে মিঃ লাহিড়ী বললেন, "মানে?"

অনিদা একই মেজাজে বলল, "আপনার কি এই ফ্ল্যাটে প্রায়ই যাতায়াত আছে?"

উত্তর দেবার সময় লক্ষ করলাম লাহিড়ী ভদ্রলোক জেরার চোটে বেশ দিশেহারা। বললেন, "না, আসলে ডাক্তারবাবু ছিলেন অকৃতদার। পরিবার বলতে কিছু নেই। মিশতেনও না তেমন কারও সাথে। তাই আমরাও শুধু দরকার পড়লেই..."

"দরকার পড়লে মানে কি অসুস্থ হলে?" মিঃ লাহিড়ীর কথার ওপর কথা চাপাল অনিদা।

তাতে ইতস্তত করে মিঃ লাহিড়ী বললেন, "ওই আর কী।" উত্তরটা দিতে গিয়ে ভদ্রলোক লজ্জা পেলেন নাকি ঢাকলেন বুঝলাম না।

অনিদা ওঁকে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?"

তখন ঘরে উপস্থিত সবার দিকে একবার নজর বুলিয়ে মিঃ লাহিড়ী বললেন, "কাকে সন্দেহ করব বলুন? ওঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তো কোনও আইডিয়াই নেই আমাদের। তবে..."

বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক কোনও একটা কথা বলতে গিয়েও বললেন না। সেটা গোপন করার জন্য কি না জানি না। অনিদা তখন ওঁর শেষ কথাটাকেই প্রশ্ন করে বলল, "তবে?"

দু'বার আমতা আমতা করে মিঃ লাহিড়ী বললেন, "ডাক্তারবাবু এমনিতে কিন্তু ছিলেন বেশ হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু কয়েকদিন আগে মর্নিং- ওয়াকে গিয়ে দেখি ওঁর মুখ কালো। কারণ জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটায় উনি কিছু বলতে চাইছিলেন না। শেষে জোরাজুরি করায় বললেন ওঁকে নাকি কেউ গত ছ' মাস ধরে ব্ল্যাকমেল করছিল।"

"ব্ল্যাকমেল! " কথাটা শুনেই কপালে গোটা কয়েক ভাঁজ পড়ে গেল অনিদার। মিঃ হালদারও ততক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। অস্বীকার করব না, তথ্যটা আমাকেও একটা ধাক্কা মারল। কানে এল ঘরে একটা হালকা গুঞ্জন উঠল, তারপর অনিদা সেদিকে তাকাতে সেটা মিলিয়ে গেল। অনিদা এবার মিঃ লাহিড়ীকে জিজ্ঞাসা করল, "কে ওঁকে ব্ল্যাকমেল করছিল? কেন করছিল?"

উনি ব্ল্যাকমেলারের পরিচয় দিতে পারলেন না। কারণ, ডঃ বর্মণ সেকথা ওঁকে বলেননি। জিজ্ঞাসা করতে উনি নাকি শুধু বলেছিলেন, " আমার অন্ন ধ্বংস করে আমাকেই ব্ল্যাকমেল!' ' এর বেশি আর কিছু না।

"হুম।" উত্তরটা শুনে কোনও একটা চিন্তায় ডুবে গেল অনিদা। বুঝতে পারছিলাম, সূত্র হাতে আসতে শুরু করেছে। অপরাধে কার হাত থাকতে পারে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। একটু আড়াল পেয়ে অনিদাকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলল, "চারজনের যে কেউ হতে পারে।"

বুঝলাম, ডঃ বর্মণের কাজের লোক অভয়দা, কম্পাউন্ডার সুখেনদা, ওঁর ছাত্র আর এই মিঃ লাহিড়ী, কাউকেই সন্দেহের তালিকার বাইরে রাখছে না ও । তবে মিঃ লাহিড়ীকে ডঃ বর্মণ যে কথাটা বলেছিলেন সেটাই ওকে বেশি ভাবাচ্ছে। অবশ্য যদি না লোকটা গল্প বানায়।

"ব্ল্যাকমেল করার কথা বলছ?" জিজ্ঞাসা করলাম ওকে।

"তার চেয়েও আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে। অন্ন ধ্বংস করা। কে ওঁর অন্ন ধ্বংস করছে আবার ক্ষতিও করার চেষ্টা করছে? কিন্তু সেই লোক ওঁকে ব্ল্যাকমেল করছে কেন?" গলার টোনই বলে দিল শেষ প্রশ্নটা অনিদা নিজেই নিজেকে করল।

অনিদা এবার বাকি তিনজনকে জেরা শুরু করল। জানতে পারলাম, খুনটা প্রথমে দেখেছিলেন কম্পাউন্ডার সুখেনদা। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই এই ভদ্রলোক কেমন যেন কথা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এনাকে আমি সেবার দেখেছিলাম। মানে যেবার আমার জ্বর হতে আমি ডঃ বর্মণের কাছে এসেছিলাম। চেহারাটা আহামরি কিছু না। কী করে মনে রাখব জিজ্ঞাসা করলে বলতে হয়, মোটা একটা গোঁফ আছে আর শরীরটা বেশ শক্তপোক্ত। মাজা গায়ের রং। উচ্চতা একটু বেঁটের দিকে। উনি বললেন, উনি বাড়ি যাবার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির দাপটের জন্য মাঝপথ থেকেই ফিরে আসেন।

"আপনি যখন বাড়ি যাবার জন্য রওনা দেন তখন ফ্ল্যাটে কে কে ছিল?" ওঁকে জিজ্ঞাসা করল অনিদা।

"অভয়দা আর স্যারের ছাত্র সমরজিৎ।" বললেন সুখেনদা।

অভয়দাকেও আমি আগেই দেখেছি। খুবই বেঁটে। পরনে পায়জামা আর ফতুয়া। মাথা ভর্তি কাঁচা পাকা চুল। তবে আমি সেদিন যখন দেখেছিলাম, তখন ওঁর মাথার চুলগুলো অনেকটা ঝাঁকড়া ছিল। হতে পারে এর মধ্যে কেটে ফেলেছেন। সামনে থেকে পেছনে একেবারে সমান মাপের। মানে আমরা যেটাকে বাটি ছাঁট বলি। কিন্তু ডঃ বর্মণের ছাত্রকে আমি এই প্রথমবার দেখলাম আর জানতে পারলাম ওর নাম সমরজিৎ।

অনিদা সুখেনদাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কতদূর গেছিলেন?"

"ওই বড়ো রাস্তার মোড় পর্যন্ত। খুব কষ্ট করে গেছিলাম। কিন্তু গাড়িঘোড়া না থাকায় ফিরে আসি।" বললেন সুখেনদা।

"এসে কী দেখলেন?"

"দরজা খোলা। স্যার ওইখানে, ওই মেঝেতে পড়ে আছেন।"

"হুম।" কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে অনিদা বলল, "কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?"

"না স্যার। কাকে সন্দেহ করব?"

"উনি কেমন লোক ছিলেন?"

"খুব শান্ত। হাসিখুশি আর সাধাসিধে। ভীষণ পরোপকারী ছিলেন। এই তো গত মাসেই আমাকে দু'হাজার টাকা দিয়ে বললেন, ছেলের পড়ার খরচ দিলাম। ফেরত দেবার নামও কোরো না।"

"কতদিন ওঁর আন্ডারে কাজ করছেন?"

একটু ভেবে সুখেনদা বলল, "তা প্রায় আড়াই বছর হবে।"

"শুনলাম, ওঁকে কেউ নাকি ব্ল্যাকমেল করছে? আপনি জানেন, কে?"

"না স্যার। এই ব্যাপারে কিছু জানি না।"

"আচ্ছা, আপনি তো বৃষ্টি কমার জন্য বাস- স্ট্যান্ডেই অপেক্ষা করতে পারতেন। হঠাৎ ফিরে এলেন যে?"

অনিদার তেরছা প্রশ্নে একটু ঘাবড়ালেন সুখেনদা। আমতা আমতা করে বললেন, "বৃষ্টি কখন থামবে বুঝতে পারছিলাম না। তাই ভাবলাম রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাই।"

"বাড়ি কোথায় আপনার?"

"অনেকদূর। ডানলপ।"

সুখেনদাকে ছুটি দেবার পর অনিদা এবার ডাকল ডঃ বর্মণের কাজের লোক অভয়দাকে। উনি সেই সময় পাড়ার কোনও একটা দোকানে খাবার কিনতে গেছিলেন। অভয়দা প্রায় পনেরবছর এ বাড়িতে কাজ করছেন। ওঁর কথা অনুযায়ী মালিক খুব ভালো লোক ছিলেন।

"তিনজনের মধ্যে আপনিই সবার শেষে ঘর ছেড়ে বেরোন?" অভয়দাকে জিজ্ঞাসা করল অনিদা।

"হ্যাঁ," বলে একটা ঢোঁক গিলল অভয়দা।

"তখন ডঃ বর্মণ কী করছিলেন?"

"নিজের চেয়ারে বসে কাজ করছিলেন।"

"রুগি দেখছিলেন?"

"না। আজ সাতটার পর আর রুগি আসেনি।"

"আপনি ফিরে এসে কী দেখলেন?"

"বাবু ওইখানটাতে মরে পড়ে আছেন। সামনে বেবাক দাঁড়িয়ে সুখেন।"

"সুখেনদা তো বাড়ি যেতে গিয়েও ফিরে এসেছিলেন । তা হঠাৎ ফিরে এলেন কেন ? কী মনে হয় আপনার?"

"বাইরে খুব বৃষ্টি ছিল তো, তাই।"

"উনি কি এর আগেও এই ফ্ল্যাটে রাতে থেকেছেন?"

"হ্যাঁ, বার দুয়েক।"

"পাড়ার খাবার দোকান তো বাস - স্ট্যান্ড থেকে অনেক কাছে। তবু ও আপনি সুখেনদার পরে ঘরে ফিরলেন কেন?"

"খাবার তৈরি হতে একটু সময় লেগেছিল বাবু।"

"আচ্ছা অভয়দা, আপনার বাবুর শোবার ঘরের জানালাটা কি বৃষ্টির সময় বন্ধ ছিল?"

অনিদার প্রশ্নে অভয়দা জোরে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ বাবু। বন্ধ ছিল।"

"ঠিক করে মনে করে বলুন।"

"আমার মনে আছে বাবু। বৃষ্টি নামতে আমিই জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।"

অভয়দা ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারে কোনও আলো দেখাতে পারলেন না। মালিক হিসেবে ডঃ বর্মণকে দশে এগারো দিলেন। ওঁদের পেছনে নাকি দেদার টাকা খরচ করতেন। এই গত মাসেই নাকি ওঁকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিলেন। কথাটা শুনে অনিদার কপালটা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কুঁচকে গেল।

চক্কর মারতে মারতে আমরা আবার ডঃ বর্মণের চেম্বারের টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজার সামনে তখনও লোকজনের ভিড়। মিঃ লাহিড়ীর উৎসাহ এতটুকু কমেনি। অবশ্য পার্থদা এখন ও আগের মতোই বিধ্বস্ত। বাইরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে দাপটটা একটু হলেও কমেছে। পুলিশ অফিসার মিঃ হালদারের মুখ থেকেও বেশি কিছু শোনা যায়নি। উনি শুধু অনিদার জেরা শুনছেন আর থেকে থেকে ঘাড় নাড়ছেন। আর মাঝে মাঝে মাথার টুপিটা সেট করে নিচ্ছেন।

অনিদা জেরা করতে করতে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভ্রূকুটি আর গম্ভীর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ও এখন কতটা চিন্তিত। এবার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা সিগারেটের প্যাকেট আবিষ্কার করল।

"সিগারেট কে খায় এ বাড়িতে?" জিজ্ঞাসা করল অনিদা।

“স্যার খেতেন।” এই প্রথম কথা বলল ডঃ বর্মণের ছাত্র সমরজিৎ। অনিদা ওকে তুমি বলেই সম্বোধন করল। দেখে মনে হচ্ছিল ছেলেটার বয়স খুব বেশি হলে পঁচিশ হবে। অনিদার থেকে কমপক্ষে পাঁচবছরের ছোটো। গায়ের রং বেশ ফর্সা। রোগা শরীরের গড়ন। উচ্চতা পাঁচ দশ মতো হবে। মানে অনিদার সমান । ভারতীয় হিসেবে যেটা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। লম্বাটে মুখে মোটা ফ্রেমের চশমা। কালো ট্রাউজারের ওপর হলুদ ফুলহাতা জামাটা না গোঁজা অবস্থায় প্রায় প্যান্টের পকেট অবধি এসে ঝুলছে। ছেলেটার জামার হাতার বোতামগুলো আটকানো। কিন্তু যেটা চোখে লাগল সেটা হল, কেন জানি না গলার বোতামটাও লাগিয়ে রেখেছে ছেলেটা।

“তুমিও বাইরে গেছিলে?”

উত্তরে মাথাটা দু’বার সামনের দিকে ঝোঁকাল সমরজিৎ।

“কেন?”

“স্যার আমাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছিলেন। ওই যে টেবিলের ওপর যে প্যাকেটটা দেখছেন, ওটা আমিই নিয়ে আসি।”

“তোমার এখানে যাতায়াতের কারণ?”

“আমি ওঁর ছাত্র। আমার ডাক্তারির ফাইনাল ইয়ার তো, তাই মাঝে মাঝেই কিছু কিছু জানতে আসতাম।”

“উনি পড়াতেন? মানে ওঁর ছাত্রছাত্রী ছিল?”

“না না। উনি আমার জেঠুর বন্ধু। সেই সূত্রেই আসতাম। এমনিতে ওঁর কোনও ছাত্রছাত্রী ছিল না।”

“স্যার হিসেবে উনি কেমন ছিলেন জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। কিন্তু মানুষ হিসেবে উনি কেমন ছিলেন বলে তোমার মনে হয়? কোনও শত্রু- টত্রু ছিল?”

“একেবারে মাই ডিয়ার টাইপের। এমন লোকের শত্রু থাকতেই পারে না। বয়সের এতটা ফারাক বুঝতেই দিতেন না। না হলে আমাকে সিগারেট আনতে পাঠান?”

“তা ঠিক।” মাথা নেড়ে অনিদা বলল, “এখানে কতদিন হল তোমার যাতায়াত?”

“নয় নয় করেও একবছর তো হবেই স্যার।“

“রোজ আস?”

“না। দরকার পড়লে তবেই। অবশ্য সপ্তাহে একবার আসতামই। তিনমাস পরেই পরীক্ষা।”

“তুমি যখন ঘর থেকে বেরিয়েছিলে তখন কি ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল?”

“না। হালকা ভেজানো ছিল।”

“দরজা খুলে চলে গেছিলে? যদি কিছু চুরি হয়ে যেত?”

“ঘরে অভয়দা ছিল। তাছাড়া ও যাবার সময় দরজা বন্ধ করে গেছিল।”

“বন্ধ মানে তালা দিয়ে?”

“না না। এমনিই লক করে। এই দরজাটা বাইরে থেকেও খোলা যায়। তাছাড়া চুরি হবে কী করে? স্যার তো তখন এ ঘরের চেয়ারে বসেই কাজ করছিলেন।”

“হুম।” কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে অনিদা বলল, “শুনেছি আজকাল ওঁকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছিল। এ ব্যাপারে তোমার কোনও আইডিয়া আছে?”

“না স্যার।”

সমরজিৎকে অনিদা আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করল না। গম্ভীর মুখে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পায়চারি করতে লাগল। মাঝে একবার দাঁড়াল। কী যেন ভাবল। দু’বার মাথা নাড়ল। তারপর আবার পায়চারি করতে লাগল। ঘরের মধ্যে একটা থমথমে আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। সমরজিৎ থেকে শুরু করে অভয়দা, সুখেনদা বা মিঃ লাহিড়ী, কারও মুখে কোনও রা নেই। মিঃ হালদারের চোখের মণিগুলো এতক্ষ ণ

অনিদার চলার সাথে সাথে ডাইনে বাঁয়ে নড়াচড়া করছিল। মাঝে অনিদা থামতে সেগুলোও একবার থামল। তারপর আবার নড়াচড়া শুরু করল। আসলে অনিদা কী করে সেটার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করছিলেন না ভদ্রলোক।

অনিদা এবার ডঃ বর্মণের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর টেবিলের ড্রয়ারগুলো খুলে দেখতে শুরু করল। শেষে একদম নীচের ড্রয়ার থেকে কিছু একটা পেয়ে সেটা যখন বের করে আনল তখন আবিষ্কার করলাম, ওর হাতে ধরা রয়েছে একটা ব্যাঙ্কের চেক - বই। ধীরে ধীরে এবার এবার চেক - বইয়ের প্রথম পাতাটা খুলল অনিদা। ওর চোখদুটো স্থির হয়ে ছিল চেক - বইটার ওপর। এবার একটা হালকা হাসি ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে। চোখজোড়া চিক চিক করে উঠল। কিন্তু কেন জানি মুহূর্তের মধ্যে মুখের ভাব বদলেও গেল আবার। কপালটা কুঁচকে গেল। মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। তারপর মাথাটা দু 'বার সামনের দিকে নেড়ে বলল, "ছি ছি, এমন কেউ করে? যে থালায় খেলি, সেই থালাতেই ফুটো করলি?"

কথাটা শুনে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আর বুঝতে বাকি রইল না যে অনিদা খুনির সন্ধান পেয়ে গেছে। তাই প্রচন্ড উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে করেছে খুনটা?"

মিঃ হালদার অবশ্য প্রথমে অনিদার কথার মানে ধরতে পারেননি। শেষে আমার কথা শুনে চেঁচিয়ে উঠলেন, "সে কি! তুমি কি খুনিকে ধরে ফেললে নাকি, অনিরুদ্ধ?"

"কেন? খুনিকে কি এত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলা উচিত ছিল না, নাকি?" হেসে বলল অনিদা।

"না মানে, তা না, আসলে এত তাড়াতাড়ি খুনির সন্ধান পেয়ে যাব, ভাবতেই পারিনি!"

আমরা খুনির পরিচয় জেনে গেছি জানতে পেরে ঘরে উপস্থিত সবার গুনগুনটা প্রায় চেঁচামেচিতে পরিণত হল। শেষে মিঃ হালদারের ধমকে সবাই থামল। আসলে সবার একটাই দাবি, যত তাড়াতাড়ি হয় খুনিকে ধরে দিতে হবে।

আমি তখন অপলকে মুখ হাঁ করে অনিদার দিকে তাকিয়ে আছি। অনিদা এবার আমার দিকে এগিয়ে এসে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে র চাপে আমার মুখটা বন্ধ করে দিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলল, "খুনটা করেছে এমন একজন যার কিনা এই ফ্ল্যাটে অবাধ যাতায়াত ছিল। প্রথম দিকে ডঃ বর্মণ তাকে পছন্দ করতেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা থেকে শুরু করে আর ও অনেকরকম সুবিধাই সে নিত ডঃ বর্মণের কাছ থেকে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তার সাথে শত্রুতা হতে শুরু করে ডঃ বর্মণের।"

"অজ্ঞাত কারণে?" জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হালদার।

"হ্যাঁ," মাথাটা একবার সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে অনিদা বলল, "সবকিছু ধরতে পারলেও খুনের কারণটা এখনও ধরতে পারিনি মিঃ হালদার। তবে সেই কারণেই ডঃ বর্মণকে..."

"ব্ল্যাকমেল হতে হচ্ছিল। " অনিদার কথাটা শেষ করলাম আমি। ও প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

"তার মানে ব্ল্যাকমেলারই ডাক্তারবাবুর খুনি?"

মাথা নেড়ে মিঃ হালদারের কথায় সম্মতি জানাল অনিদা। তারপর বলল, "আন্দাজ করা যায়, খুনির সাথে সম্পর্কের তিক্ততা একেবারে চরমসীমায় পৌঁছে গেছিল ডাক্তারবাবুর। একটা সু যোগ খুঁজছিল খুনি। আচমকা সেই সুযোগ আসে আজকে। শেষ রুগি চলে যাবার পর থেকে একেকজন একেক সময় ফ্ল্যাটে আসা যাওয়া করতে থাকে। এরই মধ্যে সবার চলে যাওয়া থেকে শুরু করে প্রথম লোকের ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই কাজ সারে সে। দরজায় যে হালকা লক ছিল সে তা জানত। তাই সটান ঘরে ঢুকে পড়ে সে। ডঃ বর্মণ অবশ্য কোনওভাবেই সেই মুহূর্তে এই বিপদের আশঙ্কা করতে পারেননি। কিন্তু খুনি শেষপর্যন্ত সেই সুযোগটা নেয়। কোনও একটা ভারী জিনিস দিয়ে আচমকা আঘাত করে ডঃ বর্মণের মাথার পেছনদিকে। শেষে শোবার ঘরের জানালা খুলে অস্ত্রটা ফেলে দেয় বিল্ডিং য়ের পেছনদিকের জলা জমিতে। সেই সময় বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। মনে হয়, জানালা খুলতে বৃষ্টির ছাঁট এসেই বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছিল।"

বুঝলাম, ওর শেষের কথাগুলো আমার উদ্দেশ্যেই বলা। এবার থামতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম , "তাহলে খুনি কি সবার অবর্তমানে বাইরে থেকে এসেছিল?"

"না, খুনি এই বিল্ডিংয়েই ছিল। নিজেকে সবার আড়ালে লুকিয়ে রেখে সুযোগের অপেক্ষা করছিল।"

"এতটা সিওর হচ্ছ কী করে?"

"খুনির জামাকাপড় শুকনো ছিল। এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বেরোলে জামা একটু হলেও তো ভিজবে।"

শুকনো জামাকাপড়ের কথা শুনে প্রথমেই আমার নজর গেল বিনয় লাহিড়ীর দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "খুনি কোথায় লুকিয়ে ছিল?"

"এমন একটা জায়গা সে বেছে নিয়েছিল যেখান থেকে ফ্ল্যাটের দরজাটা পরিষ্কার দেখা যায়।" কথাটা বলে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে অনিদা বলল, "হতে পারে সিঁড়িতে। দোতলা থেকে তিনতলায় ওঠার চাতালে।"

"কিন্তু খুনটা করল কে?"

"যে ব্ল্যাকমেল করছিল।"

"কে ব্ল্যাকমেল করছিল?"

"যাকে ডাক্তারবাবু টাকা দিচ্ছিলেন।"

আমার প্রতিটা প্রশ্ন গোল গোল করে ঘোরাচ্ছিল অনিদা। ওর হেঁয়ালির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি বললাম, "ওহ্, কাকে আবার ডাক্তারবাবু টাকা দিচ্ছিলেন?"

ও অবশ্য হেঁয়ালি থামাল না। বলল , "যার নাম চেক- বইয়ের ডিটেল পেজে লেখা আছে। যাকে ডঃ বর্মণ প্রতিমাসেই কুড়ি হাজার টাকার চেক কেটে দিতেন। জিনিসটা চলছিল গত ছ 'মাস ধরে। কিন্তু কেন? " প্রশ্নটা অনিদা নিজেই নিজেকে করল।

আমি তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই লোকটাই যে খুনি সে ব্যাপারে এতটা সিওর হচ্ছ কী করে? চেক- বইতে তার নাম লেখা আছে, তাই?"

"না, শুধুমাত্র সেই জন্য নয়। চেক - বইয়ে নাম দেখে আমি কেবল নিশ্চিত হলাম যে এই লোকটাই খুনি। আসল সন্দেহটা তৈরি হয়েছিল অন্য একটা তথ্য থেকে।"

"কোন তথ্য?" আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"সে জানল কী করে যে অভয়দা ফ্ল্যাট থেকে বেরনোর সময় গেটটা শুধুমাত্র টেনে লক করে গেছিল আর সেই সময় ডাক্তারবাবু নিজের চেয়ারে বসে কাজ করছিলেন?"

"মানে?" অনিদা কী বলতে চাইল বুঝতে পারলাম না।

ও তখন বলল, "আমার প্রশ্নটা কিন্তু সমরজিতের উদ্দেশ্যে করা।"

"তার মানে সমরজিতই..." মিঃ হালদার প্রশ্নটা শেষ করার আগেই সমরজিৎ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কী বলতে চাইছেন?"

এতক্ষণ চুপ করে ছিল সমরজিৎ। এবার ফোঁস করে উঠল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমিও এবার চমকে উঠলাম। অনিদা এবার সমরজিতকে বলল, "আমি কী বলতে চাইছি, তা তুমি ভালো করেই বুঝতে পারছ।"

সমরজিৎ এবার চেঁচিয়ে উঠে বলল, "আপনি কেন আমাকে খুনি বলে সাজাতে চাইছেন?"

তাতে অনিদা হেসে বলল, "সাজাতে চাইছি না তো, প্রমাণ করতে চাইছি।"

"ওহ অফিসার," সমরজিৎ এবার মিঃ হালদারের দিকে ফিরে বলল, "হি ইজ লাইং! হি ইজ আ বিগ লায়ার! আসল খুনিকে না ধরে..."

"শাট আপ!" সমরজিতকে এবার এক ধমকে থামিয়ে দিল অনিদা। এমন ধমক শুনে যে কোন ও পালোয়ানেরও বুক শুকিয়ে যেতে বাধ্য। অনিদা বলতে থাকল , "চেক- বইতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ডঃ বর্মণ তোমাকে গত ছ 'মাস ধরে কুড়ি হাজার টাকা করে দিয়ে আসছিলেন। বলতে পার, কী উপলক্ষ্যে? বুঝতে পারছি, এই মাস থেকে উনি টাকা দেওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই বেচারাকে তোমার রোষের সামনে পড়তে হয়েছিল। আর তাই শেষ পর্যন্ত ওঁকে খুন হতে হল।"

কয়েক মুহূর্ত থেমে দম নিল অনিদা। তারপর আবার বলতে শুরু করল , "আজ তোমার কাছে সেই সুযোগ এসেছিল। সিগারেট আনতে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির চাতালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলে। জানতে, সবাই বেরিয়ে গেলে বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। শেষে অভয়দা বেরোতে তুমি সোজা ঢুকে এলে স্যারের ফ্ল্যাটে। তোমাকে দেখে কোন ও সন্দেহ হয়নি ওঁর। কিন্তু সেই বিশ্বাস ভেঙে ওঁকে তুমি খুন করলে। তারপর অস্ত্রটা ফেলে দিলে বিল্ডিংয়ের পেছনদিকে। হয়তো খুন করে তুমি চলে যেতে। ফিরে আসতে সবাই ফিরে আসার পর। কিন্তু কোন ও কারণে সে সুযোগ না পাওয়াতে আবার সিঁড়ির চাতালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লে। এর মধ্যে অভয়দা ফিরে এলেন। আশ্চর্যজনকভাবে ফিরে এলেন সুখেনদাও। তাতে অবশ্য সুবিধেই হল তোমার। সবার শেষে ঘরে ঢোকার জন্য কেউ তোমাকে সন্দেহও করল না। কিন্তু দরজা লক করার কথা বলে আর ডঃ বর্মণের চেয়ারে বসে কাজ করার কথাটা বলেই সন্দেহটা নিজের দিকে টেনে আনলে।"

চাপের মুখে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না সমরজিৎ। সামনের চেয়ারটাতে ধপ করে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল ও। কয়েক সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলল, "হি ওয়াজ আ মার্ডারার, মিঃ সেন।"

"হোয়াট!" এবার চমকাবার পালা অনিদার।

তাতে সমরজিৎ বলল, "ইয়েস, মিঃ সেন। মাস দশেক আগে উনি এক কোটিপতি ব্যবসায়ীর কথামতো তার বাবাকে খুন করেছিলেন।"

"কেন?" সমরজিতের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল অনিদা। সাথে আমরাও।

"বাবা মারা গেলে তাঁর একশো কোটি টাকার সম্পত্তি পেতেন ওই ব্যবসায়ী। তাই উনি ডঃ বর্মণকে এই কাজটা অফার করেন। বদলে উনি ডঃ বর্মণকে পুরো সম্পত্তির এক পার্সেন্ট দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন। তাই চিকিৎসার নাম করে ডঃ বর্মণ ওই ব্যবসায়ীর বাবাকে বিষাক্ত ইনজেকশন দেন। শেষে ডেথ সার্টিফিকেটও লিখে দেন এই বলে যে, ইট ওয়াজ আ কেস অফ সিম্পল হার্ট অ্যাটাক! ব্যস, কেস সোজা জলের মতো পাস করে যায়। কিন্তু আমি এই ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছিলাম। আমাদের ফ্যামিলির অবস্থা ভালো না। ভাবলাম , এই সুযোগ। এই ফাঁকে কিছু কামিয়ে নিতে পারলে ক্ষতি কী? তাই ব্ল্যাকমেল করা শুরু করলাম খুনিটাকে। কিন্তু এই মাসে বেঁকে বসল শয়তানটা। বলতে শুরু করল, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওই ব্যবসায়ীকে সব বলে দেবে। লোকটা খুব পাওয়ারফুল। আমার লাইফ রিস্ক হতে পারত। ভাবলাম, কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। বিপদ আমার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছিল।"

"তাই শেষপর্যন্ত স্যারকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিলে।" কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অনিদা।

পুরো ফ্ল্যাটে তখন অস্বাভাবিকরকমের নীরবতা। মিঃ লাহিড়ী একাবারে থ বনে গেছেন। সুখেনদার মুখটাও একেবারে ফ্যাকাসে। এতক্ষণ এক মনে সমরজিতের কথাগুলো শুনছিলেন অভয়দা। এবার মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলে চোখ মুছলেন।

বাইরে এর মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে। অনিদারও কাজ শেষ। তাই আর বেশিক্ষ ণ অপেক্ষা করলাম না। এবার আমাদের ফেরার পালা। বেরোনোর সময় মিঃ হালদার অনিদাকে ধন্যবাদ দিলেন। অনিদা তখন ওঁকে বলল, "আমাকে যে কাজের জন্য ডাকা হয়েছিল, তা আমি করেছি মিঃ হালদার। খুনিকে আপনি অ্যারেস্ট করুন। কিন্তু এই ঘটনার সাথে আরও একজন অপরাধী জড়িয়ে আছে। তাকে আপনি অ্যারেস্ট করবেন কি না সেটা আপনিই জানেন।"

"সে কে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হালদার।

“সেই ব্যবসায়ী যে ডঃ বর্মণকে কাজে লাগিয়ে তাঁর বাবাকে হত্যা করিয়েছিলেন। সেদিনের সেই ঘটনাটা না ঘটলে আজকের এই ঘটনাটাও হত না মিঃ হালদার।”

ডঃ বর্মণের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

ছবিঃ শিমুল

রামনগরের খুনে

পার্থ মন্ডল

"সন্তুদা, বেশি পাকামো করে রিভার্স স্ট্রাইক করতে যাস না আগেরবারের মতো। সোজাসুজি স্ট্রাইক কর , এই বোর্ডেই গেম জিততে হবে। সন্ধে হয়ে আসছে।" আমাদের টু-মেম্বার ক্যারম টিমের স্বঘোষিত লিডার মিমি ইন্সট্রাকশন দিল আমাকে।

একদিকে আমি আর মিমি। আর অন্যদিকে বিল্টু আর বান্টি। খেলা জমে উঠেছে। আমাদের ২২-১৭ লিড। রেড পকেটস্থ করতে পারলে আর মাত্র দুটো কালো গুটি আটকে দিলে এই বোর্ডেই জিতে যাব আমরা।

ঘড়িতে চারটে পঁয়তাল্লিশ। শেষ ডিসেম্বরে দিনের শেষ সূর্যরশ্মি মিমির ঘরের পশ্চিমমুখো জানালা দিয়ে তেরছাভাবে পড়ছে বোর্ডের ওপরে। পড়ন্ত বিকেলে বিষ্ণুপুরে এই সময় ভালোই ঠান্ডা লাগে। টোটনদের ভিডিও হলে কাল দুপুরে মিঠুন-ধর্মেন্দ্রর ত্রিনেত্র দেখাবে। মাইকে তারস্বরে তারই প্রচার চলছে। মিমি আমার ছোটোমামার মেয়ে। আমার থেকে দু'বছরের ছোটো হলেও আমার ওপর তার যত খবরদারি। আমার ছোটোমামা বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের হেডমাস্টার।

বিল্টু মিমির সাথে এক ক্লাসেই পড়ে। পাশেই নেতাজি নগরে থাকে। গোপালগঞ্জের স্টেট ব্যাঙ্ক মোড়ে শান্তি মেডিক্যালের মালিক হলেন ওর বাবা , ছোটোমামার বাল্যবন্ধু। বান্টির বয়স আমার মতো, আমার মতোই ক্লাস নাইনে পড়ে। ওর জন্ম, ছোটোবেলা সব কুয়েতে। তবে শীতকালে ওর বিষ্ণুপুরে আসাটা বাঁধা। ওর বাবা ওখানে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করতেন। গেল বার সাদ্দাম যখন কুয়েত আক্রমণ করে, তখন ওর বাবা ফ্যামিলি নিয়ে কোনওমতে প্রাণ হাতে করে দেশে ফেরেন।

আমার মতো বান্টিরও বিষ্ণুপুরে মামারবাড়ি। আপাতত ও মায়ের সাথে মামার বাড়িতে আছে। মাস তিনেক হল ওর বাবা গুজরাটের হাজিরাতে চাকরি পেয়েছেন। এপ্রিলে নতুন সেশন আরম্ভ হলেই ওর বাবা ওদের নিয়ে যাবেন হাজিরাতে।

স্ট্রাইকটা মোটামুটি উতরালো। একটা গুটি ফেলতে পেরেছি। কিন্তু এদিকে বিল্টু পরপর চারটে কালো ফেলে দিয়েছে। মিমি রেড নিলেও কভার করতে পারেনি। বান্টির মতো আমারও প্রত্যেকবার শীতে বিষ্ণুপুরে আসাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। বাবা খড়্গপুরের রেলের চাকরির সুবাদে পাস পান। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা কোথাও না কোথাও বেড়াতে গেলেও শীতের ছুটিতে আমাকে কেউ অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না। লালবাঁধ, কালাচাঁদ মন্দির , যমুনা বাঁধ , দলমাদল, এ তো ছোটো থেকেই দেখে আসছি। নতুনত্ব কিছু নেই। আসলে এই সময় শীতে কয়েকটা দিন এই বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোটা মূল আকর্ষণ। ক্যারম

খেলা, আশেপাশে সাইকেল চালিয়ে ঘুরতে যাওয়া , বাস-স্ট্যান্ড মোড়ে মোনালিসা কেবিনের মোগলাই খাওয়া আর বিষ্ণুপুর মেলা দেখা। আর নীলাদ্রিকাকার বাড়িতে নিউ ইয়ার্স ইভে পিকনিক।

এই বোর্ডটা মনে হচ্ছে বিল্টুরাই পাবে। রেড ওদের জিম্মায়। আর মাত্র তিনটে গুটি। আমাদের সাদা এখনও ছ'টা বাকি। মিমি সুযোগ খুঁজছে কীভাবে খেলাটাকে ভন্ডুল করা যায়। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে। বাইরে প্রায় অন্ধকার। এই সময়ে নিচ থেকে ছোটোমামার গলার আওয়াজ এল, "মিমি, নীলাদ্রিকাকা এসেছে।"

এই সুযোগ। "যা-আ-আ-ই , " বলে মিমি উঠে পড়ল।

"কাল আবার হবে দুপুরে। আজ আর খেলব না।" মিমি দাঁড়িয়ে বলল।

"এই তোর দোষ মিমি। যেই দেখলি হারবি, অমনি পালিয়ে যাবার ফিকির খুঁজছিস।" বিল্টু স্বভাবতই রেগে গেল। আর তাছাড়া মিঠুনভক্ত বিল্টুকে কাল দুপুরে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

"বললাম তো , আজ আর খেলব না। " মিমির ওসব আর শোনার সময় নেই। "এখন চল নিচে, নীলাদ্রিকাকা যখন এসেছে তখন একটা ভালো গল্প শুনতে হবে।"

বিল্টুর মুখ দেখে মনে হল প্রস্তাবটা ওর খুব একটা অপছন্দ হয়নি।

নিচে ড্রয়িং-রুমে সিঙ্গল সোফাতে নীলাদ্রিকাকা বসেছেন। মা , ছোটোমামা ওনাকে কাকা বলে ডাকেন। ছোটো থেকে তা শুনে আমরাও কাকা বলে ডাকি। সাড়ে ছ 'ফুট লম্বা। এই ষাটেও চেহারাটা এখনও ছিপছিপে রেখেছেন। বনবিভাগে চাকরির দৌলতে ভারতবর্ষের প্রায় সব জঙ্গলে থাকার অভিজ্ঞতা ওনার। পুরো নাম নীলাদ্রিশেখর বসু। রাধামাধবপুরে সাড়ে তিন বিঘে জমির ওপর পেল্লায় একখানা বাগান আর একটা পুকুর নিয়ে তাঁর বাড়ি। ওনার দাদুর আমলে তৈরি। ওনার দাদু শশাঙ্কশেখর ছিলেন ইংরেজ আমলে ম্যাজিস্ট্রেট। আর ছিলেন সৌখিন শিকারি । নীলাদ্রিকাকার বাড়িতে একটা আস্ত বাস্কেটবল কোর্টের সাইজের হলঘর আছে শিকারের বিভিন্ন ট্রফিতে ঠাসা। রয়েল বেঙ্গলের মাথা , আস্ত স্টাফড চিতল, হাতির বড়ো দাঁত , চিতাবাঘের ছাল , কী নেই সেখানে। আর সব পুরনো আমলের বন্দুক। রাত্তিরে ওই ঘরে একা ঢুকতে ভয় লাগে আমার।

"কী, সন্তুবাবু? মনে আছে তো ? সামনের মঙ্গলবার ? তোরা সব সময়মতো চলে আসবি। এবারে কিন্তু স্পেশাল পিকনিক।"

"স্পেশাল কী জন্যে?" বিল্টু জিজ্ঞেস করল।

"স্পেশাল কেন নয় বিল্টুবাবু? এবারে তো আমাদের পিকনিক দশে পা দিল!"

পঞ্চাশে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে বিষ্ণুপুরে পাকাপাকি ফিরে আসবার পর প্রতিবার এই পিকনিক করেন নীলাদ্রিকাকা। ওনার ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকটা ফ্যামিলি নিমন্ত্রিত থাকে। বাগান এই সময় ফুল আর শীতের সবজিতে ভরে থাকে। শান বাঁধানো পুকুরে ঝকঝকে জল। ব্যাডমিন্টন খেলা। বড়োদের গল্প কান পেতে শোনা। আর সর্বোপরি নীলাদ্রিকাকার খাস কাজের লোক কচিদার হাতের রান্না।

"তাহলে স্পেশাল মেনু কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওটা সারপ্রাইজ থাক। তবে ঐদিন আমার একজন স্পেশাল গেস্ট থাকবে।"

"কে? লাবণ্যপিসিরা?" মিমি জিজ্ঞেস করল।

"ওরা তো প্রতিবার থাকে। স্পেশালের কী হল?" বান্টি বলে উঠল।

ঠিক বলেছে ও । নীলাদ্রিকাকার বোন লাবণ্যপ্রভা বাঁকুড়াতে ডাক্তার । ওনার স্বামীও ডাক্তার। ওঁদের একমাত্র মেয়ে সুদেষ্ণাদি কলকাতা থেকে এবারে ডাক্তারি পাস করে চন্ডিগড়ে এম . ডি. করতে গেছে। ওরা তো প্রতিবার আসে।

"ঠিক বলেছিস।" নীলাদ্রিকাকা বললেন।

"তবে কি মলয়কাকা?" মিমি ঘাড় ঘুরিয়ে নীলাদ্রিকাকাকে বলল।

মলয়াদ্রিশেখর হলেন নীলাদ্রিকাকার দাদা। বয়েসে বেশ খানিকটা বড়ো ওনার থেকে। ‘হলেন’ না বলে ‘ছিলেন’ বলা যায় হয়তো এত দিনে। আমরা কেন, আমার ছোটোমামাও কোনওদিন দেখেননি ওনাকে। খুব ছোটোবেলাতে আমার বড়োমামা আর মা ওনাকে দেখেছেন। মা’র কাছে গল্প শুনেছি যে উনি ক্লাস টুয়েলভের পরীক্ষার পর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যান। কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, কেউ বলে জাহাজের কুলি হয়ে বিলেতে চলে গেছেন।

নীলাদ্রিকাকার বাবা সৌম্যশেখর ছিলেন এখানকার রামানন্দ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। উনি শান্তশিষ্ট মানুষ হলেও তাঁর দুই ছেলে ঠাকুরদার গুণ পেয়েছিলেন। দু’জনেই নাকি ছোটো থেকে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছিলেন। সেই মলয়কাকাকে আর কেউ কোনওদিন দেখেনি। একটা মজার ব্যাপার ছিল। নীলাদ্রিকাকা আর মলয়কাকা, দু’জনের গালেই লাল জরুল আছে। একজনের কানের কাছে, আরেকজনের থুতনির পাশে। ওনাদের বাবা মজা করে বলতেন যে, একজন হারিয়ে গেলে আরেকজন ঠিক খুঁজে বের করে নেবে।

“দাদাকে কি আর দেখব এই জীবনে?” শুকনো হাসি দিয়ে বললেন নীলাদ্রিকাকা। “আমার চাকরি জীবনের শুরুর দিকে যখন রামনগরে ছিলাম, তখন আমার বস ছিলেন মিঃ ভার্মা। উনি এখন জবলপুরে থাকেন। উনি আর মিসেস ভার্মা আসছেন। ভার্মা-সায়েব কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে দীর্ঘদিন ছিলেন। তাই এবারে পিকনিকে জমিয়ে আফ্রিকার সিংহের গল্প শোনা যাবে।” চশমাটা খুলে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছতে মুছতে বললেন নীলাদ্রিকাকা।

এরই মধ্যে মা গরম শিঙাড়া আর খাস্তা কচুরি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। পেছন পেছন মামিমা। হাতে কেরোসিনের ল্যাম্প, তবে শিখাটা কমানো।

“নীলাদ্রিকাকা, ছোটন আজ চিকেন ডাকবাংলা রাঁধছে। রাত্রে খেয়ে যাবে কিন্তু। এই, তোরাও খেয়ে যাবি। আর ঘন্টাদুইয়ের মধ্যে সব রেডি হয়ে যাবে।” মায়ের কথায় বিল্টু-বান্টি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

“ছোটন রাঁধছে? তাহলে তো সন্ধেটা এখানেই কাটাতে হয়।” বলে উঠলেন নীলাদ্রিকাকা।

ছোটোমামা চিকেনটা ভালোই রাঁধেন। মামিমাও ভালো রান্না করেন। তবে বাড়িতে চিকেন এলেই ছোটোমামার ডাক পড়ে।

“ল্যাম্পটা রইল এখানে। কারেন্ট গেলে বাড়িয়ে নিবি।” মামিমা বললেন।

এই এক হয়েছে এখানে। সন্ধ্যে ছ’টায় যদি একবার কারেন্ট যায় তবে কম করে একটি ঘণ্টার ধাক্কা।

“ডিনারের এখনও দু’ঘন্টা বাকি। নীলাদ্রিকাকা, একটা গল্প বল।” আমি বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে মিমিও, “হ্যাঁ হ্যাঁ, গল্প,” বলে ধুয়ো তুলল।

“যীশুর জন্মদিনে তো পড়াশোনা লাটে উঠেছে মনে হচ্ছে। তা কীসের ফরমায়েশ আজ?”

জঙ্গলে কাজ করবার সুবাদে নীলাদ্রিকাকার গল্পের স্টক অগাধ। ওনার গল্প শুনেই আমাদের ভারতবর্ষের সব জঙ্গল ঘোরা হয়ে গেছে।

“আজ কিন্তু ভূতের গল্প শুনব। জংলি ভূতের গল্প। এই মিমি, তোর ভয় লাগবে না তো?” বিল্টু ফুট কাটল।

“উহ্, কী আমার সাহসী ছেলে রে! স্কুলের ছাদে বল উঠে গেলে আর কোনওদিন বলিস না, এই মিমি, ছাদের দরজার কাছে একটু দাঁড়াবি, আমি বলটা নিয়ে আসব?” ভেংচি কাটল মিমি।

"আচ্ছা আচ্ছা, নো ঝগড়া। কিন্তু বিল্টুবাবু, জঙ্গলে কি ভূত থাকে? স্বয়ং করবেট সায়েব তাঁর বইতে চুড়াইল, মানে পেত্নীর সঙ্গে তাঁর টক্করের কথা বলেছেন। তিনি তিনবার জঙ্গলে পেত্নীর হাড় হিম করা চিৎকার শুনেছেন। তৃতীয়বার তিনি সত্যিটা আবিষ্কার করলেন। দেখলেন, আওয়াজ আসছে গোল্ডেন ঈগল জাতীয় একটি পাখি থেকে। তখন ওনার ভুল ভাঙল। ঠিক আছে, ভূত না হলেও তোদের আমি বেশ একটা রোমাঞ্চকর জঙ্গলের গল্প শোনাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রাণটা যে চা-চা করছে মিমিসোনা? তা তোর এই চাচার প্রাণ বাঁচাতে একটু চায়ের অর্ডার দিয়ে আয় তো চট করে।" এই বলে নীলাদ্রিকাকা তাকালেন মিমির দিকে।

মিমি তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে একছুটে ফিরে এসে সোফায় আমার গা ঘেঁষে পা গুটিয়ে বসে পড়ল। আমেরিকা থেকে বড়োমামার পাঠানো ইলেকট্রিক কেটেলে চা বানাতে ঠিক দু'মিনিট লাগবে আর সেই দু'মিনিট নীলাদ্রিকাকা চুপচাপ বসে থাকবেন। যথাসময়ে চা এল, সঙ্গে একটু ডালমুট। নীলাদ্রিকাকা আরাম করে একটা টানা চুমুক দিলেন কাপে। আর কোটের বাটনটা খুলে দিলেন।

"শীতে দার্জিলিং চায়ের জুড়ি মেলা ভার, বুঝলি? তাহলে এবারে শুরু করি।" এই বলে নীলাদ্রিকাকা শুরু করলেন।

আমরাও একটু নড়েচড়ে বসলাম।

তখন সময়টা ষাটের দশকের শুরুর দিক। দেরাদুনে ট্রেনিং শেষে আমার বনবিভাগের চাকরির সাত-আট বছর কেটে গেছে। আমি তখন রামনগরে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। মানে তোরা যেটা করবেট ন্যাশনাল পার্ক বলে চিনিস, সেখানে। অশত্থ, শাল, আম এইসব গাছের ঘন জঙ্গল। সারাবছর সবুজ থাকে। আর প্রচুর পাখি। আমিও তখন সব পাখি চিনে উঠতে পারিনি।

রামনগরে তখন রামগঙ্গা নদীর ওপর ড্যাম তৈরি হচ্ছে। শান্ত জঙ্গলটা একটু ব্যস্ত। পশুপাখিরা একটু বিরক্ত। সরকারের অবিশ্যি বক্তব্য, এই ড্যাম হলে ফি-বছর বন্যা থেকে মুক্তি পাবে এই অঞ্চল। পশুপাখিদের পক্ষে সেটা মঙ্গলের। ড্যাম তৈরি হচ্ছে কালাগড়ে, সোনানদী যেখানে রামগঙ্গাতে মিশেছে, তার ঠিক উল্টোদিকে।

ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজার, সাধারণ শ্রমিক নিয়ে কালাগড় তখন সরগরম। আমারও থাকার জায়গা ছিল কালাগড়েই। তরাই এলাকা, শিবালিক হিমালয় স্পষ্ট দেখা যায়। শীতকালে সেখানে উত্তর থেকে আসা পাখিতে ভরে যায়। ভারি সুন্দর জায়গা। সেখানে সরল সাদাসিধে পাহাড়ি মানুষের বাস। বেশিরভাগ হল বকসাস প্রজাতির আদিবাসী। কিছু গুর্খাও আছে। অল্পস্বল্প চাষবাস , কাঠ কুড়িয়েই তাদের জীবন কাটে। কেউ কেউ আবার টুরিস্টদের সাহায্য করে কিছু রোজগার করে। ড্যামের সৌজন্যে এদের জীবিকার নতুন দিক খুলে গেছে। মহিলারা তখন ইঞ্জিনিয়ার , সুপারভাইজারদের জন্যে রান্না, বাসনমাজা এইসব কাজ নিতে আরম্ভ করে। কালাগড় , পাতেরপানি, ঢিকালা, জামুনগর, দোমুন্ডা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন আমার দায়িত্বে।

সবে বর্ষা গেছে। অক্টোবরের শেষ। আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ছে। মিঃ ভার্মা তখন একমাসের ছুটিতে। আমার অতিরিক্ত দায়িত্ব। তার ওপর আমার আন্ডারে জোস জিজু বলে যে প্রবেশনারি অফিসার ছিল , তাকে মায়ের মৃত্যুসংবাদে সুদূর কেরালা যেতে হয়েছে হঠাৎ। গোদের ওপর বিষফোঁড়া , চোরাশিকারিদের উৎপাতও বেড়েছে। হরিণ , বাঘ তো বটেই , এমনকি বাইসন, বুনোমোষও লোপাট হতে থাকল । একার দায়িত্বে এই বিশাল অঞ্চলটা টহল দেওয়া দুষ্কর হতে থাকল দিন কে দিন । তার ওপর এত বাইরের মানুষ এখন এই অঞ্চলে , কে ড্যামের শ্রমিক আর কে চোরাশিকারি , সেটা চিহ্নিত করাটাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় একটা কৌশলের অবলম্বন নেওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ছিল।

ভেবে দেখলাম, আমাকে ড্যামের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করে যৌথভাবে আলোচনার মাধ্যমে কৌশল ঠিক করতে হবে। একদিন সাইটে গিয়ে দেখা করলাম। মার্ক হল নামের এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। বোম্বের বান্দ্রাতে বাড়ি। খুব অমায়িক। আমরা প্রথমেই যেটা ঠিক করলাম সেটা হল, ওই অঞ্চলে সব বহিরাগত শ্রমিকদের একটা তালিকা বানাতে হবে। এটা খুব শক্ত কাজ নয় । কারণ, একটা প্রাথমিক তালিকা ছিলই। যেটা ছিল না সেটা হল ওই শ্রমিকদের সনাক্তকরণ তথ্য , মানে আইডেন্টিফিকেশন ডিটেল। যেহেতু তখন ওই সময়ে আর ওই অঞ্চলে ছবি তুলে রাখবার সুবিধে ছিল না , শ্রমিকদের চেহারার যথাসম্ভব লিখিত বিবরণ আর আঙুলের ছাপ রেকর্ড করবার কথা ভাবলাম আমরা। হল সায়েবকে বললাম উদ্দেশ্য যথাসম্ভব গোপন রাখতে। উনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন। দু 'তিনদিনের মধ্যে তিনি আমাকে জানালেন যে তালিকা বানানোর কাজ শেষ । এই মুহূর্তে ওখানে আড়াইশোর মতো শ্রমিক আছে।

সাধারণত আমি সকালবেলাটা রামনগরের অফিসে পেপার-ওয়ার্ক সারবার কাজে লাগাতাম। লাঞ্চের পর জোসকে নিয়ে টহলে বেরোতাম। আমার ড্রাইভার রামশরণ ঢিকালাতে থাকত । দিনের শেষে ও আমাকে কালাগড়ে নামিয়ে দিয়ে জিপ নিয়ে ঢিকালা চলে যেত।

নভেম্বরের শুরুর দিকের ঘটনা। মিঃ ভার্মার ছুটিতে যাবার একসপ্তাহও কাটেনি। একদিন সকালে ফরেস্ট-গার্ড এসে খবর দিল, মালানির কাছে একটা খুনের ঘটনা হয়েছে। জায়গাটা যেহেতু কোর এরিয়ার মধ্যে, প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব বনবিভাগের ওপরে। প্রয়োজন পড়লে বনবিভাগ পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। মিঃ ভার্মার অবর্তমানে আমাকেই যেতে হবে। রামশরণকে গাড়ি বের করতে বলে আমি অফিসের বাইরে পা ফেললাম। মিনিট চল্লিশের মধ্যে পৌঁছে যাব আশা করি। রামশরণ একটু জোরেই গাড়ি চালাল। মিনিট পঁয়তিরিশের মধ্যেই খুনের জায়গায় পৌঁছে গেলাম। দুটো ফরেস্ট-গার্ড ওখানে মোতায়েন। তাদের কাছে নির্দেশ ছিল মৃতদেহে হাত না দেবার। কিছু দূরে সাধারণ মানুষের জটলা। জটলার মধ্যে নারায়ণদাসকে দেখলাম। রামশরণের কাছে শুনেছি ঢিকালা থেকে কালাগড় যাবার পথে রামগঙ্গা নদীর কাছে কোনও এক পুরনো মন্দিরের কাছে উনি থাকেন। মাথায় লম্বা চুলের চূড়া , বুক ছাপিয়ে পেটের কাছ পর্যন্ত কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি আর গেরুয়া বসন। সবে হয়তো চল্লিশ পেরিয়েছেন। আর পাঁচটা সন্ন্যাসীর মতোই দেখতে। একটাই চোখে পড়ার মতো ব্যাপার। উনি আমার মতোই লম্বা, আর শরীরে যোগচর্চার ছাপ আছে। প্রায় বছর পাঁচেক হল ওনাকে এখানে দেখা যায় বলে জনশ্রুতি। এলাকার মানুষের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়।

কেউ বলে উনি হিমালয়ে ছিলেন, কেউ বলে উনি দক্ষিণ ভারতের মানুষ। আমি বিশেষ মাথা ঘামাইনি কোনওদিন।

মৃতদেহের ওপর মনোনিবেশ করলাম। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম। মধ্য তিরিশের এক যুবকের দেহ। গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা। একটু অদ্ভুতভাবে দেহটা পড়ে আছে। পা'দুটো হাঁটু থেকে মোড়ানো, অথচ ওপরের শরীরটা মাটির ওপরে শোয়ানো। মাথাটা ডানদিকে হেলানো। চোখদুটো বিস্ফারিত, মুখটা হাঁ হয়ে আছে - কোনও কিছু দেখে যেন প্রবল ভয়ের চিহ্ন। বাঁ কাঁধ আর গলা খুবলানো। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। এই বেলাতে সেই রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে, বুকে থাবার আঁচড়ের দাগ। আর হাতদুটো যেন নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের ওপরে রাখা। মনে হচ্ছে যেন লোকটা মৃত্যুর আগে হাঁটু গেড়ে হত্যাকারীর কাছে প্রাণভিক্ষা করছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাঘ বা লেপার্ডের আক্রমণে মৃত্যু। হয়তো বাঘটা সামনে থেকে সজোরে আক্রমণ করেছে লোকটার গলা লক্ষ্য করে। বর্ষা শেষে এ ক'দিন বৃষ্টি হয়নি, তাই আশেপাশে বাঘের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল না সেভাবে।

গ্রামের মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মৃতদেহটির সনাক্তকরণ সম্ভব হল না। বাইরের লোক হবে হয়তো। হল-সায়েবের সাথে যোগাযোগ করা হলে উনিও কোনও ক্লু দিতে পারলেন না। বোঝা গেল, এটা কোনও ড্যাম শ্রমিকের দেহ নয়। কোনও চোরাশিকারির দেহ নয়তো? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার মতো কোনও প্রমাণ হাতে নেই। মৃতদেহ পুলিশের কাছে চালানের বন্দোবস্ত করতে হল। একটা রিপোর্টও লিখতে হল।

দিন দুয়েক কাটল। চোরাশিকারিদের উপদ্রব আরও বেড়েছে। সাধারণ ব্যস্ততায় এই খুনের ঘটনা ভুলেও গেলাম। তারপর আবার একদিন সকালে খবর পেলাম দোমুণ্ডার কাছে খুনের ঘটনা। খুনের প্যাটার্নটা সেই এক। পা মুড়ে পড়ে থাকা দেহ। ঘাড়ের কাছটা খুবলানো, বুকে আঁচড়। এবারে হাতটা উর্ধ্ববাহু হয়ে মাটির ওপরে মাথার দু'পাশে ছড়িয়ে আছে। তবে এবারে দেহটির পরনে ফরেস্ট-গার্ডের মতো খাকি পোশাক। এবারেও সনাক্তকরণের চেষ্টা বিফলে গেল। স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস ফল করে দেহটি পুলিশে চালান করা হল।

এর পরের আঠেরো-কুড়ি দিন ছিল দুর্বিষহ। আজ ঝিরনা, কাল পাতেরপানি, পরেরদিন গারিজা, একের পর এক মৃতদেহ। সেই একভাবে দেহ পড়ে থাকা, মৃত্যুর আপাত কারণও সেই এক। এইভাবে আটটা মানুষের প্রাণ গেল। ব্যাপারটা এবারে একটু সিরিয়াস দিকে টার্ন নিল। ওপরওলার নজরেও এল ঘটনাগুলো। আমাকে বলা হল পুলিশের সাথে যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে। কারণ, সব দেহ কোর এরিয়াতে পাওয়া যায়নি। সাধারণ মানুষের মনে যথেষ্ট প্যানিক তৈরি হয়েছে।

শেষ যে ঘটনাটা ঘটল, অন্যবারের মতো সেখানেও নারায়ণদাসকে দেখলাম। নারায়ণদাস আমাকে দেখে বললেন, "বেটা, সব লোগ ডরে হুয়ে হ্যায়। ম্যায়নে সবসে বাত কি হ্যায়। মুঝে এক চিজ সাফ নজর আ রহী হ্যায়। লোগোকো ওহি বাত সমঝানে কি কোশিশ ভি কর রহা হুঁ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ক্যায়া?"

তো উনি বললেন, "ভলে লোগো কি মওত ইস তরহা নহি হো সকতি হ্যায়। ইন লোগোকো আপনে করমো কা ফল ভুগতনা পড় রহা হ্যায়।"

আমি বললাম, "ইয়ে আপ নিশ্চিত রূপ সে ক্যায়সে বোল সকতে হ্যায়?"

প্রত্যুত্তরে উনি বললেন, "ধীরে ধীরে আপ ভি সমঝ যাও গে। লেকিন মেরে সমঝানে পর ইহাঁ কে লোগো কি আপকে উপর বড়তে হুই দাবাও কম হো যায়েঙ্গে, অওর আপ ভি আরামসে ইয়ে ঘটনাও কি চুনৌতি দে সকো গে।"

আমি ভেবে দেখলাম, সাধুবাবা মন্দ বলেননি।

"অওর এক বাত। আপ সাচমুচ ইয়ে বাতাইয়ে, পিছলে দস-পনদরাহ দিনো সে অবৈধ শিকার কে ঘটনায়ে কম হুয়ে কি নহি?"

সাধুবাবার সাথে চোখাচোখি হল। আমি মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে মনে সম্মত হলাম।

এরপর কয়েকটা দিন নির্বিঘ্নেই কাটল। ভার্মা সায়েব কাজে জয়েন করেছেন। খুনের ব্যাপারে আমার তদন্তের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। আমার কাছে সবকিছু শুনে আর ফরেস্ট-গার্ডদের সাথে কথা বলে ওনার ধারণা জন্মাল যে এই মৃত্যুগুলো সাধারণ মানুষখেকো বাঘের আক্রমণে হয়নি। প্রথম কথা, বাঘ মানুষখেকো হয় যখন তার বয়সে শক্তি কমে যায়। আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী সে ধরনের বাঘ এ জঙ্গলে এই মুহূর্তে অপ্রতুল। দ্বিতীয় কথা, বাঘ একদিনেই মানুষখেকো হয় না। প্রথমে সে আশেপাশে বসতি এলাকার গবাদিপশু ধরবার চেষ্টা করবে। আশেপাশে বসতি এলাকায় কোনও গবাদিপশু হারিয়ে যাবার ঘটনা রিপোর্ট হয়নি। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হল, মানুষগুলো শুধু খুনই হয়েছে। বাঘে ওই মানুষগুলোর মাংস খেয়েছে, এটা একেবারেই মনে হয়নি। আমার লাইন অফ ইনভেস্টিগেশনে উনি একটু অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু আরেকদিকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা, সেটা হল কী, চোরাশিকার একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এই একটা ব্যাপার আমাদের সকলকে স্বস্তি দিয়েছে।

নভেম্বরের প্রায় শেষদিক। ঠান্ডা সেবারে ভালোই। এক বিকেলে আমি রুটিন টহলের পর ফিরছি। খবর পাওয়া গেছে জোস আর দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। আমি তাই একাই আছি। সঙ্গে ড্রাইভার রামশরণ। সে জানাল যে ওর বিবির আগেররাত থেকে তেজ বুখার। ওকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি বললাম যে ওকে আমি ঢিকালাতে ওর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে নিজেই জিপ চালিয়ে কালাগড়ে ফিরে আসব। রামশরণ বেশ কয়েকবার, "অ্যায়সা ক্যায়সে হোগা," বলল, তারপর দুঃখপ্রকাশ করল। আমি ওকে বললাম কিছু না ভাবতে এই ব্যাপারে। ঢিকালা থেকে রামগঙ্গার সমান্তরালে জংলি রাস্তা দক্ষিণে চলে গেছে কালাগড়ের দিকে। মাত্র তো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ।

ঢিকালাতে রামশরণকে নামিয়ে দিয়ে আমি এগিয়ে পড়লাম। জঙ্গলে সন্ধে একটু তাড়াতড়ি নামে। তার ওপরে শীতের শুরু। শালগাছের ফাঁক দিয়ে রামগঙ্গার ওপার থেকে পশ্চিমে হেলে যাওয়া সূর্য মৃদু উত্তুরে হওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে জংলি রাস্তার ওপরে আলোছায়ার খেলা খেলছে। হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলাম। একটা জায়গায় রাস্তা রামগঙ্গা থেকে অনেকটা বাঁ-দিকে সরে গেছে। রাস্তা আর রামগঙ্গার মধ্যে একটা অগভীর ট্রেঞ্চ আছে। শুনেছি যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইংরেজরা গুর্খাদের এলাকাছাড়া করবার জন্যে তেহারি রাজাদের জন্যে এই ট্রেঞ্চটা বানিয়ে দিয়েছিল। সন্ধের মুখে এখন বনের জন্তুরা ওখানে জল খেতে আসে। ঐদিন ওই ট্রেঞ্চে তখনও কোনও জানোয়ার চোখে পড়ল না। দিনের ওই সময়ে পাখির ডাক খুব শোনা যায়। একটু খেয়াল করে দেখলাম, তখন পাখির ডাক বিশেষ শোনা যাচ্ছিল না। হয়তো বাঘ এসেছে জল খেতে। গাড়ি চালাতে চালাতে একটু সাবধানী দৃষ্টি রাখলাম চারপাশে। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম ট্রেঞ্চে একটা বাঘ জলে শরীর ডুবিয়ে বসে আছে। বেশ কয়েকবার মাথা ডোবাল জলে, আর তারপর শরীরের অর্ধেক জল থেকে বের করে খুব জোরে দু'পাশে ঝাঁকাল শরীরটা। চারপাশে জল ছিটিয়ে পড়ল। তারপর অলস পায়ে ধীরে ধীরে জল থেকে তীরে উঠে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিজেকে শুকিয়ে নিতে থাকল বাঘটা। বেশ হৃষ্টপুষ্ট যুবক রয়েল বেঙ্গল। ঝকঝকে রং। সূর্যের শেষ আলোটুকু শুষে নিতে থাকল তার উজ্জ্বল শরীর। ট্রেঞ্চের জলে তার প্রতিফলন প্রায় দুশো মিটার দূর থেকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আমি জিপটা আগেই থামিয়েছিলাম বাঘের স্নান দেখবার জন্যে। এবারে আস্তে আস্তে ম্যানুভার করলাম, ইঞ্জিন বন্ধ করিনি। হাফ মাইল গেলে বাঁ-দিকে একটা সুঁড়িপথ চলে গেছে ট্রেঞ্চের দিকে। ঐটা পেরিয়ে গেলে আরও পনেরো মিনিটের রাস্তা কালাগড়।

অনেকক্ষণ একটানা বলে নীলাদ্রিকাকা একটু থামলেন। ঠিক তখুনি চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ছোটোমামা। জানেন যে নীলাদ্রিকাকার এবারে চা পানের বিরতির সময় হয়ে গেছে।

"মাংস রান্না কতদূর এগোলো হে ছোটন?" চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে নীলাদ্রিকাকা জিজ্ঞেস করলেন।

"হয়ে এসেছে। এরপর প্রত্যুষা ডাল, আলুভাজা আর চাটনি বানাবে।" প্রত্যুষা আমার মামিমা।

"যীশুঠাকুরের জন্মদিনে তো টানটান আয়োজন হে!"

"গোপালের রসগোল্লা উনুন থেকে নামল বলে। একটু পরে গিয়ে নিয়ে আসব। শেষপাতে কয়েকটা গরম রসগোল্লা হজমে সাহায্য করবে।"

"উফ্, বাবা! তুমি এবারে যাবে? খাবার আগে গল্পটা শেষ হতে হবে তো!" মিমি বলে উঠল।

"কীসের গল্প চলছে আজ?" ছোটোমামা জিজ্ঞেস করলেন।

"সেটা তো এখনও বুঝতে পারছি না। ডিটেকটিভ হতে পারে , অশরীরী আত্মার হতে পারে, আবার বাঘ-শিকারেরও হতে পারে। " বিল্টু বলল।

"হা হা হা... তাহলে আমার গল্পে রহস্যটা এখনও আছে। কী বলিস ? তাহলে চল , বাকিটা বলে ফেলি।"

"গল্প বলা শেষ হলে তোমাকে স্যালাড কাটার দায়িত্ব দেব নীলাদ্রিকাকা। " এই বলে ছোটোমামা নীলাদ্রিকাকার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘর ছাড়লেন।

"তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম বান্টিবাবু?"

"ওই তো , বাঘের স্নান দেখে তুমি আবার কালাগড়ের রাস্তা ধরলে।" বান্টি বলল।

"হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম...

যে সুঁড়িপথটা ট্রেঞ্চের দিকে চলে গেছে, তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কৌতূহলবশত ঘাড় ঘুড়িয়ে ট্রেঞ্চের দিকে তাকালাম। দেখি , নারায়ণদাস সুঁড়িপথ ধরে ট্রেঞ্চের দিক থেকে হেঁটে ফিরছেন। দেখে বোঝা গেল উনি স্নান করে ফিরছেন। হাতে কমণ্ডলু। আমি অবাক চোখে ওনার আসার পথে তাকিয়ে থাকলাম। জীপ থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। অপেক্ষা করতে থাকলাম ওনার জন্যে। উনি কাছে আসতেই ওনাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠলাম , "স্বামীজী, ইস ওয়ক্ত আপকা ইস তরহ বেফিকর ঘুমনা ঠিক নহি হ্যায়। আপকো তো কুছ দিন পহলে কে ঘটনাওঁকে বারে মে সব কুছ মালুম হ্যায়।"

"বেটা, ম্যায় এক সাধু হুঁ। মেরে প্রাণ খোনে কা ডর তো বিলকুল নহি হ্যায়।"

আমি এই উত্তরই প্রত্যাশা করেছিলাম। "লেকিন আপ কি জান জানে সে মামলা অওর গম্ভীর হো জায়েগা। আপকো পতা হ্যায় , উস খাড়ি মে ম্যায়নে থোড়ি দের পহলে এক শের কো নহাতে হুয়ে দেখা হৈ?"

দেখলাম, সাধুবাবার চুলদাড়ি থেকে তখনও জল ঝরছে। পরনের গেরুয়াও ভিজে। "বেটা, ভলা কাম করনে কে লিয়ে পহলে তো সাহস কা হোনা জরুরি হৈ।"

আমি সামান্য হলেও মেজাজ হারালাম , "ম্যায় উৎসুক হুঁ ইয়ে জান নে কে লিয়ে কি , আপ কৌন সা ভলা কাম করনে কে লিয়ে ইস ওয়ক্ত উস তরফ গয়ে থে।"

স্মিত হেসে নারায়ণদাস উত্তর করলেন, "বেটা, মেরা প্রভু কা সায়ংকালীন সেবা কা সময় হো গয়া হ্যায়। অগর অওর কুছ সময় বিতা সকতে হো তো মেরে সাথ আও। বাস, ইসি ঝাড়ি কে পিছে হি মেরা ঘর হ্যায়।"

আমি গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে ওনাকে অনুসরণ করলাম।

সাধুবাবার খড় দিয়ে ছাওয়া ছোটো কুটিরটি পুরনো ভাঙা একটা শিবমন্দিরের গায়ে। উনি আমাকে উঠোনে একটা পিঁড়ি পেতে দিলেন বসবার জন্যে। তারপর ভেতরে গেলেন। খোলা দরজা দিয়ে ভেতর থেকে প্রদীপের আলো বাইরে আসছে। আমি না বসে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে। খেয়াল করে দেখলাম, এখন আবার পাখিদের কলরব কানে এল। খুব কাছে বোধহয় একটা ধনেশপাখি আছে। একটানা ট-র-র-র ডাক কানে এল। হঠাৎ আমার মনে হল, এই নারায়ণদাস কে? কোথা থেকে এসেছেন? এর সঙ্গে আমার দেখা বাঘের বা এতগুলো ঘটে যাওয়া খুনের কি কোনও যোগসূত্র আছে?

একটু পরে নারায়ণদাস বাইরে এলেন। হাতে একটা কলা নিয়ে। আমার হাতে দিয়ে বললেন, "বেটা, পহলি বার আপ মেরে কুটির মে পধারে, অতিথি নারায়ণসম হোতা হ্যায়। ইয়ে মেরে প্রভু কা প্রসাদ হ্যায়।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "আপ থোড়ে সে চিন্তিত লগ রহে হ্যায়। লাগতা হ্যায় আপকে মন মে কুছ পহেলি, কুছ দুবিধায়ে হ্যায়।"

আমি ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ধীরে ধীরে, "আপ হ্যায় কৌন? কাহাঁ সে আয়ে হ্যায়? ইধর আপ কিস কারণ রহতে হ্যায়?"

আমার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে উনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "বেটা, আপ কি হিন্দি সুন কর মুঝে লাগতা হ্যায় আপ বঙ্গাল সে আয়ে হ্যায়। আমিও কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ।"

সেই সময়েই একটা ময়ূরের তীক্ষ্ণ চিৎকারে, নাকি নারায়ণদাসের সঠিক উচ্চারণে বাংলা শুনে, আমি ভীষণ চমকে গেলাম। কারণ, নারায়ণদাসের হিন্দি শুনে কখনওই ওনাকে বাঙালি বলে মনে হয়নি।

"আপনাকে কিছু বলব, কিছু আপনাকে নিজে বুঝে নিতে হবে।" নারায়ণদাস আবার বললেন, "তার আগে বলুন, এত ধরনের সরকারি চাকরি থাকতে আপনি বাড়ি থেকে এত দূরে জঙ্গলে কাজ নিলেন কেন?"

"কারণ, আমি ছোটো থেকেই চাইতাম আমার পেশা যেন রোমাঞ্চকর হয়।"

"সে তো পুলিশের কাজেও রোমাঞ্চ আছে। বনবিভাগে কাজ নিলেন কেন?"

"আমার মনে হত আমার পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের জন্যে প্রকৃতির কাছে যে ঋণ আছে, তা শোধ করবার দায়িত্ব আমার। আমার দাদু ছিলেন নামকরা শিকারি। এককালে প্রচুর প্রাণীহত্যা করেছেন নিছক বিনোদনের জন্যে।"

"ঠিক তাই। মানবজন্ম নিয়ে আমাদের আত্মা এই ধরাধামে আসবার আগে ঈশ্বরের কাছে তার পারমার্থিক ধন গচ্ছিত রেখে আসে। সেই সম্পদের তুল্য ভালো কাজ না করতে পারলে বারে বারে এখানে ফিরে আসতে হবে গচ্ছিত ধন ফেরত পাবার জন্যে। আমি আপনাকে আমার পূর্বজীবনের কথা বলতে পারব না, আমার গুরুর নিষেধ। আমি হিমালয়ে দীর্ঘদিন কৃচ্ছ্রসাধন করেছি, তপস্যা করেছি। আমার মনে হল, এভাবে শুধু ঈশ্বরচিন্তা করে সময় নষ্ট না করে এই পৃথিবীর জন্যে কিছু করা উচিত। তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একদিন এখানে এসে পড়লাম। দেখি, পাপে ভরে গেছে এই জঙ্গল। এককালে মানুষ জানোয়ার মারত প্রতিপত্তি দেখানোর জন্যে, বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে বা বিনোদনের জন্যে। আর আজ তার পয়সার লোভ। এই মহামূল্যবান প্রাণীগুলোর চামড়া, দাঁত, হাড়, শিং মোটা টাকায় চালান হয়ে যাচ্ছে ভিনদেশে। সরকারের একার ক্ষমতা কোথায় চোরাশিকারিদের রুখবার?"

"আর তাই আপনি ঠিক করলেন তপস্যাবলে রাত্রে বাঘ হয়ে চোরাশিকারিদের শাস্তি দেবেন?" আমার গলায় কৌতুকের আভাস স্পষ্ট।

"আপনার অনুমান সঠিক হতেই পারে। আবার এও হতে পারে, আমি যোগবলে একটা বাঘবাহিনীকে পোষ মানিয়েছি।" এই বলে সাধুবাবা জোরে হেসে উঠলেন । হাসির আওয়াজে পাশে গাছ থেকে দু 'একটা পাখি উড়ে গেল। অন্ধকার নেমে গেছে। আর বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে না। কিন্তু পুরো কৌতূহল এখনও মেটেনি আমার।

"বিকেলে বাঘের স্নান করার দৃশ্য এখনও ভোলেননি মনে হয়। যা দেখেছেন সব সত্যি দেখেছেন। দৃশ্যের পেছনের কারণ নাই বা অনুসন্ধান করলেন। শুধু এটুকু বলতে পারি , যা হয়েছে তা ভালোর জন্যে হয়েছে। যারা মারা গিয়েছে তারা সত্যি সত্যিই পাপের শাস্তি পেয়েছে। আর আপনাকে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে , আগামী কয়েকবছর এই অরণ্য সত্যিকারের অভয়ারণ্য থাকবে। জঙ্গল আপাতত বিপদমুক্ত। তবে মানুষের লোভ তো, কোনও চিরস্থায়ী সমাধান নেই এর।"

"আপনি এতটা নিশ্চিত কী করে হলেন ? আপনি নিশ্চয় সব জানেন। আমি সবটা শুনতে চাই ।" আমি জোড়হাতে মিনতি করলাম।

আমার হাতদুটো নিজের হাতে নিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন , "আমি তো আগেই বলেছিলাম, সবটা বলা সম্ভব নয়। ভালো কাজ করতে গেলে শুধু সাহসী না, মিতভাষী হওয়া প্রয়োজনীয়। না হলে অহংকারের জন্ম হয়।"

শুক্লাপঞ্চমীর চাঁদের আলোয় নারায়ণদাসের উজ্জ্বল চোখ দেখতে পেলাম। এই প্রথম ওনাকে খুব কাছ থেকে ভালো করে দেখলাম , সেই আঁধার-জোছনার সন্ধেতে। বলিষ্ঠ কাঁধ , ঈষৎ চওড়া চোয়াল, লম্বাটে মুখ , টিকালো নাক , কপালে আর নাকের পাশে বয়সের ডাকে বলিরেখার আগমন আরম্ভ হয়েছে। সব মিলিয়ে বেশ ধারালো চেহারা। মনের কৌতূহল এখনও মেটেনি।

জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কে?" আমার গলায় কৌতূহল দমন করা অসহিষ্ণু আওয়াজ।

"আমি নারায়ণদাস। এটাই আমার পরিচয়। এর বেশি জেনে কারোর কোনও উপকার হবে না।"

উত্তর পেলাম। আমি এবারে জীপের দিকে হাঁটা দিলাম। দু 'পা হেঁটে মাথা ঘুড়িয়ে নমস্কার করে বললাম, "আবার দেখা হবে।"

উনি হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন , "এই বিশাল পৃথিবীতে ঈশ্বরের নির্দেশে আমরা আবার কোনওদিন মুখোমুখি হতেই পারি। অসম্ভব নয়।"

নারায়ণদাসের এই শেষ কথাটা আমি তখন বুঝিনি। পরদিন সকালে এইসব কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে হল , কী বোঝাতে চেয়েছিলেন নারায়ণদাস ? বিকেলে রামশরণকে নিয়ে ওনার কুটিরের কাছে গেলাম। কুটিরের চারপাশ ও ভেতর ভালো করে দেখে ওনার ওখানে থাকার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। এবারে অনুধাবন করতে পারলাম ওনার শেষ কথাগুলোর তাৎপর্য। উনি যে এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যাবেন সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আমায়। এই ঘটনার পর আমি আরও বছর পাঁচেক ছিলাম ওখানে । ওনাকে আমি আর কোনওদিন দেখিনি।

"তোমার গল্প কি শেষ নীলাদ্রিকাকা?" বান্টি জিজ্ঞেস করল।

"না রে, এখনও একটু বাকি। কিন্তু তার আগে চা চাই।"

অগত্যা, এবারে আমি উঠলাম চা অর্ডার করতে। বসে রইলাম চায়ের অপেক্ষায়। চা এল । চুমুক দিয়ে নীলাদ্রিকাকা আবার শুরু করলেন।

এই ঘটনার পর প্রায় বারো বছর কেটে গেছে। আমি তখন নর্থ-ইস্টে থাকি। আমি তখন ওখানে রিজিওনাল চিফ ফরেস্ট কনজারভেটর। একদিন কানহা টাইগার রিজার্ভের কনজারভেটার মিঃ নাচাপ্পার ফোন পেলাম। সমস্ত ফরেস্ট কনজারভেটারদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় বলে জানতাম যে ওখানে তখন চোরাশিকারিদের উপদ্রব বেড়েছে। ভাবলাম, সে ব্যাপারে হয়তো কোনও আলোচনা করতে চান মিঃ নাচাপ্পা।

সিনিয়র ছিলাম, তার ওপর ওনার প্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে আমার পদবীর মিল। তাই আমাকে একটু বেশি শ্রদ্ধা করতেন। ফোনের ওপার থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলাম, "স্যার, আই নিড ইওর কাইন্ড হেল্প। আয়াম কমপ্লিটলি ক্রিপিল্ড উইথ দা রিসেন্টমোস্ট ডেভেলাপমেন্টস অফ সিরিয়াল কিলিং ইন্সিডেন্টস ইন মাই টেরিটরি। আই হার্ড দ্যাট ইউ এক্সপেরিয়েন্সড দা সেম ইন করবেট। আই শ্যাল সেন্ড ইউ দা ফোটোগ্রাফস অফ দা ভিক্টিমস। আয়াম সিওর ইউ ক্যান শেয়ার ইওর ইনসাইটস উইথ মি।"

আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম চোরাশিকারের কী অবস্থা। উত্তরে উনি বললেন যে চোরাশিকার প্রায় নির্মূল। তবে এডমিনিস্ট্রেশনের তুমুল মাথাব্যথার কারণ এই সিরিয়াল কিলিং। কারণ, উনি নিশ্চিত, এটা সাধারণ বাঘের কাজ বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিছুদিন বাদে ফটো এল আমার কাছে। এক এক করে এগারোটা মৃতদেহের ছবি। ছবিগুলো দেখে চমকে গেলাম। সেই পা মুড়ে শোয়ানো দেহ, সেই বিস্ফারিত চোখ, ভয়ে ঠোঁট হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ।

"তার মানে, কানহাতেও নারায়ণদাস গেছিলেন? তারপর কী হল?" মিমি প্রায় চিৎকার করে উঠল।

"সে গল্প আরেকদিন হবে, আজ আর নয়। ছোটন এখুনি ডাকল বলে। স্যালাড কাটতে হবে।"

"না না, নীলাদ্রিকাকা, এটা ঠিক হল না। পুরোটা তোমাকে বলতেই হবে।" বিল্টু বলে উঠল।

"একটু রহস্য বাকি থাকুক না হয়। না হলে তো আমার ডিম্যান্ড কমে যাবে।"

"আচ্ছা, আমি যা বুঝলাম তোমার বিবরণ শুনে, নারায়ণদাস তোমার মতোই দেখতে ছিলেন।" বান্টি বলল।

"আচ্ছা, ওনার গালে জরুল আছে কি না খেয়াল করতে পারনি?" বান্টিকে থামিয়ে মিমি বলে উঠল।

ঠিক তো! আমি তো মিমি-বান্টির মতো এই ব্যাপারটা খেয়াল করিনি!

"আরে দেখবে কী করে? নারায়ণদাসের গালে তো লম্বা দাড়ি।" বিল্টু বলে উঠল।

"নীলাদ্রিকাকা, সব রেডি। ছোটন বসে আছে তোমার জন্যে। কখন স্যালাড কাটতে আসবে?" মা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন।

নীলাদ্রিকাকা, "আহ্, বাঁচালি," বলে হাসতে হাসতে ডাইনিং-রুমের দিকে চলে গেলেন।

"সো আনফেয়ার নীলাদ্রিকাকা!" নিষ্ফল হতাশায় মিমির গলা থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল।

ছবিঃ অংশুমান

হুলোপ্যাঁচা ও অক্টোবর মাস

তপোব্রত মুখার্জি

সবাই জানে এসময় শিশির পড়ে। তেমনই পড়ছিল। মুখু জ্জেবাড়ির বড়োবৌ তখন সাঁঝপিদিম দেখাতে এসেছিল ছাদে। সবে সারা ছাদ ঘুরে পিদিম দেখিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে , অমনি আওয়াজখানা শুনল। সে যে কী আওয়াজ তা তো বলে বোঝানো যাবে না , তবে সে মানুষ ডাকছে না প্যাঁচা, নাকি মানুষই প্যাঁচার মতো ডাকছে না প্যাঁচা মানুষের মতো , তা ঠাহর করা যায় না। এদিকে বড়োবৌয়ের সাহস খুব। সে তো নিচের তলার দিকে পা না বাড়িয়ে দেখতে চলল কীসে ডাকল। আবার সারা ছাদ ঘুরল পিদিম হাতে। কিচ্ছু ডাকে না। মনের ভুল কি শোনার ভুল ভেবে বড়ো বৌ যেই পা বাড়িয়েছে , অমনি আবার! এবার বড়োবৌ কান খাড়া করে শুনল । না তো , ভুল তো নয় , কিছু একটা সত্যি সত্যি ডেকেছে। কিন্তু কী সেটা? এমন শব্দ আগে কেউ কখনও শুনেছে বলে তো মনে হয় না। বড়োবৌ পিদিমখানা নামিয়ে রাখল। এবার তক্কে তক্কে থাকল , ডাকলেই ওদিকে যাবে। ঠিক তক্ষুনি মাথার উপর কার্নিশে সেই ডাক আবার আর কী একটা হড়াৎ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল যেন। মাটিতেই পড়ত , কিন্তু বড়োবৌ চট করে তার আগেই সেটা ধরে ফেলেছিল। তারপর মুঠো খুলে দেখে , এ বাবা, এ কী! কেমন সবুজ সবুজ গা- খানা যেন, ঠোঁটের মতো কী যেন মুখের সামনে । কিন্তু ঠিক পাখির ঠোঁটের মতো পুরোটা নয়। গায়ে পালক না আঁশ , কী এ কখানা কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। কেমন হুমদো মুখ করে ডাকতে যাচ্ছে । সবসময় পারছে না, তবে পারলে ওই ওইরকমের একটা আওয়াজ হচ্ছে। বড়োবৌ কী করে ? ওদিকে পিদিম জ্বলে ফুরিয়ে এল। সে এখন এই এখানা সামলাবে না ওই পিদিম! আর এখানা যে কী তাও তো ছাই বোঝা যাচ্ছে না। মানুষের মতো নয় , পাখির মতোও নয়। তবে ? তলায় নামিয়ে নিয়ে গেলে যদি কিছু করে বসে ? ওদিকে শিশিরও পড়ছে। জিনি সটা ছোটো বলেই মনে হচ্ছে। যদি ফেলে গেলে ঠাণ্ডা লেগে যায় ? কিন্তু এগুলোর কি ঠাণ্ডা লাগে? বড়োবৌ খানিক ভাবল। ভেবে ঠিক করল যে নিচেই নিয়ে যাবে। যদি খারাপ কিছু হয় তবে জানালা দিয়ে ফেলে দিলেই হল!

নিচে তো গেল নিয়ে , কিন্তু রাখবে কোথায় ? চটপট ভেবে নিয়ে বড়োবৌ ওখানাকে বালিশের একটা ফাঁকে রেখে গেল কাজ সারতে। কাজ সেরে- টেরে ফিরে এসে দেখতে গিয়ে দেখে , ফাঁক থেকে

বেরিয়ে সেখানা গ্যাঁট হয়ে বালিশের উপর বসে আছে। নড়ছে-চড়ছে না। বড়োবৌ সামনে এগিয়ে দেখতে গিয়ে হেসে ফেলল। যেন ধ্যান করছে এভাবে বসে। খানিকক্ষণ বড়োবৌ হাসল । তারপর প্যাঁক করে দিল এক ছোট্ট খোঁচা। খোঁচা খেয়ে সেখানা চেয়েই যে শব্দটা করল সেটা হল এইরকম, 'ম্যাউউউম্মম...'

প্যাঁচা না বাঘ, না বিড়াল কীসের ডাক তাই বোঝা গেল না। বেশ খানিক ভেবেটেবে বড়োবৌ ভাবল, এটাকে হুলোপ্যাঁচা বললে কেমন হয়? এক তো অদ্ভুত দেখতে। মুখটা না প্যাঁচা, না মানুষ, না বিড়াল, ওদিকে ডানা নেই কিন্তু গোল গোল থাবার মতো হাত রয়েছে, পাও। তবে? হুলোপ্যাঁচাই সই। ওই ঠিক নাম।

রাত্তিরবেলা বড়দা এলেন। দেখে তো তেনারও হাসি ধরে না। তো তিনি বললেন, "রেখে দাও না, থাক।"

বড়োবৌ বলেছিল একটা খাঁচা আনার কথা। কিন্তু দাদা বললেন, "থাক। বেগড়বাই দেখলে জানালা দিয়ে দেবে ফেলে।"

কথাটা বড়োবৌয়ের মনে ধরল। সে হুলোপ্যাঁচা রয়ে গেল।

দিনে দিনে তারপর সেখানা বাড়ল। বেড়ে যেতে অবশ্য পালক কিংবা আঁশ, যাই বল, সেসব খসে গেল। তারপর আঙুল গজাল, নখ হল, দু'পায়ে হাঁটাহাটিও করল বটে । কিন্তু সেই এখনও বেশ সন্ধে নাগাদ হলে ছাদে গিয়ে ওইরকম 'ম্যাউউউম্মম' ডাক ছাড়াটা গেল না। সেখানা রয়ে গেল। ওদিকে লোকজন এখন তাকে অন্য নামে-ধামে চিনল। মাঝে অবশ্য অনেকরকম অদ্ভুতুড়ে বদমায়েশি যে করেনি তা নয়, কিন্তু বড়োবৌ সেই কবেই জানলা দিয়ে ফেলে দেবার গল্প ভুলে গেছে।

ভাবলে এই শেষ? ভুল ভাবলে। বড়োবৌ য়ের মাসিশাশুড়ির পিসিশাশুড়ির সেজ ননদের মাসতুতো জামাইবাবুর ভায়রাভাই য়ের পাড়াতুতো পিসি আর খুড়শাশুড়ির খুড়তুতো শাশুড়ি মিলে হুলোপ্যাঁচামো কাটিয়ে ওখানাকে মানুষ করার মন্তর জানত। তারা একবার সেসব করেওছিল, কিন্তু তারপর যে কাণ্ড...

যাক, আপাতত সে হুলোপ্যাঁচা মানুষের মতোই আছে। ঝামেলা বড়ো একটা করে না বটে, শুধু ওই অদ্ভুত ডাক ছাড়া। ও হ্, দেখেছ, বলতেই ভুলে গেছি - বড়োবৌ যেদিন ওখানাকে খুঁজে পেয়েছিল, সে দিনখানা দাগ দিয়ে রেখেছিল ক্যালেন্ডারে লাল কালি দিয়ে। এখনও সে ক্যালেন্ডার আছে। কবে দিনখানা? এই যে, আজকে। ৫ই অক্টোবর।

গ্রাফিক্স্ ইন্দ্রশেখর

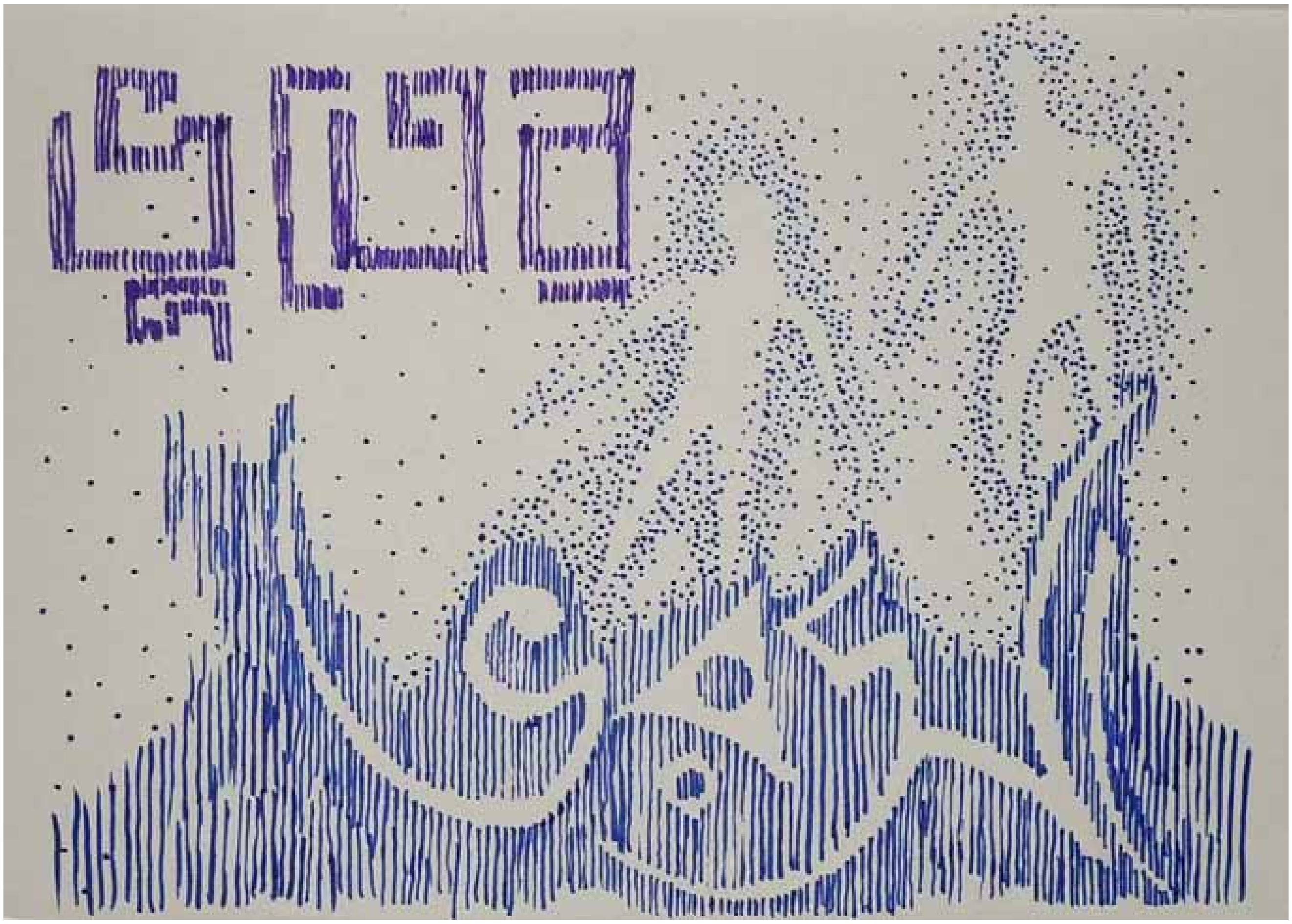

কিশোর ঘোষাল

১

থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা দিয়ে কলেজে এখন ছুটি। সর্বজিৎ প্রফুল্লনগরে এসেছে মাসিমার বাড়ি বেড়াতে। এই জায়গাটা সর্বজিতের খুব পছন্দের জায়গা। ছোট্ট শহর বলেই, শহরের সব সুযোগসুবিধে যেমন মেলে, তেমনি মেলে দেদার গাছপালাওয়ালা নিরিবিলি ফাঁকা মাঠঘাট। মনটা হালকা হয়ে যায়, ভালো হয়ে যায়। এর সঙ্গে অবশ্য আছে মাসিমার দারুণ রান্না। নানান পদ রান্না করে সর্বজিতকে খাওয়াতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। মেয়েরা তাঁর পেছনে লাগার জন্যে কিছু বললে তিনি বলেন, “তোরা তো আমার হাতে সারাবছর খাস, তা সত্ত্বেও তোদের মন পাই না। আর ও বেচারা সারাটি সময় হস্টেলে ছাইপাঁশ কী খায় না খায় তার ঠিক নেই; দু’দিন বাড়ি এলে খাওয়াব না? একশোবার খাওয়াব, সে তোরা হিংসে কর আর যাই কর।”

তাদের তিনবোনের কেউই সর্বজিৎকে হিংসে করে না। বরং সর্বজিৎকে খুব ভালোবাসে। সর্বজিতের ডাকনাম সরু। সরুদা এলে বরং খুব মজা হয়। এই ক’টাদিন মা কিংবা বাবা লেখাপড়া নিয়ে খুব চাপ- টাপ দেন না। রোজই বিকেলের দিকে পাহাড়চূড়ায় বেড়াতে যাওয়া হয়, নেমে এসে বাজারের সামনে ফুচকাওয়ালার থেকে ফুচকা, চুরমুর খাওয়া হয়। আর সারাদিন গল্প তো আছেই। সরুদার কাছে গল্প শোনাও দারুণ মজা। নানান জায়গার নানান ঘটনার কথা এমন করে বলবে, হাসতে হাসতে চোখে জল চলে আসে। মাও থাকেন সেসব সময়, তিনিও খুব হাসেন।

সেদিন সন্ধেবেলা বারান্দায় বসে সবাই মিলে গল্প হচ্ছিল, বাবা- মাও ছিলেন। হঠাৎ সরুদা বলল, “রুন্টু- ঝুন্টু, তোদের সেই বেস্ট ফ্রেন্ড রুকু- সুকু কোথায়, দেখছি না যে!”

সামনের পেয়ারাগাছের আড়াল থেকে রুকু- সুকু হালকা ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে এল। তাদের মুখে একগাল হাসি। মৃদু হাওয়ায় দুলতে থাকা ভারী পর্দার মতো দুলতে দুলতে রুকু বলল, “আজ্ঞে, এখানেই আছি দাদা। আপনি সকালে এলেন, সারাটাদিন মজার মজার কথা বলছেন, শুনছি। তারপরে আপনারা বিকেলে পাহাড়চূড়ায় বেড়াতে গেলেন, আমরাও সঙ্গী হলাম। আপনি এলে বাড়িটা খুব জমজমাট লাগে। এবারে কিন্তু বেশ ক’টাদিন থাকতে হবে, দাদা। সেই কবে এসেছিলেন, আপনাকে তো প্রায় ভুলেই গেছিলাম। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে সকালে হুট করে দরজা খুলে যেভাবে ঢুকলেন, আমি তো ভাবছিলাম আপনাকে ঠেলে বের করে দেব। সুকু চিনতে পেরে বলল, আরে ইনি তো সরুদাদা! তা না হলে কী যে অসৈরণ কাণ্ডটা ঘটে যেত!” লজ্জায় মাথা নিচু করে দুলতে লাগল রুকু।

সরুদা মুচকি হেসে বলল, “বোঝো কাণ্ড, রুন্টু- ঝুন্টু তোদের বন্ধুরা আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে আসছিল!”

“ঠিকই তো বলেছে। ওদের কী দোষ? বছরে এক আধবার এলে ওরকমই হবে।” রুন্টু হেসে উত্তর দিল।

রুন্টুর খোঁচাটা সরুদা গায়ে মাখল না। গম্ভীরমুখে সরুদা জিগ্যেস করল, “সে না হয় হল। কিন্তু রুকু, প্রমোটার প্রমথবাবু আর জ্যোতিষী কাত্যায়ণ শাস্ত্রী কী করছে এখন?”

“দু'জনেই বড়ো কষ্টে আছে, দাদা। প্রথমবাবুর ফ্ল্যাট যারা বুক করেছিল তারা রোজ এসে সকাল থেকে রাত অব্দি প্রথমবাবুর ঘরে ধর্না দিয়ে বসে থাকে। প্রথমবাবু ভোরে বেরিয়ে যায়, মাঝরাত্রে ঘরে ফেরে। আর নাত্যায়ণ শাস্ত্রী কলকাতায় কার্জনপার্কের সামনে টিয়াপাখির খাঁচা নিয়ে বসে। হপ্তায় পঞ্চাশ- ষাট টাকার বেশি রোজগার হয় না। দু’জনের দুর্গতি দেখলে আপনার চোখে জল চলে আসবে, দাদা।”

“তোরা প্রমথকে প্রথম আর কাত্যায়ণকে নাত্যায়ণ বলছিস কেন রে?” সরুদা বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করল।

“ওরা তো অশরীরি, ঠাকুর- দেবতার নাম নিতে পারে না, তাই ওরকম বলে।” রুন্টু ওদের হয়ে উত্তরটা দিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সরুদা। তারপর বলল, “অ। এতসব নিয়মকানুন তোদেরও মানতে হয় বুঝি? বুঝলাম। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, ওরা আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছিল, তাই আমরা ওদের শাস্তি দিয়েছি রুকু। কিন্তু ওদের সর্বনাশ তো আমরা চাইনি।”

“একদম ঠিক বলেছেন, দাদা। এই নিয়ে আমাদের সমাজে খুব কথা শুনতে হচ্ছে। বলছে আমাদের জন্যেই নাকি মানুষেরা ভুল বোঝে।” সুকু খুব উত্তেজিত হয়ে বলল।

“তোদের সমাজ? সেটা কীরকম বস্তু?” সরুদা কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করল।

রুকু বলল, “আমাদের সমাজকে নিরাকার সমাজ বলে। আমাদের সমাজেও নেতা আছে, মন্ত্রী আছে, প্যাঁচ- পয়জার আছে, দলবল আছে। পুলিশ আছে, আইন আদালত আছে। একদমই মানুষদের মতো। তবে কিনা মানুষরা যেমন নিজেদের মধ্যে মারদাঙ্গা, লুটপাট করে, খুনোখুনি করে, আমাদের তেমন হয় না। আগে ভূতেরা খুব হিংস্র হত, মানুষের ঘাড় মটকাত, ভয় দেখাত। বেশ ক’বছর হল সেসব একদম বন্ধ।”

“হঠাৎ তোদের এই সুবুদ্ধির কারণ?” সরুদা ঠাট্টার সুরে জিগ্যেস করল।

রুকু তার উত্তরে বলল, “দাদা, মানুষ মরেই তো ভূত হয়। মানুষ যে হারে মরছে, ভূতেদের সংখ্যাও তো বেড়ে চলেছে। আজকাল মানুষরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করেই এত মরছে, তার ওপর আমরা ঘাড় মটকালে ভূতেদের আর পা ফেলার জায়গা থাকবে না। সেই কারণেই আমাদের নেতারা সকলে মিলে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, আর কোনও নরহত্যা নয়। বরং মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, পারলে উপকার কর।”

সুকু এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিল। এখন বলল, “একটা কিছু ভাবুন দাদা, যাতে প্রথমবাবু, নাত্যায়ণ শাস্ত্রী আর ওই ফ্ল্যাট বুকিং করা আটষট্টি জন লোক দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারে, আগের মতো আবার সব যেন ঠিকঠাক চলতে থাকে।”

সরুদা গম্ভীরভাবে বলল, “হুম, সেটাই তো ভাবছি, কীভাবে কী করা যায়। আমার মনে হচ্ছে, নাত্যায়ণ শাস্ত্রীই আমাদের হয়ে পুরো কাজটা সামলে দিতে পারবে যদি তোরা দু’জনে তাকে একটু সাহায্য করতে পারিস।”

“আমরা সাহায্য করার জন্যেই তো বসে আছি, দাদা। আপনি শুধু হদিশটা বাতলে দিন।” রুকু- সুকু একসঙ্গে বলে উঠল।

২

কাত্যায়ণ শাস্ত্রী ফুটপাথের একধারে সকাল ন’টার মধ্যেই গুছিয়ে বসে পড়ে। তার সামনে প্লাস্টিকের চাদরের ওপর টিয়াপাখির খাঁচা, খাঁচার সামনে সাজানো ভাগ্যফল লেখা সারি সারি কার্ড। দুটো টাকা দিলে কাত্যায়ণ খাঁচার দরজা খুলে দেয়। পোষা টিয়াপাখি বাইরে বেরিয়ে এসে একটা কার্ড ঠোঁটে নিয়ে কাত্যায়নের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে। খাঁচার দরজা বন্ধ করে কাত্যায়ণ ভাগ্য বিচার করতে আসা গরিব- গুর্বো মানুষগুলোকে সেই কার্ডের লেখা পড়ে শোনায়। সেসব কার্ডের কোনওটায় লেখা থাকে ‘আপনার শুদীন আশতে আর দেরী নেই। আর মাত্র কয়েকটা দীনের প্রতিক্‌খা’। কোনওটায় – ‘আপনার দূঃখের দীন শেষ হয়ে এসেছে, আর কটা দীন পরেই আপনি যা চাইছেন সব পেয়ে যাবেন’।

সেদিনও কাত্যায়ণ শাস্ত্রী সকাল ন’টার আগেই গুছিয়ে বসেছিল কার্জনপার্কের উলটোদিকের ফুটপাথে। সকলের অলক্ষ্যে তার দু’পাশে এসে বসল রুকু আর সুকু। কাতারে কাতারে অফিসের বাবুরা দৌড়চ্ছে তাদের অফিসের দিকে। কাত্যায়ণ তাদের দেখছিল আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল। রোজ বাড়িতে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে নিশ্চিন্তে অফিস করা এই বাবুরা কত কত টাকা মাইনে পায়, আর দুটো টাকা দিয়ে নিজের ভাগ্যটা জানতেও এদের কোনও ইচ্ছে হয় না? মাত্র দুটোই তো টাকা!

রুকু খুব চাপা স্বরে বলল, “ও টাকায় টিয়ার জন্যে ভিজে ছোলার দামও তো ওঠে না, শাস্ত্রীজি। আপনার কী হবে?”

ঘাড় ঘুরিয়ে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী চারদিকে তাকাল। আশেপাশে কাউকেই দেখতে পেল না। তাহলে কে বলল কথাটা? কথাটা তার একদম মনের কথা। কিন্তু মনের কথা এমন স্পষ্ট করে কানেও শোনা যায় নাকি? একটু চমকে গেলেও কাত্যায়ণ শাস্ত্রী ঘাবড়াল না। তার মনে আছে প্রফুল্লনগরের সেদিনের ঘটনার কথা। কিন্তু এটা তো আর প্রফুল্লনগর নয়। কলকাতা শহর। পেছনদিকে রাজভবন, সামনে কার্জনপার্ক। মাঝখানের চওড়া রাস্তা দিয়ে দৌড়ে চলেছে অজস্র বাস আর গাড়ি। দৌড়ে চলেছে হাজার হাজার চাকুরে লোক। এ হচ্ছে সরকারি খাস জায়গা। প্রকাশ্য দিনের বেলা এখানে কোন ভূতের বাপের ক্ষমতা হবে না তার কোনও ক্ষতি করার।

রুকু আবারও বলল, “আমরা এখানে এসেছি আপনার কোনও ক্ষতি করতে নয় শাস্ত্রীজি, বরং উপকার করতেই এসেছি।”

এই কথা শুনে কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর ঘাড় একদম শক্ত হয়ে গেল। ঘাড় বেয়ে নেমে আসতে লাগল বরফ-শীতল ভয়ের স্রোত। কোনওরকমে তিনবার ঢোঁক গিলে বলল, “যা ক্ষতি করেছ ভূতভাইরা, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এখন আবার উপকার?”

“হুঁ, উপকার। ঘুঁ ঘুঁ ঘুঁ ঘুঁ।” রুকু হাসল প্রমথবাবুর মতো। “অপকার যারা করে তারা উপকারও করতে পারে।”

রুকুর হাসি শুনে আরও চমকে গেল কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। ভাবল, প্রমথবাবুও এসেছেন বুঝি সঙ্গে। বলল, “প্রমথদাও এসেছেন নাকি? তিনি কবে অশরীরি হয়ে গেলেন, জানতে পারিনি তো!”

“বালাই ষাট! তিনি কোন দুঃখে অশরীরি হবেন? তবে হ্যাঁ, তিনি খুব মনোকষ্টে আর দুশ্চিন্তায় আছেন। তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র আপনি!” সুকু কাত্যায়ণ শাস্ত্রীকে বলল।

এত দুঃখেও কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর হাসি পেল। বিষণ্ণ হাসিমাখা মুখে বলল, “আমাকে এই দুর্গতি থেকে কে উদ্ধার করে তার ঠিক নেই, আমি উদ্ধার করব প্রমথদাকে?”

“ঠিক তাই। আপনি এই টিয়াপাখির খাঁচা যার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন, তাকে ফেরত দিয়ে চলে যান প্রথমবাবুর হিমঘরে। সেখানেই তিনি সারাটাদিন বসেন। বাড়ি ফেরেন প্রায় মাঝরাত্রে। বাড়ি থেকে বেরিয়েও পড়েন ভোররাত্রে।”

কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর ভয়টা এবার একটু কেটে যেতে লাগল। বুকে যেন একটু বল পাচ্ছে। মুচকি হেসে বলল, “ভূতেরাও যে এমন পাগল হয় জানা ছিল না ভাই! প্রমথদার সামনে দাঁড়ালে আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন। আমার কোনও কথাই শুনবেন না।”

রুকু বলল, “শুনবেন, শুনবেন। ঠিকমতো বলতে পারলে সবকথা শুনবেন, এমনকি মেনেও নেবেন। মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর অন্য রাস্তা নেই কিনা!”

“আচ্ছা, শুনিই তাহলে কী করতে হবে।” কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর মনে ভয়টা আর নেই বললেই চলে।

“খুব ভালো। আপনি যে আমাদের ভরসা করেছেন আর ভয় পাচ্ছেন না, ধরে নিন এতেই আপনার আদ্দেক কাজ হয়ে গেছে। এবার কী করতে হবে শুনুন। ছেঁড়াখোঁড়া এই জামাপ্যান্ট ছেড়ে লাল কাপড় পরতে হবে, যাকে বলে রক্তাম্বর। ঘাগু তান্ত্রিকেরা যেমন পরেন আর কি! এমন মিনমিন করে কথা বললেও হবে না। বেশ রোখ- টোখ নিয়ে ডেকে- হেঁকে কথা বলতে হবে। আপনি- আজ্ঞে না বলে, তুই বলতে হবে, এক ধাক্কায়।”

“প্রমথদাকে আমি ‘তুই’ বলব, আমাকে কি ভূতে পেয়েছে, নাকি?” কাত্যায়ণ শাস্ত্রী খুব বিরক্তমুখে বলল।

রুকু ধৈর্য হারাল না। বলল, “ভূতে তো আপনাকে পেয়েইছে। আমরাই কি ভূত নই? রাজভবনের ফুটপাথে বসে এই যে আপনি আপনমনে বক বক করে চলেছেন, অনেকেই কিন্তু আপনাকে দেখে অবাক হচ্ছে। ভাবছে, আপনাকে ভূতে পেয়েছে নয়তো আপনার মাথাটা গেছে!”

কাত্যায়ণ শাস্ত্রী আশেপাশে লোকজনের দিকে তাকাল। উল্টোদিকে একজন কচি শসা ছাড়িয়ে বিটনুন মাখিয়ে বিক্রি করছে। সে সত্যি সত্যি তার দিকে বার বার দেখছে। ডানদিকে একটু তফাতে এক বুড়ি পা ছড়িয়ে বসে ভিক্ষে করছে। সেও তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। এতক্ষণ কাত্যায়ণ শাস্ত্রী লক্ষ করেনি, এখন লক্ষ করে বেশ ভড়কে গেল।

রুকু বলল, “আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন তো? কথা কম বলে আমাদের কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। যেমন বলছি, সেভাবে কাজ করলে প্রথমে প্রথমবাবুর ভালো হবে, তারপর আপনারও উপকার হবে। আপনার হারিয়ে যাওয়া সুনাম চাই কি আগের থেকে অনেক বেড়েও যেতে পারে। কী ঠিক করলেন বলুন, আমাদের কথামতো কাজ করবেন? হ্যাঁ কিংবা না- তে উত্তর দিন, বেশী কথা বলবেন না।”

ভাববার জন্যে কিছুক্ষণ সময় নিল কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। টিয়াপাখির ভরসায় তার যে দিন চলবে না সে ব্যাপারে তার চেয়ে ভালো আর কে জানে? তবে ভূতের ওপর ভরসা করাটাও উচিত হবে কি না কে জানে। কিন্তু এখন তো আর কোনও উপায়ও নেই। বিশেষ করে এই দুই ভূত যখন তার পেছনে পড়ে আছে তার থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায়ও তো তার জানা নেই। কাত্যায়ণ শাস্ত্রী ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলল, “হুঁ।”

“ভেরি গুড। টিয়াপাখির ঝাঁপ গুটিয়ে তুলে এখন তাড়াতাড়ি চলুন, হাওড়ার ট্রেন ধরতে হবে।”

৩

তালতলার বিহারী মজনুর আলির হরেক ব্যাবসা। তার কাছে ম্যাজিকের সরঞ্জাম, টিয়াপাখির খাঁচা সমেত ভাগ্য গোনার বাক্স, মানুষের ওজন মাপার ঘড়ি আর ঘন্টা, বীণ সমেত তিন সাপের ঝাঁপি, একখানা এয়ার গান, সিসের গুলি আর বেলুন চিপকানো বোর্ডে টিপ প্র্যাকটিস করার সরঞ্জাম, আরও অনেক জিনিস পাওয়া যায়। সে সকালবেলা টাকা জমা নিয়ে এসব সরঞ্জাম ভাড়া দেয় আর রাত্রে ভাড়ার টাকা নিয়ে জিনিস ফেরত নেয়। কাত্যায়ণ শাস্ত্রী অসময়ে হাজির হয়ে খাঁচা জমা দিতে খুব অবাক হল মজনুর আলি। বলল, "কা কাত্যায়ণ ভাই, আভি আভি লিয়ে গেলে, আভি আভি ওয়াপসভি লিয়ে এলে, বেওসাটা ভালো লাগল না?"

"তা নয় মজনুর ভাই। অন্য একটা ব্যাবসা মাথায় এসেছে। তুমি একটু হেল্প করলে ভালো হয়।"

"লতুন বেওসা? সে কীরকম আছে, একটু বোলেন তো?"

"লাল ধুতি আর চাদর আছে, মজনুর ভাই? সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা- টালা হলে ভালো হয়।"

কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর এই কথায় খুব একচোট হো হো করে হাসল মজনুর আলি। বলল, "কাপালিকবাবার বেওসা? এ তো বহোত পুরানা বেওসা হল। তুমি কাপালিক বনবে, ব্যোমকালী কলকাত্তাওয়ালি? হা হা হা হা। কাপালিকের সোব তামঝাম হামার কাছে মিলবে, হে রতনোয়া, কাত্যায়ণ ভাই কো ও কাপালিকওয়ালা ড্রেস দিখাও।"

মজনুর আলির শাগরেদ রতন ঘরের ভেতর থেকে খুঁজেপেতে কাপালিকের ড্রেস নিয়ে এল। রক্তাম্বর, সঙ্গে লাল কাপড়ের ঝোলা। রুদ্রাক্ষের মালা তিন সেট   গলায় পরার জন্যে একটা বড়ো, হাতে পরার জন্যে একজোড়া ছোটো। একটা লাউয়ের খোলায় বানানো কমণ্ডলু আর একটা খুব ব্যাঁকাত্যারা পাকানো অদ্ভুত দেখতে লাঠি। আর একজোড়া খড়ম। কাপালিক সাজার মোক্ষম ড্রেস দেখে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী নিশ্চিন্ত হল।

মজনুর আলি বলল, "পসন্দ হলো তো, কাত্যায়ণভাই? তোবে রেট একটু বেশি পড়বে। জোমা একসো টাকা, আর ভাড়া রোজ তিরিশ টাকা।"

"একশো টাকা জমা! অত টাকা কোথায় পাব মজনুর ভাই? টিয়াপাখির পঞ্চাশটাকা সকালে জমা দিয়ে গেলাম, ওটাতেই কাজ চালিয়ে দিন মজনুরভাই।"

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে মজনুর আলি বলল, "ঠিক আছে কাত্যায়ণভাই, লেকিন ভাড়া চালিস টাকা রোজ দিতে হোবে! কোতোদিনের জন্যে লিবেন?"

"চার- পাঁচদিন তো বটেই, দু- একদিন বেশিও হতে পারে। চল্লিশ টাকা রোজ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? মজনুর ভাই, পঁইত্রিশ হলে ভালো হত।"

"চালিস বোলে দিলোম, বাস চালিস। লিতে হয় লিন, না লিবেন তো না লিন। এক পয়সা কোম হোবে না।"

৪

স্টেশন থেকে প্রমথবাবুর হিমঘর শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে বড়ো রাস্তার ধারে। ট্রেন থেকে নেমে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী হাঁটা লাগাল হিমঘরের দিকে। যদিও সে এর আগে কোনওদিন যায়নি, তবে চিনতে অসুবিধে হবে না। কারণ, সারাক্ষণ রুকু- সুকু তার সঙ্গেই রয়েছে। ছোট্ট শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা মাঠের ধার দিয়ে যাবার সময় একটা বড়ো গাছতলার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী জামা- প্যান্ট বদলে কাপালিকের রক্তাম্বর পরে নিল। তারপর রুদ্রাক্ষের মালা পরে হাতে কমণ্ডলু আর সেই ব্যাঁকা লাঠি নিয়ে যখন দাঁড়াল, কে বলবে এ সেই কার্তিকচন্দ্র হাতি, ওরফে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। কাঁধের লাল ঝোলার মধ্যে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে নিল পুরনো

জামা- প্যান্ট। তার এই বেশ বদলের সাক্ষী রইল রুকু- সুকু দুই ভাই, মাঠে চড়তে থাকা একটি গরু আর তিনটে ছাগল।

বিশাল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর বুকটা কিন্তু কেঁপে উঠল। রুকুসুকু পাশে থেকে বলল, “কাউকে আপনি বা তুমি বলবেন না শাস্ত্রীজি, তুই বলবেন। আর যত জোরে আর ধমকে কথা বলবেন লোকে ততই আপনাকে ভক্তি করবে, এ কথাটা মোটেই ভুলবেন না যেন।”

“ভয়ে যে আমার পা কাঁপছে, ভূতভাই।” কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর গলাও কেঁপে উঠল।

“পা কাঁপছে, কাঁপতে দিন। গলা যেন না কাঁপে। খুব জোরে শ্বাস নিয়ে গলাটা সাফ করে নিন।”

কাত্যায়ণ শাস্ত্রী তাই করল। তারপর বন্ধ লোহার গেটে ঠকঠক আওয়াজ তুলল। একজন দারোয়ান গেটের সামনে কাপালিককে দেখেই নিচু হয়ে নমস্কার করল। বলল, “গোড় লাগি, মহারাজ। ইধার কুছ ভিখ নহি মিলেগা, আগে যাইয়ে।”

ভিক্ষে চাওয়ার কথাটা কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর ভীষণ গায়ে লাগল। প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল তার শরীর। বলল, “চোপরাও, বেয়াদব! সাধুসন্ত কো ভিখারি বোলতা হ্যায়, মুরখ? যা, যাকে আপনা মালিক, প্রমথ্ কে বুলা। বোল, সাধু মহারাজ আয়ে হ্যায়।”

কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর বলার দাপটে দারোয়ানজি তো বটেই, রুকু- সুকুও রীতিমতো চমকে উঠল। রুকু- সুকু একটু দূরে সরে দাঁড়াল। দারোয়ানজি আর কথা না বাড়িয়ে আরেকবার নিচু হয়ে নমস্কার করল। তারপর দৌড়ে চলে গেল অফিসের দিকে। কাত্যায়ণ শাস্ত্রী চুপিচুপি জিগ্যেস করল, “ঠিক আছে তো, ভূতভাই?”

“একদম, মোক্ষম দিয়েছেন শাস্ত্রীজি। ব্যস, এই দাপটটা ধরে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে। আপনার সুদিন ফিরে আসবে।”

দারোয়ানজির কথায় প্রমথবাবু অফিসের থেকে বাইরে এসে দেখলেন গেটের বাইরে কে একজন লাল কাপড় পরা সাধু মহারাজ এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে অদ্ভুত লাঠি আর কমণ্ডলু। এমনিতেই তাঁর এখন মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। প্রমোটারি করতে গিয়ে এমন ডুবেছেন, সেখান থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন তার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। মাদুলি, গাছের শেকড়, নানান ধরনের রত্ন, যাগ- যজ্ঞ, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়- ফুঁক কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এই সাধু মহারাজ নিজে নিজেই এসে যখন দেখা দিয়েছেন কথা বলতে দোষ কী? কার মধ্যে কী আছে কিছু বলা যায়? তিনি দারোয়ানজিকে বললেন, “জলদি যাকে গেট খোল দো, মহারাজ কো আনে দো।”

দারোয়ান দৌড়ে গেল। পেছনে প্রমথবাবুও এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। কাত্যায়ণ শাস্ত্রী খোলা গেট দিয়ে ঢুকে প্রমথবাবুর সামনে দাঁড়াল। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে জোর গলায় বলল, ‘চিনতে পারছিস?”

প্রমথবাবু চিনতে ভুল করেননি। এ তো সেই কার্তিক, কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। তাঁরা একসঙ্গেই ভূতের তাড়া খেয়ে পালিয়েছিলেন। সে ব্যাটার এত সাহস, আজ তাঁকে ‘তুই’ বলছে? রাগও হচ্ছিল, আবার অবাকও হচ্ছিলেন মনে মনে। কোনও কথা না বলে তিনি তাকিয়ে রইলেন কার্তিকের দিকে। কাত্যায়ণ শাস্ত্রী মৃদু হেসে বললেন, “মূর্খ, চিনতে পারলি না তো? আমি কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। ভূতের তাড়া খেয়ে ভয়ে তুই পালিয়ে এসে বাসা বেঁধেছিস এই হিমঘরে! আর আমি সেই অপমানের শোধ তুলব বলে চলে গেছিলাম হিমালয়ে। গুরুদেবের কাছে মন্ত্র নিয়ে তিনমাস তপস্যা করে গত পরশু সিদ্ধিলাভ করেছি। গুরুদেব বললেন, যা বেটা, আভি যাকে লড় যা ভূতোঁ কে সাথ। সমঝা দে উনকো, তু কৌন গুরু কা চেলা হ্যায়। আজই ফিরলাম। সোজা চলে এলাম তোর এখানে। রাজি থাকিস তো চল আমার সঙ্গে। কাল বাদে পরশু শনিবার রাত্রে বোঝাপড়া হয়ে যাক সেই ভূতেদের সঙ্গে। ভূতেদের বাবার নাম না ভুলিয়ে দিয়েছি তো আমার নাম কাত্যায়ণ শাস্ত্রী নয়।”

এই কথায় রুকু- সুকু একটু বিরক্ত হয়ে কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর কানে কানে বলল, “আপনার এতটা উপকার করতে চলেছি আমরা শাস্ত্রীজি, তার পরেও আমাদের বাবার নাম ভুলিয়ে দেওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?”

খুব আস্তে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী বলল, “স্যরি, ভূতভাই। ওটা ফ্লোতে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।”

রুকু বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি চালিয়ে যান, প্রথমবাবু মোটামুটি ঘায়েল হয়ে এসেছেন।”

প্রথমদিকে প্রমথবাবুর যে একটু রাগ হচ্ছিল না তা নয়, বেজায় হচ্ছিল। ব্যাটা কাত্তিকচন্দ্র হাতি, কাত্যায়ণ শাস্ত্রী হয়েও তাঁর সামনে বিনয়ের অবতারটি হয়ে থাকত। তার আজকের এই চেহারা আর ব্যবহার দেখে ঠিক কী করা উচিত তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তবে এটা বুঝতে পারলেন, সেই মিনিমিনে কার্তিক আর মিনমিনে নেই। যেন বাঘ হয়ে উঠেছে। এদিকে তাঁর সময়টাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। প্রমোটারির জমিটা নিয়ে আর অনেক লোকের থেকে ফ্ল্যাটের অ্যাডভান্স বুকিং নিয়ে তিনি অথৈ জলে পড়ে আছেন। সেক্ষেত্রে এই নতুন কাত্যায়ণ যদি আবার সব ঠিকঠাক করে দিতে পারে, মন্দ কী? তাতে যদি কাত্যায়ণ তাঁকে তুই- তোকারি করে কিংবা তাঁকে যদি কাত্যায়ণকে আপনি- আজ্ঞে করতে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী? জমির ব্যাপারটা মিটে গেলে তাঁরই লাভ। আর না মেটাতে পারলে ব্যাটাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দেশছাড়া করতে তাঁর কতক্ষণ সময় লাগবে?

“কী ভাবছিস রে, বেটা? মনে কোনও দ্বিধা রয়েছে, কোনও সংশয়?” তারপর কাত্যায়ণ শাস্ত্রী একটু মোলায়েম স্বরে ঠাট্টার সুরে বলল, “তোদের কি এখানে অতিথি এলে বসতে বলার রেওয়াজ নেই? চা-জলখাবারেরও কোনও ব্যবস্থা নেই? এই করে তুই ব্যাবসা চালাস রে, প্রমথ?”

কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর এই কথায় প্রমথবাবু থতমত খেয়ে বললেন, “আসুন আসুন কাত্যায়ণজি, ছি ছি, কী অন্যায় বলুন দিকি। সেই থেকে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছি। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। অ্যাই কানাই, বাইকটা নিয়ে চট করে শিঙাড়া, জিলিপি, মিষ্টি- টিষ্টি কী পাস নিয়ে আয় তো। শিঙাড়া যেন গরম হয়। আসুন আসুন, আপনি এখানটায় আরাম করে বসুন।”

তক্তপোশের উপর বিছানো গদিতে আরাম করে বসল কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। ঘরে এসি চলছে, মাথার উপরে হাল্কা স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। আরামে কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর শরীরটা জুড়িয়ে গেল। তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে স্বস্তিতে। এতক্ষণ সব ঠিকঠাক চলছে।

এবার পরশু রাতের যজ্ঞটা যদি ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে ফেলতে পারে তাহলেই তার পাথরচাপা কপাল আবার খুলে যাবে! ভূতভাইয়েরা যখন তাকে এতটাই সাহায্য করছে তখন বাকিটাও ভালোয় ভালোয় মিটবে বলেই তার আশা। আরামটা একটু ধাতস্থ হতে বলল, "বেটা প্রমথ, এখন ওদিকের কী অবস্থা বল তো?"

মেঝেয় পাতা কার্পেটে প্রমথবাবু বসে পড়ে বললেন, "সেই যে ভূতের অত্যাচারে আপনি আর আমি পালিয়ে এসেছিলাম, সে কথায় তো চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেল। আমার সেই জমিটার নামই হয়ে গেল ভূতডাঙা। কেউ আর সেখানে কাজ করতে যেতে চায় না। আটষট্টি জন ফ্ল্যাট বুক করে অগ্রিম টাকা দিয়েছিল, তারা একে একে আসতে লাগল টাকা ফেরত নেবার জন্যে। এক- আধ টাকা নাকি? প্রত্যেকের দু'লাখ করে হলে কত টাকা বুঝে দেখুন। বাবা, সে কি আর হুট করে ফেরত দেওয়া সম্ভব?"

"ঠিক কথা। তারপর?" চোখ বন্ধ করে হাল্কা পা নাচাতে নাচাতে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী বলল।

"তারপর আর কী, বাবা? প্রথমদিকে তারা একজন দু'জন করে আসত। তারপর তারা সবাই মিলে 'প্রতারিত ফ্ল্যাট ওনার্স সমিতি' খুলে ফেলেছে। এখন সেই সমিতির পাঁচ থেকে ছ'জন প্রতিনিধি রোজ সকাল ছ'টায় আমার বাড়ি এসে রাত দশটা অব্দি বসে থাকে। দুটো শিফট। সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দুটো, আবার দুটো থেকে রাত দশটা। কত বুঝিয়েছি, কত অনুরোধ করেছি, ক'টা মাস সময় দেওয়ার জন্যে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? এখন আমিই বাড়িছাড়া। ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, রাত এগারোটার পরে বাড়ি ঢুকি।"

"বুঝতে পারছি, খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছিস রে, প্রমথ। যাক গে, আর মাত্র দুটো দিন। তোর দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে। আমি যখন এসে গেছি তোর আর কোনও চিন্তা নেই। শনিবার মাঝরাতে আমার কাজ আমি করে দেব। রবিবার সকাল থেকে জমিতে লোকজন লাগিয়ে তোর কাজ শুরু করে দে। ঝোপঝাড় কেটে জমি সাফ করা আর মাটি কাটার কাজ আমি দাঁড়িয়ে থেকে শুরু করিয়ে দিতে চাই। ব্যস, তাহলেই তোর ফ্ল্যাট কেনা লোকেরাও স্বস্তি পাবে, তোকে আর জ্বালাবে না। কী রে ব্যাটা, ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ বাবা, ঠিক তো আছে, কিন্তু..."

"কিন্তু কী? কাত্যায়ণ শাস্ত্রী যা বলছে তা করে দেখাতে পারবে কি না? তাই তো?"

"না মানে, ওই ইয়ে আর কি! মনে খুব ভয় ধরে গেছে বাবা।"

"ভয়? কীসের ভয়? হা হা হা হা..." কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর দমফাটা হাসিতে রুকু- সুকুও চমকে উঠল।

“তা মানে, আপনি যখন ইয়ে, ভরসা দিচ্ছেন তখন আর কীসের ভয়, ঘুঁ ঘুঁ ঘুঁ ঘুঁ...” বহুদিন পরে প্রমথবাবু তাঁর হারানো হাসিটা আবার ফিরে পেলেন।

কাত্যায়ণ শাস্ত্রী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, “তোর হাসিটা কতদিন পরে ফিরে পেলি বল? ওই সঙ্গে দ্যাখ তোর কানাই শিঙাড়া- জিলিপিও নিয়ে এল।”

সত্যি সত্যি কানাই ঘরে ঢুকল শিঙাড়া আর জিলিপির মস্ত ঠোঙা নিয়ে। কাত্যায়ণ শাস্ত্রী বলল, “আমাকে দেওয়ার আগে একটা প্লেটে চারটে শিঙাড়া আর চারটে জিলিপি দে। আমার সঙ্গে দু’জন আছে, তাদেরও খাওয়াতে হবে।”

কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে দু’জন? কোথায়? কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তো! প্রমথবাবু, কানাই এবং ঘরে আরও তিনজন ছোকরা ভয়ে ভয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। কানাই একটা প্লেটে চারটে শিঙাড়া, চারটে জিলিপি সাজিয়ে ভীষণ ভয়ে ভয়ে বলল, “বাবা, এগুলো কাকে দিতে হবে বললেন?”

“হা হা হা হা... আমার বন্ধুদের! তারাও তো আমারই মতো অনেকক্ষণ না খেয়ে রয়েছে রে ব্যাটা।” তারপর পাশের ঘরটা দেখিয়ে বলল, “ওঘরে কে আছে?”

“আজ্ঞে, ওটাই আমাদের অফিস ঘর। এখন কেউ নেই।”

“খুব ভালো। ওই ঘরে টেবিলের ওপর প্লেটটা রেখে দিয়ে বেরিয়ে আয়। দরজাটা ভেজিয়ে দিবি। আর দেখিস, কেউ যেন ও ঘরে এখন না যায়।”

কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর এই কথায় সকলেরই ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবার যোগাড়। কানাই কোনওমতে প্লেটটা অফিস ঘরের টেবিলে রেখে বেরিয়ে এল দৌড়ে। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিল ধড়াম করে।

“ভয় কী রে পাগলা, আমি তো আছি।” মুচকি হেসে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী বলল, “আয়, এবার আমরা সবাই মিলে ভাগ করে খাই।”

প্রমথবাবু এতক্ষণ ফ্যালফ্যাল চোখে দেখছিলেন সবকিছু। এবার মেঝে থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর পায়ের ওপর, “যদি কোনও দোষত্রুটি হয়ে থাকে তো ক্ষমা করে দেবেন বাবা। অবোধ শিশু আমরা, কী বুঝব আপনার লীলা?”

কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর শিঙাড়ার গন্ধে খিদেটা চনমন করে উঠেছিল। প্রমথবাবুর এই আদিখ্যেতায় খুব বিরক্ত হল, “আহ্‌, ছাড় ছাড়। আমি কেউ নই রে পাগল। এ আমার গুরুর লীলা, এ আমার তারামায়ের লীলা। ছাড় ছাড়, খিদে পেয়েছে। অ্যাই কানাই, প্লেটে শিঙাড়া দে।”

গরম শিঙাড়ায় কামড় দিয়ে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী খুব আনন্দ পেল। এমন মজা আর আনন্দ সে জীবনে কোনওদিন পায়নি। প্রমথবাবুর মতো জাঁদরেল লোক তার পায়ের ওপর মেঝেয় বসে আছেন। সে কথা বলে চলেছে আর প্রমথবাবু জোড়হাতে সে কথা ভক্তিভরে শুনছেন। এ জিনিস সে কোনওদিন কল্পনাও করেনি। তার পাথরচাপা কপাল যে খুলে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে আর বাকি রইল না। একটা শিঙাড়া শেষ করে দ্বিতীয়টা খাবার সময় দেখল, প্রমথবাবু কিছু খাচ্ছেন না। কাত্যায়ণ শাস্ত্রী বলল, “খুব ভালো গরম শিঙাড়া। খেলে চিত্তশুদ্ধি হয়। কী রে, তুই খাবি না?”

“না বাবা, আপনি খান। আপনার সেবা মানে আমারও সেবা।” প্রমথবাবু গদগদ হয়ে বললেন।

“এই নে, তবে তুই আমার প্রসাদ পা।” আধখাওয়া দ্বিতীয় শিঙাড়াটা প্রমথবাবুর হাতে তুলে দিল কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। দু’হাতে সেই এঁটো শিঙাড়া মাথায় ঠেকিয়ে প্রমথবাবু বললেন, “জয়, বাবা কাত্যায়নের জয়। জয়, তারা মায়ের জয়।”

তারপর সেই শিঙাড়ার টুকরো ভেঙে ভেঙে সকলে মিলে ভাগ করে নিলেন নিজেদের মধ্যে।

শিঙাড়া জিলিপি চা খেয়ে খুব তৃপ্তি পেল কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। বলল, "চ, এবার বাড়ি যাবি না? সন্ধে হয়ে এল তো! এ ক'টা দিন তোর বাড়িতেই এককোণায় থাকতে দিবি তো রে ব্যাটা?"

প্রমথবাবু আঁতকে ওঠার মতো বললেন, "আজ্ঞে কাত্যায়ণবাবা, সে তো আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এখন বাড়ি ফিরলেই যে সেই সমিতির লোকেরা চেপে ধরবে। আমি তো এগারোটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না বাবা!"

কাত্যায়ণ শাস্ত্রী খুব বিরক্ত হয়ে ধমকে বলল, "ধুর ব্যাটা, সেই থেকে বলছি তোর কোনও ভয় নেই। কথা কানে যাচ্ছে না, নাকি? বাড়ি চল। কতদিন এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবি, অ্যাঁ? তোর নামে ক'দিন আগেও বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। সেসব কথা ভুলে গেলি কী করে র‍্যা?" তারপর একটু নরম সুরে বলল, "রাত্রে কী খাওয়াবি বল? পাঁঠার মাংস যেন থাকে। তাছাড়া তোর যা প্রাণ চায়।"

কাত্যায়ণ শাস্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এল। পেছনে প্রমথবাবু ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি বের করতে। কানাই খুব ভয়ে আর নিচু হয়ে জিগ্যেস করল, "বাবা, আপনার বন্ধুরাও যাবে তো? অফিস ঘরে ঢুকব?"

কাত্যায়ণ শাস্ত্রী কানাইয়ের পিঠে আদর করে একটা হালকা চাপড় মারল। বলল, "বোকা ছেলে! আমার বন্ধুদের কোথাও যাবার জন্যে গাড়িঘোড়া লাগে না রে ব্যাটা। তেনারা সব অশরীরি। যা যা ব্যাটা, আর ভয় নেই। অফিস ঘর থেকে প্লেটটা বের করে নিয়ে আয়।"

অফিস ঘরে ঢুকে কানাইদের চক্ষু চড়কগাছ! টেবিলের ওপর প্লেটটা খালি। জিলিপির দু- একফোঁটা রস ছাড়া কিচ্ছু পড়ে নেই প্লেটে!

৫

শনিবারের মাঝরাতে যজ্ঞ শুরু করে শেষ হল যখন তখন সকাল হয়ে গেছে। সকালে হাঁটতে বেরনো লোকজন অনেকেই এসে জড়ো হতে থাকল একে একে। কয়েকমাস আগে এই মাঠেই ভূতেদের তাণ্ডবের কথা সকলেরই মনে ছিল। আজ প্রমথবাবুকে তাঁর দলবল নিয়ে মাঠের মধ্যে জাঁকিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখে সকলেই খুব অবাক হল। প্রমথবাবুর পাশেই দাঁড়িয়েছিল কাত্যায়ণ শাস্ত্রী। আজ কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর ভয়ংকর চেহারা। পরনে রক্তাম্বর। পায়ে খড়ম। গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে টুকটুকে সিঁদুরের বিশাল তিলক। সারা গায়ে মুখে ছাইভস্ম মেখে ভয়ংকর।

প্রমথবাবুর আজ বড়ো আনন্দের দিন। তাঁর জমিতে এমন নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়ে যাবে তিনি ভাবতেও পারেননি। কোনও লোকই এখানে কাজ করতে আসতে চাইছিল না। হাতে পায়ে ধরে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে কিছু লোককে আনা গিয়েছে। সকাল থেকেই তারা লেগে পড়েছে ঝোপঝাড় কেটে জমি সাফ করার কাজে। কিছু লোক লেগে পড়েছে বাড়ির ভিতের জন্যে মাটি কাটার কাজে। প্রথমে সকলেরই মনে একটু ভয় ভয় ছিল। এখন আর নেই। অনেকেই এসে মহাতান্ত্রিক কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর পায়ে প্রণাম করে গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে চলেছে।

ভালোয় ভালোয় সবকিছু মিটে যাবার পর কাত্যায়ণ শাস্ত্রীকে নিয়ে প্রমথবাবু বাড়ি ফিরলেন। স্নান সেরে কাত্যায়ণ শাস্ত্রী লুচি, আলুর দম, একগাদা মিষ্টি দিয়ে জলখাবার খেয়ে বড়ো আরামে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসল। কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর পায়ের কাছে মেঝেয় বসে প্রমথবাবু বললেন, "কাত্যায়ণবাবা, এরপর আপনার কী প্ল্যান?"

সারারাত জেগে যজ্ঞ করে ক্লান্ত কাত্যায়ণ শাস্ত্রীর চোখে ঘুম আসছিল আরামে। বলল, "কাল ভোরবেলায় বেরিয়ে যাব। হিমালয়ে। গুরুদেবের সঙ্গে বাকি জীবনটা সাধন ভজনেই কাটিয়ে দেব ভাবছি।"

"হিমালয়ে? না না বাবা, তা কী করে হয়? আমাদের কে রক্ষা করবে? আপনাকে যখন এই রূপে আবার ফিরে পেয়েছি আর ছাড়ছি না।"

"তোদের রক্ষা করবেন মা তারা। আমি তো নিমিত্তমাত্র রে পাগল!"

"আমরা বাবা, পাপীতাপী মানুষ, আমাদের ডাকে মা তারা মোটেই সাড়া দেন না। আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন আপনি! আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি না। আপনাকে এই প্রফুল্লনগরেই থাকার বাসা দেব। আপনি এখানেই থেকে আমাদের মতো সংসারের মায়ায় বাঁধা পড়া মানুষদের বিপদে আপদে একটু উদ্ধার করে দেবেন, ব্যস। আর কিচ্ছু চাই না। গতরাত্রের যজ্ঞের জন্যে আপনার সেবায় তিরিশ হাজার, না না, তিরিশ বড্ডো কম হয়ে যাচ্ছে, পুরো পঞ্চাশ দেব বাবা। দয়া করে আপনি আর না করবেন না বাবা।"

"আচ্ছা আচ্ছা, এখন যা, আমি ভেবে দেখব না হয়। আমার এখন বিশ্রামের সময় হল। যাবার সময় দরজাটা চেপে দিয়ে যাস। আর দেখিস কেউ যেন বিরক্ত না করে। দুপুরে সেবার আগে আমাকে আর ডাকবি না। এখন যা।"

প্রমথবাবু কাত্যায়ণ শাস্ত্রীকে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিলেন। কাত্যায়ণ শাস্ত্রী চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল। তারপর নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

সন্ধের পর রুকু- সুকুর কাছে সব ঘটনা শুনে সরুদা বলল, "তার মানে যেমন যেমন বলেছিলাম, ঠিক তেমনই সব করে ফেলেছিস তোরা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ দাদা, কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয়নি।"

"এই ব্যাপারে আমার এই দুইবোন রুন্টু- ঝুন্টুর কথা কেউ জানবে না তো?"

"ঘুণাক্ষরেও না। আমরা এই ক'জন ছাড়া কেউ না।"

"প্রমথবাবু তাঁর প্রমোটারির সঙ্গে আবার শপিংমল বানানোর কথাও আর ভাববেন কি?"

"একদম না। মলের কথা তিনি নোংরা মলের মতোই ত্যাগ করেছেন।" রুকুর এই কথায় সুকু হাসল, ঘুঁ ঘুঁ ঘুঁ ঘুঁ।

"যাক, মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে ছিল সেটা দূর হল। এবার প্রমথবাবু তাঁর ক্ষতিটুকু সামলে নেবেন। আর কাত্যায়ণ শাস্ত্রীও তার পুরনো চেম্বার আর তন্ত্রচর্চার ঠিকানা পেয়ে গেল আগের মতোই।" সরুদা বলল।

সরুদা আরও বলল, "অন্যায় কাজ করলে শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলে কারও সর্বনাশ করাটা কোনও কাজের কথা নয়। বুঝলি রুন্টু- ঝুন্টু? যা হল, এই বেশ হল।"

ছবিঃ শিমুল

ডারবানের ডায়েরি

(ডারবান ঘুরে এসে দীপক গোস্বামীর গালগল্প
আর অ্যান মেরি ইঞ্জোকি এবং ঋতুপর্ণ গোস্বামীর ছবি)

১। ডারবান ভারত মহাসাগরের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কোয়াজুলু-নাটাল প্রদেশের রাজধানী এবং ওই দেশের সবচেয়ে বড়ো ও ব্যস্ততম বন্দর। ওদেশে জোহানেসবার্গ আর কেপ টাউনের পরে এটাই সবচেয়ে জনাকীর্ণ শহর। যদিও আমাদের মতো কলকাতা বা মফস্বলবাসীদের চোখে একটু নির্জনই মনে হয়। কারণ কলকাতার তুলনায় জনসংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও বেশি কম।

২।	পুরোনো যা কিছুর ওপরে স্থানীয় অধিবাসীদের আকর্ষণ আছে– স্টিম ইঞ্জিন তার মধ্যে অন্যতম।

৩।	তাই UMGENI STEAM RAILWAY নামে একটা স্বেছাসেবী সংস্থা প্রতিমাসের শেষ রবিবার একটা বাতিল হয়ে যাওয়া রেল লাইনে ডারবানের CLOOF থেকে INCHANGA পর্যন্ত দু'বার স্টিম ইঞ্জিনের ট্রেন চালায়। একটা সকালে অন্যটা বিকালে।

৪। এটাকে ওরা আদর করে INCHANGA CHOO CHOO TRIP বলে। ওদের কাছে CHOO CHOO বাংলা 'কু ঝিক ঝিক'-এর প্রতিশব্দ। এটা কম্পার্টমেন্টের ভেতরের চেহারা। কোচগুলো বেশিরভাগই ১৯৩০ এর কাছাকাছি সময়ে তৈরি– ১৯০৮-এর কোচও আছে। আর সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখনও বেশ ভালই আছে।

৫। কোচগুলো CUBICLE-এ ভাগ করা। অনেক CUBICLE-এই যাত্রীদের ওঠানামার জন্য আলাদা দরজা আছে। এ ভাবে কোচে প্রায় গোটা দশেক দরজা।

৬। CHOO CHOO ট্রেনের বারান্দা ।.

৭।	কোচগুলো টানার জন্য কয়েকটি ইঞ্জিন আছে। তারমধ্যে WESLEY খুব পুরনো স্টিম ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটা ১৯৩৮ সালে জার্মানিতে তৈরি হয়। গত এক বছর ধরে সে অসুস্থ ছিল। কোনও কাজ করতে পারে নি। এক বছর পরে ২৯ জানুয়ারি তার প্রথম সফর।

৮। সে সফরে আমরাও ছিলাম। রেললাইনের দুপাশে বাচ্চারা কী অসীম আনন্দে WESLEY-কে স্বাগত জানাচ্ছিল, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

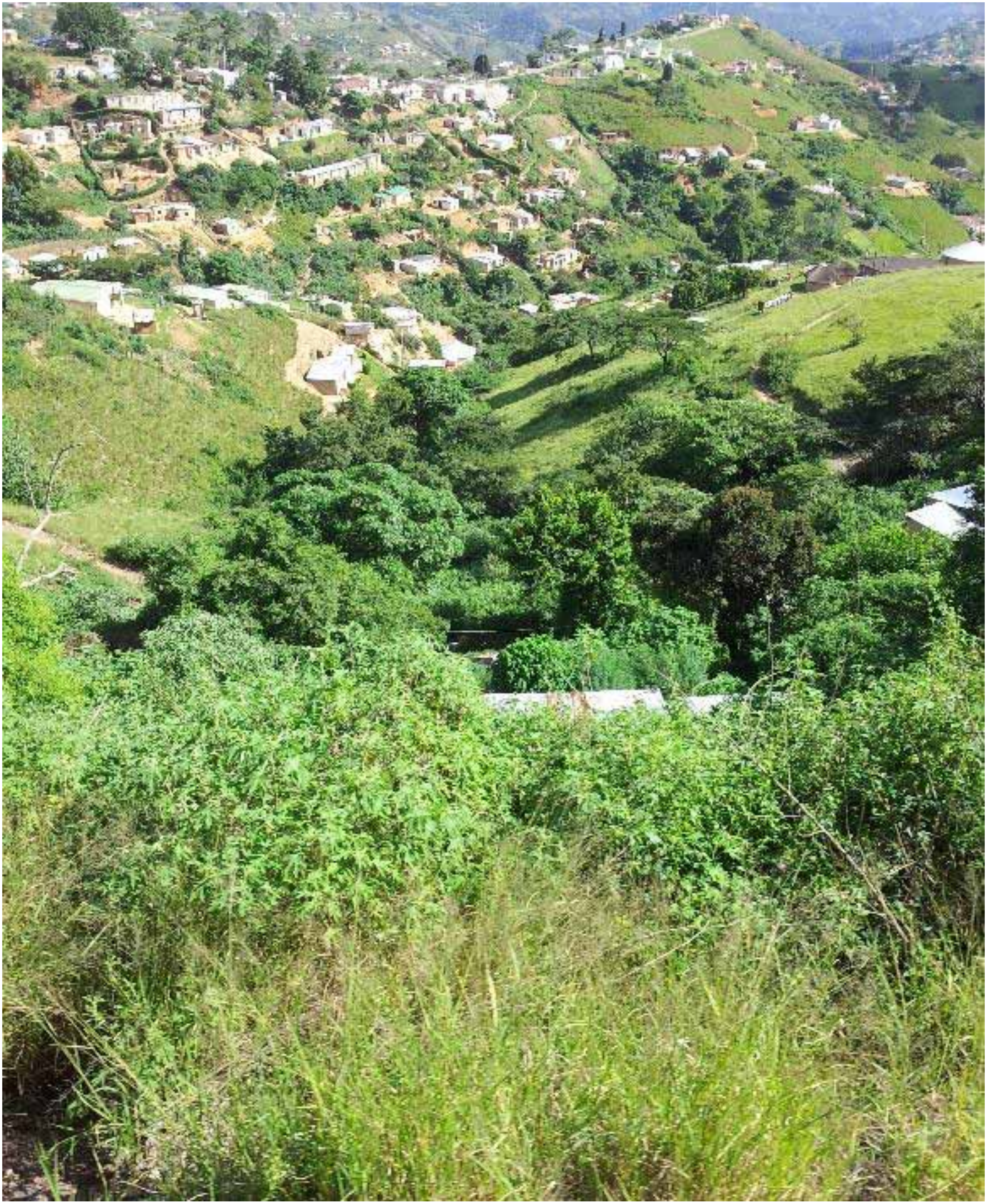

৯। ট্রেন থেকে দু'ধারের পাহাড়ি দৃশ্য অসাধারণ। তা সে GILLITIS-ই হোক...

১০। বা HILLCREST…

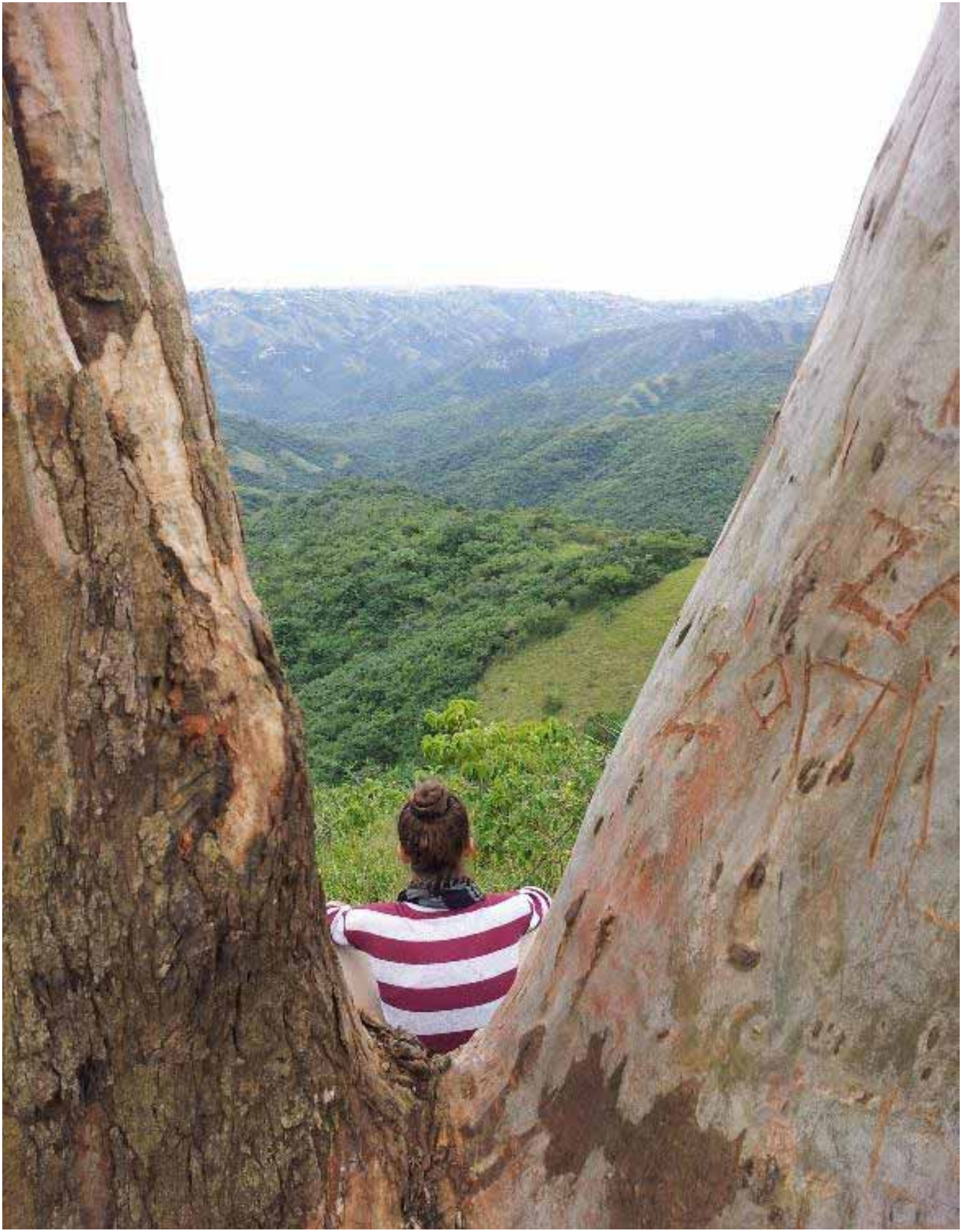

১১। কিংবা BOTHA’S HILL, যাকে VALLEY OF THOUSAND HILLS-ও বলে।

১২। KLOOF থেকে GILLITIS, HILLCREST, BOTHA'S HILL, DRUMMOND স্টেশন পার হয়ে এটা INCHANGA স্টেশন। অন্য স্টেশনগুলোতে এখন ট্রেন দাঁড়ায় না। সব মিলিয়ে মাঝের দুরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। পথে ৫২ মিটার লম্বা একটা ছোট টানেলও আছে– নাম DRUMMOND TUNNEL.

১৩। CHOO CHOO TRAIN INCHANGA পর্যন্তই যায়। এখানে এক ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপর আবার ফেরা।

১৪। কেবলমাত্র ওই দিন যাত্রীদের জন্য একটা ছোট হাট বসে স্টেশনের ধারে। ওরা বলে INCHANGA COMMUNITY CRAFT MARKET. আশপাশের গ্রামের লোকেরা তাদের নিজের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রী করেন এখানে।

১৫। ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হলে মুক্ত পরিবেশে খাবারের দোকানও অনেক।

১৬। এক ঘন্টার বিরতিতে ছোটোরা ইচ্ছা করলে ঘোড়ায়ও চড়ে নিতে পারে।

১৭। আর কেউ একটু WESLEY-তে বসতে চাইলে তার সাধও অপূর্ণ থাকে না।

১৮। INCHANGA স্টেশনেই মডেল দিয়ে তৈরি করা একটা রেল-মিউজিয়াম আছে। বাতিল হয়ে যাওয়া রেল লাইনের অনেক পুরোনো ইতিহাস জানা যায় এখানে।

১৯। দিনের শেষে ফেরার পথে কোচগুলো যে লাইনে দাঁড়ায় সেখানে কোনও প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যায় না। অগত্যা অস্থায়ী সিঁড়ি দিয়েই ট্রেনে ওঠা...

২০। ...এবং অবশেষে সাদা ধোঁয়ার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে WESLEY-র ফিরে আসা।

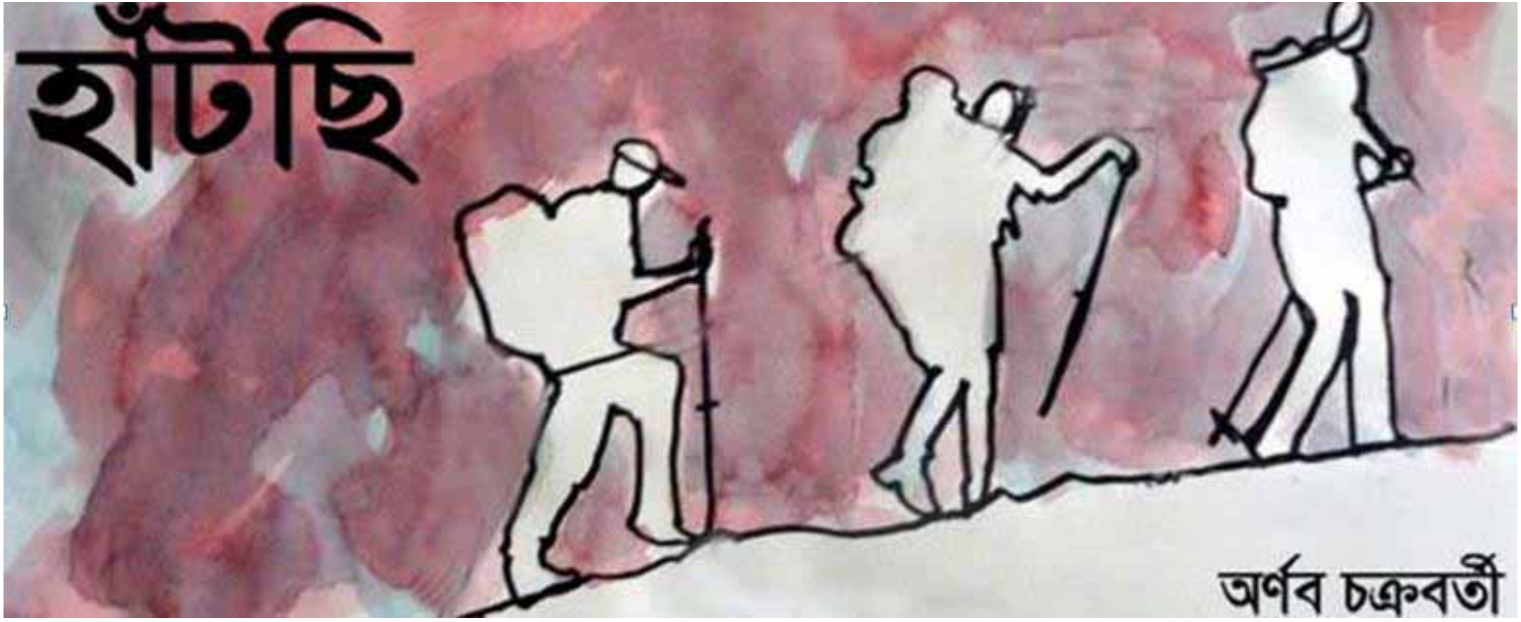

পৌরাণিক ক্ষেত্রে, একা ও কয়েকজন

সীমা গ্রাম ছাড়িয়ে এসেছি, দুপুর ধীরে ঢলে পড়ছে বিকেলের কোলে। ওসলা গ্রামের পাহাড়ি বন্ধু প্রকাশ জানায় - আরেকটু এগোলেই একটা সুন্দর চারণভূমি আছে, সেখানে তাঁবু ফেলা যাবে। অতএব আমরা এগোতে থাকি এবং শেষ দুপুরে পৌঁছই সেই আয়তক্ষেত্র চারণভূমিতে। সত্যিই সুন্দর এক ক্যাম্পিং মাঠ। যে পথ বেয়ে এসেছি তা ধুসর বিকেলের আলোয় পিছনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। সামনে রাস্তা কিছু দূর গিয়ে উঠে গেছে এক পাহাড়ি রিজের উপর। আগামিকাল আমরা ওই পথে এগোব। তার আগে আজকের দিনটা উপভোগ করি। দেখতে থাকি মেঘ সূর্যের ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা, মেঘের ঘুলঘুলি বেয়ে নেমে আসছে আলোর বর্শা, উপত্যকার মাথায় শিরস্ত্রাণের মত এক রামধনু জেগে ওঠে। বড়ো নিরাভরণ শান্ত এক প্রকৃতি যেন পা ছড়িয়ে বসে আমাদের সাথে, গালগল্প করে। অজান্তে সন্ধ্যা নেমে আসে ক্রমে।

ঐতিহাসিকভাবে স্বতন্ত্র এই তম সা উপত্যকা। ভারতবর্ষের একমাত্র অঞ্চল, যেখানে দেবরূপে দুর্যোধনের পুজো হয়। গাঙ্গোর, ওসলা গ্রামে দুর্যোধনের বহু প্রাচীন মন্দির আছে। ভাগ্যচক্রে পুরোলায় আমাদের সাথে গাঙ্গোর গ্রামের বিজয় সিং এর আলাপ হয়। আমাদের দলে মালবাহক হিসেবে তার অন্তর্ভুক্তি আমাদের সামনে এনে দেয় এক অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ। শাকরি গ্রাম থেকে সীমার উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা শুরু করি। কিছু গাঙ্গোরে পৌঁছে নদীর ধারে বিজয়ের কাঠের বাড়িতে থাকার নিমন্ত্রণ অযাচিতভাবে এসে পড়ায়, আমরা আর দ্বিতীয় চিন্তা না করে বিজয়ের আতিথেয়তা গ্রহ ণ করি। দুপুরের হালকা খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ির সামনের পাহাড়ি রাস্তার উপর শুরু হয় ছোটছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা, একটা কাঠের তক্তা আর টোল খাওয়া প্লাস্টিকের বল নিয়েই চলতে থাকে আমাদের দাপাদাপি। এরমাঝেই বিজয়ের ঘরওয়ালি আমাদের জন্য চা নিয়ে আসে। চা শেষ করে বিজয়ের তত্ত্বাবধানে আমরা নদীর অপর দিকে গাঙ্গোর গ্রামের দিকে হাঁটতে থাকি, মুল অভিপ্রায় গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে দুর্যোধনের মন্দিরটি দর্শন করা। প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গ ণে পৌঁছে দেখি, মন্দির বন্ধ। তবুও আমরা

সেই পাথরে তৈরি প্রাঙ্গণে মৃদু চালে হেঁটে বেড়াই, প্রাচীন এক সময় যেন চোখের সামনে ক্রমাগত পাপড়ি মেলতে থাকে, পাষাণে যেন শোনা যায় শত অশ্বক্ষুরের আওয়াজ, প্রতিজ্ঞা আর প্রতিশোধের ইতিহাস যেন নিভৃতে বয়ে চলেছে মন্দিরের আনাচে-কানাচে। এক অজ্ঞাত ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে নিজেদের ধনী মনে হয়, পরিপূর্ণ হয়ে সন্ধ্যার মুখে বিজয়ের বাড়িতে ফিরে আসি। অন্ধকার আর নদীর শব্দের ক্রো ড়ে বাড়িটিও যেন এক নতুন চরিত্র হিসেবে ধরা দেয়।

সীমা ছাড়িয়ে বেশ উঁচুতে এক আয়তাকার চারণভূমিতে আমাদের তাঁবু পড়েছে পরের দিন। রাত্রের খাওয়া সেরে তাবুর উষ্ণতায় শরীর এলিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ খুব সামনে অশ্বক্ষুরের দাপট টের পাই। যে নির্বিকার মেরুন-র ঙা
ঘোড়াগুলো বিকেলে চারণক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ তাদের শরীরে জেগে উঠেছে যেন যুদ্ধের দামামা। আমার মনে তখনো জেগে আছে বিকেলের মন্দিরের স্মৃতি, নিদ্রাহীন মনে হয়, যেন কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গ ণে শুয়ে আছি অসহায়। ইতিহাসের পরিখার বাইরে এলেই টের পাই, আমার মাথার ঠিক পাশ দিয়ে দামাল ঘোড়াগুলো তাদের তেজি ক্ষুরে লাগানো নালের অহঙ্কার ছড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। ভীতু আমি গায়ে জ্যাকেটটা চাপিয়ে টর্চ নিয়ে তাঁবুর বাইরে আসি। টর্চের আলো মেরুন-র ঙা এক মখমলি গাত্রে প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে আসে, আমি তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করি, সে আলোর পরিধির বাইরে মিলিয়ে যায়। তাঁবুতে ফিরে এসে স্বস্তির শ্বাস ফেলে চোখদুটি এক করতেই আবার মাথার ঠিক পাশে ধুলো উড়ানো দর্পের অনুভুতি জেগে ওঠে। শঙ্কিত আমি আবার তাঁবু ছেড়ে বে রিয়ে আসি, ইতিমধ্যে বিজয় তার তাঁবু থেকে বে রিয়ে আসে। আমার টর্চের আলোকে পিছনে রেখে হুশ হুশ হারারারা করতে করতে ঘোড়ার পিছনে তা ড়া করতে থাকে বিজয়। দু-এক মিনিটের মধ্যেই আমার দু-ব্যাটারির টর্চের আলোর পরিধির বাইরে এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে যুগপত সেই ঘোড়ার দল আর বিজয় মিলিয়ে যায়। জেগে থাকে তম সার

হাড় হিম করে দেওয়া হাওয়ার গর্জন। তাঁবুতে ফিরে আসি - স্লিপিং ব্যাগের ওমে শরীরটাকে ডুবিয়ে দিয়ে বেশ আরাম হয়। চোখে ঘুম নেমে আসে। স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাই, হর-কি-দুন উপত্যকা ছাড়িয়ে পান্ডবদল স্বর্গারোহিনী শিখরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর সেই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে অট্টহাস্যে উপত্যকা বিদীর্ণ করে দিচ্ছেন দুর্যোধন।

আন্দামান

প্রদীপ্ত ভক্ত

এ জায়গাটা প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর আগের সময়। মনে হয় যেন আমি টাইম ট্রাভেল করছি। ছোট্ট এয়ারপোর্ট। ঝকঝকে রাস্তা। গাছে গাছে ভরা শহর পোর্ট ব্লেয়ার। অমনি আমার ধোঁয়ায় মোড়া পানের পিকে ভরা কোলকাতা সামনে চলে এল , একই দেশ অথচ কত তফাৎ। আসলে আমার ভাঙাচোরা নোংরা শহরটাকে আমি বড্ড ভালোবাসি তাই যেখানে ভালো কিছু দেখি আমি মনে হয় আহা এটা যদি আমার শহরেও হত!

পোর্ট ব্লেয়ারে সব মেলানো মেশানো লোকজন । বাঙালি , তামিল, তেলুগু বাসিন্দা হিসেবে। আর ট্রাভেলার হিসেবে তো দেশের সব প্রদেশের লোকই । বিদেশিদের দেখা অবশ্য পাওয়া যায় না। তারা দ্বীপে ঘোরাঘুরি করে। হাসিখুশি ড্রাইভার ছেলেটা আমার বয়েসীই হবে , কিন্তু কী দারুণ গাড়ি চালায়! আমি আড় চোখে দেখেছি ক্লাচ ছাড়াই , ব্রেক কষে গাড়ি না থামিয়ে স্পিড কন্ট্রোল করছিলো। এহঃ আমি কবে পারবো এমন কে জানে।

যেই না সমুদ্রের ধরে এসেছি , আমি তো যাকে বলে বোব্বা। এ কী রকম কালার কম্বিনেশন রে বাবা! প্রথমে হালকা সবুজ , তারপর শিশিবোতলের মতো সবুজ তার পর কালি ডোবানো নীল। আরে আরে সামনের দিকের জল আবার এত পরিষ্কার সে জলের নিচে মাছ খেলে যাচ্ছে সেইটাও দেখা যাচ্ছে দিব্যি।

মাউন্ট হ্যারিয়েট যাওয়ার রাস্তায় একটা ঝিম ধরা জঙ্গল পড়ে। সুই টুই টুই করে একটা পাখি ডাকছে , জঙ্গলের নিস্তব্ধত বড় মায়াময়, দূরে রস আইল্যান্ডের লাইট হাউস , সাদা সি বিচ দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এখানে এই গাছের ছায়ায় যদি থেকে যাওয়া যেত!

ইন্টারনেট ছাড়া আট নয় দিন কাটানো সোজা কথা না এই বাজারে। তার মধ্যে আমার তো ফেসবুক চ্যাট এসব প্রায় নেশার পর্যায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু সবুজ গাছে মোড়া পাহাড় , নীল-সবুজ সমুদ্র , লাল নীল হলুদ মাছ, সাদায় কালোয় মেশানো কোরাল মুচকি হেসে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে , কী হে ! দেখি কেমন পার আমাদের ছেড়ে ওই অন্যকিছুতে ডুব দিতে। ভাগ্যিস সে চ্যালেঞ্জ আমি জিতিনি।

আন্দামান তো অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি । তা তাই বলে তার উত্তর দক্ষিণ নেই তা তো না। সবুজ দ্বীপের রাজায় পড়েছিলাম মায়াবন্দর বলে একটা জায়গার নাম । মনে গেঁথে গিয়েছিল। কীরকম মায়াময় নাম। এক বন্ধুর থেকে একটু খোঁজ নিয়ে গিয়েছিলাম তাই যাবার আগে। অনেকে ওইদিকটা যায় না। জায়গাটা চমৎকার। বিরাট একটা বন পেরিয়ে, ভেসেলে করে খাঁড়ি পেরিয়ে যেতে হবে। ওই বনে আবার জারোয়াদের বাস , তাই পাহারা টাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে , যাতে আমরা ওদের বিরক্ত করতে না পারি।

অবাক লাগে ভেবে মাঝে মাঝে , কষ্ট হয় , এতগুলো পূর্ণবয়স্ক লোক যাবে তাদের পাহারা দিতে হবে কেন ? কেন একজন মানুষ চিড়িয়াখানা বা অভয়ারণ্যের জন্তু দেখতে যাওয়ার মতো আরেকজন মানুষকে দেখতে যাবার জন্য তার ছবি তোলার জন্য উত্তেজিত হবে। বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিলো প্রায় হারিয়ে যেতে বসা জনজাতির জন্য। সব কিছু কেড়ে নিতে নিতে সামান্য এই জঙ্গলটুকুই তো ছিলো। আমরা নাকি সভ্য হয়েছি , অথচ অন্য মানুষকে সামান্য সম্মানটুকু করতে পারি না। আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে হয় পাচ্ছে অসভ্যতা করি।

ভোর ভোর বেড়িয়েছি , সূর্য ওঠেনি এখনও , জঙ্গল ঘুমোচ্ছে। কুমার , মানে আমাদের গাড়ির চালক- এর চোখেও ঘুম লেগে। জঙ্গুলে নৈঃশব্দ বুনো গন্ধ সব কেমন বদলে যায় রাতে আর দিনে এই রাস্তা ধরে যেতে গিয়ে টের পেলাম। মানে এই যে এখন যাচ্ছি রাতের অন্ধকারে এখনকার হাওয়ার

ঠান্ডা গন্ধটা অন্যরকম , পাতাদের শিরশিরে কথার আওয়াজ নেই। তারপর পারমিট নিয়ে যখন ব্যারাট্যাং এর পথে করেছি জারোয়াদের অঞ্চল দিয়ে তখন রোদ উঠেছে। হাওয়ায় ঠান্ডা আমেজ এখনো, তবে জঙ্গল জাগতে শুরু করেছে। নীল রঙের একটা পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল দেখি। আরে ব্যাটার লেজটা দেখ যেন ড্রোন উড়ছে একটা। কতরকম গাছ কত পাখি ডাকছে। আমি চোখ থাকতেও অন্ধ হয়েছিলাম কিনা , তাই শিখিনি এতদিন কোনো গাছের নাম , কোনো পাখির নাম। ভারী আফশোস হচ্ছিল যে কী গাছ কী পাখি যদি জানতে পারতাম ! ঠিক করেছি আমি ফিরে গিয়েই গাছ চিনব, পাখি চিনব। দূরে দেখি পরপর কয়েকটা গাছের পাতা এমন লাল রং ধরেছে মনে হচ্ছে লাল জঙ্গল। আরে আরে হলুদ পাখিটা (পরে জেনেছি ওটা আন্দামান বুলবুল) লাল গাছটায় বসে পুরো ইস্টবেঙ্গলের জার্সি বানিয়ে দিয়েছে তো। বাপরে বাপ্! কী করে লোকে পাখিদের ছবি তোলে কে জানে। আমি তো ক্যামেরা তাকে করলেই পাখিরা ফুড়ুৎ , মনে মনে নির্ঘাত জিভ ভ্যাঙায়।

ব্যারাট্যাং এ একটা চুণাপাথরের গুহা আছে। স্পিডবোটে করে দুই ধারের ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা খাড়ি পেরিয়ে পৌঁছনোটাই এত ভালো ছিল , পৌঁছে কী দেখব তার তাড়া আমার আর ছিল না। ছানা পাতাগুলোর সবুজ আর বড় পাতাগুলোর সবুজ দাঁড়িয়ে থেকে আলাদা শেড চিনিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বোটের ছেলেটা ওস্তাদ বোটুরে (এরম শব্দ হয়ত হয় না , কিন্তু আমার মাথায় একে বোটুরে বলে ডাক এসেছে) , কাত করে দিচ্ছে এক একবার , জল এসে মুখে ছিটোচ্ছে আর এক এক করে বাকি বোটদের কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আকাশে তাকিয়ে দেখি একটা বড় কোন পাখি। চিল হতে পারে, বাজ হতে পারে। আমি জানি না। পরে খুঁজেও পাইনি।

স্পিডবোটটা গোঁত খেতে একটা সরু খাঁড়িতে ঢোকার পর ব্যাপারটা ছমছমে হয়ে গেল । এমনকি স্পিডবোটের গোঁ গোঁ আওয়াজ যেন সঙ্কুচিত। বাঘ নেই এখানে তবে কুমির আছে।

একবার একটা সিনেমা দেখেছিলাম। একদল লোক গেছে এক্সিপিডিশনে , গুহার মধ্যে অন্ধকারে চলতে চলতে তাছাড়া নানারকম বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তাদের মনোবল কমে আসে একসময়। তারপর অবশেষে একদিন সূর্যের আলোয় ফেরে দলের মাত্র দু 'জন। কোনো গুহায় গেলেই আমার সেই সিনেমাটার কথা মনে প ড়ে। খুব বড় না , বোরা গুহালুর তুলনায় একদম ছোট্ট কিন্তু তার মধ্যে প্রকৃতি চমৎকার হাতের কাজ দেখিয়েছে। কতকাল ধরে পাথরে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে, হাওয়া দিয়ে স্ট্যাল্যা কটাইট স্ট্যালাগমাইট এর নানা আকার তৈ রি হয়েছে। লোকে তাতে গণেশ থেকে বুদ্ধ সব মূর্তি দেখছে। আমি একটু একপাশে সরে গিয়ে মোবাইল টর্চ জ্বেলে খুঁজতে চেষ্টা করছিলাম যদি আর কিছুর আকার খুঁজে পাই। বেশ একটা খেলার মত। আমি তিন চোখওয়ালা দৈত্য , ইউনিকর্ন, একটা হেলিকপ্টার এমনকি একটা স্পাইডারম্যান অব্দি খুঁজে পেয়েছি। যা খুঁজবে তাই পাবে।

দুপুরবেলার জঙ্গল ঝিম ধরানো। এই গভীর জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী নেই কোন। পোষা হাতি, অল্প দু'একটা হরিণ, বুনো শুয়োর আছে কিছু। আর আছে ছোট ছোট গ্রাম। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো দু'তিন মাইল হেঁটে হেঁটে দিব্যি স্কুল চলেছে। এক মক্কেল দেখি লাফিয়ে লাফিয়ে একটা কাঠবেড়ালিকে ধাওয়া করেছে। তার দাদা হাঁক দিচ্ছে , স্কুলের দে রি হয়ে যাচ্ছে বলে। চারিদিক ভারী শান্ত । যেন কোনো চিন্তা নেই , লড়াই নেই । বনের মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম , পুলিশ চৌকি , স্কুল , বাড়ি । কোথাও বাহুল্য নেই । বরং এখানে যে চকমিলানো বাড়ি বা ঝকঝকে দোকানপাটই বেমানান। খাওয়ার

দোকানগুলোও সব ভারী ছিমছাম , আর সবার মধ্যেই একটা আন্তরিকতার সুর ।

হ্যাভলক যাবার পথে উড়ুক্কু মাছ দেখলাম । আমি সিনেমা আর ন্যাট জিওর বাইরে আগে দেখিনি কখনও উড়ুক্কু মাছ । ফড়িংএর মতো , বা ক্ষুদে জেট প্লেনের মতো সাঁই সাঁই করে উড়ছে ব্যাটারা। দূরে দ্বীপগুলো কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে , রবিনসন ক্রুসোর মত আমি যদি ওরকম দ্বীপে গিয়ে পড়তাম!

আমাদের স্কুবা ডাইভ করতে নিয়ে যাবে যে ছেলেটা নাম লীলা। বোঝো ! আমরা জানি লীলা মেয়েদের নাম হয় I ছেলেদের নামও হয় তা জানতাম না। দক্ষিণ ভারতীয় ছেলেটা খুব সুন্দর করে আমাদের সব বুঝিয়ে দিল I জলের নীচে কথা বলা যাবে না। সুবিধে অসুবিধে বোঝাতে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হয়। অল্প জলে বুঝিয়ে দেওয়ার পর ভাসাতে ভাসতে নিয়ে গিয়ে টুপ্ করে ডুবিয়ে দিল I আর ডুব দিতেই সে এক অপূর্ব পৃথিবী। ঝাঁক ঝাঁক নীল হলুদ , কালো লাল সব মাছ ঘুরছে। কোরালগুলো তো আমি ভেবেছি পাথর বুঝি । জ্যান্ত কোরাল কেউ কেউ আবার সরে সরে যাচ্ছিল আমাদের হাতের ছোঁয়ায়।

জলের নিচের ওই জগতে গিয়ে আমার ভারী সাধ হয়েছে ডুবু রি হবার। এখানে সমুদ্রের ধারে গাছপালা ভরা , নোংরা আবর্জনা ফেলে নষ্ট হয়ে যায়নি সি বিচ । এক সি বিচের ধারে বসে বসে সূর্যাস্ত দেখছি, নীল জলের পরে পাহাড় তার পিছন লাল টুকটুকে , হাঁসের ডিমের কুসুমের মত সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে । তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেভুল লাগে । তারপর টুকটুক করে এগিয়ে দেখি , দু ভাই বোনে চায়ের দোকান দিয়েছে। বোনের আবার দাদার উপর ভরসা কম। ঠিকমত গ্লাস ধুচ্ছে কিনা , চায়ে চিনির পরিমাণ ঠিক দিচ্ছে কিনা সে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম , “কীরে স্কুল ফাঁকি দিয়ে এইসব হচ্ছে ? অ্যাঁ?” মেয়েটা ছোট হলে কি হবে বে শি স্মার্ট । ফিক করে হেসে বলে , “দূর কিছুই জানো না তুমি I আমরা তো স্কুলের পরে এখানে এসেছি। আমাদের স্কুল ছুটি হয় তিনটের সময়।” বলে আবার খানিক ফিক ফিক হাসি । হাসছে কেন জানতে চাইলে সে কিছুই বলে না । খালি হাসে। জানা গেল তিনি এখন সিক্সে পড়েন। “দাদা কোন ক্লাসে পড়ে রে?”

ফিকফিক হাসি চেপে গম্ভীর স্বরে জানাল দাদা পড়ে না ।

“সে কী রে ? তুই ব্যাটা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিস এক্ষু ণি! অ্যাঁ? ” বোনটি জবাব দিলেন

তড়িঘড়ি, "দাদা নাইন অব্দি পড়েছে, আসলে এবার ক্লাসে উঠতে পারেনি তো তাই . . . "

ওদিকে দাদা তো চোখ বড় বড় করে বোনকে থামাতে চাইছে। শিগগির একটা যুদ্ধ লাগল বলে। আমি তাড়াতাড়ি দাদাকে বললাম, "আরে তাতে কী?, এক ক্লাসে বেশিদিন থাকলে স্কুল ছাড়তে হয় নাকি? পরের বার নতুন ক্লাসে না উঠলে তো নতুন গল্প হবে না।"

কী জানি কী ভাবল! আমায় বলল, "আমি স্কুবা শেখাব আর একটু বড় হলেই।"

ঝকঝকে স্বপ্নমাখা চোখজোড়াকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, "বেশ বেশ। কিন্তু লেখাপড়াটা পাশাপাশি চালিয়ে গেলে আরো দূরের দূরের সমুদ্র নিয়ে জানতে পারবি তো রে ব্যাটা।"

লাজুক ছেলেটা নিজের স্বপ্নটুকু বলেই ভারী লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল, তাই ফের মাথা নামিয়ে ফেলল চটপট। আমি তার পিঠে চাপড় মেরে এগিয়ে গেলাম।

একটু পরে শুনি কিসের একটা হইচই। এগিয়ে গিয়ে দেখি, একজন ট্যুরিস্ট গাছের ডালে হোঁচট খেয়ে পড়েছে। আর এই ছেলেটা দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে টেনে তুলছে তাকে, বসাচ্ছে নিয়ে গিয়ে। ভাগ্যিস এ জঙ্গুলে জায়গায় আছে, অবারিত সমুদ্র আর গাছপালার ছায়ায় এখনো ভাগ্যিস ও তথাকথিত স্মার্ট হয়ে ওঠেনি। ভালো থাকিস, স্কুলে যাস বা না যাস এরকমই থাকিস, ভালো মানুষ হয়ে।

দেশবিদেশের ভূত

দেশ

বিরিকা

চেহারায় ছোটোখাটো। লালরঙের কাপড় পরে। খোঁচা খোঁচা রক্তমাখা দাঁত। রাত্তির হলে কখনো কখনো কোন বাড়ির সামনে তার আবির্ভাব হয়। বিটকেল শব্দ করে খানিক ঘোরাফেরা করে সে উধাও হবে ফের। যার বাড়ির সামনে সে তেমন করল, সে বাড়িতে এরপর কারো মৃত্যু হবেই। লোকজন ভিরিকাকে চটাতে চায় না তাই। রেগে গেলে সুস্থসবল মানুষের বাড়ির সামনে এসে রাতে একবার নাচ দেখিয়ে গেলেই চিত্তির। সে বাড়ির মানুষ হোক, গরুভেড়া হোক, কেউ একটা অসুখে পড়বে আর মারা যাবে।

বছরে একবার করে গুড়, ভাত আর একখানা লাল শাড়ি দিয়ে তাই তার পুজো করা হয়। ভুলে গেলে মহা বিপদ। তখন ক্ষেপচুরিয়াস ভিরিকাকে ঠাণ্ডা করতে “কানি” পুরুতের ডাক পড়ে।

বিদেশ

ভিলকাসি

লাটভিয়ার ভূত। বেজায় ভয়ংকর। অভিশপ্ত কোন মানুষের ঘুমের মধ্যে তার শরীর থেকে বের হয়ে আসে। লাটভিয়ানরা বিশ্বাস করে তাদের ভগবান যদি কোনো লোকের ওপর ক্ষেপে ওঠে তাহলে ঘুমের মধ্যে তার আত্মার অন্ধকার দিকটা একটা নেকড়ের চেহারা নিয়ে বের হয়ে আসে। সে নেকড়েকে অস্ত্র দিয়ে মারা যায়। কিন্তু মুশকিল হল, এমনি নেকড়ের চেয়ে সে অনেক বেশি হিংস্র আর চালাক হয়। তবে কেউ কেউ আবার তাকে কাজেও লাগায়। ধর কোন শিকারী যদি একটা ভিলকাসিকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে তখন তার চারপাশে গোলাপের পাপড়ির একটা বৃত্ত বানিয়ে দিলেই ভিলকাসি ঠাণ্ডা। শিকারীর হুকুমের চাকর হয়ে সে তখন গুপ্তধন খুঁজে দেবে তাকে মাটি শুঁকে শুঁকে।

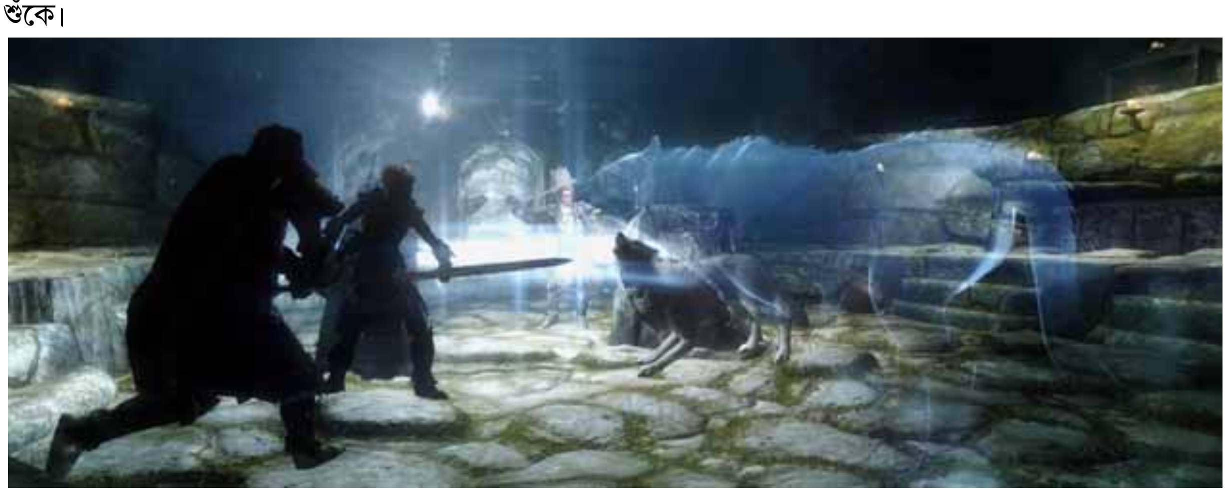

পার্ক স্ট্রিট গোরস্থান

সুজয় রায়

ওয়ারেন হেস্টিংস তার স্কুলের মিত্র ও পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইম্পের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। সেদিন কলকাতার মানুষ শিউরে বলে উঠেছিল "ওরে বাপরে! সেদিন কোনো কলকাতাবাসি গঙ্গাস্নান করে পাপ না ধুয়ে ফেলে বাড়ি ফেরেনি্‌। ব্রক্ষহত্যার পাপ লাগল মহামান্য হেস্টিংসের গায়ে। তাই সে মরে ভূত হয়ে আলিপুর হেস্টিস হাউসে হানা দিল। জাঁদরেল লর্ড কার্জন আর কটন সাহেব কলকাতার ইতিহাস কাঁপা হাতে বিবরণ লিখে গেছেন, যে দুপুর রাতে বাড়ির সংলগ্ন বাগান মথিত করে চার ঘোড়ার গাড়ি চেপে হেস্টিংসের প্রতাত্মা হাজির হতো। এবার সারা বাড়িতে ছোটাছুটি ও উন্মাদ নৃত্য করত সে। একটা বাক্সের সন্ধানে। ১৭৮৭ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে জি জি, অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল হারানোপ্রাপ্তি কলমে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন যে একটা কাঠের হাতবাক্স হারিয়েছেন দলিল, ও দুটি ছবি, কেউ সন্ধান দিলে উপযুক্ত পুরস্কার পুরস্কার পাবে।

মা বলেন খাঁ খাঁ দুপুর, উষা-ভোর, তিন-সন্ধ্যা হ'ল অশরিরী অতৃপ্ত আত্মাদের জেগে ওঠার প্রহর। মা বলেন এই সময়ে মাঠে ঘাটে যেতে নেই, দাওয়ায় চুল খুলে শুতে নেই। শনিবার প্রেতসিদ্ধ বার। নন্দকুমার অভিযুক্ত হয়েছিলেন শনিবারে , কারায় রুদ্ধ হন শনিবারে , এমনকি ফাঁসিও হয় শনিবারে। ভাদ্র মাস সামলে চলো। আজকের পার্ক স্ট্রিট প্রথমে তার নাম ছিল Burial Ground। আমার ভূত দেখার একটা অবিবেচক ক্ষিদে আছে। সেই খেয়ালে কবরখানায় ঘোরাঘুরি করি, ছবি তুলি, কিন্তু অশরীরির সাক্ষাৎ পাইনি তো !

... সাউথ পার্ক স্ট্রিট কবরস্থান। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, আকাশ ঘোলাটে, বেশ জোর বাতাসে মস্ত গাছের পাতায় সাঁই সাঁই আওয়াজে অনেক দিনের দীর্ঘশ্বাস যেন গুমরে উঠছে। এক ঝাঁক কাক যেন কাকাদের ডাক দিয়ে দুরের গাছে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই যেন বিছুটির জ্বালায় ছিটকে ডানা মেলল আকাশে। ক্যামেরা উদ্যত করে সেদিকে পা বাড়াই। এই সময় কে আসছে পিছু পিছু একরাশ শুকনো পাতা মাড়িয়ে প্রায় কবর ফুঁড়ে উঠে? এক দীর্ঘকায় পুরুষ।শুকনো গলায় বলি, 'আপ?

" - 'জি ইখানেই থাকি। ই কবরখানায় ।" অজানা মানুষটি বলল। তার মুখের দিকে তাকাবো কী, কলজের জোর পাচ্ছিনা। আজ শনিবার, ভাদ্র মাস, তিন সন্ধ্যা সময়, ভূতপ্রেতের মাহেন্দ্র যোগ। 'একটা বিড়ী হবে?' বলে সে। লম্বা লোমশ হাত মেলে ধরে। হাতের তালুতেও লোম তার! সিগারেট এগিয়ে ধরি, মুখের পানে তাকাতে সাহস যাচ্ছেনা। "একালের বাবু, তোমার ভূত দেখার শখ। কামেরা হাতে হামেশা দেখতে পাই। কব্বর লিয়া লিখন কাজ, ভাল কথা, আমাগো লিয়ে সুখ-দুখের দুটি কথা লিখবা ?"

আমার পা নড়ছেনা, কথা সরছেনা। আর্তস্বরে বলি, "আপনাকে লিয়ে ?" - এবার অজানা সেই না-মানুষ(?) বলে, " অ আপনার জাত যাত যাবে তাতে ? আপনার সাহেব ভূতে শখ বেশি বটে। কীই বা লিখবা আমাগো লিয়া, আমাদের নসিব ফতে হয়ে গেছে লবাবের সনে। মুর্শীদাবাদের সিরাজ আইলেন কলাত্তায়, আমার বাবজানরা তার ও নানা আাইল সাথে। মস্ত লড়াই হইল। সাহেব, মেমসাহেব পলাইল ফলতায়। আমাগো ডেরা পড়ল লালদিঘির ধারে হোগলা পাতার ছাওনিতে।" বোঝা গেল এ মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ির নাতিপো।

"কিন্তু খোদাতাল্লা নারাজ, সাহেব সুবারা ফিরি আইল এই শহরে। আমার লোকেরা গায়েব হইয়ে গেলেন। আমি এখন ইখানে। _ আমাগো বাড়ি? সাহেবদের কাগজে লিখেছিল দু কুড়ি এক বছর আগে লাট সাহেবের লগে লাল মুখো সাহেবরা আমাগো বাড়ি টপ কইরা লিয়া গেছে। ফিন একদিন ইখানে আইস, বলব তুমায় পুরানো কব্বরেরকথা।"

আর তাকাইনি ফিরে তার পানে। মা বলতেন পিছনে কে আসছে তার দিকে ফিরে তাকানো অলুক্ষণে কাজ। কবরস্থানের লোহার গেট ক্যাঁচ করে খুলে ছুটে পালিয়ে চলি ফুটপাথ ধরে। কিন্তু শরীরে পেছন থেকে একটা হ্যাঁচকা টান, এবার বাধ্য হয়ে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়। বয়স্ক শীর্ণ একটি লোক যেন নিয়মিত Nux Vomica খাওয়া খিটখিটে মেজাজে খেঁকিয়ে বলল, "এত তাড়া কিসে , ভূতে পেয়েছে নাকি ?"
তার ছাতার ব্যাকানো বাট দিয়ে আমার কাঁধ আটকে ধরেছে।...

কয়েকদিন পরে ভূতের নাকি সুরে কথাগুলো সত্যি-মিথ্যা যাচাই করতে 'দ স্টেটসম্যান ' কাগজের দপ্তরে পুরানো সংবাদের কবর খোঁড়াখুড়ি শুরু করে দিলাম। নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো। দু কুড়ি এক বছর আগে ১৯১৫ সালের হলদেপানা জীর্ণ কাগজের বান্ডিল নিয়তির টানে যেন ওল্টানো শুরু হল। কয়েকদিন চলল কাগজে চাল বাছবার কাজ। ১৯১৫ সালে ২৪শে অক্টোবরের বিবর্ণ কাগজের পাতা হাতে আসতেই জোর ঘেমে উঠেছি। পেছন থেকে কাঁধের ওপর দিয়ে কে যেন গলা বাড়িয়ে দেখছে কাগজের দিকে। আমি পড়লাম কলকাতায় ক্লাইভ স্ট্রিটে পুরানো রয়েল এক্সচেঞ্জের ভিত খনন করতে গিয়ে দু'খানা কুয়ো বেরিয়ে পড়েছে, প্রতিটি কুয়ো প্রায় কুড়ি ফুট

গভীর। অনুমানিক প্রায় দেড়শো বছর পুরানো। এইখানে একসময় একটা বস্তি ছিল। পরে রয়েল এক্সচেঞ্জের বাড়িতে হেস্টিংস ও ক্লাইভ মর্যাদাভরে বাস করে গেছেন।

খবরটা পড়তে গিয়ে যেন ঘরে বিদ্যুতের আলো নিভু নিভু, ফ্যানের পাখা থেমে আসছে, ঘরের মানুষগুলো যেন ফটো নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। খবরে সত্যের সামনে পড়ে এবার প্রায় ছুটে বেড়িয়ে আসি কাগজের দপ্তর থেকে । "একটা বিড়ি হবে ?"- কে যেন কাছ থেকে ডেকে বলে। বহু পুরানো কবরে চাপা থাকা মাটির গন্ধ নাকে এল। ছুটে একটা চলন্ত ট্রামে চেপে বসি। এখন অফিস পাড়া, তবু যেন ভিড়ের মাঝে আমি একা। অতি দীর্ঘ পুরানো কালের ব্যাবধান অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ির নাতিপো আমাকে পেতে চাইছে।
(ঋণ স্বীকার : 'কলকাতা' - শ্রীপান্থ)

ফিবোনাচি সংখ্যা

কাব্য থেকে অঙ্ক

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব চারের শতক পিঙ্গলমুণি একটা পুঁথি লিখেছিলেন। তার নাম চন্দ্রশাস্ত্র। সংস্কৃতভাষায় সেই হল প্রথম ছন্দশাত্র বা প্রসডি।

ছন্দ চলে অঙ্কের তালে।তাই নানাজাতের ছন্দের কথা বলতে গিয়ে তাঁকে অঙ্কের প্রসঙ্গ আনতেই হয়েছিল সেখানে।

ওই কেতাবেই প্রথম ছোট এবং বড়ো সিলেবল এ তৈরি নির্দিষ্ট ধাঁচের বিভিন্ন মিটার বা কবিতার ছন্দচাল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির উল্লেখ করেন তিনি। (বাইনারি মানে হল আমরা এখন যাকে ০,১ এ তৈরি কমপিউটারের ভাষার মূল হিসেবে জানি। পিঙ্গল তাদের নাম দিয়েছিলেন লঘু আর গুরু।) ওর শুরু হয় '১' দিয়ে যাকে তিনি বললেন "চারটে হ্রস্ব সিলেবল-(লঘু-লঘু-লঘু-লঘু বা ০-০-০-০)", এইরকম করে। অবশ্য লঘুর বদলে শূন্যর ব্যবহার হয় এর এগারোশ বছর পরে ব্রহ্মগুপ্তের আমলে।

এই করতে গিয়ে পিঙ্গলমুণি একজায়গায় একটা রহস্যময় চালের কথা বলে গিয়েছিলেন ধাঁধার ভাষায়। সেইটে হল মাত্রামেরু। তার রূপের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, এ হল, "মিশ্রছন্দৌ চ" বাংলায় যার অর্থ হবে দুটো ছন্দের মিশেল। পরবর্তী সময়ে ওর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পণ্ডিতরা বলেন, ও হল গিয়ে এমন একখানা চাল যাতে তুমি যদি

দশ নম্বর বিটে মাত্রাসংখ্যার হিসেব চাও, তাহলে তা হবে ন নম্বর বিটের লম্বা সিলেবল এর মাত্রা সংখ্যা আর আট নম্বর বিট এর ছোটো সিলেবল্ এর মাত্রাসংখ্যার যোগফল।

এবার চলে আসা যাক টাইম মেশিনে চেপে ১২০২ সালের ইউরোপে। সেখানে ফিবোনাচি নামে এক গণিতবিদ খরগোশের সংখ্যা নিয়ে বেজায় মাথা ঘামাচ্ছিলেন। তাদের সংখ্যা বাড়ে কোন চালে? বেচারা নোয়া যে তার জাহাজে একজোড়া খরগোশ তুলে অন্য প্রাণীদের আনতে গিয়ে কিছুদিন বাদে ফিরে এসে দেখে জাহাজভর্তি খরগোশ হয়ে গেছে সে সংখ্যাবৃদ্ধি ঠিক কোন পথে ঘটল সেইটেই বোঝা ছিল তাঁর ফন্দি। ধরো নোয়া একজোড়া সদ্যোজাত খরগোশকে জাহাজে তুলল। একমাস বাদে তারা বড়ো হল। দুমাসের মাথায় খরগোশ দম্পতির একজোড়া ছেলেমেয়ে হল। তারপরে মাসে তাদের আরেক জোড়া ছেলেমেয়ে হল। তার পরের মাসে তাদের প্রথম প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এক জোড়া ছেলেমেয়ে জন্মাল। ফিবোনাচি জিজ্ঞাসা করলেন, যদি একটাও খরগোশ না মরে তাহলে এক বছরের শেষে মোট কটা খরগোশ হবে?
নিচের ছবিটা দেখঃ

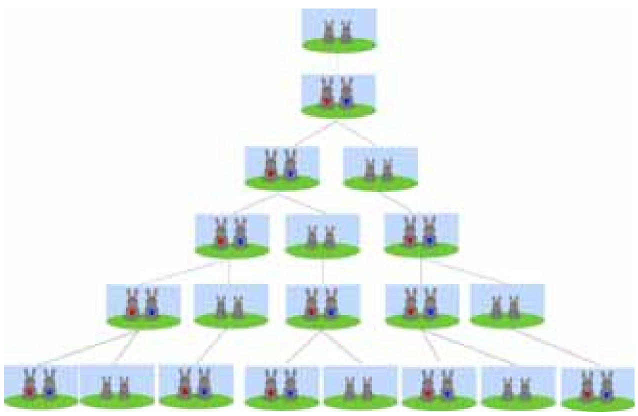

খেয়াল করলে দেখবে যেকোন মাসে যে ক'টা খরগোশ থাকছে তার সংখ্যা আগের দুটো মাসের খরগোশের মোট সংখ্যার সমান।

সহস্রাব্দির আগে পরে, কবিতার মাত্রামেরু ছন্দ আর খরগোশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অঙ্কে দেখা গেল একই ধরণের নিয়ম মেনে আগের দুটোর যোগফল হলে পরেরটা পাওয়া যায় এমন সংখ্যা মিলছে।

এই যে অদ্ভুত একটা সংখ্যার ধারা – ০,১,১,২,৩,৫,৮,১৩,২১---- যাতে প্রত্যেকটা সংখ্যা তার আগের দুটো সংখ্যার যোগফলের সমান তাকে বলে ফিবোনাচি সিরিজ।

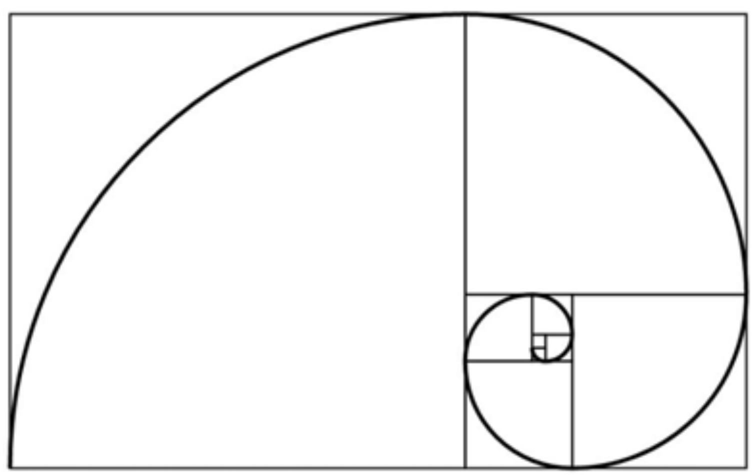

এই ফিবোনাচি সিরিজকে ছবিতে দেখালে এইরকম লাগে।

এখানে কতগুলো বর্গক্ষেত্র তৈরি করা আছে যাদের বলে ফিবোনাচি টাইল। এদের আয়তন ফিবোনাচি সংখ্যা মেনে তৈরি। সবচেয়ে ছোট্টোটার আয়তন, ১, তারপর,১, তারপরেরটার আয়তন ২ এইভাবে। এবার যদি তুমি তাদের কর্ণগুলোকে পরপর জুড়ে দাও তাহলে এই প্যাঁচালো ছবিটা তৈরি হয়ে যাবে নিজে নিজেই।

বেশ শামুকের খোলের মত লাগছে না? ঠিক। শামুকের খোলে যে প্যাঁচালো ছবিটা সেইটেকে যদি তুমি কাগজে ধর, তাহলে তা ঠিক এই ভাবে সাজানো বর্গক্ষেত্রদের সঙ্গে হিসেবে মিলে যাবে। অংকের ভাষায় একে বলে গোল্ডেন স্পাইরাল। তবে ওর অংকটা এইখানে দেয়া যাবে না। বেজায় কঠিন। তার চেয়ে ছবিটা দেখে অঙ্কের

আন্দাজ বোঝা সহজ। কী বেজায় মজার ব্যাপার! একটা বেচারা শামুক, কিচ্ছু না জেনেই এমন একখানা অঙ্ককে তার খোলায় বয়ে নিয়ে বেড়ায়! কী করে হয়? ম্যাজিক! আসলে সবচেয়ে বড়ো ম্যাজিশিয়ান তো প্রকৃতি নিজে, তাই না?

এ সংখ্যাদের অনেক মজার গুণ আছে। যেমন ধর, ৫ থেকে শুরু করে সমস্ত ফিবোনাচি সংখ্যাই হল গিয়ে এমন কোন না কোন সমকোণী ত্রিভূজের অতিভূজের মাপ, যাদের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য পূর্ণসংখ্যায় হয়।

ফিবোনাচি সংখ্যাদের একেবারে প্রকৃতির নিজস্ব গণনাপদ্ধতি বলা যায়। প্রকৃতিতে, গাছের পাতার সজ্জা, ফুলের পাপড়ির সজ্জা, পাইনকোনের মধ্যে ছোটোছোটো বৃন্তগুলোর সজ্জা, আনারসের চোখের সজ্জা-এই সবকিছুই, যা বেঁচে থাকে ও বেড়ে ওঠে তাতে এ সংখ্যার উপস্থিতি। বেচারা গাছেরা তো আর অঙ্ক জানে না, তারা শুধু যেভাবে বাড়বৃদ্ধি হলে সবচেয়ে কম শক্তি খরচে সবচেয়ে বেশি ফল মিলবে সেই রাস্তাটা অনুসরণ করে বেঁচে থাকে। আর প্রকৃতি মা নির্ধারণ করে রেখেছেন যে সেই পথটাই হল ফিবোনাচি সংখ্যার পথ।

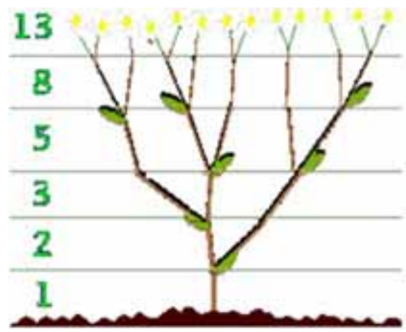

গাছের ডালে পাতা বেরোয় যে দূরত্বগুলোতে সেগুলোকে কাগজে আঁকলে দেখা যাবে তারা ওই গোল্ডেন স্পাইরালের বিভিন্ন বর্গক্ষেত্রের কোণগুলো ধরে গজায়। কারণ তারা দেখেছে ওতে করে সব পাতাগুলো সূর্যের আলো সবচেয়ে বেশি করে পায়।

একভাবে গাছের ডালগুলোও সেই কায়দা অনুসরণ করে ছড়ায়, যাতে তার গায়ে গজানো পাতারা সবচেয়ে বেশি সূর্যের আলো পায়। সঙ্গে তার ছবি দিলামঃ

সূর্যমুখীর বীজগুলোও ওই একই নিয়মে সজানো থাকে তার বীজধারক অঞ্চলে, কারণ তাতে করে সবচেয়ে কম জায়গায় সবচেয়ে বেশি বীজ সাজানো যায়। পাইন কোণের বৃন্তগুলোকে দেখলে দেখা গেছে ওতে আবার তারা দুটো জড়াজড়ি করা গোল্ডেন স্পাইরালে সাজানো। একটা ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে, অন্যটা তার বিপরীতে।

গোলাপফুলের পাপড়িরা তো আবার ভেতর থেকে বাইরে এইসজ্জায় একেবারে হুবহু ফিবোনাচি সজ্জাকে মেনে চলে। সঙ্গে তার ছবি দিলাম।

প্রাণীজগতে, শামুকের খোলায় গোল্ডেন স্পাইরালের উপস্থিতির কথা তো আগেই বলেছি। ওতে করে খোলার ভারসহন ও ঘাতসহতা সবচেয়ে বেশি হয়। অন্যদিকে ডলফিন তার চোখ, পাখনা আর লেজের মধ্যেকার দূরত্বকে সাজিয়েছে ফিবোনাচি সংখ্যায়। তাই তার দেহগঠন জলচর সব জীবদের মধ্যে অত্যন্ত ভারসাম্যযুক্ত হয়ে ওঠে।

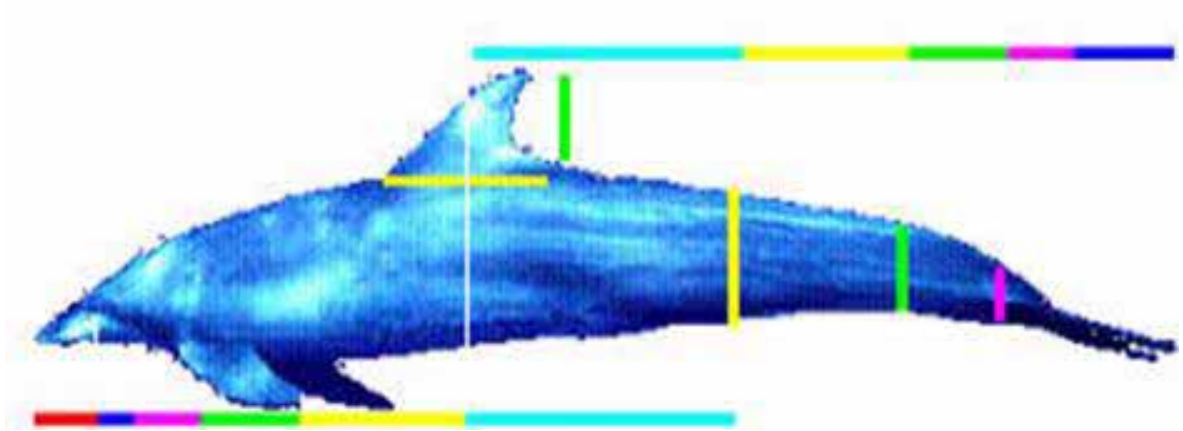

মানুষের ক্ষেত্রেও গোল্ডেন রেশিওর আবির্ভাব ঘটেছে। কানের ভেতরের ককলিয়া গড়ে উঠেছে গোল্ডেন স্পাইরালকে মেনে, বাহু আর হাতের তুলনামূলক দৈর্ঘ্যও ফিবোনাচি সংখ্যাকে মেনে চলে।

তাহলেই বোঝ, প্রকৃতিতে কত গভীর অঙ্কের রহস্য বসে আছে, মানুষের আবির্ভাব, তার হাতে অঙ্কের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকে এমন মজার একটা অঙ্ক দুনিয়ায় আছে, আর অজস্র উদ্ভিদ আর প্রাণী বেঁচে থাকবার সেরা রাস্তাটা খুঁজতে গিয়ে নিজের শরীরের নানান বস্তুকে সাজিয়ে চলেছে ক্রমাগত সেই রহস্যময় সংখ্যাসারি আর তার চিত্ররূপের পথে।

ভালো ম্যাজিক, নয়?

পরের সংখ্যায় নতুন ম্যাজিক–কলনবিদ্যা।

র‍্যান্ডম সংখ্যার খেলা (২)

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

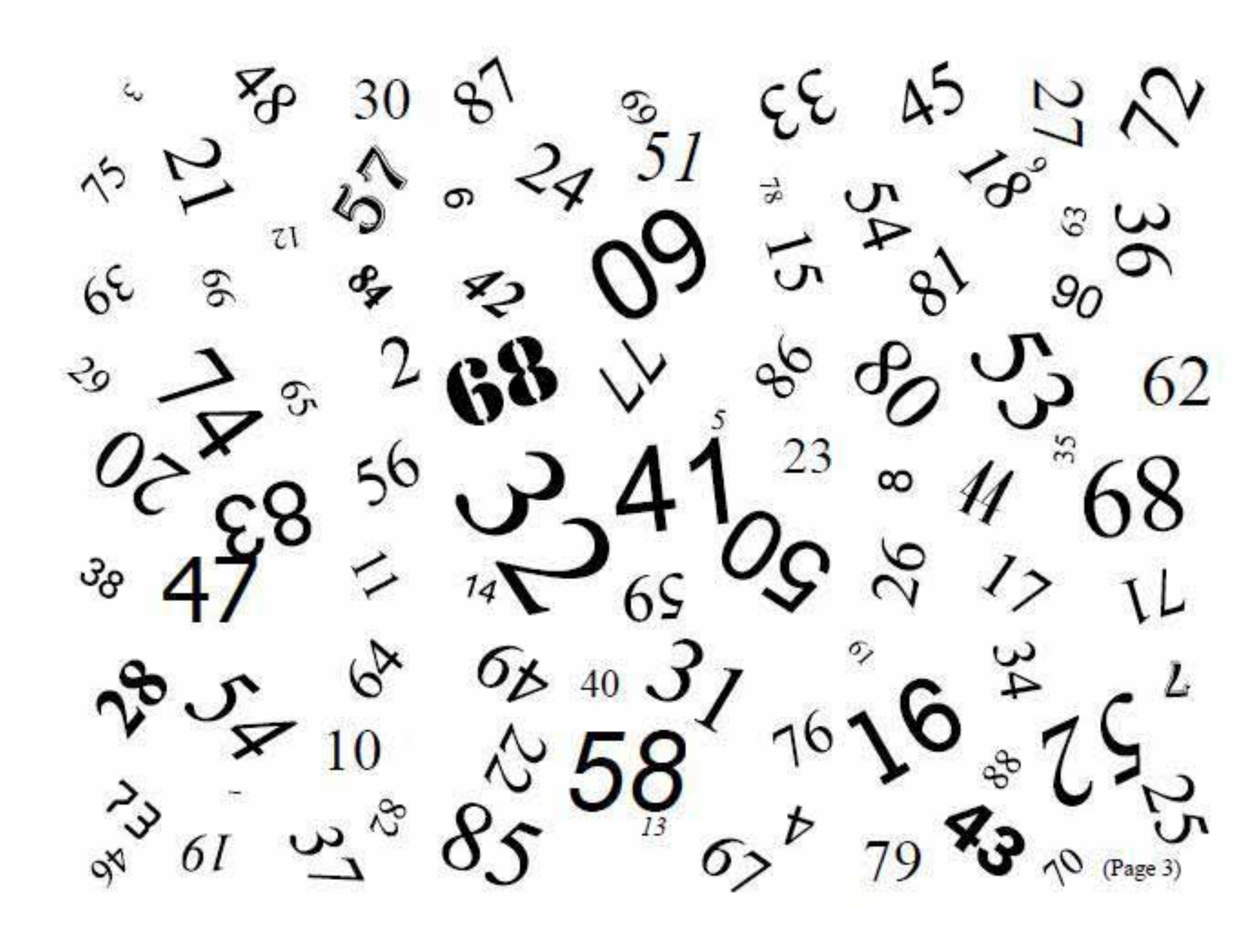

এক

চারটে কার্ড নাও। কার্ডগুলোর দু'পিঠে মোট এই আটটা সংখ্যা লেখা– ৩৯। ৫১, ২৬।৩৪, ৬৫।৮৫, ৫২।৬৮।
কার্ডগুলো পরপর সাজিয়ে রাখো যাতে ওপরে এই সংখ্যাগুলো থাকে,– ২৬ ৩৯ ৫২ ৬৫।
এইবার এর মধ্যে যে কোনও একটা কার্ড বার করে নাও ও অন্য তিনটে কার্ড পালটে দাও। ধরো ৩৯ সরিয়ে বাকিগুলো পালটে দেওয়া হল। তাহলে টেবিলে রইল,– ৩৪ ৬৮ ৮৫।
তারপর ঐ তিনটে কার্ডের মধ্যে আবার যে কোনও একটা, ধরো ৮৫, সরিয়ে বাকি দু'টো পালটে দাও। এবার রইল,– ২৬ ৫২। হাতে আছে, ৩৯ ও ৮৫।
শেষে টেবিলের দুটো কার্ডের মধ্যে যে কোনও একটা সরিয়ে নিয়ে অবশিষ্ট কার্ড পালটে দাও। ধরা যাক ২৬ সরিয়ে ৫২ পালটানো হল।
তাহলে এখন মোট হাতে রইল,– ৩৯ ৮৫ ২৬ ৬৮।
এই চারটি সংখ্যার গুণফল হবে ৫৮৬০৯২০। হ্যাঁ, যে কোনও ক্রমে কার্ড সরালেও এই একই ফলাফল হবে। করে দেখতে পারো।

আরও মজার কথা হল, সর্বশেষ পাওয়া কার্ডগুলোর উল্টোপিঠের সংখ্যাগুলোর গুণফলও আশ্চর্যজনক ভাবে ঐ একই হবে। এক্ষেত্রে যাচাই করে দেখো, ৫১ × ৬৫ × ৩৪ × ৫২ = ৫৮৬০৯২০ ! যদিও শুরুতে দু'পিঠের সংখ্যাগুলোর গুণফল মোটেই সমান ছিল না।
রহস্য-সংকেতঃ কার্ডের দু'পিঠে সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ১৩ ও ১৭-এর ২, ৩, ৪, ও ৫ গুণিতক। এবং গুণফলটি হল, $১৩^২ \times ১৭^২ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times ৫$। রহস্যভেদ হলে যেকোনো দু'জোড়া সংখ্যা ও তার অন্যান্য গুণিতক দিয়েও প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে খেলাটা দেখানো যাবে।

দুই

একটা তাসের প্যাকেটে ৫২ টা কার্ড থাকে। চার রঙএর প্রত্যেকটা ১৩টা করে। এই রকম একটা সাধারণ প্যাকেট থেকে যে কোনও ৩০টা কার্ড আলাদা করে রাখো। সুতরাং অপর অংশে ২২টা কার্ড রইল। এখন প্রশ্ন, প্রথম ভাগের লাল কার্ড ও দ্বিতীয় ভাগের কালো কার্ডের সংখ্যার তফাৎ কত?
এই তফাৎ সর্বদাই হবে চার!
একইভাবে প্রথম ভাগের কালো কার্ড ও দ্বিতীয় ভাগের লাল কার্ডের সংখ্যার তফাৎও হবে চার। প্রথমে যেকোনো ৩০টা কার্ড সরানো যেতে পারে।
রহস্য-সংকেতঃ প্যাকেটে ২৬টা করে লাল এবং কালো কার্ড থাকে।

তিন

দু'টো লুডো খেলার ছক্কা চালো। মনে করা যাক, ছক্কা দু'টোর নাম দেওয়া হল 'ক' এবং 'খ'। এইবার এই গুণফলগুলো বার করো–
(১) 'ক' এবং 'খ'এর ওপরের সংখ্যাদ্বয়ের।
(২) 'ক' এবং 'খ'এর নীচের সংখ্যাদ্বয়ের।
(৩) 'ক'এর ওপরের এবং 'খ'এর নীচের সংখ্যাদ্বয়ের।
(৪) 'ক'এর নীচের এবং 'খ'এর ওপরের সংখ্যাদ্বয়ের।
প্রাপ্ত চারটি গুণফলের সমষ্টি কত বল দেখি? এই সমষ্টি সর্বদাই হবে ৪৯ !
রহস্য-সংকেতঃ ছক্কার দুই বিপরীত তলের সংখ্যার যোগফল হয় ৭।

রহস্যময় জ্যোতিষ্ক - কোয়াসার

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্য অস্ত গেলে নেমে আসে অন্ধকার। আর তখনই মহাকাশ ধীরে ধীরে ছেয়ে যায় আলোর মালায়। কোনোটি মিটমিট করে জ্বলছে, কোনোটির রঙ লাল, কোনোটি নীল, কোনোটি আবার ধবধবে সাদা। আদিমকাল থেকেই এই নক্ষত্রখচিত মাহাকাশ আমাদের কাছে বিস্ময়। আজও আমাদের এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। কত না রহস্য ছড়িয়ে আছে এই আদি-অন্তহীন মহাকাশের আনাচে কানাচে।

কোয়াসি-স্টেলার রেডিও সোর্স (Quasi-Stellar Radio Source), সংক্ষেপে কোয়াসার (Quasar) হল মহাকাশে এক রহস্যময় জ্যোতিষ্ক। এগুলি নক্ষত্র নয়, অথচ বিপুল আলো নিঃসরণ করে। এই নক্ষত্রসদৃশ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলি মহাকাশের অতি দূরতম অঞ্চলে অবস্থিত। এখনও পর্যন্ত এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরের ব্রহ্মাণ্ডগুলি (গ্যালাক্সি বা তারাজগত) দেখা সম্ভব হয়েছে। কোয়াসারগুলি আরও দূরের জ্যোতিষ্ক। সাধারণ নক্ষত্রের সাথে এদের বড় পার্থক্য হচ্ছে এদের অকারের তুলনায় আলো নির্গমনের হার অত্যন্ত বেশি। অর্থাৎ আকারে অনেক ছোট হয়েও এরা অবিশ্বাস্য রকমের উজ্জ্বল।

মহাকাশে কোয়াসারের উপস্থিতি প্রথম জানা যায় ১৯৬০ সালে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন যে মহাকাশের এমন জায়গা থেকে বেতার-তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে যেখানে কোনো নক্ষত্রজাতীয় দৃশ্য আলোর উৎস নেই। এই বেতার-তরঙ্গের উৎস খুঁজতে গিয়েই তাঁরা সুদূর মহাকাশে কোয়াসার নামক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কর অস্তিত্ব টের পান। পরবর্তীকালে শক্তিশালী দূরবিনের সাহায্যে ওই অঞ্চলগুলিতে তাঁরা দৃশ্য আলোর উৎসের সন্ধান পান। এত দূর থেকে এদের টিমটিমে তারার মত দেখতে লাগলেও প্রকৃতপক্ষে এদের ঔজ্জ্বল্য কোনো বড় তারাজগতের চেয়েও কয়েক শ' গুণ বেশি হতে পারে।

প্রথম দিকে আবিষ্কৃত কোয়াসারগুলির মধ্যে বেতার তরঙ্গ নির্গমনের বিষয়টি প্রবলভাবে লক্ষ করা গেলেও পরবর্তীকালে এমন কিছু কোয়াসারের সন্ধান পাওয়া গেল যাদের বেতার তরঙ্গ সক্রিয় নয়। বেতার তরঙ্গহীন কোয়াসার আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা 'কোয়াসি-স্টেলার রেডিও সোর্স' নাম থেকে 'রেডিও' এবং 'সোর্স' শব্দ দুটি পাল্টে 'অবজেক্ট' (Objects) শব্দ ব্যবহার করে জ্যোতিষ্কগুলির নতুন নামকরণ করেন 'কোয়াসি-স্টেলার অবজেক্ট' (Quasi-steller Objects সংক্ষেপে, QSO)।

কোনো কোনো কোয়াসারে বেতার তরঙ্গ সক্রিয় আবার কোনো কোনোটাতে তা অনুপস্থিত কেন? এর কারণ সঠিকভাবে এখনও জানা যায় নি। তবে দেখা গেছে যে কোয়াসারগুলি থেকে লেজের মতো অংশ বের হয় সেগুলির বেতার তরঙ্গ সক্রিয়।

কোয়াসার সম্পর্কে যে মতবাদগুলি প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে কয়েকটি হল–

কোয়াসার হল এমন একটি নক্ষত্র যার ভর দশ লক্ষ সৌরভরের সমান। এর আলোর উৎস নক্ষত্রটির কেন্দ্রের কণা সমূহের মধ্যে সংঘটিত তাপ উৎপদ্যমান বিক্রিয়া ফিশন, ফিউশন, মহাকর্ষীয় ধ্বংস ইত্যাদি।

এই মতবাদ অনুসারে ক্ষুদ্র আয়তনের কোয়াসার থেকে বিপুল আলো নির্গমনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও অতি ভরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীদের মতে ওরকম বিপুল ভরের কোনো নক্ষত্র যদি এতো আলো নিঃসরণ করতে থাকে তাহলে সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা। এছাড়াও এ রকম বিপুল ভরের নক্ষত্রের নির্গত শক্তির ধরণ কোয়াসার থেকে নির্গত শক্তির ধরণ এক নয়। এই সব কারণে মতবাদটি সর্বজন গ্রাহ্য হল না।

মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা অদৃশ্য নক্ষত্রজগতের (গ্যালাক্সি) কোনো কোনোটার কেন্দ্রে রয়েছে অতিভারী কৃষ্ণবিবর। এরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ধূলি কণা ও গ্যাস গ্রাস করছে। কৃষ্ণবিবরে আগত বস্তুর ধ্বংসজনিত শক্তিই কোয়াসারের আলোর উৎস। কোনো নক্ষত্র যখন এই কৃষ্ণবিবরের পাশ দিয়ে যায় তখন তার নিকটপ্রান্তের উপর কৃষ্ণবিবরটির আকর্ষণ দূরপ্রান্তের তুলনায় বেশি থাকে। এই অসম আকর্ষণের ফলে নক্ষত্রটি ভেঙে চুড়ে ঘূর্ণায়মান ধূলি কণা ও গ্যাসীয় মেঘে পরিণত হয়ে কৃষ্ণবিবরের পৃষ্ঠে পতিত হয়। এই ধুলো ও গ্যাসীয় মেঘ যতক্ষণ ঘটনা দিগন্তের বাইরে থাকে ততক্ষণ এগুলি থেকে বিপুল আলো, বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি নিঃসরণ হয়। ঘটনা দিগন্তে প্রবেশ করলে কৃষ্ণবিবরের প্রবল আকর্ষণে সেগুলি আর বেরিয়ে আসতে পারে না। এমন অবস্থায় কোয়াসারের কোনো বেতার তরঙ্গ সক্রিয়তা থাকে না। কোয়াসারে সঙ্গে কৃষ্ণবিবরের এই সংশ্লিষ্টতা থেকে কোয়াসারের ক্ষুদ্র আয়তন ও বিপুল আলো ও বেতার তরঙ্গ নিঃসরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ১৯৭৫ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিল এই মতবাদকে সমর্থন করে বলেন, কৃষ্ণবিবরটি প্রকৃতপক্ষে কয়েক কোটি সৌরভরের সমান ভর বিশিষ্ট কোনো নক্ষত্রের এক ঘন সন্নিবেশের কেন্দ্রে অবস্থিত।

অনেকের মতে এই বিস্ময়কর জ্যোতিষ্কগুলির অফুরন্ত শক্তির উৎস হল অতি ভারী কৃষ্ণবস্তু (Dark Matter) যারা চারপাশের ধূলি কণা ও গ্যাস শোষণ করে নিজেরাই হয়ে ওঠে বিপুল শক্তির উৎস।

আরেকটি মত হল একটি কোয়াসারের জন্ম হয় দু'টি প্যাঁচানো তারাজগতের (গ্যালাক্সি) সংঘর্ষের ফলে। এই সংঘর্ষের সময় যে তারাজগতটির ভর বেশি থাকে তার কেন্দ্রস্থ অতিভারী কৃষ্ণবিবর শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অপেক্ষাকৃত কম ভরের তারাজগতটির নক্ষত্রগুলি ও গ্যাসকে গ্রাস করতে থাকে। এই সময় প্রচণ্ড আলো নিঃসৃত হয়। চুপসে যাওয়া কম ভরের এই তারাজগতটিই হয়ে ওঠে একটি কোয়াসার। সম্প্রতি হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এরকমই একটি কোয়াসারের সন্ধান পেয়েছে। PG- 1012 + 008 নামের এই কোয়াসারটির পৃথিবী থেকে দূরত্ব ১•৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ।

কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা কোয়াসারগুলি খালি চোখে দেখতে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দেখার জন্য অতি শক্তিশালী বিশাল দূরবিনের সাহায্য নিতে হয়। এদের সম্পর্কে প্রচলিত কোনো মতবাদই এখনও সর্বজন গ্রাহ্য নয়। তবে এই জ্যোতিষ্কগুলি থেকে আগত আলোকরশ্মি, বেতারতরঙ্গ, এক্স-রে এবং অবলোহিত রশ্মি বিশ্লেষণ করে এখনও পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তা হল এগুলি হল ধুলোর বলয়ে গঠিত দূরবর্তী কোনো তারাজগতের উজ্জ্বল সক্রিয় কেন্দ্রবিশিষ্ট বস্তু।

১৯৬০ সাল নাগাদ বেতার তরঙ্গ সক্রিয় জ্যোতিষ্কদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সেই তালিকায় 3C-273 নামের একটি জ্যোতিষ্ক ছিল। বেতার উৎসের এই জ্যোতিষ্কটি মাঝে মাঝেই চাঁদের আড়ালে চলে যায়। ১৯৬২ সালে নিউ সাউথ ওয়েলসের পার্কস রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা এর অবস্থান নির্ণয় করতে সমর্থ হন। ১৯৬৩ সালে জ্যোতির্বিদ মার্টেন স্মিড এর বর্ণালি বিশ্লেষণ করে হতবাক হয়ে যান। দেখা গেল 3C-273 কোনো নক্ষত্রই নয়। এক বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক। এর উজ্জ্বলতা একটা তারাজগতের মোট উজ্জ্বলতা থেকে অনেক গুণ বেশি।

কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রে (Synchrotron) চুম্বকক্ষেত্রের ভিতর যখন শক্তিশালী ইলেকট্রন পাঠান হয় তখন এক ধরনের তরঙ্গ বিকিরণ পাওয়া যায়। একে বলা হয় সিঙ্কোট্রন রেডিয়েশন (Synchrotron Radiation)। কোয়াসারগুলি থেকে যে বিকিরণ বেরিয়ে আসে তা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি এই তরঙ্গ বিকিরণের

মতোই। যেহেতু কোয়াসারের শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলি প্রচণ্ড গতিতে কুণ্ডলী আকারে চলে তাই অজস্র বেতার তরঙ্গ বেরিয়ে আসে।

রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইগর নোভিকভ এবং ইজরাইলের ইয়ুভ্যাল নীম্যান মনে করেন যে কোয়াসার হল আসলে শ্বেতবিবর বা শ্বেতগহ্বর (White Hole)। যদিও শ্বেতবিবরের অস্তিত্ব তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মহাকাশে এখনও আমরা এদের খুঁজে পাই নি। তবে কোয়াসারের অস্তিত্ব এবং ধর্ম সম্বন্ধে এখন আমাদের অনেকটাই জানা।

চল্লিশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে আছে G2237 + 0305 গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগত। এর পিছনে আটশো কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে একটি কোয়াসার। এর আলো গ্যালাক্সিটির পাশ দিয়ে আসার সময় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে বেঁকে যায়। ফলে 'মহাকর্ষীয় লেন্সিং প্রভাব'-এর কারণে কোয়াসারটির চারটে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। একে 'আইনস্টাইন ক্রস' বলে। কোয়াসারের একট মাত্র প্রতিবিম্ব খুব কম দেখতে পাওয়া যায়।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেউ অমর নয়। 'জন্মিলে মরিতে হবে' এই তত্ত্ব সকলের জন্যই প্রযোজ্য। পৃথিবীতে জীবজগতের যেমন জন্ম-মৃত্যু আছে তেমন মহাবিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্রেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। কোয়াসারের জীবনও অনন্ত নয়। এদের কাছাকাছি গ্যাসভাণ্ডার যখন নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন এদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ এদের মৃত্যু হয়। বিজ্ঞানীদের মতে কোনো কোয়াসারেই দু'শো কোটি বছরের বেশি টিকে থাকতে পারে না। বর্তমানে আমরা যে কোয়াসারগুলি দেখছি সেগুলি থেকে নির্গত আলো মহাকাশের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বহু কোটি বছর পর আমাদের চোখে এসে পড়ছে। তাই বলা যেতে পারে দৃশ্যমান কোয়াসারগুলির অনেকেরই হয়তো এখন আর অস্তিত্ব নেই। যা দেখছি তা তাদের একেবারে শৈশবের চেহারা।

তথ্য সূত্রঃ

Space Encyclopedia – Heather Couper and Nigel Henbest; 1999 Dorling Kindersley.

The Universe – Iain Nicolson; 1996 Horus Editions.

The Rough Guide to the Universe – John Scalzi; 2003 Rough Guides Ltd.

মহাবিশ্বের বিস্ময় (প্রথম খণ্ড) - অরুণাভ চক্রবর্তী; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ - শঙ্কর চক্রবর্তী; বেস্ট বুক্স্, কলকাতা।

মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় - প্রশান্ত প্রামাণিক; জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা।

আকাশ ও পৃথিবী - মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ; চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৮, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ।

(পর্ব-২)

কিশোর ঘোষাল

৩

আগেই বলেছি সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা দ্রব্য বিনিময় প্রথা (barter system) এবং অর্থ বিনিময় প্রথা (money transaction system) দুটোতেই অভ্যস্ত ছিল, তা না হলে দেশের ভেতরে এবং বিদেশেও নিয়মিত বাণিজ্য করা সম্ভব হত না। এই সভ্যতার মানুষেরা তামা, রুপো, সোনা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারও যে জানত, সে প্রমাণ বহুল পাওয়া যায়। অতএব, অনুমান করা যায় যে অর্থ বিনিময়ে তারা ধাতুর ব্যবহারও শুরু করতে পেরেছিল। সেই সময় যে অঞ্চল থেকে রুপো আমদানি করা হত, তাদের মধ্যে প্রধান দেশ ছিল সুমের (এখন সে অঞ্চল ইরাকের মধ্যে), এ সুমেরের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের ঘনিষ্ট বাণিজ্য সম্পর্কের অনেক হদিশ পাওয়া গেছে।

এ প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া এগারোটি রুপোর টুকরোর কথা উল্লেখ করা যায়। একটি রুপোর বাক্সের মধ্যে কিছু গয়নার সঙ্গে এই এগারোটি রুপোর টুকরো পাওয়া গিয়েছিল। এদের মধ্যে দুটি ছাড়া, অন্যগুলির আকার গোল কিংবা আয়তাকার। এই নটি ধাতুখণ্ডের ওজন, সিন্ধুসভ্যতার তৌল ও ওজন রীতি(weighing system)-র সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু যে দুটি ধাতুখণ্ড সিন্ধুসভ্যতার ওই প্রচলিত ওজনের সঙ্গে মেলে না, তাদের গায়ে কীলক (cuneiform) আকারের লিপি খোদাই করা আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বিশেষ করে দেখেছেন, এই আলাদা ধাতুখণ্ডদুটি সুমের থেকে এখানে এসেছিল। এই উদাহরণ থেকে ধরে নেওয়া যায়, আমাদের দেশে ধাতুকে বিনিময় মাধ্যম (medium of exchange) হিসেবে ব্যবহার করার প্রচলন পশ্চিম এশিয়ার প্রভাবেই শুরু হয়েছিল, যদিও তার গুণমান পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়।

সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির অনেক কারণ অনুমান করা হয় এবং সে নিয়ে নানান বিতর্কেরও শেষ নেই। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার উন্নত নাগরিক সভ্যতার পর, আর্যভাষীদের সামাজিক কাঠামোর যে সন্ধান আমরা পাই, সে সভ্যতা পুরোপুরি গ্রাম নির্ভর। সেক্ষেত্রে তাদের দ্রব্য বিনিময় প্রথাই (barter system) হয়তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ঋগ্বেদের একটি সূত্রে 'নিষ্ক' ব্যবহারের যে কথা বলা হয়েছে, সেটি ধাতব খণ্ড বিশেষ করে সোনার খণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। এই 'নিষ্ক' সাধারণত সোনার ছোট ছোট টুকরো জুড়ে গয়নার কথা বোঝাত। কিন্তু যেখানে 'নিষ্ক'র বিশেষণে শত ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে নির্দিষ্ট ওজনের একশটি সোনার খণ্ডের কথাই বলা হয়েছে মনে করা যায়। সেক্ষেত্রে আর্যভাষী সমাজেও নির্দিষ্ট ওজনের ধাতব খণ্ডকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত, এ কথা বলাই যায়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বৈদিক যুগের শেষের দিকেই অর্থাৎ ৮০০/৭০০ খৃঃপূঃ-এর কোন সময়েই নির্দিষ্ট ওজনের ধাতবখণ্ড বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ছিল।

এই সময়েই উত্তরপশ্চিম থেকে, পূর্বে গঙ্গার উপনদী ও শাখানদীর অববাহিকা ধরে, আর্যভাষীদের সমাজ ও সভ্যতার প্রসার হচ্ছিল। এই অঞ্চলের ষোড়শ মহাজনপদের হাত ধরেই আর্যভাষীদের নগরায়ণ ও নাগরিক সভ্যতার সূত্রপাত। সুতরাং সেই সময়েই উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন নগরে বেড়ে উঠতে লাগল

বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। এই বাণিজ্যের প্রয়োজনেই নির্দিষ্ট ওজন এবং নির্দিষ্ট গুণমানের ধাতুখণ্ডের নির্ধারিত মূল্য এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতা জরুরি হয়ে উঠতে লাগল। জরুরি হয়ে উঠল এই ধাতুখণ্ড তৈরির নির্দিষ্ট পদ্ধতি। কোন রাজ্যের শক্তিশালী রাজা বা তাঁর প্রতিনিধি কিংবা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য কোন বণিকসভা ছাড়া এই ধাতবখণ্ডের নির্দিষ্ট মূল্যমান নিয়ন্ত্রণের কঠিন দায়িত্ব নেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ধাতব মুদ্রা বা টাকা অপরিহার্য হয়ে উঠতে লাগল।

ভারতবর্ষে ঠিক কবে থেকে টাকার প্রচলন শুরু হয়েছিল, আজ তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে বৌদ্ধ কাহিনী ও বুদ্ধদেবের জীবনী, জাতকের নানান কাহিনীতে এই টাকা ও মুদ্রার ব্যবহারের ইঙ্গিত প্রচুর পাওয়া যায়। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের মোটামুটি ৬০০ থেকে ৫০০ বছর আগে, ঐতিহাসিকেরা এই সময়টাকে নির্দিষ্ট করেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটকের একটি কাহিনী শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

সে সময়কার একজন ধনী ব্যবসায়ী বা শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ ছিলেন বুদ্ধের একান্ত ভক্ত। তিনি একবার মনস্থ করলেন, ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর সকল শিষ্যদের থাকার জন্যে একটি সঙ্ঘবিহার নির্মাণ করাবেন। উপযুক্ত জমির খোঁজ করতে করতে তিনি শ্রাবস্তী (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের সাহেত-মাহেত) নগরের কাছে মনোমত বেশ অনেকটা জমির সন্ধান পেলেন। সেই জমির মালিকের নাম জেত। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ জেতের কাছে ওই জমি কিনে নেবার প্রস্তাব দিলে, শুরুতে জেত কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। অনেক অনুরোধের পর জেত রাজি হলেন, কিন্তু জমির যে দাম দাবি করলেন, তা শুনলে চমকে উঠতে হয়। তিনি দাবি করলেন, জমির দাম হিসেবে, পুরো জমিটা সোনার ধাতুখণ্ড দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ রাজি হয়ে গেলেন এবং গরুর গাড়িতে হাজার হাজার সোনার খণ্ড এনে, প্রচুর লোক দিয়ে সেই খণ্ড বিছিয়ে, ঢেকে দিতে লাগলেন সেই জমি। শ্রেষ্ঠীর এই অদ্ভূত ভক্তি দেখে জেত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ অব্দি তিনি কোন দাম না নিয়ে জমিটি শ্রেষ্ঠীকে দান করে দিয়েছিলেন। সেই উপকারের কথা মনে রেখে শ্রেষ্ঠী সেই বিহারের নাম জেতবনবিহার রেখে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। এই আশ্চর্য ঘটনার কথা অজানা কোন শিল্পী ছবির ভাষায় লিখে রেখে গেছেন মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার ভারহুত স্তূপের কাছে, একটি স্তম্ভের গায়ে।

বৌদ্ধ কাহিনীর বর্ণনা এবং উপরের চিত্র দেখে অনুমান করা যায়, চারকোণা এই সোনার পাতের টুকরোগুলিই মুদ্রা, আর এই মুদ্রার নাম ছিল কার্ষাপণ। প্রথমে ধাতুকে গলিয়ে ছাঁচের মধ্যে সমান উচ্চতায়(thickness) ঢালাই (casting) করে লম্বা পাত বানানো হতো। অন্যদিকে নানান চিহ্ন এবং নকশা উলটো খোদাই করে, ছোট ছোট ছাঁচ বানানো হত। মিষ্টির দোকানে আজও সন্দেশ বানানোর যেমন ছাঁচ থাকে, অনেকটা সেরকম। এবার ঢালাই করা ধাতুর পাত, সমান মাপে কেটে ফেলে, একটু গরম করে, ধাতুকে সামান্য নরম করে নেওয়া হত। তারপর ওই ছোট ছাঁচ নরম ধাতুর পাতের ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে জোরে ঘা দিলেই, নরম পাতের টুকরোতে ছাপা হয়ে যেত সোজা চিহ্ন বা নকশা। তৈরি হয়ে যেত মুদ্রা (coin)। এই ধরনের মুদ্রাকে ছাপদেওয়া মুদ্রা (punch marked coin)বলা হত। সোনার কার্ষাপণ আজ পর্যন্ত উদ্ধার না হলেও রুপোর অজস্র কার্ষাপণ উদ্ধার করা গেছে। প্রাচীনতম রুপোর যে কার্ষাপণ পাওয়া গেছে, সেগুলি মৌর্য আমলের, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কাল মোটামুটি ৩২০-থেকে ২৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ধরা হয়।

সম্পূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশ এবং তার বাইরের প্রতিবেশী কিছু দেশও সেই সময় মৌর্য রাজাদের অধীনে ছিল। বিশাল এই সাম্রাজ্যের সর্বত্র মুদ্রার ঠিকঠাক প্রচলন করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। জাল বা নকল মুদ্রার প্রচলন ঠেকাতে, মৌর্য রাজারা বিশেষ কয়েকটি রাজকীয় প্রতীক ব্যবহার করতেন। নিচের এই নকশাগুলির মধ্যে বাঁদিক থেকে প্রথম চারটি চিহ্ন বা সংকেত মৌর্য আমলের পাওয়া, প্রায় সব মুদ্রাতেই দেখা যায়, এই চারটি ছাড়াও নানান সময়ের নানান মুদ্রায় আরো কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রধান চারটি চিহ্ন ছিল রাজা কিংবা রাজ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নির্দিষ্ট চিহ্ন, আর অন্যগুলি হয়তো স্থানীয় প্রশাসন কিংবা নানান সময়ের মুদ্রা হিসেবে অথবা কোন বিশেষ উৎসবের সংকেত হিসেবে ছাপ দেওয়া হত।

(মৌর্য যুগের মুদ্রা ও মুদ্রায় ব্যবহার করা কিছু বিশেষ সংকেত চিহ্ন)

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের গুরু ও মহামন্ত্রী কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থে, মুদ্রার গুণমান এবং তার নিয়ন্ত্রণের নিয়ম কানুন নিয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর মতে মুদ্রা তৈরির সম্পূর্ণ দায়িত্ব লক্ষণাধ্যক্ষের - ইনি রাজকোষের বা টাঁকশালের অধ্যক্ষ। লক্ষণাধ্যক্ষই রাজ্যের প্রয়োজন অনুসারে, পণ (কার্ষাপণ), অর্ধপণ, পাদপণ ও অষ্টভাগপণ মুদ্রা তৈরি করাবেন। এক পণ মানে ৩২ রতি বা ৫৭.৬ গ্রেন কিংবা ৩.৭৩২ গ্রাম। যদিও এখনকার হিসাবে ৩২ রতি মানে ৩.৮৮৮গ্রাম ধরা হয়। অর্ধপণ মানে ১৬ রতি, পাদপণ মানে ৮ রতি, আর অষ্টভাগপণ মানে ৪ রতি। খাঁটি রুপো কিন্তু বেশ নরম ধাতু। [কাঠের হাতুড়ি পিটিয়ে বানানো অতি পাতলা রুপোর তবক দেওয়া ভালো সন্দেশ তোমরা নিশ্চয়ই খেয়েছ] খাঁটি রুপোর মধ্যে খাদ অর্থাৎ অন্য ধাতু মিশিয়ে, মুদ্রার জন্যে উপযোগী শক্ত সংকর ধাতু বানানো হত। কৌটিল্যের নির্দেশ ছিল, একটি ৩২ রতি মুদ্রার মধ্যে ২২ রতি খাঁটি রুপো থাকতেই হবে, আর বাকি ১০ রতি হবে তামা। প্রচলিত মুদ্রার গুণমান পরীক্ষা এবং নকল মুদ্রা ধরার জন্যে ‘রূপদর্শক’ নামে মুদ্রা পরীক্ষক নিযুক্ত হতেন। ‘রূপদর্শক’-এর দায়িত্বে গাফিলতি ধরা পড়লে ১০০০ পণ জরিমানার নির্দেশ ছিল এবং রাজকোষে নকল মুদ্রা চালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়লে, রূপদর্শকের মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠিন শাস্তিরও নির্দেশ ছিল।

মৌর্যযুগে মুদ্রা তৈরির অধিকার ছিল শুধুমাত্র রাজা ও রাজসরকারের। সে সময় আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের সকল জনসাধারণ এই সমস্ত মুদ্রাই ব্যবহার করত। সাম্রাজ্যের সকল রাজকর্মচারীদের বেতনও এই মুদ্রাতেই দেওয়া হত। সাধারণ জনগণের মনে রাজা ও রাজ প্রতিনিধিদের উপর যে যথেষ্ট আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, এই মুদ্রা ব্যবস্থার বিপুল ব্যবহার দেখে বোঝা যায়। এর থেকে এও স্পষ্ট বোঝা যায় মৌর্য যুগের রাজাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি, প্রভাব ছিল ও সারা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন।

তবে সর্বকালে সর্বদেশেই দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের যেমন অভাব হয় না, তেমনি সে সময়েও হয়নি। এত সব কঠোর নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ থাকলেও, সে সময়কার এমন অনেক মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি নিঃসন্দেহে জাল। এই মুদ্রাগুলি পাৎলা রুপোর পাত মোড়া তামার মুদ্রা!

মৌর্য যুগের পরে ছাঁচে ঢালা বিভিন্ন আকারের তামার মুদ্রার বহুল প্রচলন হয়েছিল। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দুদিকে ছবির ছাপযুক্ত তামার মুদ্রা অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকেই লেখসমেত ছাঁচের আঘাতে মুদ্রিত ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইরাণে পাওয়া 'ধমপালস' এবং 'উজেনিয়ি' লিপির ছাপযুক্ত উজ্জয়িনীর মুদ্রার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এই সময়ের মুদ্রাগুলির উপর শক্তিশালী কোন রাজসরকারের কিংবা প্রভাবশালী প্রশাসকের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, কিন্তু দুপাশেই ছবি ও লেখ সমেত ছাঁচে ঢালা মুদ্রার ব্যবহার প্রচুর হয়েছিল।

৪

'টাকা' কথাটি এসেছে 'টঙ্ক' বা 'টঙ্কক' শব্দ থেকে, এই দুটি শব্দের অর্থ 'বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের উপযুক্ত প্রশাসনিক ছাপমারা ধাতবখণ্ড'। ইংরিজি coin শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন 'কুনেউস' (cuneus) থেকে যার মানে কীলক। যে কোন পোস্ট অফিসে, কাঠের হাতলের সামনে গোল ছাপ মারার যে যন্ত্রটি দিয়ে পোস্ট অফিসের অফিসাররা সবকিছুতে ছাপ মারেন, সেই রকম কীলক দিয়ে ছাপ দিয়ে ধাতব মুদ্রায় ছবি ছাপা হত বলেই, ইংরিজিতে এই ধাতব মুদ্রাকে coin বলা হয়। আবার মুদ্রা তৈরির জন্যে, একটি কাঠের পাটার মধ্যে উলটো ছবির ছাঁচ বানিয়ে, রোমের লোকেরা মুদ্রা ছাপাত। সেই কাঠের পাটার নাম মনেতা (Moneta)। রোমের Juno Moneta মন্দিরে এই পদ্ধতিতে মুদ্রা তৈরি করা হত বলেই, ইংরিজিতে বিনিময় যোগ্য ধাতব খণ্ডকে, ওই মন্দিরের দেবতার নাম অনুসারে money বলা হত।

এই সময়ে সারা বিশ্বেই মুদ্রার বহুল ব্যবহার শুরু এবং জনপ্রিয় হলেও বিনিময় প্রথা (barter system) কিংবা দ্রব্যধন বিনিময়ের (Commodity exchange system) প্রথা একদম বন্ধ হয়ে যায়নি। এই দ্রব্যধনের মধ্যে নানান শস্য, যেমন ধান, গম; নানান পশু, যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া; এমনকি মানুষও ব্যবহার হত। আয়ারল্যাণ্ডে প্রাচীনকালে অর্থের বিনিময়ে এক বিশেষ জাতির ক্রীতদাসী একক হিসাবে ব্যবহার হত! আফ্রিকার সুদানে আজ থেকে ১৫০/২০০ বছর আগেও ক্রীতদাসকে দ্রব্যধন হিসাবে ব্যবহার করা হত।

পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যধনের মধ্যে সব থেকে বেশি দেশে যে দ্রব্যধনের বহুল প্রচলন ছিল, তার নাম কড়ি (cowry)এবং পুঁতি (bead)। প্রাচীন ভারতের বহু বসতিতে উৎখননের সময় অজস্র পুঁতি পাওয়া গেছে। এই পুঁতির মধ্যে অনেকসময় মূল্যবান পাথরও থাকত।

একসময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ এবং মালদিভ্‌স অঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর কড়ি পাওয়া যেত। বিনিময় মাধ্যম হিসাবে কড়ির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যার জন্যে সেই সময়ে কড়ি প্রায় গোটা বিশ্বেই জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথমতঃ নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল ছাড়া কড়ি বেশ বিরল, অতএব কড়ির সরবরাহ সীমিত ছিল। তাছাড়া আকারে এবং ওজনে কড়ি যথেষ্ট হালকা হওয়ায় বহন করতে সুবিধে হত। তার চেয়েও বড় ব্যাপার হল, প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া ভালো জাতের কড়ির গুণ বা মান পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সোনা, রুপো কিংবা তামার মুদ্রার ক্ষেত্রে গুণ বা মানের কারচুপি হামেশাই হত এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই সব নকল মুদ্রা চট করে ধরাও সম্ভব হত না। এই সব কারণে যে সব জায়গায় কড়ি সহজলভ্য নয়, সে সব অঞ্চলে দৈনন্দিন ছোটখাটো কেনা বেচার ক্ষেত্রে কড়ি ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতকের শেষদিকে কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে, ফা হিয়েন যখন ভারতে এসেছিলেন, তিনি মধ্যভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জিনিষপত্র কেনা বেচায় কড়ির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলেন। সংস্কৃত 'কপর্দ্দক' শব্দ থেকে কড়ি শব্দের সৃষ্টি। বেশ কিছু কাল কড়ির ব্যবহার লুপ্ত হলেও, আমাদের চলতি নানান কথায়, সেই স্মৃতি আমরা আজও বহন করে চলেছি, যেমনঃ 'টাকাকড়ি' কেমন দেবে? আমার কাছে এখন একটা 'কানাকড়ি'ও নেই, ব্যক্তি নাম হিসেবে 'তিনকড়ি', 'পাঁচকড়ি' ইত্যাদি এবং কাউকে 'নিঃস্ব' বোঝাতে আজও 'কপর্দ্দকহীন' বলা হয়। লক্ষ্মীপুজোর

সময়, লক্ষ্মীঠাকুরের ঝাঁপিতে দু একটা কড়ি আটকে ধনের দেবীকে অর্থপূর্ণ করে তোলার স্মৃতি, আজও সেই সব দিনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

যে কড়িগুলি টাকার মতো ব্যবহার করা হত, সেগুলির বৈজ্ঞানিক নাম মনেটারিয়া মনেটা (Monetaria moneta)। এগুলি এক প্রজাতির সামুদ্রিক শামুক (sea shell), যাকে জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় সাইপ্রেডি (cypraeidae) গোষ্ঠীর gastropod mollusc বলা হয়।

(পরের সংখ্যায় শেষ কিস্তি)

মন্দার ফুল

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান শহরের দক্ষিণে যে রাস্তাটি আরামবাগ চলে গেছে এই রাস্তা ধরে আট কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়া মোড়। এখান থেকে একটি রাস্তা সোজা পশ্চিমদিকে চলে গেছে বাঁকুড়া। বাঁকুড়া যাওয়ার রাস্তায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে কেশবপুর। কেশবপুরের পাশেই শাঁকারি। শাঁকারি গ্রামে রয়েছে কয়েকটি পুরানো মন্দির। এক দিন সকালে শাঁকারির মন্দিরগুলি দেখবো বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কেশবপুর আসতেই মনে পড়লো পুরানো দিনের কথা।

বেশ কয়েক দশক আগে স্কুল জীবন সবে শেষ হয়েছে, সেই সময় আমাদের বাড়ীতে ভাড়া ছিলেন ডাঃ সব্বির আমেদ। এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের যেন আত্মীয়তা হয়ে গেছিল। ডাঃ আমেদ আমার ছোটো জামাইবাবুর বন্ধু। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কয়েক বছর আমাদের বাড়ীতে থাকার পর বহরমপুর চলে যান। সম্ভবত চাকরিতে বদলির কারণে। শুনেছিলাম ওনাদের বাড়ী কেশবপুর। আমার পরিবারের অন্যান্যরা কেশবপুর এসেছিলেন, আমার যাওয়া হয় নি। কেশবপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে রাস্তার ধারে একটি গাছে উজ্জ্বল লাল থোকা থোকা ফুল দেখে মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গী এই অসাধারণ সুন্দর ফুলটির নাম জানালেন মন্দার।

অভিধানে লিখেছে, মন্দার স্বর্গের বৃক্ষ বা পুষ্প। সত্যই স্বর্গের পুষ্পই বটে। এই ফুলকে না ভালবেসে থাকা যায় না। সংস্কৃত নাম পারিজাত। তবে স্বর্গের পারিজাত আর আমাদের দেখা এই পারিজাত এক কিনা, তা আমার

জানা নেই। ইংরেজিতে এই গাছটিকে বলে The Coral tree বা Tiger's Claw । ফুলগুলি দেখে বাঘনখের কথাই মনে আসে। সঠিক নামকরণ বটে।

মন্দার বা মাদার ফুল উজ্জ্বল টকটকে লাল ফুল। ডালে থোকা থোকা ধরে থাকে। গ্রাম বাংলায় এই গাছ প্রচুর দেখা যেত কিন্তু বর্তমানে প্রায় আর দেখা যায় না। গাছের কাণ্ড আর সরু সরু লম্বা ডালে অসংখ্য ছোটো ছোটো কাঁটা থাকে। গ্রামের লোকেরা এই গাছের ডাল কেটে বাগানে বেড়ার খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতো। আজ আর তা দেখা যায় না। বেড়ার সরু সরু ডালগুলি কিছুকাল পরে গাছ হিসাবে পুনর্জন্ম নিত। গাছে পাতা আসত, আর শীতের শেষে গাছ ভরে যেত অতি উজ্জ্বল টকটকে লাল ফুলের থোকায়। এই সুন্দর থোকা থোকা ফুলের দিকে আমাদের মতো মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি - কতক্ষণ তা জানি না। অথচ গ্রামের মানুষ প্রায় ভুলে গেছে এর ব্যবহার। তাদের আকর্ষণ করে না এই ফুল, কেন তা জানিনা।

তবে এই ফুলের গন্ধ বা সুবাস নেই বললেই চলে। ফুলের বাহারেই মন ভরে ওঠে, তাই সুবাসের কথা মনে আসে না। গাছের ডাল শক্ত নয়। সরু সরু লম্বা ডাল সারা গাছকে পূর্ণ করে রাখে। যখন গাছে ফুল ধরে, লম্বা সরু ডালে পাতা আর থাকে না। বাহারি ফুলের আকর্ষণে পাখি আর মৌমাছি এসে ভীড় করে।

ভারত মহাদেশ ছাড়া পূর্ব আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশে এই গাছ দেখা যায়। এই গাছ অনেক লম্বা হয়। পাতাগুলি প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা-চওড়া, হৃদয় আকৃতির। ফলগুলি বিন জাতীয়। দক্ষিণ ভারতে কফি গাছের আচ্ছাদক গাছ হিসাবে ব্যবহার হয়। পাতা এবং ডালে এল্কালয়েড রয়েছে। এই গাছের ভেষজ ব্যবহার রয়েছে।

পাতার রস কাটাছেঁড়া, ফোলা, ত্বকের রোগ বা কানের ব্যথায় ব্যবহার করা হয়। পাতার নির্যাস খিঁচুনি, বমি, অনিদ্রা, জ্বর, প্রস্রাবের কষ্ট ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। গাছটির বিজ্ঞান সম্মত নাম *Erythrina variegate* (= *Erythrina indica*) । গাছটি *Fabaceae* বা মটরগাছ পরিবারভুক্ত।

ছবিঃ লেখক

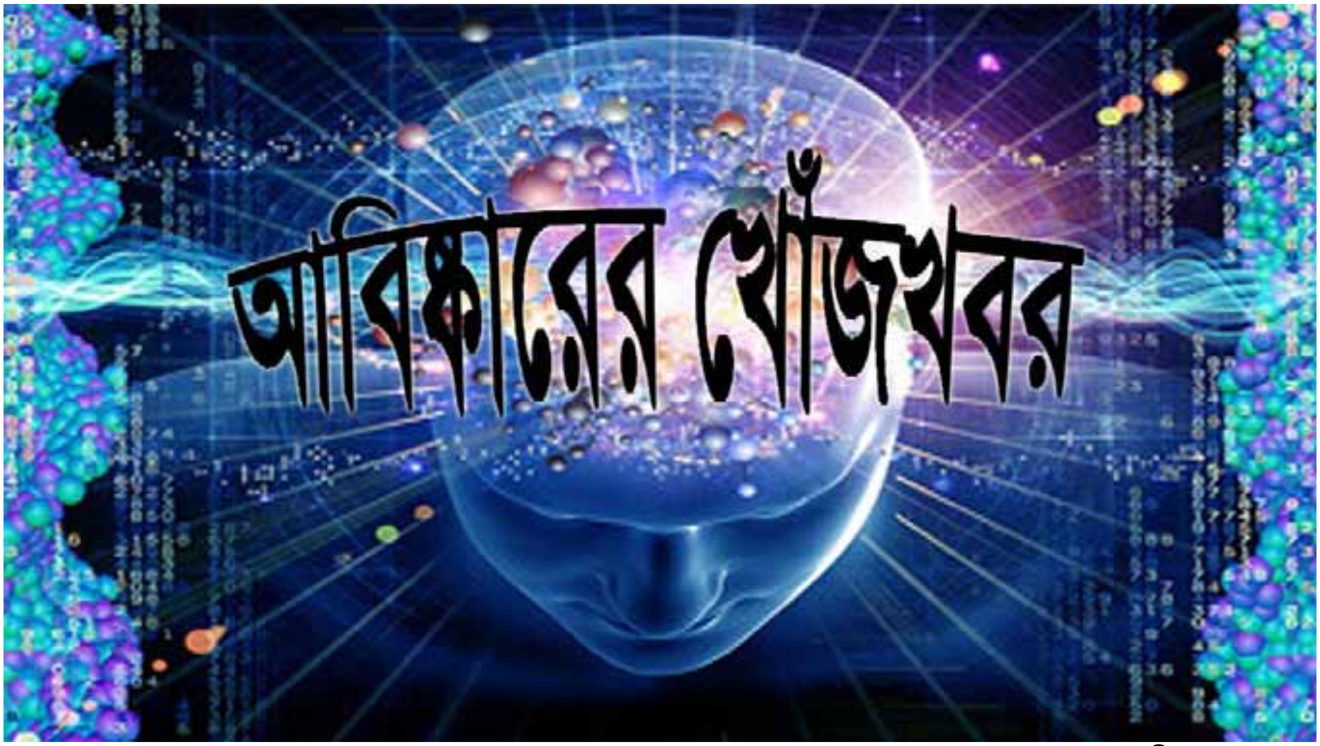

রাজীব কুমার সাহা

এই নীলগ্রহের জন্মলগ্ন থেকেই ঘটে চলেছে কতই না আজব কাণ্ডকীর্তি। বিশেষত মানুষ বা তার পূর্ব-প্রজাতির সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন আবিষ্কার। আদিযুগ থেকে বিভিন্ন খোঁজ আর আবিষ্কারের যথাসম্ভব তথ্য ক্রমানুসারে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই বিভাগে।

পর্ব – ৫

রজ্জু-ঘাগরা (String Skirt) (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০)

বয়নশিল্পের প্রচলনের সাথে সাথেই তা আদিম মানবের কাছে একটা অত্যন্ত মনোরঞ্জনমূলক কাজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শুরু হয় একের পর এক নিত্যনতুন পরিধেয় বস্ত্রের আবিষ্কার। পশুপাখির শক্ত শুকনো চামড়া বা কাপড় বুনে কোমরের দিকে একটা বেল্টের মতো আটকে তাতে সরু দড়িদড়া পাকিয়ে, কখনও তা বিভিন্ন লতাপাতার রঙে রাঙিয়ে নিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে নতুন ধরনের পরিধেয় তৈরি করা হত। আধুনিক সভ্যতার সাথে অপরিচিত এমন অনেক উপজাতি সম্প্রদায় আজও রয়েছে যারা এখনও এধরনের কাপড়চোপড় পরিধান করে। ডেনমার্কের এক তাম্রযুগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল থেকে এ জাতীয় কিছু দড়িনির্মিত ঘাগরাকৃতি পরিধেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা প্রলেপিত বেড়া (Wattle and Daub) (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০)

প্রথমে ছিল প্রকৃতিসৃষ্ট গুহা-কন্দর। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করায় তাতে স্থানসংকুলানের অভাব দেখা দিল। এদিক ওদিক তৈরি হতে লাগল লতাপাতা ছাওয়া আশ্রয়। কিন্তু এতে দেখা গেল বিপদ বেশি। কখনও তুমুল ঝড়বৃষ্টি, কখনও বা প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ, কখনও হিংস্র জন্তুজানোয়ারের অতর্কিত আক্রমণ আদিম মানবকে একটা নিরাপদ বাসস্থান নির্মাণের কাজে নতুন করে ভাবাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে জড়ো হতে লাগল গাছপালার শুকনো ডালপালা, জন্তুজানোয়ারের সরু অথচ পোক্ত আর লম্বা হাড় ইত্যাদি। তৈরি হল

ঘরের বেড়া। শুকনো অথচ বড়ো আর শক্তপোক্ত পাতা দিয়ে ছাওয়া হল চাল। কিন্তু সহস্র ফাঁকফোকরযুক্ত এই বেড়া পুরোপুরি নিরাপত্তা দিতে পারল না মানুষকে। মাটি গুলে প্রলেপ লাগানো শুরু হল তাতে। তবে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না পুরোপুরি। বৃষ্টি নামলে বা জোরে ধাক্কা লাগলে এই প্রলেপ খসে পড়তে শুরু করল। শেষে মৃৎপাত্রের মতো করে আগুনে পুড়িয়ে নিতেই সমস্যা মিটে গেল। নবপ্রস্তর যুগেই আদিমানবের বাসস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল।

সেচব্যবস্থা (Irrigation) (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০)

কে সর্বপ্রথম নিকটবর্তী নদীনালা থেকে জল তুলে এনে সেচব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে ইতিহাসবিদরা খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০-এর কাছাকাছি সময়ে মেসোপটেমিয়ার সুমের অঞ্চলে সেচব্যবস্থার এবং নীলনদের তীরবর্তী মিশরীয় ক্ষেতখামারের প্রমাণাদি খুঁজে পেয়েছেন। তদানীন্তন কালে মেসোপটেমিয়ার কৃষকেরা টাইগ্রিস বা ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বার্লি, গম এবং অন্যান্য শস্যাদির চাষবাসে বৃষ্টিপাত আর বন্যার ওপরই নির্ভর করত। কিন্তু প্রায়শই ভয়ংকর খরার কারণে খাদ্যাভাব দেখা দিতে শুরু করলে পরিকল্পিত সেচব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। শুরু হল কাছাকাছি নদীনালা থেকে খাল খনন করে শস্যক্ষেত্রে সেচব্যবস্থা। সুমেরীয় আদিবাসীরাই সর্বপ্রথম শস্যক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

কুঠার বা কুড়ুল (Axe) (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০)

লক্ষ লক্ষ বছর আগে 'হোমো ইরেক্টাস' প্রজাতি সেই প্রস্তরযুগে প্রথম কুড়ুল ব্যবহার করতে শিখেছিল। তবে তা ছিল নিতান্তই সাধারণ এক পাথরের টুকরো। পরবর্তীকালে গাছগাছড়া কেটে বসত গড়তে বা অস্ত্র হিসেবে কুড়ুলের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে তার আকার-আকৃতিরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটতে শুরু করে। জন্ম নেয় হাতলযুক্ত আধুনিক কুড়ুলের। ধাতব পিন্ড গলিয়ে দু'দিক ধারালো করে নিয়ে মধ্যবর্তী গোলাকার গর্তের ভেতর গাছের শক্ত ডালপালা জুড়ে নিয়ে তৈরি করা হয় কুড়ুলের পরিবর্ধিত সংস্করণ। ব্যবহার আর প্রয়োজনের নিরিখে তা অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, এ ধরনের আধুনিক কুড়ুল বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রস্তরযুগীয় জনজাতির মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ব্যবসা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নিউ গিনির মাউন্ট হেগেন পর্বতাঞ্চলে এ ধরনের প্রায় ৮০০০ বছরের পুরনো কুড়ুল খুঁজে পান।

ধীরে ধীরে এই অত্যন্ত কার্যকরী যন্ত্র কুড়ুল সমাজপতিদের প্রতিপত্তির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বীয় বেশ কিছু বুলগেরীয় সমাধিক্ষেত্র খনন করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অন্যান্য বহুমূল্য জিনিসপত্রের পাশাপাশি স্বর্ণপ্রলেপিত কুড়ুলও খুঁজে পান।

হল বা লাঙল (Scratch Plow) (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০০)

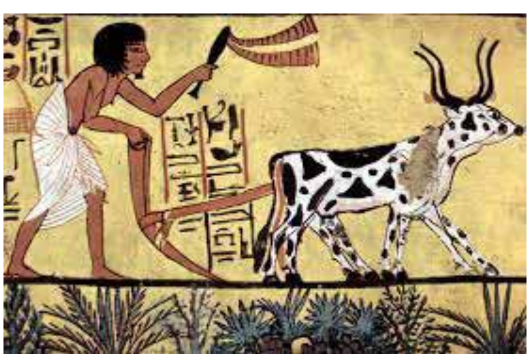

পরিকল্পিত সেচব্যবস্থার পর শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরেক যুগান্তকারী উদ্ভাবন ছিল লাঙলের ব্যবহার। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০০ নাগাদ সিন্ধুসভ্যতার অন্তর্গত মেসোপটেমিয়ায় কাষ্ঠনির্মিত এক বিশেষ ধরনের কৃষি-উপকরণের আবিষ্কার হয় যা দেখতে অনেকটা আধুনিক লাঙলের মতোই। গৃহপালিত গরু-মোষের সাহায্যে এর দ্বারা শস্যক্ষেত্র কর্ষণ করে শস্যাদি ফলানোর প্রথা শুরু হয়। মাটির উর্বরতা বাড়াতে ক্ষেতে একবার লাঙল চালিয়ে আবার উলটোদিক থেকেও তা চালানো হত। এতে চাষবাস করা অনেকটাই সহজ হয়ে পড়ে। সুইডেনের বোহুস্লান, ফ্রান্সের ফন্টান্যালবা প্রভৃতি স্থানের শিলাচিত্রে এমন অনেক হলকর্ষণরত আদিবাসীর রেখাচিত্র অঙ্কিত রয়েছে। আদিমকালের চাষ ব্যবস্থার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই উপকরণ বর্তমানকালেও সিরিয়া, মধ্য ইরাক, তুর্কিস্তান, চিনের কাংসু প্রদেশ এবং আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলেও প্রচলিত রয়েছে।

প্লাস্টার (Plaster) (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০০)

প্রায় ৭০০০ বছর আগে বাসস্থান নির্মাণের উপকরণ হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে প্লাস্টারের ব্যবহার শুরু হয়। বিভিন্ন রকমের প্লাস্টার যেমন, প্লাস্টার অফ প্যারিস, শুষ্কপ্রায় জিপসাম ও ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেটের মধ্যে জিপসাম আগুনে পুড়িয়ে চূর্ণ করে জল মিশিয়ে প্লাস্টার তৈরি করত প্রাচীন মিশরীয়রা। ব্যবহার করা হত বাসস্থানের দেওয়াল এবং ছাদে। রোমানরা সর্বপ্রথম ইউরোপে এই প্লাস্টারশিল্পের কলাকৌশল চালান করেন। ধীরে ধীরে আধুনিক শিল্পকলায় প্লাস্টারের কদর বেড়ে যায়।

দন্তমঞ্জন (Toothpaste) (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০)

বাহারি রং, নানা প্রস্তুতকারী সংস্থা, রঙচঙে প্যাকেট, লোভনীয় স্বাদ, অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন উপকরণ আর সর্বোপরি মনমাতানো বিজ্ঞাপনের বাহার – টুথপেস্ট বা দাঁতের মাজন। ছেলে থেকে বুড়ো কেউই আজ আর এই জিনিসটি ছাড়া দিনের শুরুটা কল্পনাই করতে পারেন না। জিনিসটির ব্যবহার শুরু হয় কিন্তু সেই সুদূর ৫৫০০ খ্রিস্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে। কী ছিল সে সময়কার দাঁতের মাজনের উপকরণ? ম্যার (বৃক্ষজ আঠাবিশেষ), অগ্ন্যুৎপাতজাত পাথরগুঁড়ো, গরু-মোষের খুর পোড়ানো ছাই, ডিমের খোলা, ঝিনুকের খোলা প্রভৃতি চূর্ণ করে একসাথে মিশিয়ে তৈরি হত সেকালের টুথপেস্ট। আঙুলের ডগায় নিয়ে দাঁতে মাজতে থাকলে বেরিয়ে আসত বাসি খাদ্যকণা, ময়লা-আবর্জনা। পাশাপাশি দাঁতের ঔজ্জ্বল্যও ফিরিয়ে আনত এই দন্তমঞ্জন।

কাষ্ঠশিল্প (Carpentry) (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০)

কাঠ মানবসভ্যতার শুরু থেকেই প্রাচীনতম স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম প্রধান উপকরণ। প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ থেকে মানবসভ্যতা লৌহযুগে উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি কাষ্ঠশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। নবপ্রস্তরযুগে কাষ্ঠনির্মিত বিভিন্ন জিনিসপত্র শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়। জাপানে খুঁজে পাওয়া কাষ্ঠনির্মিত ঘোড়া প্রায় ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বে নির্মিত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন।

দাঁড় টানা নৌকো (Rowboat) (খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০)

আদিমানব এতদিন নদীনালা পারাপার করতে ভাসমান প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি বা শালতির ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এবার প্রয়োজন পড়ল সেগুলোকে নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করে জলে বিচরণ করার। আদিম মিশরীয়রা শালতির আরও কিছু উন্নতি ঘটিয়ে তার সাথে যোগ করে ফেলল দাঁড়, যা টেনে প্রয়োজনমতো জলের বুকে চলাফেরা করা যায়। শুরু হল মানুষজন পারাপার, মালপত্র স্থানান্তর আর ব্যবসায়িক কাজে এর ব্যবহার। স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া মানুষজন, গবাদিপশুর জীবন রক্ষার্থেও এই দাঁড় টানা নৌকো এক আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। প্রায় ৬৫০০ বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় আবিষ্কৃত নৌকো চালনার সেই চিরাচরিত কৌশল আজও বিদ্যমান।

কৃত্রিম খাল (Canal) (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০)

মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীরা কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতিকরণের পাশাপাশি নদী বা বৃষ্টিপাতের ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে সারাবছরের জন্যে একটা নির্দিষ্ট স্থানে জল ধরে রাখার চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছিল। তদানীন্তন মেসোপটেমিয়ায় খননকৃত খাল হচ্ছে বিশ্বের সর্বপ্রাচীন খাল যা প্রায় ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বে খনন করা হয়। বর্তমানে ইরাক এবং সিরিয়ায় তা অবস্থিত। পরবর্তী সময়ে সিন্ধু, মিশরীয় প্রভৃতি সভ্যতাগুলো বিভিন্ন কৃত্রিম খালের জল দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ওঠে। মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম খালের জল বর্তমান যুগেও কৃষিক্ষেত্রে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এরপর আগামী সংখ্যায়

আকাশে আলোর রোশনাই- মেরুপ্রভা

অরূপ বন্দ্যোপাধায়ায়

পৃথিবীর দুই মেরু, উত্তর ও দক্ষিণ। এই দুই মেরুর আকাশে অত্যাশ্চর্য আলোর খেলা দেখা যায়, যাকে আমরা মেরুপ্রভা বলে জানি। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে বিস্মিত করেছে আলোর এই কারসাজী। উত্তর মেরুতে এই আলোর ছটাকে বলা হয় Aurora Borealis। দক্ষিণ মেরুর মেরু প্রভাকে বলা হয় Aurora Australis। Aurora কথার অর্থ ভোরের আলো।

যখন মানুষ বিজ্ঞানের আলোয় পারিপার্শ্বিক ঘটনাকে ব্যখ্যা করতে পারত না, তখন তার ধারনা ছিল, নিশ্চই এর পিছনে আছে কোনও দৈবশক্তি বা আসুরিক শক্তি। যেমন আদিম যুগে গ্রীনল্যান্ড বাসিদের ধারনা ছিল, মেরুপ্রভা আসলে মৃত সন্তানদের আত্মা। সুইডেনের মানুষেরা মনে করত দেবতা তাদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন মেরুপ্রভার মাধ্যমে। রোমানরা মেরুপ্রভাকে আলোর দেবী বলে কল্পনা করত। শোনা যায় মেরু থেকে দূরেও এই প্রভা দেখা যেত অনেক কাল আগে। যেমন চিনা ড্রাগনের কল্পনাও নাকি এই মেরুপ্রভা থেকেই। মেরুপ্রভা দেখে তারা নাকি মনে করত ভাল ড্রাগন আর খারাপ ড্রাগনে লড়াই বাধিয়ে বেজায় আস্ফালন করছে দিগন্ত জুড়ে। সত্যি সত্যি চিন দেশে এই মেরুপ্রভা দেখা যেত, না তখনকার যাযাবর মানুষেরা উত্তর মেরুর কাছাকাছি কোথাও এই আলোর খেলা দেখে ফেলেছিল, সে সব আজ আর জানবার কোন উপায় নেই।

পৃথিবীর আকাশে এই দৈব আলোর পিছনে আছে অত্যন্ত চমকপ্রদ বিজ্ঞান। তোমরা সবাই জানো যে পৃথিবীর নিজস্ব চুম্বক শক্তি আছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যেতে আমরা চারটি স্তর পাই- তৃতীয় স্তরটিতে আছে তরলীভূত লোহা আর নিকেল। তরল পরিস্থিতিতে থাকবার কারনে এরা আয়নিত অবস্থায় থাকে। পৃথিবী তার নিজের অক্ষে যখন পাক খায়, তখন এই তরল আয়নিত লোহা ও নিকেলের মিশ্রন বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। কাজেই সৃষ্টি হয় বৃত্তাকার বিদ্যুৎ প্রবাহ। ঘুরতে থাকা এই বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য সৃষ্টি হয় চুম্বক শক্তি

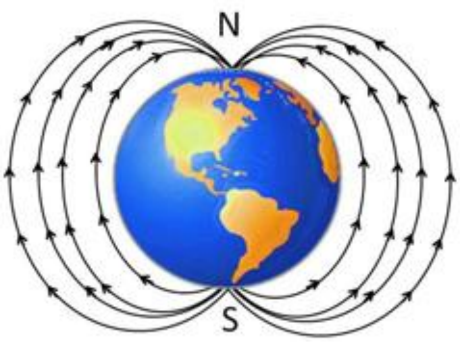

(রাইটহ্যান্ড থাম্ব রুল)। ফলে পৃথিবীর চুম্বক বল রেখা গুলো ভৌগলিক দক্ষিণ মেরু থেকে শুরু হয়ে ভৌগলিক উত্তর মেরুতে শেষ হয়। নিচের ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে দুই মেরুতেই এই চুম্বক বল রেখা গুলো সোজাসুজি ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। এখানে মনে রাখতে হবে, ভৌগলিক উত্তর মেরু কিন্তু চুম্বকীয় দক্ষিণ মেরু এবং ভৌগলিক দক্ষিণ মেরু চুম্বকীয় উত্তর মেরু।

এবার দেখা যাক মেরুপ্রভাতে সূর্যের ভূমিকা। সূর্যের ভিতরে আছে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাস। প্রবল তাপে সেই গ্যাসের পারমানবিক বিক্রিয়া হয়ে চলেছে ক্রমাগত। কখনো কখনো সেই বিক্রিয়ার প্রবল বিস্ফোরণে সূর্যের উপরি ভাগের গ্যাস তিব্র গতিতে চারিদিকে ছিটকে ওঠে। সূর্যের নিজস্ব চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতির জন্য নির্গত ইলেকট্রন স্রোত ধাবিত হয় পৃথিবীর অভিমুখে। এই ঘটনাকে বলা হয় সৌর ঝড়। যে কোনও সময়ে এই সৌর ঝড় ঘটতে পারে, তার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই।

সূর্য থেকে আগত ইলেকট্রন স্রোত এবার ভূপৃষ্ঠে কি খেলা করে দেখা যাক। ফ্লেমিঙ্গের বিখ্যাত বাম হস্ত নিয়ম (লেফট হ্যান্ড রুল) স্কুলে পড়েছ অনেকে। মনে করার জন্য নিচের ছবিতে দেখ। এই নিয়ম অনুযায়ী, যদি তর্জনীর দিকে হয় চৌম্বক ক্ষেত্র, মধ্যমার দিকে হয় তড়িৎ প্রবাহ, তাহলে একটি বিদ্যুৎ বাহী তার অঙ্গুষ্ঠের দিকে বেঁকে যায়। সূর্যের থেকে ধেয়ে আসা ইলেকট্রন স্রোত বিদ্যুৎ বাহী তারের মত ব্যবহার করে, কারণ ইলেকট্রনে আছে নেগেটিভ চার্জ। আর পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের সাথে সামান্য আনত অবস্থায় এই ইলেকট্রন স্রোত যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তার গতি বেঁকে যায় এবং ইলেকট্রন স্রোত স্প্রিঙের মত পাক খায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত

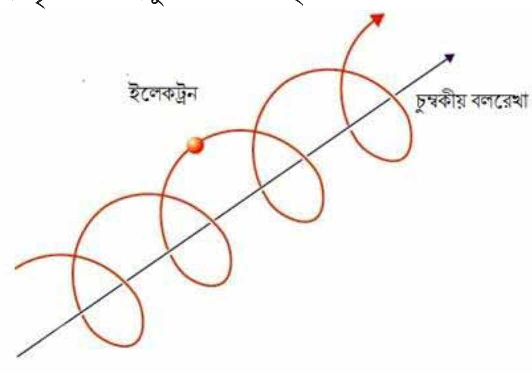

অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের সাথে ধাক্কা খায় এই ইলেকট্রন স্রোত। ধরা যাক, অক্সিজেনের একটা পরমাণুর সাথে ধাক্কা খেল একটা তীব্র গতিতে ধেয়ে আসা এক ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের গতিশক্তি অক্সিজেন পরমাণুর বাইরের খোলে ঘুরতে থাকা ইলেকট্রনে হস্তান্তরিত হল। অক্সিজেনের ইলেকট্রন উচ্চ শক্তির স্তরে চলে গেল। কিন্তু যখনি এই ইলেকট্রন আবার তার অপেক্ষাকৃত নিচের শক্তি স্তরে নেবে আসে, তখন সে শক্তি নির্গত করে এবং সেই শক্তি আলোক শক্তি। কোটি কোটি ইলেকট্রন এই ভাবে আলো বিচ্ছুরিত করে। এই যে আলোর বিকিরণের কারণ ব্যাখ্যা করা হল, তার পিছনে যে নিয়ম আছে, তা হল বোরের সুত্র। ১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী নীলস বোর তার বিখ্যাত " Bohr's Theory" প্রস্তাবনা করেন।

অক্সিজেন পরমাণুর থেকে যে রশ্মি নির্গত হয়, তার রঙ সবুজ। আবার নাইট্রোজেন পরমানু থেকে নির্গত হয় লাল রঙ। কারণ প্রতি পরমাণুর শক্তি স্তর আলাদা আলাদা। শক্তি স্তরের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে সে কোন রঙের আলো নির্গত করবে।

আকাশে এই আলোর রঙিন খেলা দেখতে হলে যেতে হবে উত্তর মেরুর কাছাকাছি দেশ গুলোতে, যেমন কানাডা, আলাস্কা, আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড বা রাশিয়া। দক্ষিন মেরুতেও ঠিক একই সময়ে মেরুপ্রভা দেখতে পাওয়া যায়।

কখনও কখনও মনে হয় যেন রঙিন আলোর চাদর কেউ আকাশে মেলে দিয়েছে আর হাওয়ায় দুলছে। আলোর চাদর বা আলোর সিঁড়ি দুলতে থাকার কারণ পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন।

এবার কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে এই বিস্ময়কর মেরুপ্রভা যেমন দেখা যায়, অন্য গ্রহেও কী এমনটাই দেখা যেতে পারে? এতক্ষনে নিশ্চই তোমরা বুঝে গেছ যে কোনও গ্রহে বায়ুমণ্ডল থাকলে এবং তার নিজস্ব চুম্বকীয় ক্ষেত্র থাকলেই এই মেরুপ্রভা দেখা যাবে। বৃহস্পতি আর শুক্রগ্রহে গেলে আমারা মেরুপ্রভা দেখতে পাব। কিন্তু চাঁদে দেখা যাবে না, কারণ চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই।

চুম্বকের দোসরের গল্প

সুজিতকুমার নাহা

হদিশ প্রথমে দিয়েছিলেন বরেণ্য বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে বিদ্যুৎ নিয়ে তাঁর বিচিত্র পরীক্ষা-গবেষণা-তত্ত্বানুসন্ধানের বিবরণ লিখতে বসে চুম্বকের দোসরের অস্তিত্বের আভাষ দিয়েছিলেন তিনি। মজার বিষয় হল, চুম্বকের ইংরেজি নামে মাত্র ছটি অক্ষর থাকলেও ফ্যারাডের দেওয়া দোসরের নামটিতে ছিল পাক্কা উনিশটি অক্ষর ! বিষয়টি নিয়ে এরপর আলোচনা করেন বিজ্ঞানী অলিভার হেভিসাইড। ফ্যারাডের রাখা উনিশ অক্ষরের দাঁতভাঙ্গা নাম সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় পালটে রাখেন আট অক্ষরের ছোটো নাম 'ELECTRET'। আসলে, ELECTRicity ও magnET-এর অংশ সহযোগেই তিনি ELECTRET শব্দটি গঠন করেছিলেন।

চুম্বকের এই দোসরের সাহায্য আমরা নিয়ে থাকি হামেশাই। হয়তো অজান্তেই। এমন বহু বহনযোগ্য (পোর্টেবল) বৈদ্যুতিন (electronic) উপকরণ আমরা ব্যবহার করি যেগুলো হয়ত বানানোই যেত না এটির উদ্ভাবন ছাড়া।

ইলেকট্রেট-এর বাংলা পরিভাষা কী হবে ? হেভিসাইডের অনুকরণে 'বিদ্যুৎ' ও 'চুম্বক' শব্দদ্বয়ের টুকরো জুড়ে তৈরি করতে পারি ইলেকট্রেট-এর বাংলা রূপভেদ 'বিম্বক'।

ফ্যারাডে কিংবা হেভিসাইড কিন্তু বিম্বক বানাননি। তাঁদের কাজ তাত্ত্বিক আলোচনাতেই থেমে ছিল। সেই সময়ের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁরা হাতে নিতে পারেননি বিম্বক তৈরির কাজ। এরপর কেটে যায় অনেকগুলো বছর। এখন (2017) থেকে ঠিক 92 বছর আগে জাপানি অধ্যাপক মোতোতারো ইগুচি বিম্বক তৈরির কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন। তাই ইগুচির বানানো নমুনাটিকেই বিশ্বের প্রথম বিম্বক বলে গণ্য করা হয়।

এবার জেনে নেওয়া যাক বিম্বক ঠিক কী জিনিস।

বিম্বককে মনে করা যেতে পারে চুম্বকের বৈদ্যুতিক প্রতিরূপ (electrical counterpart)। আসলে বিম্বক হচ্ছে মৌচাকের মোম (beeswax), অ্যাক্রিলিক (এক ধরনের প্লাস্টিক),ইথাইল সেলুলোজ,পলিস্টাইরিন, সিরামিক ইত্যাদি স্বমেরু অণু (polar molecule)-সমন্বিত অন্তরকের (insulator) বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এমন একটি টুকরো যার একদিকে পজিটিভ চার্জ ও অন্যদিকে নেগেটিভ চার্জ অবস্থান করে স্থায়ীভাবে। চুম্বকের দুই প্রান্তে ভিন্নধর্মী মেরুর অবস্থানের সাথে এটা বেশ মিলে যায়। মিল আরও আছে। চুম্বককে যেমন ঘিরে থাকে চৌম্বক ক্ষেত্র, ঠিক তেমনি বিম্বকের চারপাশেও থাকে স্থিরবৈদ্যুৎ ক্ষেত্র।

বিম্বক সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর জানা যাক বিম্বক কীভাবে তৈরি করা হয় আর এটির ব্যবহারের ক্ষেত্র কী কী। এই বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করা যাবে পরের আলোচনা থেকে।

বিম্বক বানানোর কৌশল

বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিম্বক তৈরি করা যায়। প্রথমদিকে কায়দাটা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রতি মিটারে প্রায় এক লক্ষ ভোল্ট বা তার কাছাকাছি উচ্চ মাত্রার বিভব ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তার ভেতর তরল অবস্থায় বিম্বকের উপাদানটি রেখে জমতে দেওয়া হত। উপাদানের স্বমেরু অণুগুলো সাধারণত এলোমেলোভাবে বিভিন্ন দিকে মুখ করে বিন্যস্ত থাকে। হাই ভোল্ট ফিল্ডের পাল্লায় পড়ে কিন্তু স্বমেরু অণুগুলো ফিল্ডের অভিমুখ অনুসারে ঠিক দিকে মুখ করে নিজেদের সাজিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশ্রামরত সেনারা কমান্ডারের নির্দেশে যেমন চটজলদি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে, ব্যাপারটা যেন তেমনই ! ঠান্ডা হয়ে জমাট বাধার পরে ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ্ করলেও বজায় থাকে অণুদের এই সুশৃঙ্খল বিন্যাস । এই ব্যবস্থাপনার নিট ফল হিসেবে দুই প্রান্তে বিপরীতধর্মী চার্জ পাকাপাকিভাবে আস্তানা গাড়ে। একদিকে পজিটিভ চার্জ ও অন্যদিকে নেগেটিভ চার্জের স্থায়ী উপস্থিতির কারণে জন্ম হয় বিম্বকের।

বিম্বক প্রস্তুতিতে বিপজ্জনক অত্যুচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ এখন আর দরকার পড়ে না। বিম্বকের উপাদানের ভেতর অতিরিক্ত চার্জ বাইরে থেকে ঢোকানোর উপায় উদ্ভাবনের পর অনেক সহজে ও কম খরচে বিম্বক বানানো সম্ভব হয়েছে।

বিম্বকের ব্যবহার

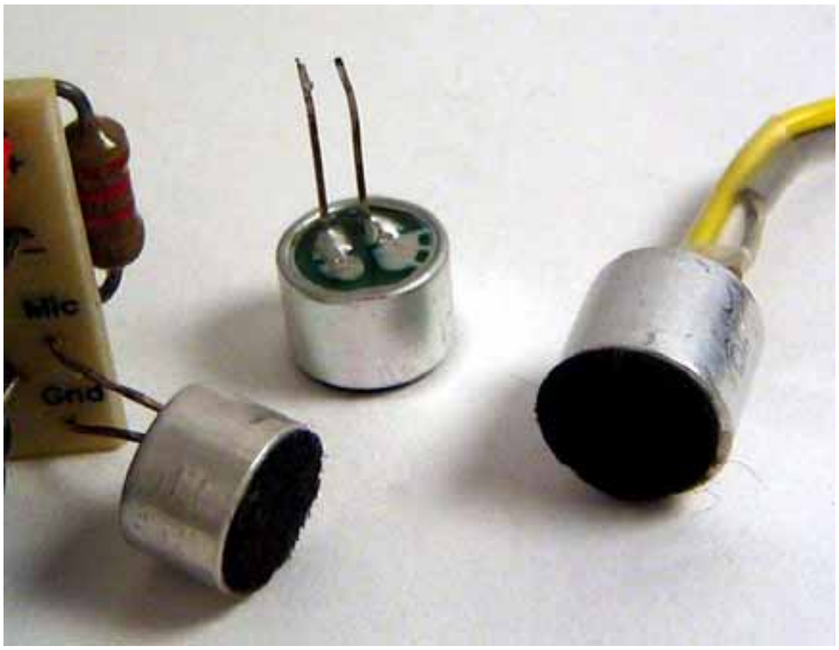

বিম্বকের উদ্ভাবনে পালটে গেছে মাইক্রোফোনের দুনিয়া। বিম্বক ব্যবহার করে গোলমরিচের চেয়েও ছোটো কিন্তু অত্যন্ত উন্নত ধরনের 'ইলেকট্রেট মাইক্রোফোন' তৈরি করা সম্ভব হয়েছে । মাইক্রোফোন বাজারের প্রায় নব্বই শতাংশই এখন বিম্বকের দখলে। সংখ্যার হিসেবে বছরে ইলেকট্রেট মাইক্রোফোনের উৎপাদন 200 কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

প্রত্যেক ল্যাপটপ, ট্যাব, মোবাইল ফোন, ডিজিটাল অডিও রেকর্ডার, হিয়ারিং এইড এসবের ভেতরে ইলেকট্রেট মাইক্রোফোনের দেখা অবশ্যই মিলবে। এমনকী রেকর্ডিং স্টুডিওতে ব্যবহৃত বেশির ভাগ মাইক্রোফোনই এখন ইলেকট্রেট পরিবারভুক্ত।

বিম্বক যে কেবল মাইক্রোফোন বানাতেই কাজে লাগে তা নয়। ফোটোকপি মেশিন, এয়ার ফিল্টার, রেডিয়েশন মিটার, কম্পনশীল বস্তু থেকে শক্তি সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক মাপন যন্ত্র --- এসব নানা উপকরণ বানাতে এখন বিম্বক ব্যবহৃত হচ্ছে।

উন্নত মানের বৈদ্যুতিন সামগ্রীর আকারগত ক্ষুদ্রায়নের (miniaturisation) স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পেছনে চুম্বকের দোসর বিম্বকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সেকথা মানতেই হবে !

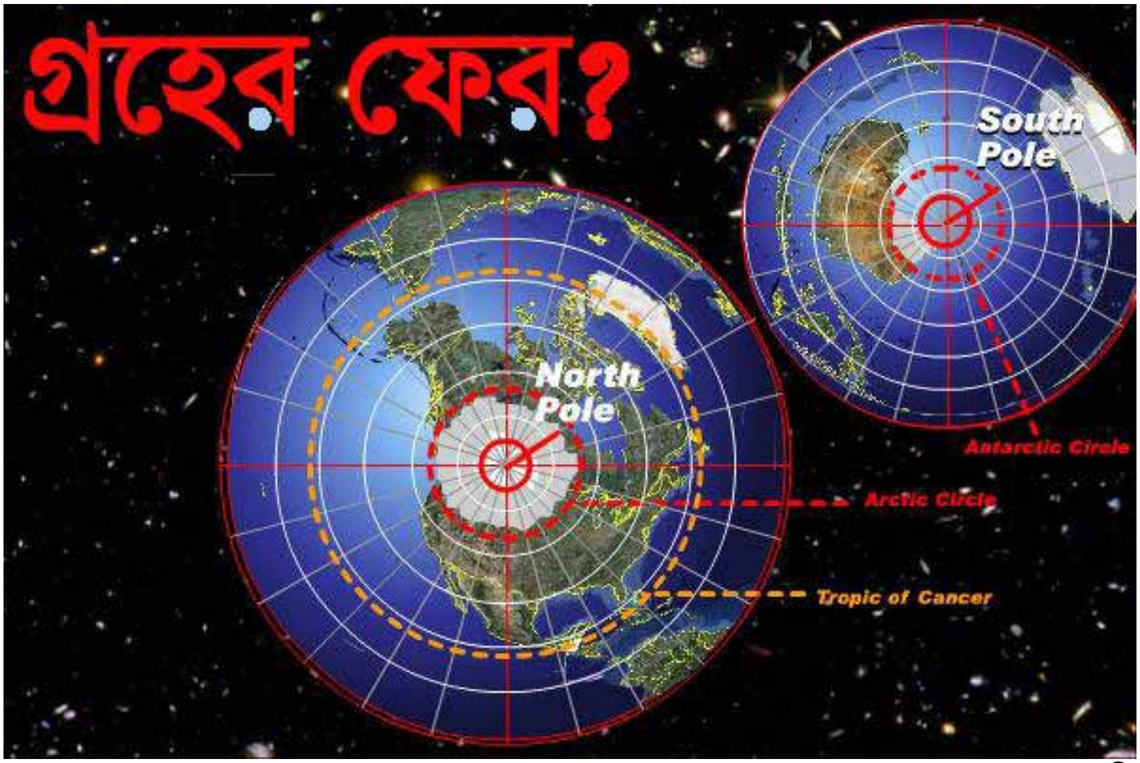

ঋজু গাঙ্গুলী

কলিং বেলের কাছে আঙুলটা নিতে গিয়েই খটকা লাগল।
শনিবারের রাত, দরজার বাইরে বাহারি জুতো আর চটির একটা ছোটোখাটো স্তূপ।
কিন্তু সব এত চুপচাপ কেন?
দরজা খোলার পর ভেতরে একঝলক তাকিয়েই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা সত্যি। টিভিটা বন্ধ, সোফায় চৌকো বা কাত হয়ে রয়েছে মেঘনা, মধুরিমা, তোষালি, অনুমিতা, আর আমার বউ। রান্নাঘরে জয়া খুটুরখাটুর করছে ঠিকই, তবে এছাড়া ফ্ল্যাটে কোনো আওয়াজ নেই।
ব্যাপার সিরিয়াস!
আমার দিকে তাকিয়ে প্রথম মুখ খুলল অনুমিতা, "আচ্ছা ঋজুদাদা, এই উত্তর-দক্ষিণ উলটে যাওয়ার ব্যাপারটা যখন হবে, তখন দিন-রাত কি এখনকার মতো করেই হবে, না কি পৃথিবীর ঘোরাও থেমে যাবে?"
লোকে বলে, ষোলো বছরের সরকারি চাকরি আর সাড়ে তেরো বছরের বিবাহিত জীবনের পর আমি নাকি কিছুতেই অবাক হই না। ওসব কথায় একদম কান দেবেননা, কারণ অনুমিতা-র এই কথাটা শুনে আমি জুতো খোলা ভুলে হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।
"অনু পোলার শিফটের কথা বলছে, ভাইদা", একটু প্রাঞ্জল করে বলে মধুরিমা, "মানে পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরু তো এবার পালটে যাবে, তাই না?"
"এই শিফট-টাই কি বছর চারেক আগে হওয়ার কথা ছিল? মানে, সেই যে মায়া ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০১২-র পর আর কিছু নেই…" হালকা করে বলে তোষালি।
"পৃথিবী ওলটপালট হতে চলল, আর তুমি কিচ্ছু জাননা!", রীতিমতো হতাশ গলায় বলেন শ্রীমতী।
আমাকে ভেবলে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে মেঘনা কিছু আন্দাজ করে। ওর এনে দেওয়া জলের বোতলের প্রায় অর্ধেকটা খালি করে মাথাটা ঠান্ডা হয়।
একটা চেয়ার টেনে গুছিয়ে বসি আমি।

শনিবারের সন্ধেয় আমাদের ফ্ল্যাটে যে আড্ডাটা বসে, তার সঙ্গে ইতিমধ্যেই আপনারা পরিচিত হয়েছেন। এই 'শনিচক্র'-য় আজকের সংযোজন অনুমিতা, যে সচরাচর অন্য দিনে মেঘনাকে গান শেখাতে এলেও আড্ডার টানে নিজের রুটিন বদলেছে ইদানিং। বুঝলাম, আজকেও এই আড্ডার সদস্যরা লেটেস্ট ব্লকবাস্টারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বা ঠিক কোন মাসে গ্যাংটক/পুরী/গোয়া/কোচি বেড়াতে যাওয়া উচিৎ সেই নিয়ে আলোচনা না করে একটি আক্ষরিক অর্থে হেভি-ডিউটি বিষয় বেছেছেন। এও বুঝলাম, সদ্য কেনা পত্রিকার 'ভূত' সংখ্যাটা হাতে নিয়ে সোফায় কাত হওয়ার পরিকল্পনাটি আপাতত মুলতুবি রাখাই শ্রেয়।

ঘড়ির দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাইলাম। রাত পৌনে আটটার সময়ে চা চাওয়াটা নিতান্তই বিপজ্জনক, তবে এই মুহূর্তে আমি ভিআইপি। 'শোলে'-তে ঠাকুরের কথা অনুযায়ী লোহা গরম থাকাকালীন হাতুড়ি মেরে দেওয়ার ফল পাওয়া গেল। বেটার হাফ রান্নাঘরের উদ্দেশে হাঁক পেড়ে জয়াকে আমার জন্য এক মগ চা করতে বললেন। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি কথা শুরু করলাম।

"প্রথমেই একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। 'পোলার শিফট', অর্থাৎ একটা গ্রহের ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু জায়গা বদল করার ঘটনা এখনও অবধি সৌরজগতের ইতিহাসেই ঘটেছে মাত্র কয়েকবার ঘটেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এখনও অবধি এটা ঘটেইনি"।

সবাইকে উশখুশ করে উঠতে দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলে চললাম, "পৃথিবীর ইতিহাসে যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে পরে বলছি। আগে এই উত্তর-দক্ষিণ পালটে যাওয়ার ব্যাপারটা খোলসা করা দরকার।

"পোলার শিফট-এর দুটো উদাহরণ আমাদের সৌরজগতে দেখা যায়। প্রথমটা দেখা যায় ভেনাস বা শুক্রগ্রহ-র ক্ষেত্রে। এই গ্রহ নিজের অক্ষ বা অ্যাক্সিস-এর চারপাশে যে অভিমুখে ঘোরে, সেটা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের ঘূর্ণনের বিপরীত। এটার অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবে নিতান্তই আজগুবি থিওরিগুলো ঝেড়ে ফেললে এর একটাই সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায়, আর সেটা হল: কোনো একটি বিশাল বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষে শুক্র পুরো উলটে গিয়ে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে যায়। পোলার শিফটের দ্বিতীয় উদাহরণ হল ইউরেনাস, যার ঘূর্ণন অক্ষ বরাবর সোজাসুজি না হয়ে পাশাপাশি হয়। এক্ষেত্রেও কোনো সংঘর্ষ তার এই অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে; অথবা সৌরজগতের দুই বড়ো 'দাদা' বৃহস্পতি বা জুপিটার, আর শনি বা স্যাটার্নের মধ্যে অভিকর্ষগত টানাপোড়েনের ফলেও এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কারণ যাই হোক না কেন, এই দুই গ্রহে প্রাণ যদি তার আগে থেকেও থাকে, সেসব যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল এর ফলে, তাই নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

কিন্তু"··· আবার ঘর জুড়ে প্রবল উশখুশ শুরু হতে দেখে আমি একটা ঢোঁক গিলেই গলা ভেজালাম, আর হুড়মুড়িয়ে বলে চললাম।

"পৃথিবীর ক্ষেত্রে এমন কিছু হতে পারে, এটা অনেক দিন ধরে বলা হয়ে আসছে। সত্যি বলতে কী, ডুমসডেয়ার বা ধ্বংস তথা প্রলয়ের প্রেডিকশন করে বাজার গরম করা লোকেদের খুব ফেভারিট একটা থিওরি হল এই পোলার শিফট। এদের প্রায় সব ফান্ডার উৎস হল চার্লস এইচ হ্যাপগুড-এর একদা বেস্টসেলার "পাথ অফ দ্য পোল"। এই বইয়ে হ্যাপগুড বিভিন্ন পুরোনো মানচিত্র, আন্টার্কটিকার পুরোনো চেহারা নিয়ে প্রকাশিত নানা তত্ত্ব, আর কিছু-কিছু ভৌগোলিক তথ্যের ভিত্তিতে 'দাবি' করেন যে পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বেশ কয়েকবার জায়গা বদল করেছে, এমনকি পৃথিবীর উপরিভাগ বা ক্রাস্ট কেন্দ্রীয় কোরে ডুবে গেছে ও কোর থেকে নতুন ক্রাস্ট তৈরি হয়েছে! এই থিওরি, আর সঙ্গে প্ল্যানেট এক্স, মানে সৌরজগতের তথাকথিত আপাত অদৃশ্য দশম গ্রহ-র সূর্যের কাছে আসার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন গাঁজাখুরি থিওরি মিশিয়ে ডুমসডেয়ার-রা এইসব হাবিজাবি কথা রটিয়েছে। যেহেতু মায়া ক্যালেন্ডার ২০১২-র পর আর এগোয়নি, তাই এরা হালে কিছুটা পানি পেয়েছিল।

তবে এই থিওরিগুলো এখন, যাকে বলে, থরোলি ডিসক্রেডিটেড হয়ে গেছে। এখন আমরা সমুদ্রতলের বিভিন্ন জায়গার ম্যাগনেটিক ফিল্ড পর্যবেক্ষণ করে এটা বুঝেছি যে পৃথিবীর উপরিভাগ বা ক্রাস্টের বিভিন্ন অংশ নড়াচড়া করে। গন্ডোয়ানাল্যান্ড আর আঙ্গারাল্যান্ডের সংঘাতে হিমালয় তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা তো প্লেট

টেকটনিক্স-এর উদাহরণ হিসেবে পাঠ্য বইয়েই আছে। এটাও মাথায় রাখা উচিৎ যে ভারতের এই 'উত্তরায়ন' এখনও চলছে, তবে বছরে ইঞ্চিখানেক করে। তাই ভৌগোলিক মেরু বা পোল উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাওয়ার কথাগুলো স্রেফ গুল"।

তোষালি প্রশ্ন তোলে, "পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথাগুলো বলে লোকের কী লাভ হয়?"
আমি বলি, "মোল্লা নাসিরুদ্দিনের একটা পাঁঠা ছিল"।
আমার বউ বিরক্ত হয়ে বলে, "একটা সিরিয়াস প্রসঙ্গেও তোমায় ইয়ার্কি মারতেই হবে?"
আমি বলি, "শোনো না। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের একটা পাঁঠা ছিল। তার বন্ধু আর পড়শিদের ওই পাঁঠাটার ওপর অনেকদিন ধরে নজর ছিল। তা তারা একদিন, বেশ আনুষ্ঠানিক জাব্বাজোব্বা পরে নাসিরুদ্দিনের বাড়ি গিয়ে বলল, 'বড়ো খারাপ খবর শুনলাম মোল্লাসাহেব। পৃথিবী নাকি কাল ধ্বংস হয়ে যাবে'।
নাসিরুদ্দিন বলল, 'পাঁঠাটাকেও তাহলে ধ্বংস করা যাক'।
পাঁঠার মাংস খেয়ে সবাই ভারী জামাকাপড় খুলে একেবারে ঘরোয়া পোশাকে আরামসে ঘুম দিল। ঘুম থেকে উঠে দেখে, তাদের দামি-দামি জামাকাপড় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। নাসিরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, 'পৃথিবীই যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন ওইসব জামাকাপড় রেখে কী লাভ? তাই আমি সেগুলোকেও ধ্বংস করে দিয়েছি'।
মোদ্দা কথা হল, এই ডুমসডে বা কেয়ামত সমাসন্ন হওয়ার কথাটা বাজারে ছড়ালে অনেক লোক ফাঁকতালে প্রচুর লাভ করতে পারে। হলিউডের কথাই ভাবো। 'দ্য কোর' নামক টোটাল ভুলভাল জিনিসে ভর্তি সিনেমাটাও বাজারে চলল স্রেফ লোকের এই ভয়ের কাঁধে ভর দিয়ে যে পৃথিবীর নিজের অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন থেমে গেলে কী হবে! আর 2012 -র কথা তো আমরা সবাই জানি"।
মেঘনা এবার মুগ্ধ কণ্ঠে যোগ দেয়, "কী ভালো ছিল মুভিটা"।
সিনেমাটার পিন্ডি চটকাতে উদ্যত হচ্ছিলাম, কিন্তু অনুমিতা আলোচনাটা মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনে, "তাহলে এই উত্তর-দক্ষিণ নিয়ে কথাগুলো এখন আবার উঠছে কেন?"
আমি বলি, "কথাটা উঠছে জিওম্যাগনেটিক রিভার্সাল নিয়ে"।

স্রোতাদের মুখচোখ দেখে বুঝি, আমি চিনা বা রাশিয়ান ভাষায় কিছু বলে ফেললেও এই প্রতিক্রিয়াই হত। ইতিমধ্যে চা এসেছে, এবং অর্ধেক উড়েও গেছে। বাকিটা সযত্নে লালন করার ফাঁকে আমি বলি, "পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে তোমরা কিছু জান?"
সবাই এত জোরে মুন্ডু হেলাতে লাগল, যে আমার ভয় হল, মাথাগুলো কাঁধ থেকে না খুলে পড়ে যায়।
আমি কাজ কমানোর আশায় বললাম, "আচ্ছা বেশ। কোনো জিনিস ম্যাগনেটিক বা চৌম্বকীয় কেন হয়, মানে চুম্বক ঠিক কেন ওইরকম ভাবে আচরণ করে, সেটা নিশ্চই তোমরা জান?"
এবারো প্রতিক্রিয়া একই রকম দেখে আমি এত জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম যে সামনের সেন্টার টেবিলে রাখা ডিসকাউন্ট কুপন সম্বলিত কয়েকটা বিউটি পার্লারের হ্যান্ডবিল উড়ে গেল। সমবেত "হায়-হায়" থামলে, আর সেইসব অমূল্য নিধি যথাস্থানে ফেরত এলে আমি শুরু করলাম।

"কয়েক সহস্রাব্দী বা মিলেনিয়াম আগেই মানুষ এটা দেখে যে লোডস্টোন, মানে প্রকৃতিতে পাওয়া চুম্বক, যা আসলে প্রাকৃতিকভাবেই চুম্বকে পরিণত হওয়া একধরনের লৌহ-আকরিক ম্যাগনেটাইট মাত্র, লোহাকে আকৃষ্ট করতে পারে। গ্রিসের ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে পাওয়া যাওয়া এই ধরনের পাথর, বা ম্যাগনিটিস লিথোস থেকেই ম্যাগনেট কথাটা এসেছে।
অ্যারিস্টোটল চুম্বক ও চৌম্বকীয় ক্ষেত্র, মানে ম্যাগনেটিক

ফিল্ড নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত করলেও এখানে ভারতের একটা ছোট্ট অবদানের কথাও বলতেই হয়: সুশ্রুত শল্যচিকিৎসার কাজে চুম্বক ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এরপর ম্যাগনেটিজম নিয়ে প্রচুর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা হয় চিন-এ। দশম শতাব্দীতে চিনা বিজ্ঞানী শেন কুও তাঁর একটি প্রবন্ধে ম্যাগনেটিক নিডল-কে কম্পাস হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলেন, যাতে ভৌগোলিক উত্তর মেরু আরো নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই চিনা জাহাজে লোডস্টোন কম্পাস ব্যবহৃত হতে শুরু করে, যেখানে একটি চামচের আকারের লোডস্টোন সবসময়েই দক্ষিণ দিকে মুখ করে ঝুলে থাকত।
দ্বাদশ শতাব্দীতে আলেক্সান্ডার নেক্যাম, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পিটার মারিকোর্ট ও ইয়েমেনের বৈজ্ঞানিক আল-আশরফ-এর মাধ্যমে ম্যাগনেটিজম নিয়ে চর্চা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম গিলবার্ট প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত কাজ ‘অন দ্য ম্যাগনেট অ্যান্ড ম্যাগনেটিক বডিজ, অ্যান্ড অন দ্য গ্রেট ম্যাগনেট দ্যাট ইজ আর্থ’। এই বইয়ে গিলবার্ট ‘টেরেল্লা’ নামে পৃথিবীর একটি মডেল বানিয়ে বুঝতে পারা বেশ কিছু জিনিস লেখেন, এবং তাঁর এই বইয়েই প্রথম, একেবারে স্পষ্টভাবে, বলা হয় যে পৃথিবী নিজেই একটি চুম্বক, আর সেজন্যই কম্পাসের সূচ উত্তর দিকে মুখ করে থাকে। এটা এজন্যেই উল্লেখযোগ্য যে এর আগে লোকের ধারণা ছিল, ধ্রুব তারা বা পোলারিস-এর আকর্ষণে কম্পাস উত্তরমুখী হয়। কেউ তো এমনও ভাবতেন যে উত্তর মেরুতে একটা বিশাল চুম্বকীয় ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বীপ আছে বলেই লোডস্টোন এমন আচরণ করে!
উনিশ শতকের ইউরোপে একের পর এক দিকপাল বিজ্ঞানীর কাজের মাধ্যমে ম্যাগনেটিজম নিয়ে আমাদের ধারণাটা আরেকটু স্পষ্ট হয়। ওরস্টেড দেখান যে তড়িৎ প্রবাহিত হলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। এরপর অ্যাম্পিয়ার, গস, বায়োট ও স্যাভার্ট, এবং মাইকেল ফ্যারাডে তাঁদের কাজের মাধ্যমে একেবারে প্রমাণ করে দেন যে তড়িৎ বা ইলেকট্রিসিটি আর চুম্বকীয় বল বা ম্যাগনেটিজম আসলে একই শক্তির রকমফের মাত্র, যা শেষ অবধি জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের হাতে সূত্র আর সমীকরণের বাঁধনে ধরা পড়ে। এরপর আসেন আইনস্টাইন তাঁর স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে। এসবের প্রভাবে তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের শুধু স্বভাব নয়, উৎস বিষয়েও আমরা বেশ কিছু জিনিস জানতে পারি”।

আলোচনাটা ভারী হয়ে যাচ্ছে বুঝে, এবং চনমনে চোখগুলো ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে দেখে ইতিমধ্যে গৃহকর্ত্রী ফিল্ডে নেমেছিলেন। ফলে, নিতান্তই অসময় হওয়া সত্ত্বেও ধূমায়মান পকোড়ায় ভরা একটা ডিশ সামনে আবির্ভূত হল। কিছুক্ষণের হুশ-হাশ-‘কী গরম’-‘এত ঝাল কেন’ শেষ হলে, আক্ষরিক অর্থে ফর্টিফায়েড হয়ে, আমি আবার শুরু করি।

“যেকোনো পদার্থ যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি, তাদের অণু-পরমাণু এসব নামে আমরা জানি। একটি মৌলের পরমাণুর চেহারা কেমন সেটা বুঝতে গেলে সৌরজগতের ছবিটাই আমাদের সামনে ভাসে, যেখানে সূর্যের মতো কেন্দ্রে আছে নিউট্রন-প্রোটন ঠাসা নিউক্লিয়াস, আর তার চারপাশে গ্রহের মতো নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে ইলেকট্রনের ঝাঁক। এখন যদিও কোয়ান্টাম মেকানিক্স এসে এই মডেলকে একেবারে বাতিল করে দিয়েছে, তবে বোঝার সুবিধার্থে আমরা এটা দিয়েই শুরু করি।
এই সব সাব-অ্যাটমিক পার্টিকল, মানে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন নিজের নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরপাক খায় মূলত তাদের চারপাশে চলতে থাকা নানারকম আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। চার্জের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় নিউট্রন আর পজিটিভ চার্জ বহনকারী প্রোটনে ঠাসা নিউক্লিয়াস ভীষণ ভারী, আর স্থায়ী। সেখানে এই ঘূর্ণনের ফলে আশেপাশে তেমন একটা তড়িচ্চুম্বকীয় প্রভাব পড়েনা। ইলেকট্রনগুলো নিজের অক্ষের ওপর ঘুরপাক খেলে একটা বল তৈরি হয় বটে, তবে সেটাও আমরা যা নিয়ে গ্যাঁজাচ্ছি তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হল নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন বা অরবিট্যাল মোশন”।

“ধুর! এইসব জিনিস তো ক্লাসে পড়ানো হয়। তুমি বলো, পৃথিবীতে ঠিক কী হচ্ছে, যা নিয়ে লোকে এতসব কথা বলছে”, বিরক্ত কণ্ঠে বলে মধুরিমা।
“ঠিক বলেছিস”, গলা মেলায় অনুমিতা, “এসব শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। তুমি এই পড়াশোনার জিনিসগুলো বাদ দিয়ে বলো তো”।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর ক্লাস নাইন-টেনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি মনে-মনে প্রভূত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানিয়ে, আবার শুরু করি।

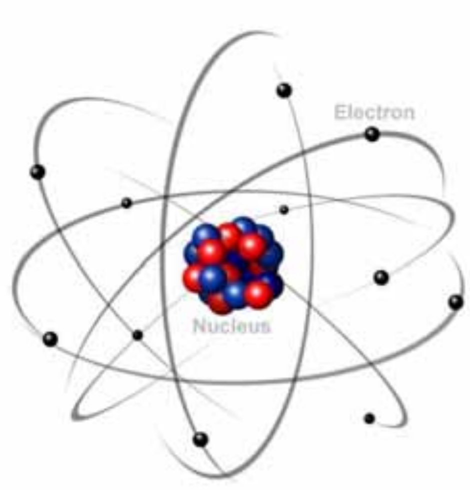

"মোদ্দা কথা হল, সাধারণ অবস্থায় একটা পদার্থের অণুতে ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে থাকে, যাতে তাদের নিজের টানাপোড়েন একে-অপরকে কেটেকুটে দেয়, ফলে বস্তুটা স্থায়ী থাকে। মানে, তোদের একজন যদি আরেকজনের হাত শক্ত করে ধরে বনবনিয়ে ঘুরপাক খাস তাহলে হাতে টান পড়লেও যেমন কেউই ছিটকে পড়বিনা, তেমন করেই পদার্থের ভেতরে ইলেকট্রনের ঘোরাঘুরি সত্বেও জিনিসটা ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু…

একটা শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে পড়লে একটা পদার্থের ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে যুদ্ধ করতে চলা সৈন্যবাহিনীর মতো লাইন দিয়ে দাঁড়ায় যে তাদের মধ্যে একটা নেট পজিটিভ-নেগেটিভ, তথা উচ্চ শক্তিস্তরের নর্থ আর নিম্ন শক্তিস্তরের সাউথ ব্যাপার তৈরি হয়। এটাই হল ম্যাগনেটিক ডাইপোল, আর এই জিনিসটা হলেই সেই বস্তুর মধ্যে চুম্বকের ধর্ম দেখা যায়"।

"সব কিছুই কি এরকম ভাবে চুম্বক হয়ে উঠতে পারে?", জানতে চায় তোষালি।

"নাঃ", আমি বলি, "একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে একটা বস্তু ঠিক কেমন আচরণ করে তার ভিত্তিতে তাকে প্যারাম্যাগনেটিক, ফেরোম্যাগনেটিক, অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক, ফেরিম্যাগনেটিক, এমন আরো নানা গোত্রে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে যারা ফেরোম্যাগনেটিক, তাদের মধ্যেই চুম্বক বেশি পাওয়া যায়। লোডস্টোন মানেই তো চুম্বক হয়ে যাওয়া ম্যাগনেটাইট, যা ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থের সেরা নমুনা"।

"আচ্ছা বাবা", এবার মেঘনা যোগ দেয় আলোচনায়, "ম্যাগনেটাইট মানেই কি তাহলে ম্যাগনেট?"

"না-না!", আমি আঁতকে উঠি, "পৃথিবীতে যত ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়, তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশই চুম্বকের মতো আচরণ করে"।

"কেন?", প্রশ্নটা সমস্বরে উড়ে আসে।

শ্রোতাদের মনোযোগ ফিরে পাওয়া গেছে বুঝে, কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেই বলি, "নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের ডক্টর পিটার ওয়াসিলিউস্কি রীতিমতো হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে একটা বিশেষ ধরণের ক্রিস্টালাইন গঠন হলে তবেই ম্যাগনেটাইটের কোনো একটা নমুনা চুম্বকে পরিণত হতে পারে। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়, কারণ পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডে সেরকম নমুনা ফেলে রেখেও দেখা গেছে যে তাতে কোনো রকম চৌম্বকীয় ক্ষমতা-টমতা তৈরি হয়না। গিলবার্ট সেই পাঁচশো বছর আগেই একটা গির্জার মাথায় বসানো লোহার চুম্বক হয়ে যাওয়ার কথা লিখে গেছিলেন। নিউ মেক্সিকোর ল্যাংমুর ল্যাবরেটরি, যেটা বজ্রপাত নিয়ে গবেষণার প্রধান কেন্দ্র, তাতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে গিলবার্টের পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল। অর্থাৎ বজ্রপাতের মতো কিছু হলে, মানে খুব অল্প সময়ের জন্য খুব বেশি মাত্রার তড়িচ্চুম্বকীয় বল কোনো ফেরোম্যাগনেটিক জিনিসের ওপর কার্যকরী হলে তা ম্যাগনেট হয়ে যেতে পারে।

যেমন, চাল-ঘি-মাংস নিয়ে সবাই ঘাম ঝড়ায়, কিন্তু আমার বউ হাত লাগালে তবেই সেগুলো বিরিয়ানি হয়ে ওঠে"।

ভবি ভুলল না। সোফা থেকে আওয়াজ ভেসে এল, "এখন আর চা না। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও শিগগির"।

বেজার মুখে "সংসার অসার" গোছের মন্তব্য করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মেঘনা আবার প্রশ্ন তুলল, "তাহলে পৃথিবী ম্যাগনেট হল কীভাবে?"

"হ্যাঁ, এটাই হল আসল ব্যাপার", বলে আমি গুছিয়ে বসি। আশেপাশে যে শরীরগুলো ক্রমেই ভার্টিকাল থেকে হরাইজন্টাল হয়ে পড়ছিল, সেগুলোও নড়েচড়ে ওঠে।

"পৃথিবীর উপরিভাগ, মানে সমুদ্র-মহাদেশ এসব যাতে থাকে সেই ক্রাস্ট থেকে, ম্যান্টল হয়ে, আমরা যখন ক্রমশ ভেতরে ঢুকতে থাকি, তখন, মোটামুটি দু'হাজার মাইল ভেতরে গেলে যা পাওয়া যাবে তা হল একটা তরল জায়গা, যেটাকে লিকুইড কোর বলা চলে। কিন্তু জলের বদলে এই অংশটায় আছে সাংঘাতিক গরম তরল লোহা, সঙ্গে কিছু সালফার আর নিকেল। এর থেকেও ভেতরে গেলে পাওয়া যাবে একটা নিরেট কেন্দ্রীয় জায়গা, বা সলিড কোর।

লিকুইড কোরে থাকা এই তরল লোহা, যা ফেরোম্যাগনেটিক, এই অংশের তাপ ও চাপ ব্যালেন্স করতে গিয়ে খুব মন্থর গতিতে হলেও ঘুরপাক খেতে থাকে। এই ঘূর্ণনে বিপুল পরিমাণ ইলেকট্রনের বিন্যাস ঘটে তৈরি হয় ইলেকট্রিসিটি বা তড়িৎ। সেই তড়িৎ পৃথিবীর নিজের অক্ষ বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘূর্ণনের সঙ্গে যোগ দিয়ে তৈরি করে এমন একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যাকে মাইকেল ফ্যারাডের তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে ব্যাখ্যা করে বলা হয় "ডায়নামো এফেক্ট"।

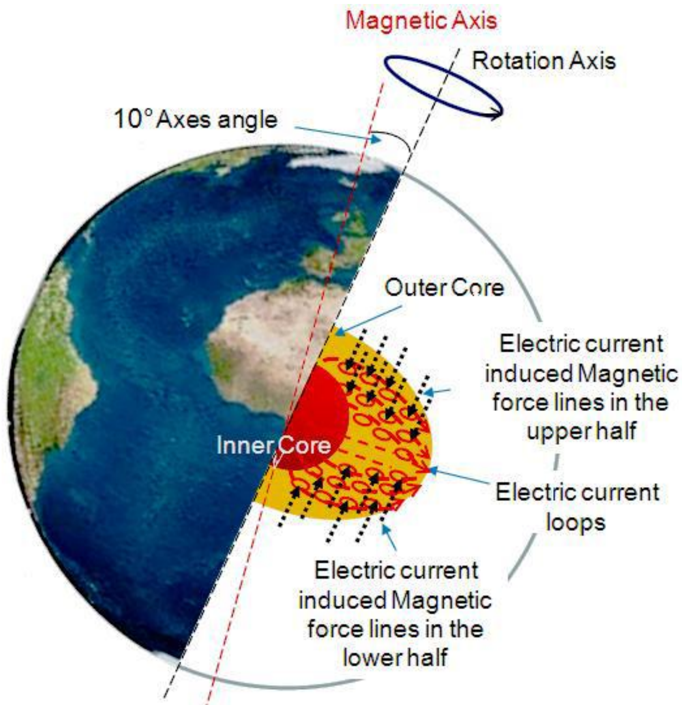

ঠিক কীভাবে পৃথিবীর এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় সেটা বোঝার জন্য বিস্তর চেষ্টা হয়েছে। অনেক অংক কষেও এর কোনো মডেল দাঁড় করানো কঠিন হয়েই থেকেছে, কারণ পৃথিবীর ভেতরে, মানে 'কোর' অংশে চাপ আর তাপ এমন ভয়ানক যে কোনো মডেলকেই পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বলা চলেনা। অধুনা মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্যান ল্যাথ্রপ এই রহস্যভেদ করার জন্য গিলবার্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি দশ ফুট ব্যাসের একটা ধাতব গোলকের ভেতরে গলন্ত সোডিয়াম ভরছেন। সোডিয়ামের গলনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি হওয়ায় একমাত্র সেটিই ল্যাবরেটরির পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশে তরল রাখা যাবে। এই গোলকের মোট ভর হবে ২৬ টন! তারপর এই গোলকটাকে, নিরক্ষরেখার কাছে পৃথিবী যে বেগে ঘোরে সেই ঘন্টায় ৮০ মাইল বেগে ঘোরানো হবে। ল্যাথ্রপ আশা করছেন যে এর ফলে একেবারে নিখুঁতভাবে বোঝা যাবে, পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে ঠিক কেমন করে তৈরি হয় এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তথা ডায়নামো এফেক্ট।

এই এফেক্ট তথা ফিল্ডের ফলে পৃথিবীর ভেতরে তৈরি হয় এক ঝাঁক ফিল্ড লাইন, যারা পৃথিবী নামক চুম্বকের দ্বারা প্রভাবিত এলাকার সীমারেখা নির্ধারণ করে। এই ফিল্ড লাইনগুলো পৃথিবীর চৌম্বকীয় দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুতে, যারা যথাক্রমে ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু আর উত্তর মেরুর কাছেই অবস্থিত, ধেয়ে যায়।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, এই ফিল্ড লাইনগুলো শুধুই মাটির মধ্য দিয়ে, বা সমুদ্রতল, এমনকি বায়ুমণ্ডল দিয়ে গেছে তা নয়। এরা বায়ুমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়েও ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুর কাছ থেকে পৃথিবীর বাইরে বহু-বহু দূর অবধি বেরোয়, আর তারপর লম্বা, আরো লম্বা, আরো-আরো লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে উত্তর মেরুর কাছে এসে ঢুকে পড়ে ভেতরে।

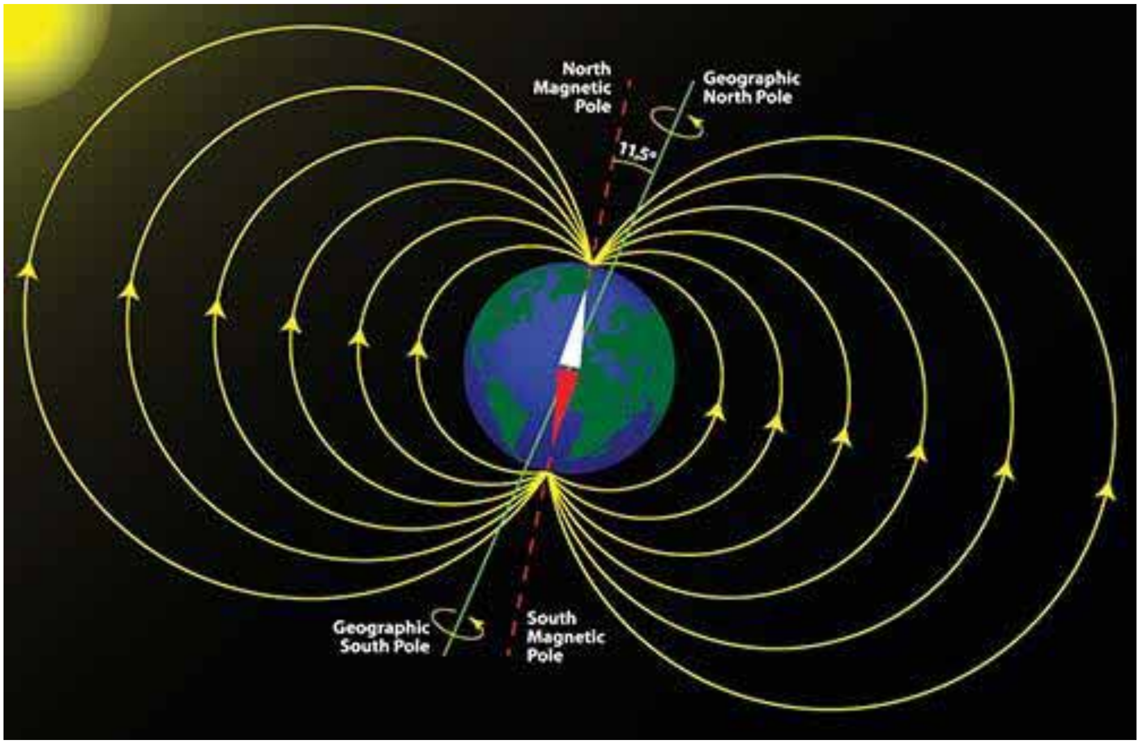

এই ফিল্ড লাইনগুলো দিয়ে যে জায়গাটা মোটামুটি ঢাকা পড়ে, সেটাই হল পৃথিবীর ম্যাগনেটোস্ফিয়ার, যা পৃথিবীকে নানা মহাজাগতিক রশ্মি আর সূর্যে হওয়া বিশাল আগ্নেয় বিস্ফোরণ ও ঝড়ের ফলে সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে হামলে পড়া সোলার উইন্ড বা প্লাজমার আক্রমণ থেকে বাঁচায়। যদি এই প্লাজমা পৃথিবীতে এসে পৌঁছত তাহলে ওজোন স্তর স্রেফ উড়ে যেত, আর তাহলেই গল্প শেষ হয়ে যেত। মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল, এবং সেখানে প্রাণের বিকাশের যাবতীয় সম্ভাবনা এই সোলার উইন্ডের ধাক্কাতেই লোপ পেয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পৃথিবীকে বাঁচানোর পাশাপাশি ম্যাগনেটোস্ফিয়ার আরো একটা কাজ করে। সূর্যের করোনা থেকে বেরিয়ে সেকেন্ডে ২০০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার অবধি বেগে ছুটে আসা চার্জ-বহনকারী কণাগুলো নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে ইন্টারপ্ল্যানেটারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড। পৃথিবীর পৃষ্ঠতল বা সারফেসের সমান্তরাল বরাবর ছুটে চলা ফিল্ড লাইনের ওপর লম্বালম্বি আছড়ে পড়ে এই কণাগুলোর অধিকাংশই আটকে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছে উত্তরমুখী জিওম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে যে কণাগুলোর সংঘর্ষ হয়, যদি তাদের ইন্টারপ্ল্যানেটারি ফিল্ডের অভিমুখ তখন দক্ষিণ দিকে থাকে, তাহলে একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়। সেই ফাঁক দিয়ে এই কণাগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একেবারে ওপরে আয়নোস্ফিয়ারে ঢুকে পড়ার সুযোগ পায়, আর কণায়-কণায় সংঘর্ষ হয়ে তৈরি হয় অরোরা বা মেরুজ্যোতি! যেহেতু আমাদের বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি আছে নাইট্রোজেন, তাই তা আয়নিত হয়ে তৈরি হওয়া নীল আর বেগুনি রং মেরুজ্যোতিতে সবচেয়ে বেশি হাজির থাকে। তারপরেই থাকে আয়নিত অক্সিজেনের থেকে পাওয়া লাল আর সবুজ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ম্যাগনেটিক নর্থ আর সাউথ পোল কি জায়গা পাল্টাচ্ছে?

তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন হল, যদি সেই ওলট-পালট হয়ই, তাহলে কী হবে?"

"হ্যাঁ ভাইদা", বলেওঠে মধুরিমা, "সেরকম হলে কী-কী হতে পারে?"

"খবরে দেখি সোলার ফ্লেয়ারের ফলে স্যাটেলাইট অকেজো হয়ে গেছে। তাহলে তখনও কি আমাদের সব স্যাটেলাইট অকেজো হয়ে যাবে?", জানতে চায় তোষালি।

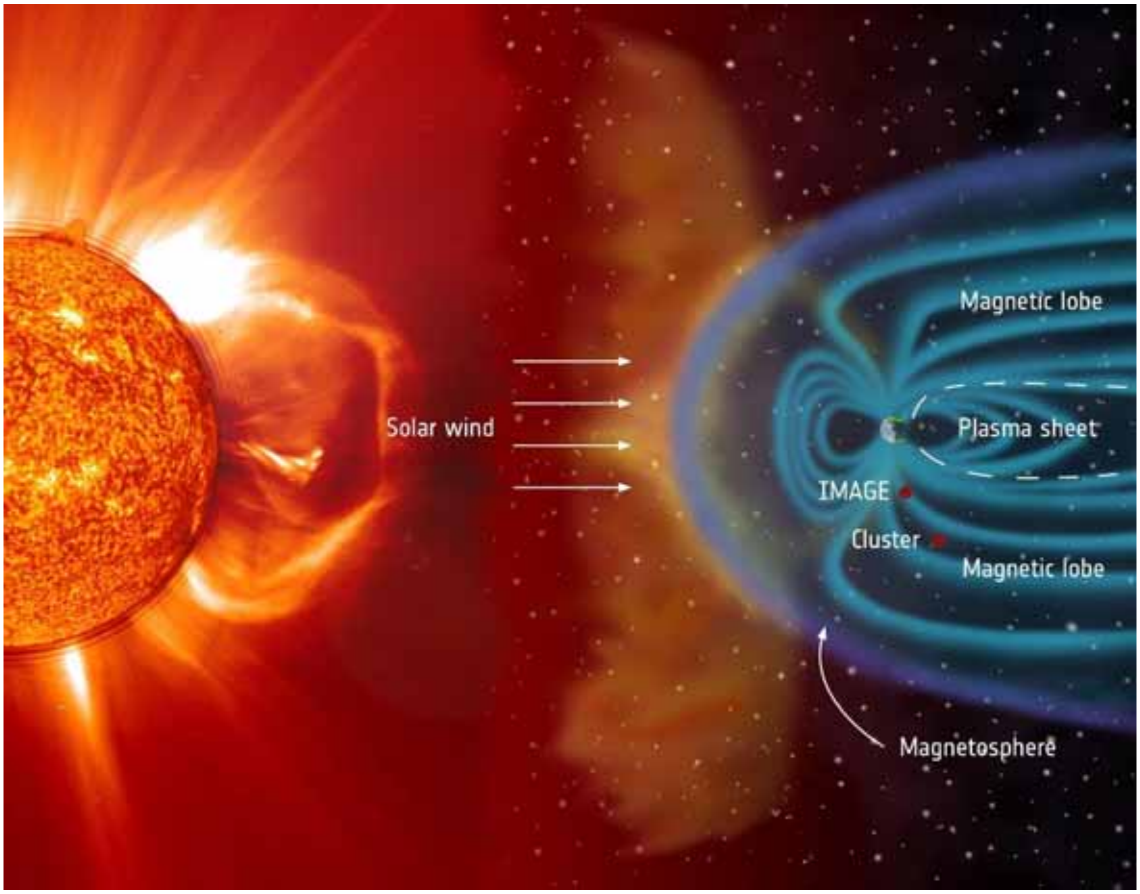

"আচ্ছা, পাখি আর মাছেরা তো পৃথিবীর এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কাজে লাগিয়েই চলাফেরা করে, তাই না? ওদের তখন কী হবে?", উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করে অনুমিতা।

শ্রোতাদের গ্রিপে পাওয়া গেছে বুঝে আমি আবার উৎসাহিত হই। বলি, "তাহলে আগে বুঝতে হবে যে এই চুম্বকীয় উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর জায়গা-বদলটা সত্যিই হয় কি না।

অতীতে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অভিমুখ কেমন ছিল সেটা বোঝা যায় আগ্নেয়গিরি থেকে বেরোনো ব্যাসল্ট শিলা পর্যবেক্ষণ করে, আর সেটাও সবথেকে ভালো দেখা যায় সমুদ্রের তলায়।

মিড-আটলান্টিক রিফট নামক ভৌগোলিক চ্যুতিরেখাটা ভূতত্ত্ববিদেরা মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। আসলে ওই রেখার দু'ধারে উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপ ক্রমেই একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে নিচ থেক উঠে আসছে লাভা, যা একটু-একটু করে ঠান্ডা হয়ে ব্যাসল্ট হয়ে যাচ্ছে, আর সেই ব্যাসল্টকে দু'ধারে সরিয়ে দিচ্ছে দুটি বিপরীতমুখী প্লেট। এই জমাট বাঁধা ব্যাসল্টে আছে প্রচুর পরিমাণে ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ, যারা ঠান্ডা হওয়ার সময় পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড অনুযায়ী নিজেদের চুম্বকীয় সত্তাকে সাজিয়ে ফেলছে, আর সঙ্গে নিজের মধ্যে পাকাপোক্তভাবে ধরে ফেলছে এই ফিল্ডের অভিমুখকেও।

এর ফলে, এই ব্যাসল্টের স্তর থেকে যুগ-যুগ ধরে জিওম্যাগনেটিক ফিল্ডের অভিমুখ কেমন ছিল, তা বোঝা যায়। আর সেটা দেখতে গিয়েই বিজ্ঞানীদের চক্ষু চড়কগাছ হয়।

এটা বেশ স্পষ্ট হয় যে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক নর্থ আর সাউথ পোলের অভিমুখ অতীতে বেশ কয়েকবার উলটে গেছে"।

"এই ব্যাপারটা কীভাবে হয়েছে এর আগে? কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়…?" জানতে চান শ্রীমতী।

"চুম্বকীয় মেরু যে স্থির বা ধ্রুব নয়, সেটা বিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই জানতেন। ১৮৩১ সালে জেমস রস প্রথমবার ক্যানাডিয়ান আর্কটিকে ম্যাগনেটিক নর্থ পোল সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন। তারপর, ১৯০৪ সালে

রোয়াল্ড আমুন্ডসেন যখন তাকে আবার খুঁজে পান তদ্দিনে সে পাড়ি দিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। তারপর থেকে এটা দেখা গেছে যে উত্তর মেরু বছরে প্রায় দশ কিলোমিটার করে উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে, আর হালে তার বেগ হয়েছে বছরে চল্লিশ কিলোমিটার!

আর", একটু নাটকীয় বিরতি নিয়ে বলি আমি, "এর পাশাপাশিই দেখা গেছে যে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র উনিশ শতকের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কমে গেছে"।

"তার মানে…" উদ্বেগে অনুমিতার গলা চোকড হয়ে যায়। মহাপুরুষদের স্টাইলে হাত তুলে সবাইকে আশ্বস্ত করি আমি।

"ম্যাগনেটিক ফিল্ড কতটা জোরালো তা বোঝা যায় তার ডাইপোল মোমেন্ট থেকে। উনিশ শতকে কার্ল ফ্রেডরিক গস একঝাঁক কঠিন অংক কষে এটা গণনার ফর্মুলা ও পদ্ধতি বলে যান, এবং সেটার বাস্তবায়ন করতে সেই যুগেই ব্রিটিশ ও রাশিয়ান সাম্রাজ্য রীতিমতো সহযোগিতা করে। ১৮৩৫ থেকে এখন অবধি পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রাবল্য মাপা হয়ে চলেছে। সেইসব জটিল হিসেবের মধ্যে না গিয়েও বলি, পৃথিবীর এই 'কমে যাওয়া' মোমেন্ট-ও কিন্তু গত সহস্রাব্দীর গড় মোমেন্টের দ্বিগুণ। তাছাড়া, এই উত্তর-দক্ষিণ ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমজোর হয়ে গিয়ে পৃথিবীর নিরক্ষরেখা বরাবর অবস্থিত একটা দুর্বল ফিল্ড জোরালো হয়ে ওঠা দিয়ে কিন্তু জিওম্যাগনেটিক রিভার্সাল, অর্থাৎ চৌম্বক মেরুর উত্তর-দক্ষিণ পালটে যাওয়া ব্যাখ্যা করা যায়"।

"নিরক্ষরেখা বরাবর ফিল্ড মানে?", তোষালি আমার কথার মধ্যে থাকা ফুলটসটা নাগালে পেয়ে যায়।

একটা শ্বাস ফেলে আমি বলি, "ডায়নামো এফেক্ট ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝা না গেলেও এটা মনে করা হয় যে লিকুইড কোরের তরল লোহার স্তরের ঘূর্ণন থেকে উত্তর-দক্ষিণ ডাইপোল যেমন তৈরি হয়, তেমন ভাবেই তৈরি হয় আরেকরকম দুর্বল ডাইপোল, যার অভিমুখ হয় আড়াআড়ি।

যদি পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ডাইপোল দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতেই থাকে, তাহলে দুটো সলিড মেরুর বদলে অনেকগুলো দুর্বলতর মেরু তৈরি হয় আস্তে-আস্তে। তখন যে অবস্থাটা তৈরি হতে পারে সেটা মোটামুটি এরকম:

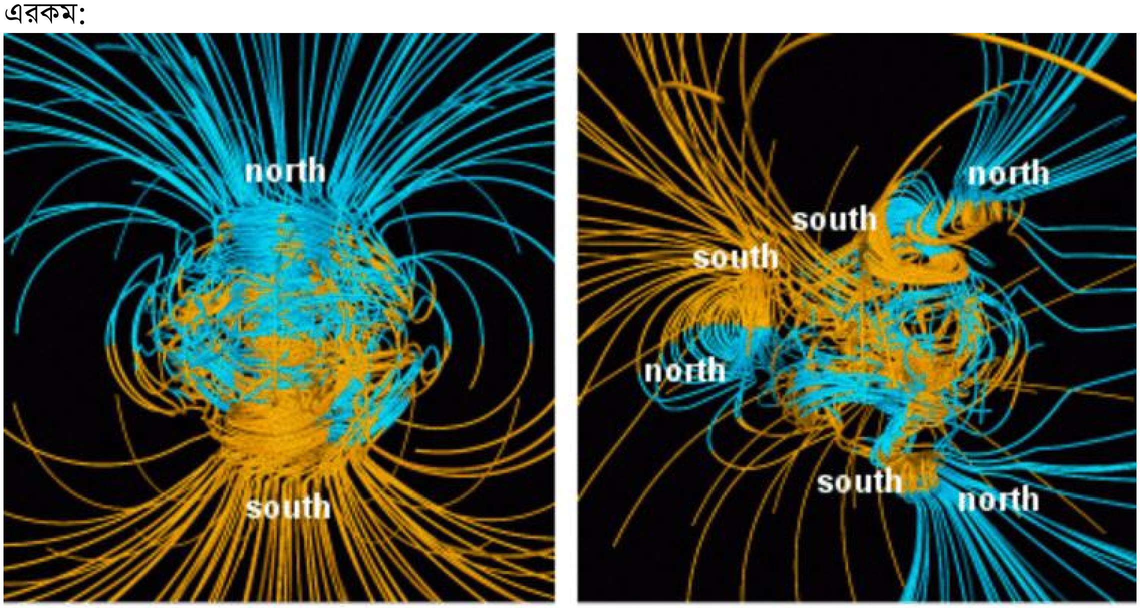

between reversals during a reversal

এই অবস্থা বেশিদিন চলা সম্ভব নয় বলে স্বাভাবিকভাবেই আবার একটা ডাইপোল, মানে উত্তর-দক্ষিণ অবস্থা তৈরি হয়, তবে তখন ফিল্ডের অভিমুখ পালটে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে শেষ এই ঘটনা ঘটেছে আজ থেকে প্রায় সাত লক্ষ আশি হাজার বছর আগে। ব্যাপারটার পাথুরে প্রমাণ যাঁরা পেয়েছিলেন সেই বিজ্ঞানীদের নামানুসারে

একে বলা হয় ব্রুনস-মাতুয়ামা রিভার্সাল। পৃথিবীর এক-এক জায়গায় এই পরিবর্তন ঘটতে এক-এক রকম সময় লেগেছিল, কোথাও বারোশো বছর, কোথাও দশ হাজার বছর"।

একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাস শুনে বুঝলাম, রাতারাতি পৃথিবীর মেরুবদল হওয়া ও তার ফলাফল নিয়ে জল্পনাকল্পনায় আমি কয়েক বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছি। আলোচনা দ্রুত শেষ করে দেওয়ার আশায় আমি আরো বললাম, "ওই রিভার্সালের পর থেকে ভৌগোলিক হিসেবে মিডল প্লিস্টোসিন যুগ শুরু হলেও তখন যে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট কিছু বিপর্যয় ঘটেছিল, এমন কিচ্ছু কিন্তু সেই সময়ের ফসিল ও অন্যান্য জিনিস থেকে মনে হয়না।
এরপরেও অবশ্য আরেকবার পৃথিবীর চৌম্বক মেরুবদল ঘটেছে। গত তুষার যুগের শেষ দিকে, আজ থেকে মোটামুটি একচল্লিশ হাজার বছর আগে, প্রায় আড়াইশো বছর ধরে পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরু দিক বদলায়। রিভার্শনের সময় পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্বাভাবিকের মাত্র পাঁচ শতাংশে নেমে এসেছিল বলে মনে করা হয়। মেরুদের অবস্থান বদলে যাওয়ার পরে যে ফিল্ড তৈরি হয় তার প্রাবল্যও ছিল পরিবর্তনের আগের পঁচাত্তর শতাংশ। এর ফলে মহাজাগতিক কণারা পৃথিবীতে বেশি পরিমাণে পৌঁছেছিল বলে কার্বন-১৪ আর বেরিলিয়াম-১০ আইসোটোপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর প্রাণী বা উদ্ভিদকুলের ওপর এমন কিছু প্রভাব পড়েছিল বলে জানা যায়নি। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, এই বদলে যাওয়া মেরুরা নিজেদের সেই অবস্থানে ছিল মাত্র চারশো বছরের কিছু বেশি"।

"তাহলে এখন জিওম্যাগনেটিক রিভার্সাল হওয়ার কি আদৌ কোনো সম্ভাবনা আছে?", জানতে চায় তোষালি, "কারণ একটা লেখায় পড়েছিলাম যে এটা নাকি, মানে, ওভারডিউ!"
আমি হতাশ গলায় বলি, "এই ফান্ডাটার জন্য দায়ী হল অ্যালান একার্ট-এর একটা বই, "দ্য হ্যাব থিওরি"। এই বইয়ে হার্বার্ট অ্যালান বোর্ডম্যান (এইচ.এ.বি) নামে এক ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার ৯৪ বছর বয়সে অনেক হিসেব-নিকেশ করে আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুরা প্রতি কয়েক হাজার বছর পর জায়গা বদলায়, যখন, অ্যাজ ইউজুয়াল, যাবতীয় মেকানিক্যাল জিনিস অচল হয়ে যায়, তুমুল সব ঝড়ঝঞ্ঝা দেখা দেয়, পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন বুঝে যারা চলাফেরা করে সেই পাখিরা পথ ভোলে আর মাছ, এমনকি তিমিরা দিকভ্রান্ত হয়ে ডাঙায় উঠে আসার চেষ্টা করে, ইত্যাদি। তিনি মার্কিন প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করার অনেক চেষ্টা করেও পাত্তা না পেয়ে শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দিকে মোমের গুলি চালান, যাতে লোকে তাঁর কথায় গুরুত্ব দেয়। এই হ্যাব চরিত্রটিও আসলে হিউ অচিনক্লস ব্রাউন বলে এক বাস্তব চরিত্রের আদলে নির্মিত। যাইহোক, এই ফান্ডা লোকের মাথায় এমন করে ঢুকে যায় যে পৃথিবীতে গড়ে এই জিওম্যাগনেটিক রিভার্সাল লাখ দুয়েক বছর পর হয় বলে, আর শেষ রিভার্সাল সাত লক্ষ আশি হাজার বছর আগে হয়েছে বলে, কারো-কারো মতানুযায়ী এটা ওভারডিউ। অথচ আমরা জানি যে ক্রিটেশিয়াস যুগে দুটি রিভার্সালের মধ্যে ফাঁক ছিল পাক্কা চল্লিশ লক্ষ বছরের।
আসলে লিকুইড কোর থেকে তৈরি হওয়া ফিল্ডে যে কিছুটা টলমল অবস্থা থাকবে, তা তো স্বাভাবিক। তাই, মোটামুটি হাজার পঞ্চাশেক বছর পর-পরেই পৃথিবীর মেরুদের জায়গা বদল করার একটা বাই চাপে। কিন্তু, নতুন মোবাইল কিনতে ইচ্ছে করলেই যেমন কেনা যায়না, কারণ সেটা কিনতে গেলে যা লাগবে সেই টাকাপয়সার ওপর অন্য অনেক ফ্যাক্টরের শাসন চলে, ঠিক তেমন করেই লিকুইড কোরে তৈরি হওয়া ফিল্ড থাকবে না থাকবেনা তা ঠিক হয় ইনার কোরের মাধ্যমে"।
"কীভাবে?", প্রশ্ন তোলে মধুরিমা।
"ইনার কোর একান্তভাবেই নিরেট, তাই তাতে ফিল্ড তৈরি হয়না। কিন্তু লিকুইড কোরে তৈরি হওয়া ফিল্ড লাইনগুলো শেষ হয় ওতেই এসে। অর্থাৎ, সেই অবশেষ ফিল্ড, যা কিনা ভীষণরকম স্থায়ী, পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন না হলে নতুন ফিল্ড লাইন তৈরি হওয়া অসম্ভব। তাই মনে করা হয় যে প্রতি দশটা জিওম্যাগনেটিক রিভার্সালের মধ্যে মাত্র একটা শেষ অবধি ঘটে"।

বড়ো একটা নিশ্বাস নিয়ে, আর আজকের সেশনটা ভালোভাবেই উতরে গেল বলে সগর্বে বলি, "তাই নিশ্চিন্ত মনে চুলে রং-টং করাও। এমন কিছুই ঘটতে চলছেনা যাতে লোকে তোমাদের ছেড়ে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে"।

পার্টিং শটটা যথাস্থানেই পৌঁছত যদিনা জয়া ঠিক তখনই "ম্যাডাম, কাল সকালে এরা কী খেয়ে বেরোবে?" প্রশ্ন তুলে আবির্ভূত হত। আর তক্ষুনি শ্রীমতীর মনে পড়ে গেল সকাল থেকে আমাকে মাত্র বারতিনেক মনে করানো কথাটা। ফলে…

"হ্যাঁগো, তুমি কি আমার একটা কথাও মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা কর না?"

"আম…"

"তোমাকে সকাল থেকে বলছি যে সস শেষ, এদিকে এরা সব সকালে বেরোবে স্যান্ডউইচ নিয়ে। তুমি এতবার বেরোলে, এমনকি একবার চুপিচুপি আনন্দ-র শো'রুমে ঢুকে বই কিনবে বলে প্রায় গড়িয়াহাট গেলে, কিন্তু এটা আনতে পারলেনা?"

"কিন…" (আনন্দ-র খবরটা যে বিশ্বাসঘাতক পাচার করেছে তাকে আইসক্রিম কিনে দিচ্ছিনা-দেব না)

"সাহুর দোকান বন্ধ হওয়ার আগে গিয়ে সস নিয়ে এস শিগগির। যাও।"

চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম…

অনুমিতা আর মেঘনা বিছানা থেকে হারমোনিয়াম তুলে বাক্সে ঢোকাতে এবং খাটের চাদর পরিপাটি করতে ব্যস্ত হয়েছে।

তোষালি পরের দিনের পরীক্ষার জন্য ব্যাগ গোছাচ্ছে।

মধুরিমার হঠাৎ খেয়াল হয়েছে যে ওর মা'র সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি।

শনিচক্র অ্যাস্টেরয়েড বেল্টে পরিণত হয়েছে!

ভগ্নহৃদয়ে চটিতে পা গলাতে গিয়ে চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল।

প্রায় পৌনে আট লাখ বছর আগের এক গুহার বাইরে তখন রাত নেমেছে। হোমো ইরেক্টাস গুহাস্বামী একটা মোটা চামড়া দিয়ে গা ঢেকে ঘুমে প্রায় ঢুলে পড়েছে। এমন সময়…

কাংস্যবিনন্দিত কণ্ঠে গুহা প্রকম্পিত হল। শোনা গেল, "সবাই নিজের-নিজের মতো করে ফল আর মাছ পেল। শুধু এই একজন এসে বলল, কীসব দিকবদল হয়ে নাকি গাছে আর ফল ধরেনি, মাছও নাকি অন্য দিকে চলে গেছে! শুধু গল্প বানানো। কাল সকালে কী খাওয়া হবে?"

কেম্যাজিক

অধ্যাপক পান্নালাল গোস্বামী

চল কাগজের ঠোঙায় চা বানাই

চা বানাতে গরম জল চাই। জল ফোটানোর জন্য তাপের প্রয়োজন। তাপের সহজ উৎস আগুন। গ্যাস বার্নার, উনুন, মায় মোমবাতি জ্বালিয়েও কাজ চলবে। কিন্তু জল গরম করবার পাত্র একটা তো চাই। হাঁড়ি, কড়াই, কড়াই, সসপ্যান কিছুই নেই। তাহলে জল গরমকরা হবে কেমন করে? কুছ পরোয়া নেই, কাগজের ঠোঙা একটা পাওয়া গেছে। ওতেই জল গরম করা যাবে।

অসহ্য! কথাবার্তার ছিরি দেখ! বলি, কাগজের ঠোঙার গায়ে আগুন লাগলে ওটা তো ফরফর করে জ্বলে যাবে!

দাঁড়াও। অধৈর্য হয়ো না। কাগজের ঠোঙাটা যদি খালি থাকে তাহলে তোমার কথাই ঠিক। খুব সহজেই তাতে আগুন ধরে যাবে। কিন্তু ওটার দুই তৃতীয়াংশ জল ভরে আগুনের আগুনের শিখাটা শুধুমাত্র ঠোঙার তলাতেই লাগাতে থাক। এভাবে বেশ কিছি সময় রেখে দাও। দেখবে ঠোঙা তো পুড়ছেই না, উলটে তাতে থাকা জলই টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। এখন এর মধ্যে ক'টা চা পাতা ফেলে দিলেই তোমার লিকার চা তৈরি। ইচ্ছে হলে দুধচিনিও মিশিয়ে দিতে পার। কী বললে? একটু আদা আর এলাচ মেশাবে? বাপ রে! তাহলে তো জম্পেশ হয়ে যাবে!

জল থাকা কাগজের ঠোঙাটা পুড়ছে না কেন? এটা জানতে হলে প্রথমেই আগুন লাগা বা জ্বলার কারণটা জানতে হবে। আগুনের জন্য তিনটে জিনিস প্রয়োজন। প্রথমটা হল ইন্ধন, দ্বিতীয়টা অক্সিজেন, তৃতীয়টা হল দহন তাপ। এই তিনের মিলনেই আগুনের সৃষ্টি। এ যেন এক ত্রিভুজ! তিনটে বাহুর মিলিত শক্তি। এর যে কোন একটা না থাকলেই কিন্তু আগুন জ্বলবে না। অথবা জ্বললেও নিভে যাবে।

ইন্ধন হল সেই বস্তু যাতে আগুন ধরে। আমাদের এখানে কাগজটা এক ভালো ইন্ধন। ইন্ধন না হলে আগুন ধরার প্রশ্নই নেই। দ্বিতীয় প্রয়োজন অক্সিজেন। বাতাস থেকেই আমরা আগুন ধরাবার অক্সিজেন পেয়ে থাকি। নিভু নিভু আগুনে একটু দূর থেকে ফুঁ দিতে থাক, দেখবে আবারও দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। আগুন জ্বলতে থাকা জায়গায় অক্সিজেনের জোগান বন্ধ করে দাও, দেখবে আগুন নিভে যাচ্ছে।

ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড আগুনের ওপর ছেড়ে দিয়ে যে আগুন নেভানো হয় তা তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। ওখানে অক্সিজেনকে আগুনের জায়গা থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়। আসলে কার্বন ডাই অক্সাইড তো বাতাসের থেকে ভারী, তাই ওটা বাতাসের তলার দিকে নেমে এসে আগুন আর বাতাস তথা তাতে মিশ্রিত অক্সিজেনের মাঝখানে ঢুকে পড়ে ও দুটোকে আলাদা করে দেয়। ফলে অক্সিজেনের অভাবে আগুন নিভে যায়।

এখন আসা যাক আগুন জ্বলার তৃতীয় বাহুটির কথায়, মানে তাপ তথা দহন তাপের কথায়। দহনতাপ হল সেই পরিমাণ তাপ যে তাপে তাপিত হলে তবেই দাহ্যবস্তুতে আগুন ধরে। মনে রেখ, সব ইন্ধনেরই একটা করে নির্দিষ্ট দহনতাপ আছে। আর, এটা প্রত্যেক ইন্ধনেরই আলাদা আলাদা হয়। জল ছিটিয়ে আগুন নেভাবার ক্ষেত্রেও জ্বলতে থাকা ইন্ধনের তাপ ঠাণ্ডা করে তাকে দহনতাপ থেকে নিচে নামিয়ে দিয়েই ওটা করা হয়ে থাকে।

দহনতাপ না পেলে যে একটা দাহ্যবস্তু জ্বলে না তার একটা সাধারণ পরীক্ষা করা যাক। মোটা একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে ওটাকে একটা মোমবাতির শিখার ওপর অনেকক্ষণ ধরে রাখলেও দেখবে ওটাতে আগুন ধরছে না। একটু পোড়া পোড়া ধরনের হবে। এখন ওই কাঠ থেকে পাতলা একটা চিলতে ছিঁড়ে এনে ওই শিখার ওপর ধর, দেখবে সঙ্গেসঙ্গে তাতে ফরফর করে আগুন জ্বলে গেছে। এই দুটো ক্ষেত্রেই ইন্ধনের অক্সিজেন একই আছে। কেবল দহনতাপের তারতম্য ঘটছে চ্যালাকাঠ আর তার ছোট্ট চিলতেতে। চ্যালাকাঠের ক্ষেত্রে মোমবাতির শিখা থেকে পাওয়া তাপ কাঠের বাকি অংশ শুষে নিচ্ছিল। তাই তার দহনতাপ পেতে দেরি হচ্ছিল। কিন্তু পাতলা চিলতেটা খুব তাড়াতাড়ি দহনতাপ পেয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

কাগজের ঠোঙায় চা বানাবার ক্ষেত্রেও একই ধরণের কাণ্ড ঘটছে। জল থাকা কাগজের ঠোঙায় যখন তাপ দেয়া হয় তখন জল সেই তাপ শোষণ করে ফুটতে শুরু করে। আর ফলে, কাগজটা তার দহনতাপ পায় না। ফলে ঠোঙাটা থাকে অক্ষত। আর আমাদের চা বানানোটাও আরামসে হয়ে যায়।

এ পরীক্ষাটা তোমরা আরেকভাবেও করে দেখতে পার। তিনটে যথেষ্ট বড়ো আকারের বেলুন নাও। ফোলাবার আগে একটাতে বেশ কিছু পরিমাণে জল ভরে নিয়ে সবক'টাকে অর্ধেক পরিমাণ ফোলাও। এবার জল না থাকা বেলুনদুটো একটা একটা করে মোমবাতির শিখার ওপর ধরলেই দুমদাম ফেটে যাবে। এবার জল ভরা বেলুনটা ওই শিখার ওপর সাবধানে ধর, যাতে আগুন, জল থাকা অংশেই লাগে। দেখবে বেলুনটা অনেকক্ষণ ধরে ফাটছে না। একটু কায়দা করে এইটে দেখালে সবাইকে ম্যাজিক দেখিয়ে তাকও লাগিয়ে দিতে পার।

আলেকজান্ডার ও মৎসকন্যা

(মূল-গ্রীস দেশের লোককথা)
ভাষান্তর- রমিত দে

মৎসকন্যা বা মারমেড ! কেউ কেউ জলপরীও বল হয়ত। তা এই মৎসকন্যাদের নিয়ে গল্প পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতাতেই প্রচলিত। কোথাও সে দেওয়ালে আঁকা ছবি আবার কোথাও বা লোককথার আদলে মুখে মুখে তা হয়ে উঠেছে শতাব্দীপ্রাচীন। পেরুর কুসকোর প্রাচীন পাথরের দেওয়ালে কতই না জলকন্যাদের ছবি আঁকা যা দেখে মনে হতেই পারে সত্যিই তারা ছিল , তারা আছে, আর সে ধারনা আরও শক্তপোক্ত হয় যখন আমরা শুনতে পাই আটলান্টিকের তীরে ম্যাথু নামের একজন মানুষের প্রেমে পড়ে এক মৎসকন্যা। আমার তো মনে হয় ওরা নিশ্চয় আছে, একদিন ঝাউগাছগুলোকে পেরিয়ে সূর্যের আলোর তলায় বালিগুলোকে লুকিয়ে আর কাছিমের ডিমেদের দিকে হাত নেড়ে নেড়ে অনেক দূর সমুদ্রে ফিরে এলেই হয়ত দেখা পেয়ে যাব অবিশ্বাস্য কোনো এক জলপরীর; জানি না তোমাদের হয়ত হানস এন্ডারসনের লিটিল মারমেডের কথা মনে পড়ে যাবে , আমার কিন্তু বাপু মনে হবে নীল সমুদ্রে নিজেকে ছেড়ে দিই আর গড়াতে গড়াতে নেমে আসি ওর ফেনার সংসারে, নুড়ির সুতোর মাঝে ওর রোদ পোহানো আর গা গড়ানোর গল্পে। তোমরা হয়ত বলবে ওমা এত পুরো মাছ আর আমি বলব না না পুরো একটা মানুষ। তো মাছমেয়েকে নিয়ে আমাদের সে ঝগড়াঝাঁটি না হয় পড়ে হোক, আজ বরং দেখে নি এই মৎসকন্যা এল কোথা থেকে ! সে অনেক অনেক বছর আগের গ্রীসদেশের কথা। তখন বীর আলেকজান্ডার ছিলেন গ্রীসের রাজা। আমরা আজ সেই আলেকজান্ডারের বোন থেসালোনিকারই গল্প শুনব।

আলেকজান্ডারের নাম তো তোমরা নিশ্চই শুনেছ। গ্রীসের সেই প্রবল পরাক্রমী রাজা যে কিনা পশ্চিম থেকে পূর্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজের সাম্রাজ্য, প্রায় পুরো পৃথিবীটাই তাঁর দখলে ছিল যে। এককথায় পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁকে অন্যতম সফল সামরিক কিংবদন্তি বলা যেতে পারে। টলেমির মানচিত্রানুযায়ী পৃথিবীর বেশিরভাগ এলাকাই জয় করেন মেসিডনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার। কিন্তু কথায় বলে না আগে দুঃখ পরে সুখ-তো অতিমানবীয় হলে কি হবে সম্রাট আলেকজান্ডারেরও ছিল এক অদ্ভুত দুঃখু-

একদিন রাজ্যের সব মহান জাদুকর আর সব প্রাজ্ঞ-জ্ঞানী মানুষদের একযোগে সভায় ডাকলেন তিনি।

“পুরো পৃথিবীটাই আমার”-সভায় উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন আলেকজান্ডার। মিনমিন করে নয় কিন্তু, এক্কেবারে তারঃস্বরে ! সারা রাজপুরী কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

“আমার ইচ্ছে সব মানুষের ওপর যেন আমার কর্তৃত্ব থাকে আর যা আমার চাই তাই যেন পাই।- অথচ একটা না-পাওয়া নিত্যদিন মনের মধ্যে খোঁচা দেয়, আর তা হল অমরত্ব। আজ আপনাদের এ সভায় ডাকার একটাই উদ্দেশ্য হল এই মৃত্যুকে জয় করতে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।”

এখন উপস্থিত সবাই তো জানে রাজার এহেন ইচ্ছা পূরণ করা একপ্রকার অসম্ভব কিন্তু সে কথাটি বলতে গেলেই যে রাজরোষে পড়ার সম্ভাবনা, সে ঝুঁকি নেবে কে! তবে শেষমেশ তাদের মধ্যে থেকে একজন গুণী মানুষ এগিয়ে এলেন। রাজার উদ্দেশ্যে বললেন, “সম্রাট, ধৃষ্টতা মাপ করবেন। আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতি। বীরত্ব আর সাহসিকতার জন্য পরম শ্রদ্ধেয়। আপনার নিজস্ব শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে আপনি মহামতি। কিন্তু আপনি এইমূর্হুতে একটি অসম্ভবকে প্রত্যাশা করছেন কারণ মৃত্যু ভাগ্যের লিখন এবং ভাগ্যকে কেউ বদলাতে পারে না।”

“আমার জন্য কোনো ভাগ্য নির্ধারিত নেই। আর যদি থেকেই থাকে তবে তাকে আমি জয় করে নেব,” সদর্পে বলে উঠলেন আলেকজান্ডার।

এ কথা শুনে সভার মধ্যে থেকে অন্য এক প্রবীণ ম্যাজিশিয়ান উঠে এলেন। ধীর কণ্ঠে বললেন, "সম্রাট, আপনি এ মুহূর্তে যা বললেন হয়ত তার অনুতাপ করার জন্য বেঁচে থাকবেন না একদিন কিন্তু যখন অমর হওয়ার জন্য এতই পীড়াপীড়ি করছেন তখন আমি একটা উপায় বাতলাতে পারি আপনাকে। যদিও আজ অবধি কেউই সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করে উঠতে পারেনি সেটা।"

সম্রাট আলেকজান্ডার বুড়ো জাদুকরের উপদেশ শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। গোটা সভায় বাকি সবাই তখন চুপ।বুড়ো কী বলে তা শোনার জন্য রাজপুরীতে নিমন্ত্রিতদের ঘিরে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে রহস্যের বাতাস।

"বল, জাদুকর!" তোমার এই নিশ্চুপতা কি এটাই প্রমাণ করে যে এমন কোনোকিছু কাজ এখনও এ পৃথিবীতে রয়ে গেছে যা রাজা আলেকজান্ডারের পক্ষে করা সম্ভব না? বেশ খানিকক্ষণ বুড়ো জাদুকর চুপ করে থাকায় উৎকণ্ঠায় তীব্র চিৎকার করে উঠলেন আলেকজান্ডার।

"না মহারাজ", শেষমেশ নিশ্চুপতা ভেঙে বলে উঠলেন জাদুকর।

"আপনি মৃত্যুকে জয় করতেই পারেন যদি একটিবার অমরতার সরোবর থেকে অমর জল পান করেন এবং যে এই জল একবার পান করেছে তার আর মৃত্যুভয় থাকবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হল কোনো জীবন্ত মানুষই আজ অবধি সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ওই জল অবধি পৌঁছতে পারেনি। প্রথমেই আপনাকে একটি গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে যেখানে সেই পথটিকে পাহারা দেওয়া অদ্ভুত বরফবেষ্টিত পাহাড়দুটো অনেকটা অন্ধকার কারাগারের মত, পাহাড়ে পাহাড়ে এত ঠেসাঠেসি যে হাত পর্যন্ত গলে না। এবং তারা প্রতিমূহূর্তে ভয়ংকরভাবে ছুটে আসে একে অপরের দিকে আবার সরে যায় পরের মূহূর্তেই। আর পুরো ঘটনাটা এত অবিরাম গতিতে ঘটতে থাকে যে অতিক্রমণ তো দূর অস্ত, নরকযন্ত্রণার মত ওই পাহাড়মধ্যবর্তী অংশই হয়ে ওঠে মৃত্যুপুরী। উড়ন্ত পাখির পক্ষেও তা ভেদ করা প্রায় অসম্ভব। মূঢ়তার বশবর্তী হয়ে কত সাহসী মানুষ যে ওই সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রমণ করতে গিয়ে নরকগহ্বরে পতিত হল; এমনকি তারা অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হওয়ার সুযোগটুকুও পেল না।

"কেবল এটুকুই?" আলেকজান্ডার জিজ্ঞেস করলেন।

"না মহারাজ, দ্বিতীয় একটি কাজও আছে," প্রাজ্ঞ জাদুকর বলে যেতে থাকেন, "যদিও বা আপনি পাহাড়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে এলেন কিন্তু এরপরই আপনার মুখোমুখি হবে হাজার ফুট লম্বা অতিকায় এক ড্রাগন যে দিনরাত ওই অমরতার জলের সরোবরটার পাহারায় রয়েছে। বিশালাকায় সে ড্রাগন, স্তব্ধকঠিন তার শরীর ভেদ করে সূর্যকিরণ আসে না। তার এক পা জলভর্তি সরোবরের সামনের গুহার মাথায় রেখে আর অন্য পা পাহাড়ের চূড়ায় দিয়ে অভ্রভেদী উত্তুঙ্গতায় দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় সে শয়তান। তাকে হত্যা করেই একমাত্র অমরতার সরোবর থেকে জল তুলে আনতে পারবেন মহারাজ।

ঠিক এটুকুই শুনেছিলেন আলেকজান্ডার। আর এক মূর্হুতও সময় নষ্ট না করে নিজের প্রিয় ঘোড়া বুসেফেলাসের পিঠে চড়ে বসলেন তিনি। আর ধুলো উড়িয়ে দূরের হালকা বাতাসে হারিয়ে গেল তারা।

মহারাজ চলে যেতেই সভাশুদ্ধ সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন এতবড় সাম্রাজ্য এখন কে সামলাবে, রাজস্ব আদায় থেকে শুরু করে প্রজাদের সুখসুবিধের দিকে নজর দেওয়া-কাজ কি কম নাকি ! আর চিন্তা হবেইনা বা কেন? অমরতার জল আনতে গিয়ে আজ অবধি তো কেউ বেঁচে ফিরে আসেনি,ফলে রাজার মৃত্যুচিন্তাতেও চিন্তিত হয়ে পড়লেন দরবারে উপস্থিত সভাসদেরা।

হতাশায় তাঁরা এক পা নড়াবেন কি নড়াবেন না যখন এমন অবস্থা, তক্ষুনি শুনতে পাওয়া গেল কেল্লার বাইরের পাথরের পথের ওপর দিয়ে ফিরে আসা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। প্রহরীরা জেগে উঠল। হৈ চৈ পড়ে গেল দুর্গের মধ্যে। আর বাইরে বেরিয়ে এসে হতবাক হয়ে গেলেন সবাই, দেখলেন স্বয়ং সম্রাট আলেকজান্ডার তাদের সামনে উপস্থিত। হাতে সোনার পাত্রে করে নিয়ে আসা অমরতার জল। বুসেফেলাসের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত সোজা দরবারে প্রবেশ করলেন । উপস্থিত জ্ঞানী ব্যক্তি আর জাদুকরদের উদ্দেশ্যে জলভর্তি পাত্র তুলে বললেন, "বলেছিলাম না, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নেই যা আলেকজান্ডারের পক্ষে জয় করা সম্ভব না?"

কিন্তু যাত্রার ক্লান্তিতেই হোক অথবা অমর হয়ে ওঠার উত্তেজনায়, সেই অমরতার জলভর্তি পাত্র একটা শ্বেতপাথরের টেবিলে রেখে বেমালুল ভুলে গেলেন সম্রাট আলেকজান্ডার। আর ঠিক এখান থেকেই আলেকজান্ডারের বোন থেসেলোনিকা ওই অমর জলের অর্ধেকটা না জেনে পান করে নিল, আর নিজের সুন্দর লম্বা সোনালী চুল ধুয়ে নিল বাকি অর্ধেক দিয়ে।

পরের দিন যথারীতি অমরতার জল পান করার সময় এলে আলেকজান্ডার খুঁজে পেলেন না তাঁর সোনার পাত্র। তন্নতন্ন করে খোঁজা হল রাজপ্রাসাদের আনাচকানাচ, কিন্তু কোথাও নেই। শেষঅবধি ভৃত্যদের একজনের মুখ থেকে তাঁর নিজের বোনেরই জল পান করে নেওয়ার ঘটনা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন আলেকজান্ডার। সে মূর্হুতে কেবল বিস্ময়ে যে তাঁর চোখ বড় হয়ে উঠল তা নয়, রাগে উৎকন্ঠায় আর হতাশায় মাথা কাজ করছিলনা আলেকজান্ডারের। থেসেলোনিকা ভুল করে ফেলার জন্য দাদার পা ধরে ক্ষমা চাইলেও আলেকজান্ডার রাগে থরথর হয়ে বলতে থাকলেন, "তুমি অমরতার জল পান করেছ, অর্থাৎ তুমি এখন অমর, কিন্তু মনে রাখবে সারাজীবন তুমি অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক মাছ হয়ে বেঁচে থাকবে। এতটুকুও শান্তি পাবে না, সারা সমুদ্র ছুটে বেড়াবে।"

আলেকজান্ডারের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই থেসেলোনিকা মৎসকন্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

এই হল জলপরীর সৃষ্টিকাহিনী। তোমরা জানো কি এরপর থেকেই সেই মারমেড বা জলপরী সারা সমুদ্র সাঁতরে বেড়ায়, হয়ত অভিমানে হয়ত নিজের ভুলের প্রতি চরম হতাশায় কিংবা কেবল অমন এক ভালো দাদার আদর থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার যন্ত্রণায়। এখনও সারা সমুদ্র ঢেউ নিয়ে খেলে সে মেয়ে। জাহাজ দেখতে পেলেই জিজ্ঞেস করে দাদা বেঁচে আছে কিনা , কেমন আছে?

যারা এ গল্প জানে না তারা তো বলেই ফেলে বহুবছর আগে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর ঘটনা আর মাছমেয়ে রেগে মেগে তার লম্বা চুল দিয়ে ঢেউ দুলিয়ে দেয়, ডুবিয়ে দেয় জাহাজ। আর যারা জানে তার যন্ত্রণার কথা, তারা বলে, "হ্যাঁ গো মেয়ে, বেঁচে আছেন তিনি, বোনের জন্য কত না তাঁর মন কেমন করে।"

এই শুনেই জলপরী গান শুনিয়ে দেয় আর তার নরম লেজের আদরে জাহাজকে এগিয়ে দেয়।

কখনও যদি জাহাজে করে সমুদ্রসফরে বেরোও আর নতুন কোনো গান ভেসে আসে কানে, জানবে সেই ভালোমানুষের মেয়ে, সেই মারমেড কাছেই কোথাও আছে আর হয়ত তোমার দিকেই সাঁতরে এগিয়ে আসছে,মুখে করে দু একটা নীল ফেনা আর সেই হারিয়ে যাওয়া দুটো কাছিমের ডিম। সবাই তোমার জন্য।

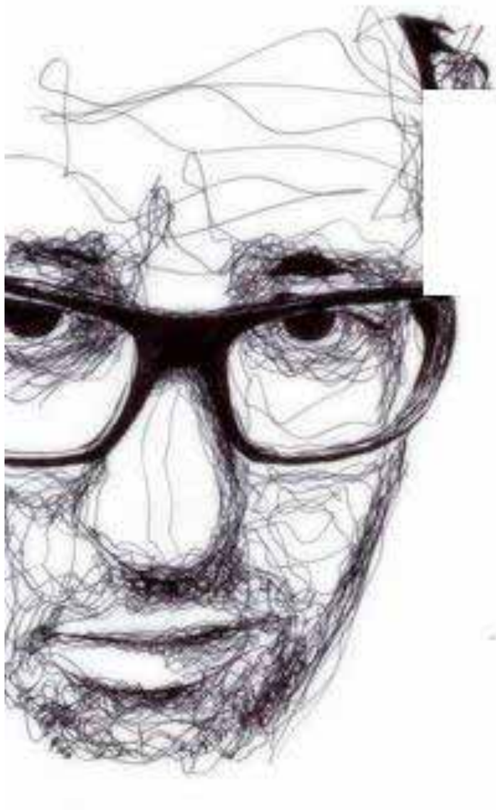

আগে আমার কথা শোন

অমিত দেবনাথ

এসো ওয়াল্টার,তোমাকে একটা গল্প শোনাই। একজন লোকের গল্প। এমন একজন লোকের গল্প,যাকে তুমি চেনো। তার নাম হার্ভে নিউসাম,যে কদিন আগে মারা গেছে।

ওয়াল্টার,তুমি তো একজন বিচারক,জজসাহেব। আর আমি হলাম ডাক্তার,প্রয়াত হার্ভে নিউসামের ডাক্তার। কাজেই আজ এখানে,এই কানট্রি ক্লাবের লনে বসে পান করতে করতে তো

মাকে আমি গল্পটা শোনাতেই পারি। এবং এই গল্পটা তোমাকে আমি এমনভাবে পেশ করতে পারি,যাতে তুমি শেষমেষ রায় দেবে যে লোকটা একজন খুনি। না,এতে অমন ভুরু কুঁচকে তাকানোর কিছু নেই,আগে আমাকে গল্পটা শেষ করতে দাও।

হার্ভে নিউসামকে তুমিও চিনতে,তবে আমি যেভাবে চিনতাম,সেভাবে নিশ্চয় নয়। তোমার আমার মতই ওরও বয়স ছিল ষাটের কোঠায়। এই ক্লাবেরই মেম্বার ছিল সে,পেশাদার হিসেবে দারুন সফল,বিরাট অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস,ভাল স্কুলে পড়াশোনা,ঠিকঠাক বিয়ে। এই বয়সেও দারুন সুদর্শন,একমাথা সাদা চুল,উজ্জ্বল চোখ,দুষ্টু হাসি।

নিশ্চয় ওকে একটু একটু মনে পড়ছে। তাহলে নিশ্চয় ওর সম্বন্ধে আরো কিছু মনে পড়ছে।

ওর কথা বলার ধরনটা।

তাহলে তোমার এজলাসে আমার প্রথম কেস পেশ করছি ---

প্রমাণ ক।

বছর কয়েক আগে আমার একটা নেমন্তন্ন ছিল,একটা গার্ডেন পার্টিতে। বেশ বড় পার্টি ছিল সেটা। সেখানেই আমি প্রথম খেয়াল করি হার্ভের কথার ফাঁদে একজনকে পা দিতে। হ্যাঁ,আমরা সবাই অল্পবিস্তর ওর

কথার মায়াজালে পড়েছি,তবে আমরা সেটা কাটিয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হল না। পার্টি তখন প্রায় শেষের দিকে,দেখলাম সোনালি চুলের এক সদ্যবিবাহিত সুন্দরী মহিলার সঙ্গে হার্ভে নিউসাম কথা বলছে। কাছে ঘেঁষে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে,কথা বলছে,কথা বলছে। সে কি কথা বলার ধুম!আর কথাবার্তার বিষয়?এমন কোন বিষয় বাদ নেই,যা সে বলছে না,এমনকি সিরিয়াস ব্যাপারেও।

তোমার নিশ্চয় মনে পড়ছে ওর কায়দাকানুনগুলো?কিভাবে ও লোক ধরে রাখতো?যখনই দেখতো কেউ বোর হয়ে যাচ্ছে,ও সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিষয়ে চলে যেত,এমন বিষয়ে,যা তুমি শুনতে বাধ্য হবে?অথবা যখনই তুমি ভাবছো আর কিচ্ছু শোনার নেই,তক্ষুনি ও এমন ভাব দেখাতো যেন ওর মত শ্রোতা আর দুনিয়ায় নেই?অথবা-সবচেয়ে খারাপ যেটা-যখনই তুমি বলছ এবার কিন্তু যেতে হবে, তখনই ওর তোমার দিকে সেই আশ্চর্য চাহনি দেওয়াটা?

এককথায়,মেয়েটার ওপর ও এর সবকটাই প্রয়োগ করল। মেয়েটার ততক্ষনে পাঁচবার না ছ'বার গুডবাই জানানো হয়ে গেছে,ওর স্বামীও সেটা বলেছে ওর পাশে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেসব বেকার হয়ে গেল। আর তখনই দেখলাম ওর স্বামীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে। ওর স্বামী তখন স্ত্রীর চোখে দেখতে পাচ্ছে হার্ভের প্রতি ওর স্ত্রীর আকর্ষণ-হার্ভের ব্যক্তিত্ব,অভিজ্ঞতা-সব কিছুর প্রতি ঈর্ষা জেগে উঠছে ধীরে ধীরে ওর স্বামীর মনের গভীরে।

শেষ পর্যন্ত,সেই তরুণ সেই কাজটা করল,যা তখন একমাত্র করার ছিল। আমি যদি তখন ওকে থামাতে পারতাম!

সেই তরুণ সোজা হার্ভের স্ত্রীর কাছে চলে গেল-নিশ্চয়ই তোমার তাকে মনে আছে,সুন্দরী,সাদা চুল,সপ্রতিভ-গিয়ে সটান বলল, "আপনার স্বামীকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন না?"

একজন সদ্য বিবাহিত যুবকের পক্ষে এটা একটা মারাত্মক ভুল। কারন ওরা যখন চলে যাচ্ছে,আমি শুনতে পেলাম,ওর স্ত্রী ফোঁপাতে ফোঁপাতে স্বামীকে বলছে, "তুমি এরকম একটা কথা বলতে পারলে? অত ভাল একজন বয়স্ক মানুষ? আমি তো জানিই আমাদের যেতে হবে,কিন্তু আমি তো শুনছিলাম,আমার তো বিরক্ত লাগছিল না? তুমি-"

সংক্ষেপে,কয়েকমাসের মধ্যেই ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়।

আমি বলব,হার্ভে নিউসাম একটা বিবাহিত জীবনকে খুন করল।

কিন্তু এটাকে তো সত্যিকারের খুন বলা যায় না। তাই আমি পেশ করছি -

প্রমাণ খ।

এটাও ছিল আরেকটা পার্টি,এই ঘটনার কয়েক বছর পরে। সেটাও ছিল বোধহয় এই ক্লাবেই,যদ্দুর মনে পড়ছে আমার। হার্ভে এটাতেও ছিল,এবং ওর সঙ্গে ছিল একটা লোক,বছর চল্লিশ বয়সের। লম্বা চেহারা,নম্র স্বভাব। আমি বসে বসে দেখছিলাম ব্যাপারটা। একধরণের লোক থাকে দেখবে,যারা একেবারে স্বভাব-শ্রোতা এবং এ ধরণের লোকদের সবাই পছন্দ করে। প্রথম প্রথম আমার ভালই লাগছিল দেখতে- শেষ পর্যন্ত সেই জুটি- বক্তা এবং শ্রোতা।

যদিও,অন্যরা যখন বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে,একজনকে ছেড়ে আরেকজনের সঙ্গে গল্প করছে,তখনও এই দুজন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে আমার একটু অস্বস্তি লাগছিল। কারণ আমি দেখছিলাম সেই লোকটার মুখ-তার সারা শরীর-ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠছে,একটা অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠছে সেখানে,যা দেখে মনে হচ্ছিল যে সমস্ত কিছুরই,এমনকি এই লোকটার,যে জন্ম-শ্রোতা,তারও শোনার একটা সীমা আছে। আমি সেদিকে এগোতে যাচ্ছিলাম,কিন্তু তার আগেই যা হওয়ার হয়ে গেল।

লোকটা এই ধাক্কা আর সামলাতে পারল না-পড়ে গেল মেঝেয়-হার্ট অ্যাটাক।

আমি তো ডাক্তার,আমার যা করার আমি করেছিলাম,ওয়াল্টার,বিশ্বাস কর। আমার স্ত্রী দৌড়ে গাড়ি থেকে আমার ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে এসেছিল-ইনজেকশন,সি পি আর-সবকিছু। কিন্তু যখন অ্যাম্বুলেন্স এল,তখন সব শেষ।

ওহ্,আরেকটা কথা।

যখন সেই লোকটা মেঝেয় হাঁসফাস করছে,তখন ছটফট করতে করতে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল,এমন কিছু,যেটা আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি।

বাতাস-,হাঁফাচ্ছিল লোকটা, দম আটকে আসছে-বাতাস-

তারপর সে কোনরকমে একটা হাত তুলে হার্ভে নিউম্যানকে দেখাল।

- ওর কাছে যেও না-পালাও-

কি বলবে,ওয়াল্টার? তুমি তো বিচারক। এর থেকে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে হার্ভে কথা বলে আক্ষরিক অর্থেই মানুষ খুন করতে পারে?

এখনো তোমার কাছে এই প্রমাণ যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না?

ঠিক আছে,একটু অন্যদিক দিয়ে ভাবা যাক। আমি দেখাব,কিছু কিছু ব্যাপার আছে,যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। তুমি এটা শোনার পর নিশ্চয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে ঐ শ্রোতা লোকটা তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছে,স্বর্গে আছে সে,কিন্তু হার্ভের আরেক শিকার এখনো জীবিত-তবে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে।

প্রমাণ গ।

আরেকটা পার্টি। খুবই খারাপ লাগছে বলতে-হার্ভের এবারের শিকার আমারই এক রোগী। চমৎকার ছেলে,বুদ্ধিমান,সদ্য প্রিন্সটন থেকে বেরিয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা-সে একজন লেখক। তার লেখা একটা গল্পের বইও বেরিয়েছে,অনেক স্বপ্ন তার চোখে-আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে।

এই পার্টিতে অবশ্য আমি দূরে ছিলাম না,কাছেই ছিলাম,যেখানে তরুণ প্রতিভাবান ছেলেটি ছিল আরো কয়েকজনের সঙ্গে,এবং তাদের সঙ্গে ছিল হার্ভে। ছেলেটা হার্ভের কথা শুনছিল।

তুমি যদি কখনো হার্ভের কাছাকাছি থেকে থাক,তাহলে নিশ্চয় জানবে যে কিভাবে হার্ভে প্রত্যেকটি জিনিস জানত, প্রত্যেকটি বিষয়ের আদ্যোপান্ত নিয়ে কথা বলতে পারত? তার নিজের অভিগ্ঞতা নিয়েও?

সংক্ষেপে-সপ্তাহখানেক বাদে ছেলেটি আমার কাছে এল ফ্যাকাশে মুখে। বিড়বিড় করে বলল, আমার সব গেছে। আপনি বুঝবেন ডাক্তারবাবু-আমরা,লেখকরা-নিজেদের জগত নিয়ে থাকি। লেখালেখি করার জন্যই।

তারপর ছেলেটি আমার টেবিলে প্রচন্ড চাপড় মারল-ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে।

-আমি আর লিখতে পারব না-ঐ বুড়োর বুকনির চোটে আমার আত্মবিশ্বাসটাই নষ্ট হয়ে গেছে। যদি পারিও-কত বছর লাগবে কে জানে।

আমি ওকে এক সাইকোলজিস্টের কাছে পাঠিয়েছিলাম। অনেকগুলো সিটিং দিতে হয়েছিল তাকে। শুনেছিলাম সে ওকে বুঝিয়েছিল যে জগতটাকে জানার জন্য,বোঝার জন্য ওর হার্ভের বয়সে পোঁছনোর দরকার নেই। আর লেখালেখি নিয়ে ওর অত চিন্তা করারও কিছু নেই-কারণ ওর লেখার ক্ষমতা ওরই আছে।

কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। কারণ বহুবার সিটিং-এর পর,শেষ পর্যন্ত সেই লেখক ছেলেটা বলেছিল, ওই বুড়ো সব বলে ফেলেছে-সব ধরণের গল্পই। আমার আর কিছু লেখার নেই। আমার কল্পনাশক্তিটাই কেড়ে নিয়েছে ও।

সেই একদা তরুণ লেখক এখন বিগ্ঞাপনের কপি লেখে।

এই হল ঘটনা,ওয়াল্টার। প্রয়াত হার্ভে নিউসাম নিয়ে আমার আর কিছু বলার নেই। আর আমি এ-ও জানি,আমি যদি ঐ কথা-বলিয়ের কথা বলে আরো সময় নষ্ট করি,তবে তুমিও আমায় ঐ দলেই ফেলবে। কাজেই বন্ধু,চল,এখন ওঠা যাক-যেটা হার্ভে কখনই বলত না, কিন্তু আমি বলছি। আর আমি এটাও তোমাকে ভাবতে বলছি যে তুমি ভেবে দেখ হার্ভেকে খুনি সাব্যস্ত করবে কিনা,যেটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

আরো একটা জিনিস বলার আছে।

এমন একটা ব্যাপার-তোমাকে ছুঁয়ে বলছি,যে ব্যাপারে আমি রীতিমত শঙ্কিত,আতঙ্কিত।

আতঙ্ক যে ব্যাপারে,তাকে আমি বলতে চাই-

প্রমাণ ম-মৃত্যুর জন্য।

তুমি জান,যখন হার্ভে মৃত্যুশয্যায়,তখন আমিই তাকে দেখছিলাম।

সেই শেষ মুহুর্তটায়-যখন,কখনো কখনো রোগীরা আশ্চর্যজনকভাবে চেতনায় ফিরে আসে,অবর্ণনীয় একটা ছাপ ফুটে ওঠে মুখের ওপর,কিছু বলার চেষ্টা করে,সম্ভবত ওপারের সঙ্গে-

আমি আতঙ্কিত,ওয়াল্টার,মহা বিপদ নেমে আসছে স্বর্গের ওপর,কারণ আমি শুনলাম ভাঙা গলায়,হার্ভে শেষবারের মত বলছে:

না, ঈশ্বর, তোমার কথা পরে শুনব-আগে তুমি আমার কথা শোন।

জন ম্যাকলে রচিত একজিবিট ডি অবলম্বনে।

ইভান আর রূপমতীর কাহিনী

মূলঃপোলেভয়-এর স্কাজকি
বাংলা ভাষান্তরঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

অনেক অ-নেকদিন আগে এক দেশে আফ্রন আফ্রনোভিচ নামে এক রাজার রাজত্ব ছিল। তার তিন ছেলে। বড়টার নাম দিমিত্রি, মেজছেলের নাম ভ্যাসিলি আর ছোটোছেলে ছিল ইভান। তারা কত আনন্দে হেসেখেলে ঘুরে বেড়ায়। রাজার তখন ষাট বছর বয়েস। ছেলেদের দিকে দেখে তার মনটা ভারী খারাপ লাগে। কেবল ভাবে, আহা ওরা কেমন আনন্দে আছে। আর আমি দেখ কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! কেমন করে বুড়ো হবার হাত থেকে বাঁচি?

এইসব ভাবতে ভাবতেই রাজা একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখে সাতাশ দেশের তিরিশ রাজ্যের পরে এক দেশ আছে। সেখানে থাকেন রাজকন্যা রূপমতী। তাঁর তিন মা, তিন দিদিমা আর নয় ভাই। রূপমতীর বালিশের নিচে থাকে কৌটোভরা নবজীবনের জল। সে জলের এক ঢোঁক কেউ খেলে সঙ্গেসঙ্গে তার তিরিশ বছর বয়স কমে যায়।

ঘুম ভেঙে উঠে পরদিন রাজসভায় রাজা তিন রাজপুত্র আর দেশের জ্ঞানীগুণীদের ডেকে স্বপ্নের কথা শোনাতে জ্ঞানীগুণীরা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "হুঁ হুঁ। রূপমতী রাজকন্যার কথা আমরা কানাঘুষোয় শুনেছি বটে মহারাজ। তবে কোথায় যে তার দেশ সে খবর কেউ জানে না।" তাই শুনে রাজপুত্ররা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আমরা দুনিয়া ঢুঁড়ে সেই রাজকন্যার খবর নিয়ে আসব।" শুনে রাজা বেজায় খুশি হয়ে অনেক আশীর্বাদ করে তিন রাজপুত্রকে বিদায় দিলেন।

রাজধানী ছেড়ে বের হয়ে বড়ো দুই ভাই চলল ডানদিকের পথ ধরে, আর ছোটোভাই ইভান ধরল বাঁদিকের পথ। বড়োভাইরা তাদের রাস্তায় শ'খানেক মাইল পেরিয়ে গেছে, তখন এক বুড়োর সঙ্গে তাদের দেখা।

ভাইদের দেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, "চললে কোথা? অনেক দূর?" শুনে রাজপুত্ররা রেগেমেগে বলে, "তাতে তোর কী রে বুড়ো? পথ ছাড় বলছি!" শুনে বুড়ো আর কিছু না বলে নিজের পথে রওনা দিল।

তারপর প্রায় এক সপ্তাহ পথ চলে রাজপুত্ররা শেষে হাজির হল এক বুনো এলাকায়। সেখানে না আকাশ না মাটি, কিচ্ছু চোখে পড়ে না। যতদূর চোখ যায় প্রাণেরও কোন চিহ্ন নেই সেখানে। এইখানে ঘুরতে ঘুরতে ভাইদের সঙ্গে আর এক বুড়োর দেখা। আগের বুড়োর চেয়েও বেশি বুড়ো সে। ভাইদের দেখে এগিয়ে এসে সে বলে, "চললে কোথা? কিছু খুঁজছ বলে মনে হয়?"

ভাইরা বলল, "খুঁজছি রূপমতী রাজকন্যার দেশ। তার কাছ থেকে বুড়ো বাবার জন্য নবজীবনের জল আনতে বেরিয়েছি আমরা।"

"সে জায়গায় যেও না বাপু," বুড়ো গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

"কেন? কেন?"

"পথে তিনটে নদী পড়ে যে। সে নদীরা যেমন গভীর তেমন চওড়া।"

"তাতে কী? পাড় হবার জন্য নৌকো চাপলেই হল!"

"সে তো বটেই। খেয়ানৌকোর ঘাটও আছে। তবে ভাড়া বেজায় চড়া। প্রথম নদী পেরোবার জন্য কেটে দিতে হবে তোমার ডানহাত, দু'নম্বর নদী পাড় হবার জন্য বাঁ হাত আর তিন নম্বরের জন্য মুণ্ডু। তাই বলছি–"

শুনে দুই বড়ো ভাই ভয়েই সারা। বলে, "আগে তো প্রাণ বাঁচাই, তারপর সময়সুযোগ হলে নয় সমুদ্রপথে জাহাজে করে রূপমতীর দেশের খঁজে যাওয়া যাবে।" এই বলে তারা ঘরের পথ ধরল।

রাজ্যের কাছাকাছি পৌঁছে, আর যখন একদিনের পথ বাকি তখন একটা মাঠের ভেতর তাঁবু ফেলল দুই ভাই। বলে, "এইখানে বসে বসে ছোটকুমারের জন্য অপেক্ষা করি। সে এলে একসঙ্গে ফেরা যাবে'খন।"

ওদিকে ইভানের ভাগ্যে তখন অন্য ঘটনা ঘটে চলেছে। রওনা হবার খানিক বাদে তার সঙ্গেও সেই প্রথম বুড়োর দেখা হয়েছিল। তাকে দেখে একগাল হেসে বুড়ো বলে, "চললে কোথা? অনেক দূর?" জবাবে ইভান বলল, "সে কথা আমি তোমায় বলব কেন?"

কিন্তু খানিক বাদে তার হঠাৎ মনে হল, বুড়োমানুষটার সঙ্গে অমনটা না করলেই ভালো হত। হয়ত কোন খবরটবরও দিতে পারত আমায় রূপমতীর দেশ নিয়ে। এই ভেবে সে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে টগবগিয়ে গিয়ে বুড়োর সঙ্গ ধরল। বলল, "ভুল হয়েছে বাবা। তখন তুমি কী বললে আমি ঠিক শুনতে পাইনি কিনা!"

"আমি জানতে চাইছিলাম, অনেক দূর যাচ্ছ নাকি?"

"কাছেদূরে বলতে পারি না বাবা। আমি রূপমতী রাজকন্যার দেশ খুঁজছি। সে দেশ কোথায় আছে কে জানে? তার থেকে বাবার জন্য নবজীবনের জল চেয়ে আনব কিনা!"

"বেশ বেশ। আমার কথায় যখন ভালো করে জবাব দিয়েছিস তখন আমিও তোকে ঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দেব," বুড়ো একগাল হেসে বলল, "তবে মুশকিল হল, সাধারণ ঘোড়ায় করে সেখানে পৌঁছুতে পারবি না যে!"

"অসাধারণ ঘোড়া আমি পাব কোথায় বাবা?"

"বলছি। বাড়ি ফিরে যা। সেখানে গিয়ে রাজপ্রাসাদের আস্তাবলের সব ঘোড়াকে সমুদ্রের ধারে তাড়িয়ে নিয়ে যা। যে ঘড়াটা দল ভেঙে সমুদ্রে গিয়ে গলা অবধি ডুবিয়ে সমুদ্রের জল খেতে শুরু করবে, আর তাইতে সমুদ্র উথালপাথাল হয়ে ঢেউ আছড়াবে পাড়ের গায়ে, সেই ঘোড়াটার পিঠে চাপবি।"

"ধন্যবাদ বাবা," এই বলে ইভান ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তার দেশের পথে।

রাজপ্রাসাদে ফিরে ইভান বুড়োর কথামত কাজ করে যে ঘোড়াটাকে পেল সে হল আস্তাবলের সবচেয়ে তাগড়া ঘোড়াটা। পরদিন সকালে সে তার পিঠে চাপতে ঘোড়া মানুষের গলায় বলে, "নেমে দাঁড়াও ইভান। আমি তোমায় তিনবার ধাক্কা দেব। তাতে তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হয়ে যাবে।"

ইভান নেমে দাঁড়াতে ঘোড়া তাকে একখানা ধাক্কা দিল, তারপর আরেকখানা। তারপর তিন নম্বর ধাক্কা দিতে গিয়েও কী ভেবে যেন থেমে গেল সে। বলল, "উঁহু। তিনবার ধাক্কা দিলে তোমার গায়ে এমন জোর হবে যে তাতে পৃথিবীটাই ফেটে যাবে। সে বরং থাক।"

তখন ইভান বর্মচর্ম তলোয়ারে সেজে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চলতে চলতে তিনমাস বাদে তারা এসে পৌঁছোল একটা জলায়। সেখানে ঘোড়ার হাঁটু অবধি জল, ইভানের বুক অবধি ঘাস, খাবার জন্য কুটোটি মেলে না। ঘুরতে ঘুরতে যখন সে খিদেতেষ্টায় অস্থির তখন হঠাৎ দেখে দূরে একটা জরাজীর্ণ কুঁড়েঘর। ঘরটা একটা মুরগির পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আর তার মধ্যে শুয়ে আছে রোগাভোগা, কঙ্কালসার ডাইনি বাবা ইয়াগা। ইভান ঘরে ঢুকে হাঁক দিল, "ও ঠাকুমা।"

ডাইনি মুখ তুলে তাকে দেখে বলে, "আরে রাজপুত্র ইভান যে? কী খুঁজতে বেরিয়েছ?"

"আমি সাতাশ দেশের তিরিশ রাজ্য পেরিয়ে রাজকন্যা রূপমতীর প্রাসাদ খুঁজতে যাচ্ছি। বাবার জন্য তার কাছ থেকে নবজীবনের জল চাইতে যাব।"

"শুনেছি বটে সে দেশের কথা, "বাবা ইয়াগা মাথা নাড়ল, "কিন্তু সেখানে তুই পৌঁছুতে পারবি না যে!"

"কেন? কেন?"

"পথে তিনটে নদী পড়ে যে। সে নদীরা যেমন গভীর তেমন চওড়া।"

"তাতে কী? পাড় হবার জন্য নৌকো চাপলেই হল!"

"সে তো বটেই। খেয়ানৌকোর ঘাটও আছে। তবে ভাড়া বেজায় চড়া। প্রথম নদী পেরোবার জন্য কেটে দিতে হবে তোর ডানহাত, দু নম্বর নদী পাড় হবার জন্য বাঁ হাত আর তিন নম্বরের জন্য মুণ্ডু। তাই বলছি–"

"একখানা মুণ্ডু গেলে ক্ষতি নেই। গিয়েই দেখি।"

"আহা বাচ্চা ছেলে। কখনো বিপদের মুখ দেখিসনি যে! এখনো জীবনে কত সাধ আহ্লাদ বাকি তোর। ফিরে যা বাপ।"

"না ঠাকুমা। পথে যখন বেরিয়েছি তখন আমি যাবই যাব।" এই বলে রাজপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ফের। তারপর ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে প্রথম নদীর খেয়াঘাটে এসে হাজির। এসে সে দেখে মাঝি ঘুমোচ্ছে। "আহা জোরে হাঁক দিলে বেচারাদের কানে তালা ধরে যাবে। জোরে শিস দিলে নদীতে তুফান উঠবে। আমি বরং আস্তে করে ডাকি। এই বলে ইভান খুব আস্তে শিস দিল একটা। অমনি মাঝি জেগে উঠে নৌকোয় গিয়ে বসল। তারপর ইভানকে নদী পার করে দিয়ে বলে, "এইবার ভাড়া দাও রাজপুত্তুর। তোমার ডানহাতটা কেটে দাও আমায়।"

"উঁহু। হাতটা আমার কাজে লাগবে যে," ইভান জবাব দিল। তারপর তলোয়ার বের করে ভীষণ যুদ্ধ করে মাঝিকে হারিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলল পরের নদীর দিকে।

এইভাবে যুদ্ধ করে করে তিন নদী পার হয়ে সে তিরিশ নম্বর রাজ্যের সীমানায় এসে পৌঁছে দেখে সেখানে একটা রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা বনের সবচেয়ে বড়ো গাছটার চেয়েও বড়ো। হাতে একটা বিরাট বড়ো ওককাঠের মুগুর।

"কোথায় যাচ্ছিস রে ব্যাটা পোকা?" বাজের মত গলায় হাঁক দিল সে ইভানকে দেখে।

"যাচ্ছি রূপমতীর দেশে। বাবার জন্য নবজীবনের জল আনতে।" ইভান জবাব দিল।

“কী বললি ব্যাটা বামন? আমি তাঁর রাজ্য এখানে দাঁড়িয়ে শতেক বছর ধরে পাহারা দিচ্ছি। তোর চেয়ে কত বড়োবড়ো বীর এল সেই জল নিতে তার লেখাজোখা নেই! কেউ আমার হাত থেকে প্রাণ নিয়ে রাজকন্যার দেশে ঢুকতে পারেনি। তাদের হাড়গোড় সব এখানে ছড়িয়ে আছে। তাদের কাছে তুই তো একটা পোকা। বাঁচতে চাইলে প্রাণ নিয়ে পালা।”

ইভান দেখল অতবড়ো একটা রাক্ষসের সঙ্গে সে মোটে এঁটে উঠতে পারবে না। তখন সে ঘোড়া ঘুরিয়ে সীমানার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে বনের ভেতর দিয়ে চলল। অনেক পথ পেরিয়ে সে হাজির হল বনের ভেতর একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরে। সেখানে শুয়েছিল এক বুড়ি। ইভানকে দেখে তড়বড়িয়ে উঠে বসে সে বলে, “রাজপুত্র ইভান যে! হায় হায়, ভগবান তোমায় কেন এ দেশে পাঠালেন?” ইভান তাকে সব কথা খুলে বলতে বুঝি এবার একটু দয়া হল বুড়ির। উনুনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে সে বের করে আনল খানিক বিষ লতা আর একটা ছোট্ট বল।

রাক্ষসের কাছাকাছি গিয়ে আগুন জ্বেলে লতাগুলো ওতে ফেলে দিবি। সাবধান। সে ধোঁয়া যেন তোর নাকে না ঢোকে। রাক্ষস ও গন্ধ পেলেই ঘুমিয়ে পড়বে দেখিস। তারপর তার মুণ্ডু কেটে ফেলে, এই বলটাকে মাটিতে গড়িয়ে দিবি। বল যেখানে যাবে তার পিছুপিছু যাবি। তাহলেই রূপমতীর প্রাসাদের পাশে পৌঁছুবি গিয়ে। রাজকন্যা ন’দিন জেগে থেকে প্রাসাদের বাইরে ঘোরেফেরে, খেলা করে, তারপর দশ দিনের দিন সে প্রাসাদে ফিরে ঘুমোয়। গোটা প্রাসাদই ঘুমিয়ে পড়ে তখন।

“সে যখন ঘুমোবে তখন এক লাফে প্রাসাদের দেয়াল টপকাবি। সাবধান দেয়ালের মাথার কাঁটাতারে যেন হাত না ঠেকে। তাহলেই সারা রাজ্য জেনে যাবে প্রাসাদে চোর ঢুকেছে। প্রাসাদে ঢুকে সটান রাজকন্যার ঘরে যাবি। আস্তে আস্তে দরজা খুলে পা টিপে টিপে ভেতরে গিয়ে তার বালিশের তলা থেকে জলের কৌটো বের করে নিবি। জল নিয়েই সোজা পালিয়ে আসবি কিন্তু। রাজকন্যার মুখের দিকে খবরদার তাকাস না। সে মুখ এমন সুন্দর যে চোখে ধাঁধা লেগে গিয়ে ধরা পড়ে যাবি।”

তাই হল। সীমানার ধারে বিষ লতা জ্বলল, রাক্ষস ঘুমোল, তার মুণ্ডু কাটা হল। বল গড়াল, ইভান তার পিছুপিছু রওনাও হল। বেশ অনেকদূর গিয়ে যখন রাজপ্রাসাদের একেবারে কাছাকাছি পৌছেছে, ঠিক তখন দেখা গেল সেখান থেকে একদল সৈন্য বেরিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইভানের দিকেই তেড়ে আসছে। বলটা অমনি রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা গলিতে গিয়ে ঢুকল। ইভানও চলল তার পেছনপেছন। খানিকদূর গিয়ে একটা ঘাসজমিতে ঘোড়াটাকে চরবার জন্য ছেড়ে দিয়ে ইভান যেই না প্রাসাদের দিকে তাকিয়েছে, দেখে রাজকন্যা রূপমতী সৈন্যদলের সামনে ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা ছেড়ে সেই ঘাসজমির দিকেই আসছে। তার সৈন্যদলের সবাই মেয়ে।

ঘাসজমিতে পৌঁছে তারা তাঁবু খাটিয়ে আস্তানা গেড়ে খেলায় মাতল। তাদের হাসি, গানের শব্দে বন ভরপুর। ইভানের কিন্তু তখন সব ছেড়ে রূপমতীর দিকেই চোখ। মেয়েরা সব্বাই সেরা সুন্দরী, কিন্তু রূপমতীর মত সুন্দর মানুষ ইভান কখনো দেখেনি। একবার তাকালে চোখ ফেরে না।

দশ দিনের দিন খেলাধুলো সেরে তাঁবু গুটিয়ে ফিরে গিয়ে তারা সবাই যখন ঘুমিয়েছে, ইভান তখন চুপিচুপি গিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে একলাফে পাঁচিল টপকে গিয়ে ঢুকল প্রাসাদের বাগানে। তারপর ঘোড়াটাকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে রাজকন্যার ঘরে গিয়ে ঢুকল চুপিচুপি। সেখানে সোনার পালঙ্কে রাজকন্যা রূপমতী ঘুমোয়। তার মাথার এলোচুল ছড়িয়ে আছে চারপাশে। তার মাঝখানে পদ্মফুলের মত সুন্দর মুখটা ফুটে আছে। সাবধানে তার বালিশের তলা থেকে নবজীবনের জলের কৌটোটা বের করে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোতে গিয়ে ইভানের কী যে হয়ে গেল, সব সাবধানতা ভুলে সে ফিরে এল রাজকন্যার কাছে। তারপর রাজকন্যাকে তিনবার চুমু খেয়ে সে একছুটে বের হয়ে গিয়ে হাওয়ার চেয়েও আগে ছুটিয়ে দিল তার ঘোড়াকে।

ওদিকে রজকন্যাও ইভানের ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠেছে। বালিশের তলা থেকে জলের কৌটো চুরি গেছে টের পেয়ে সে ছুটে বের হয়ে এল। তারপর তার সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটার পিঠে চেপে দড়বড়িয়ে ধাওয়া করল ইভানকে। তার চোখে আগুন, হাতে খোলা তলোয়ার।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পেছনে ক্ষুরের শব্দ পেয়ে ইভান পিছু ফিরে দেখে রাজকন্যার ঘোড়া তাকে ধরে ফেলল বলে। তখন সে নিজের ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাতে ঘোড়া মানুষের গলায় বলল, “আমায় মেরে লাভ নেই

ইভান। রূপমতীর ঘোড়ার চেয়ে আগে ছুটতে পারে এমন ঘোড়া পৃথিবীতে নেই। তার পায়ের দাপে জগত কাঁপে। এক লাফে গোটা নদী পেরিয়ে যায় সে। তার ক্ষুরের নিচে পাহাড় পর্বত বিদ্যুতের মত মিলিয়ে যায়।”

ঘোড়ার কথা শেষ হতে না হতে রূপমতীর ঘোড়া এসে তার সামনে পৌঁছেছে। ঝলসে উঠেছে রূপমতীর তলোয়ার। সটান এসে বিঁধে গেছে ইভানের বুকে। বুকে তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটির বুকে আছড়ে পড়ল রাজপুত্র ইভান। তার বুকের রক্তে তখন মাটি ভিজে উঠেছে।

তার যন্ত্রণায় ভরা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রাজকন্যার মুখটা কালো হয়ে গেল। কী সুন্দর এক রাজপুত্র! সে তাকে চুমু খেয়েছিল। তাহলে রূপমতী কেমন করে তার বুকে তলোয়ার গেঁথে দিতে পারল?

তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে এসে ইভানের বুকে হাত রাখল রূপমতি। তারপর চুরি যাওয়া নবজীবনের জলের কৌটো ইভানের ঘোড়ার জিন থেকে বের করে এনে তার বুকের তলোয়ারের ক্ষতে ছড়িয়ে দিতেই, মিলিয়ে গেল তলোয়ারের দাগ। ইভান চোখ খুলে উঠে বসল, যেন কিছুই হয়নি তার।

“আমায় বিয়ে করবে রাজপুত্র?” রূপমতীর চোখে চিকমিক করছিল হাসি।

“করব।”

“বেশ। তাহলে ফিরে যাও তোমার দেশে। তিন বছর অপেক্ষা করবে তুমি। তারপরেও আমায় যদি তোমার মনে থাকে তাহলে ফিরে এসে আমার রাজ্যে। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য।”

তারপর দুটো ঘোড়া তাদের সওয়ারদের নিয়ে দুটো রাস্তা ধরে যার যার দেশে ফিরে গেল। অনেক নদী পাহাড়পর্বত পেরিয়ে ইভান যখন তার দেশের কাছে এল, তখন দেখে সেখানে পাহাড়ের ধারে এক মাঠের ওপর দুটো তাঁবু গেড়ে তার দুই দাদা বসে আছে।

“কী রে ইভান, নবজীবনের জলের খোঁজ পেলি?” ইভানকে আসতে দেখে দাদারা জিজ্ঞাসা করল। ইভান তো ভারী ভালো ছেলে। তাই সে দাদাদের সব কথা বলে দিল। শুনে দাদারা করল কী, রাতের বেলা খেয়েদেয়ে ইভান যখন ঘুমোচ্ছে, তখন তার কাছ থেকে সেই জলের কৌটো চুরি করে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলল একটা গভীর খাদের ভেতর।

খাদের ভেতর পড়তে পড়তে পড়তে–ইভান শেষে হাজির হল একেবারে পাতালপুরীতে। সে তখন কপাল চাপড়ায় আর বলে, “সব শেষ। আর কখনো এখান থেকে আমি ফিরতে পারব না। হায় হায়–”

পাতালপুরীর ভেতর ঘুরতে ঘুরতে ইভান দেখে ক্রমেই দিনগুলো ছোটো হয়ে আসছে। অবশেষে সে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছোল যেখানে শুধুই রাত। সেখানে সমুদ্রের ধারে একটা দুর্গ, যেটা আসলে একটা গোটা শহর, আর একটা কুঁড়েঘর যেটা আসলে একটা প্রাসাদ।

ইভান সেই কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে বলল, “আমায় একটু থাকতে দেবে?”

ঘরের ভেতরে এক বুড়ি বসে ছিল। একেবারে থুত্থুরি বুড়ি সে। ইভানকে দেখে বলে, “সে তুমি নয় আমার ঘরে খেলে ঘুমোলে! কিন্তু কথা হল, এই পাতালপুরীতে তুমি এলে কেমন করে?”

“আগে আমায় কিছু খেতে দাও বুড়িমা, তারপর একটু ঘুমোতে দাও, তারপর সব বলছি।” ইভান জবাব দিল।

শুনে বুড়ি তাড়াতাড়ি ইভানের সামনে খানিক খাবার ধরে দিল। তারপর বিছানা পেতে দিল তার ঘুমোবার জন্য। অবশেষে তার ঘুম ভাঙলে সে ফের জিজ্ঞাসা করল, “এখানে তুমি এলে কেমন করে?”

ইভান বলল, “আমি রাজা আফ্রনের ছেলে। রূপমতীর প্রাসাদে গিয়েছিলাম তার অতিথি হয়ে। দেশে ফেরার পথে পথ হারিয়ে এইখানে এসে পৌঁছেছি। তুমি কী আমায় আমার দেশের রাস্তা বলে দেবে?”

"সে আমি জানি না। এইখানে জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু আফ্রন নামে কোন রাজার নামই তো শুনিনি বাপু," বুড়ি জবাব দিল, "আজকের দিনটা এখানেই বিশ্রাম করে নাও, কাল আমি আমার দূতদের খবর দেব'খন। তাদের কেউ যদি তোমার দেশের খবর দিতে পারে!"

পরদিন সকালে স্নানটান সেরে ইভান বারান্দায় বুড়ির কাছে যেতে বুড়ি আকাশের দিকে মুখ করে চড়া গলায় হাঁক দিয়ে উঠল, "জলের যত মাছ, মাটির তলায় গর্তে যত সাপ, বনের যত জন্তু, আকাশের যত পাখি সবাই এস আমার কাছে।"

অমনি কুঁড়ের পাশের সমুদ্রে এসে জড়ো হল সাগরজোড়া মাছের দল, আর সাগরের পাড় ভরে উঠল হাজারো জীবজন্তু আর সাপের ভিড়ে।

"তোমরা কি কেউ রাজা আফ্রনের নাম শুনেছ?"

অমনি তারা সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ল, "অমন নাম আমরা কক্ষণো শুনিনি। কোথায় তার দেশ আমরা কেউ জানি না।"

"নাঃ রাজপুত্র। সবাইকেই তো জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ কিছু জানে না।" এই বলে মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ি ঘরের ভেতর ঢুকতে যাবে ঠিক তক্ষুণি বাতাসে ডানার সাঁইসাঁই শব্দ তুলে উড়ে এল বিরাট বড়ো মোগল পাখি।

"তুমি এত দেরিতে এলে যে? আমি ডেকেছি শুনতে পাওনি?" বুড়ি রেগে উঠে তাকে বলল।

"অনেক দূর থেকে আসছি যে মা," মোগল জবাব দিল, "ডাক আমি ঠিকই শুনেছি। কিন্তু আমি গিয়েছিলাম সে-ই রাজা আফ্রনের দেশে। সে একেবারে পৃথিবীর অন্যপাড়ে। তাই দেরি হয়ে গেল।"

অমনি বুড়ির মুখে হাসি ফুটল, "আহা বেশ বেশ। এই খবরটাই তো জানতে চাইছিলাম সবার কাছে এতক্ষণ। এখন যাও তো, এই রাজপুত্র ইভানকে আফ্রনের দেশে পৌঁছে দিয়ে এস।"

"আগে পেট ভরে খাবার দাও। তারপর যেতে পারি," মোগল পাখি জবাব দিল, "সে বেজায় দূরের পথ। তিনতিনটে বছর লাগবে উড়ে উড়ে সেইখানে পৌঁছোতে।"

বুড়ি তখন মোগলকে ভালো করে খাওয়াল প্রথমে। তারপর তার পিঠে একঝুড়ি মাংসের পিঠে, বেশ খানিক জল আর একটা লম্বা লোহার লাঠি রেখে ইভানকে বলল, "উড়তে উড়তে যখনই মোগল তোমার দিকে ফিরে চাইবে, এই লাঠিতে গেঁথে একটা মাংসের পিঠে তার মুখে গুঁজে দেবে।"

"তুমি খুব ভালো, বুড়িমা," এই বলে একগাল হেসে ইভান মোগলের পিঠে চড়ে বসল। মোগলও অমনি তার বিরাট দুটো ডানা মেলে বাতাসে ভেসে উঠে ঝড়ের মত ধেয়ে গেল আফ্রনের দেশের দিকে।

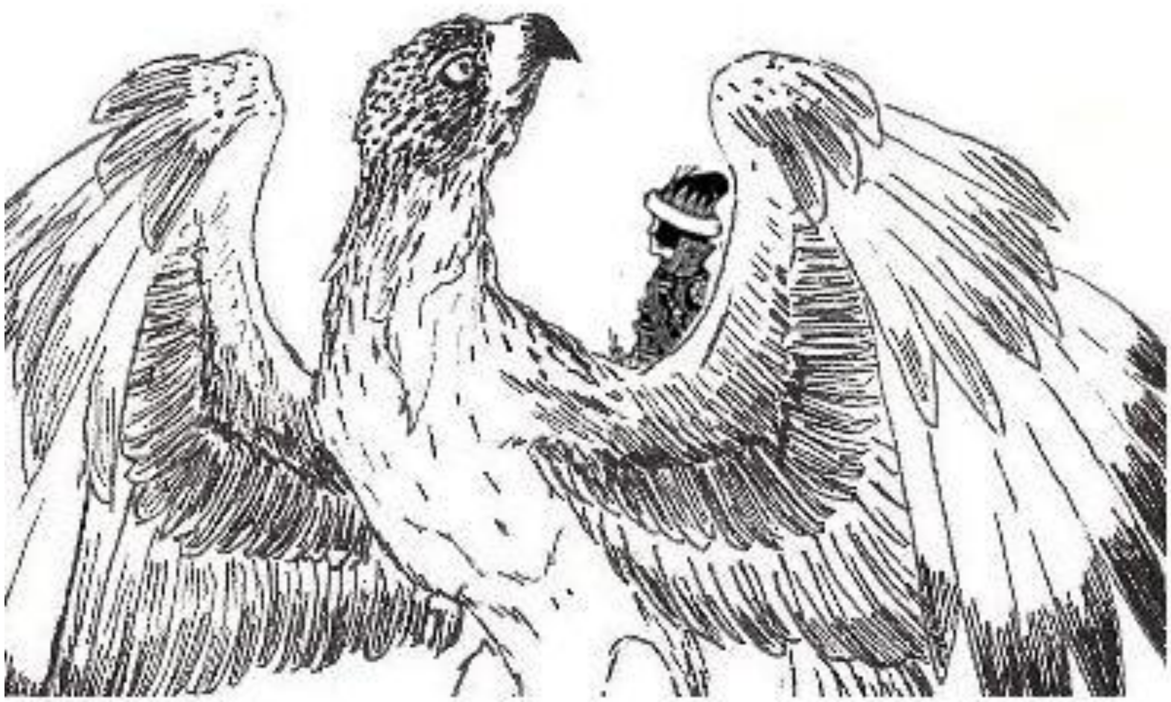

মোগল যায় আর খায়, খায় আর যায়–তারপর একদিন ইভান দেখল পিঠের ঝুড়ি খালি হয়ে আসছে। সে তখন মোগলকে ডেকে বলল, "তোমার খাবার প্রায় শেষ। একবার মাটিতে নামলে আমি ফের ঝুড়িভরা খাবার জোগাড় করে নিতে পারি।"

"পাগল নাকি?" পাখি জবাব দিল, "আমাদের পায়ের নিচে ঘন জঙ্গল। অন্ধকার। সেখানে কোন খাবার মিলবে না।" এই বলে সে আরো জোরে জোরে ডানা ঝাপটে উড়ে চলল।

তারপর উড়তে উড়তে একদিন খাবার যখন সব শেষ, তখন ফের মোগল মুখ ঘুরিয়ে চাইল ইভানের ইকে। ইভান তখন কী আর করে? নিজের পায়ের পাতাদুটো কেটে লাঠির আগায় গেঁথে সে মোগলের মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরল। পাখি সেগুলোকে গিলে ফেলে উড়তে উড়তে অবশেষে আফ্রনের রাজ্যের এক মাঠের ভেতর এসে নামল তাকে নিয়ে। নেমে এসেই পাখি ইভানের পায়ের পাতাদুটো উগরে দিয়ে সেগুলো ইভানের পায়ে জুড়ে দিয়ে তাতে একটু থুতু দিতেই পাতাগুলো জুড়ে গেল ফের।

রাজ্যে পৌঁছে ইভান দেখে সেখানে ভারী হইচই বেধেছে। সেনারা কুচ করছে। লোকজন ভয়ে এদিকসেদিক ছুটছে। একটা লোককে ডেকে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে সে ইভানকে বলল, "সর্বনাশ হয়েছে। রূপমতী রাজকন্যা আমাদের দেশে হানা দিতে এসেছে সমুদ্র বেয়ে। বন্দরে তার চল্লিশটা যুদ্ধজাহাজ ভর্তি লক্ষ সেনার দল। তার দাবি, একদিন তাকে ঘুমের মধ্যে চুমু খেয়েছিল যে রাজপুত্র ইভান তাকে তুলে দিতে হবে তার হাতে। নইলে আমাদের গোটা দেশ জ্বালিয়েপুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে সে।"

"হুম। ঠিক সময়েই এসেছি তাহলে," ইভান মুচকি হাসল, "তিন বছর অনেকদিন হল পেরিয়ে গেছে যে! আমিও তো তার কাছেই যেতে চাই এখন!" এই বলে তাড়াতাড়ি বন্দরে পৌঁছে সটান রূপমতীর জাহাজে গিয়ে উঠল ইভান। তারপর গির্জায় গিয়ে বিয়ে সেরে দুজন মিলে হাত ধরাধরি করে আফ্রনের দরবারে গিয়ে সব কথা খুলে বলল। আফ্রন তখন রেগে আগুন হয়ে দুই বড়ো রাজপুত্রকে দূরদূর করে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর ইভান আর রূপমতীকে নিয়ে সুখেশান্তিতে ঘর করতে লাগলেন রাজা আফ্রন।

নবজীবনের জলের কৌটোর কথা আর তাঁর মনেই ছিল না।

(পর্ব ৩ - পাংসাও পাস)

মালিনী ভট্টাচার্য্য

সকালে উঠেই কাগজে প্রথম পাতায় চোখ রাখতেই বেশ লাগল - মিষ্টি চেহারার Duchess of Cambridge (Kate)- এর "স্নেহের পরশ" এর ছবি দেখে। কাজিরাঙাতে পশু উদ্ধার ও পুণর্বাসন কেন্দ্রে একটি গন্ডার শাবককে ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়াবার ছবি! হাতি ক্লিনিকে গিয়ে সেখানেও নাকি হাতির বাচ্চাকে আদর করে তার মুখে দুধের বোতল ধরেন কেট্। আমরা আসলে কদিন আগেই কাজিরাঙা ঘুরে এসেছি বলে খুব কৌতূহল নিয়ে পড়ছিলাম কেট-উইলিয়ামের সফরের বৃত্তান্ত।

কিন্তু দিনের শুরুটা যেরকম ছিল, শেষটা সেরকম হল না। কারণ প্রাক্-নববর্ষের সন্ধ্যায় "মায়ান্মারী ঝট্কা" বেশ কাঁপিয়ে দিল আমাদের। তখন খালি মাথা ঘুরে গেলেও পরে জানলাম যে ভূকম্পের কেন্দ্র মায়ান্মারের রাজধানী "নেপিদওয়ের" ৩৬০ কিমি দূরে ও মাটির ১৩৫ কিমি নিচে অবস্থিত। সেটি নাকি খুবই অস্থির এলাকা। মনটা একটু উদাস হল, কারণ কদিন আগেই একটা ছোট্ট সুযোগ হয়েছিল মায়ান্মারী মাটি ছোঁয়ার। সেই গল্পই আজ সবাইকে শোনাব।

বন্ধুর অনুরোধে গিয়েছিলাম আপার আসামের তিনসুকিয়া-ডিগবয় এলাকাতে - চা বাগানে ওদের সাথে কিছু অবসর কাটাতে। সেখানে 'সবুজ' দেখে চোখের যে কী দারুণ আরাম হয়েছে, তা অনুমেয়। ডিগবয় থেকে কয়েকঘন্টার পথ পেরিয়ে আসামের 'লেডো' হয়ে অরুণাচল সীমান্তে 'জয়রামপুরে'র কাছে এক ঐতিহাসিক সমাধিক্ষেত্র দেখার সুযোগ হল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিহত হাজারখানেক সৈনিকদের সমাধিস্ত করা হয়। ইট ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি এই সমাধিগুলোর খোঁজ ১৯৯৮-এ পাওয়া যায়। এর ডানদিকে অবস্থিত 'Stilwel Road (1736 km)', যা তৈরি হয়েছিল (১৯৪২-১৯৪৫) তখনকার South East Asia Axis Forces দ্বারা । এই পথ আসামের লেডো থেকে অরুণাচলের জয়রামপুর স্পর্শ করে চলে গেছে Nampong-Pangsau Pass (Arunachal Pradesh – Myanman border)এ। সেখান থেকে অধুনা মায়ানমার (পূর্বে বর্মা) হয়ে চীনের Kunming প্রান্তরে।

পরেরদিন বন্ধু টেনে নিয়ে গেল এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার জন্য - গন্তব্য - সীমান্তের ওই Pangsau Pass Market। জয়রামপুরে পৌঁছোনর আগে ছুঁয়ে গেলাম লেডো, মার্গারিটা নামক জায়গাগুলো। নামগুলো বেশ অদ্ভুত ও অচেনা বলে ছোট্ট

অপুর মতন অপার অচেনার আনন্দ অনুভব করছিলাম। অতঃপর জয়রামপুর থেকে খানিক এগিয়ে পৌঁছলাম নাম্পং-এ, যেখানে S.D.Oর অফিস থেকে পাস বানাতে হল মূল গন্তব্যে যাওয়ার জন্য। তবে মজার কথা যা ঐ চেকগেটে গিয়ে শুনলাম যে ভারতীয়রা গেটের ওপারে মায়ানপমার মাটিতে পা রাখতে পারবেন প্রত্যেক মাসের কেবল ১০, ২০ ও ৩০ তারিখে। ভাগ্যক্রমে আমরাও ঐ নির্ধারিত তারিখেই হাজির ছিলাম। যদিও বাকিদের জন্য রোজই খোলা। সেখানে আমাদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হল ও ছবি তোলা হল। এর পরে হাতে পেলাম একটি রূপোর মুদ্রা, যার মাধ্যমে আমরা ঐ দেশে পা রাখতে পারব। তবে এও বলা হল যে বিকেল ৪-৩০ এর মধ্যে আমাদের ঐ মুদ্রা ফেরত দিতে ফিরে আসতে হবে এই প্রবেশদ্বারে। বেশ কঠিন ব্যবস্থা।

গুটিগুটি পায়ে এক উত্তেজনা নিয়ে ‘Aung San Su ki’র মিষ্টি চেহারাটা মনে ধরে নিয়ে পৌঁছলাম ওপারে। ভারত-মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত এই Pangsau Pass Market ছোট্ট, তবে মন-কাড়া। মূলত ত্রিপলের উপর সাজানো রয়েছে খেলনা, মনোহারী দ্রব্য, স্থানীয় পোশাক, বিভিন্ন ধরনের টুপি ও ন্যাচারাল কস্‌মেটিক্‌স্‌। ভাষাটা যেহেতু একটা সমস্যা, তাই বেশি সময় নষ্ট না করে সংগ্রহ করলাম একটি স্থানীয় টুপি ও কিছু টুকিটাকি। এদিকে তো পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু তাই খোঁজ-খোঁজ খাবারের। মোটামুটি বাছাই করে একটি দোকানে তো ঢুকলাম। কিন্তু আবার বিপত্তি। যা চাই তা বোঝাতে পারি না, আর যা পাই তা খেতে পারি না! অনেক কষ্টে পাওয়া গেল সবজি সমেত এক বাটি সুপি নুডলস আর মেয়ের জন্য একটি চেনা চিকেনের পদ, সেও আবার চপ-স্টিক সমেত। ক্ষিদে মহাশয়ের কল্যাণে মন্দ লাগেনি হালকা খাবারটা।

ভরাপেটে খানিক এদিক ওদিক ঘুরলাম বটে তবে ফেরার তাড়ায় মন ভরল না। নতুন দেশের মাটির স্বাদটা ঠিক পেলাম না। ক্ষিদেটা বেড়ে গেল। তখনই মনে মনে একটা সংকল্প করলাম যে পরে সময় নিয়ে অবশ্যই আসব।

আংকল স্যাম (৩)

সংহিতা

নাগরিকরা বাধ্য হন কেমন কাজ করতে? বাড়ি বানালে সেখানে একটা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকেন নাগরিকরা। আবর্জনা ফেলার সেই নির্দিষ্ট জায়গা কত লম্বা হবে, কত চওড়া হবে তার মাপ বলা থাকে বাড়ি বানানোর নিয়ম নির্দেশিকায়। এই নির্দেশিকায় আরও বলা থাকে যে আবর্জনা ফেলার সেই নির্দিষ্ট জায়গাটি বাড়ির বাইরের দিকে করতে হবে। এর ফলে কোনো লোক বাড়িতে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য উপস্থিত না থাকলেও ময়লা সংগ্রহ করার লোক এসে ময়লা যথা সময়ে নিয়ে যেতে পারে।

তবে এই নির্দেশিকা সরাসরি আইন হিসেবে বাস স্টেসনে মানে বাস স্ট্যান্ডে বা গ্যাস স্টেসনে মানে পেট্রল পাম্পে সবার জানার জন্য ঝোলানো থাকে না। কোনো একটা এলাকায় যাঁরা বাড়ি বানান বা যাঁরা বাড়ি কিনে কিংবা ভাড়া নিয়ে বাস করেন তাঁরা অঙ্গীকার পত্রে সই করে কবুল করেন যে তাঁরা যে এলাকায় বাড়ি বানাতে চলেছেন বা বাস করতে চলেছেন সেই এলাকাতে বাড়ি বানানোর বা বসবাসের সমস্ত নিয়ম মানতে তাঁরা রাজি আছেন। যাঁরা বাড়ি বানান তাঁরা কবুল করেন নিজেদের নির্মাণ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সময়ে। বসবাস করেন যাঁরা তাঁরা কবুল করেন যে সংস্থার থেকে বাড়ি কিনছেন বা ভাড়া নিচ্ছেন তাঁরা, তাঁদের কাছে। এরপরে তাঁরা সেই অঙ্গীকার পত্রের সঙ্গে পেয়ে যান কাগজে ছাপানো অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী।

যাঁরা বাড়ি বিক্রি করেন বা ভাড়া দেন তাঁরা তাঁদের খদ্দেরকে অঙ্গীকার করানোর কাজটা করেন কারণ এটা করানোর জন্য তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কার কাছে? এলাকার জনপ্রতিনিধিরা যে পরিষদ চালান, সেই পরিষদ রাষ্ট্র এবং রাজ্যের আইন মেনে সরকার তৈরি করেন এবং সেই সরকারের মধ্যে দিয়ে নানান নাগরিক পরিষেবা দেন ও রাজস্ব সংগ্রহ করেন। সেই সরকারের দেওয়া পরিষেবাগুলোর একটা ব্যবসায়িক সংস্থার প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেওয়া। যাকে বিজনেস রেজিস্ট্রেসন বললে চটপট বোঝা যায়। যে সংস্থা বাড়ি বিক্রি বা ভাড়া দেওয়ার কাজ করেন তাঁরা নিজেদেরকে বিজনেস হিসেবে রেজিস্টার করানোর সময় যে এলাকায় কাজ করবেন, সেই এলাকার নাগরিকদের বানানো নিয়ম মানতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

সাধারণত এইসব নিয়ম স্থির করেন এলাকার বাসিন্দারা, তাঁদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে, জনপ্রতিনিধিদের দরবারে। সেই দরবারে থাকেন এলাকার বণিক সভার প্রতিনিধিরাও। এলাকায় ব্যবসা করেন এবং করেন না এই দু ধরনের মানুষের মত বিনিময় আর বিতর্কের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় এইসব নিয়মনীতি। এলাকাভিত্তিক জনপ্রতিনিধিদের এই দরবারকে বলা হয় সিটি কাউন্সিল। ভারতে আমরা এই সংস্থাগুলোকে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেসন বলি। তা বাদে ট্রাইবাল কাউন্সিলও হয় উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে। তবে সাধারণভাবে একেকটা এলাকার জনপ্রতিনিধিদের দরবারেই ঠিক করা হয় সেই এলাকার এইসব আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা কেমন হবে এবং সেই সংক্রান্ত নানান মাপজোপ। আসলে বাজারে নানান মাপের নানা ডিজাইনের নানান স্ট্যান্ডার্ডের যন্ত্র এবং জিনিস পাওয়া যায়। তাদের সবার সাথে সবটা খাপ খায় না। ডামস্টারের মাপ, আর তার সাথে ময়লা সংগ্রহ ট্রাকের যন্ত্রপাতি মানানসই হতে লাগে। বেখাপ্পা যন্ত্র ও জিনিসের ব্যবহার এড়াতে আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থাতেও মাপজোপের কিছু কড়াকড়ি থাকে।

অনেক কথা ভেবে, অনেক হিসেব করে বাড়িগুলোতে রাখা হয় ময়লা ফেলার জায়গা, যাকে কিনা ডাম্পস্টার বলে, সেটা। এখানে বাড়ি বলে বোঝাতে চেয়েছি বসতবাড়ি, ইস্কুলবাড়ি, দোকান-বাজার, হোটেল, হাসপাতাল, মল – সব ধরণের ইমারৎ। ফিরে যাই হিসেবের কথায়। কিসের হিসেব? হিসেব হলো ডাম্পস্টার অবধি যাতে ময়লা সংগ্রহ করার ট্রাক পৌঁছোতে পারে, তার। এই জন্য সব অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিং স্পেসে থাকে ডাম্পস্টার রাখার কুঠুরি। সাধারণত এসব কুঠুরির তিনদিকে ইঁটের তৈরি দেওয়াল থাকে। কখনও কখনও দেওয়াল তৈরি করা হয় কাঠের পাটাতন দিয়েও। আর রাস্তার দিকে থাকে সেই কুঠুরির দরজা। হোটেলেও তাই, তবে হোটেলে ঢোকার দরজা থেকে সেসব দেখা যায় না সাধারণত।

ডাম্পস্টার পার্কিং-এ থাকার সুবিধে অনেক। ময়লা ফেলার কাজটা বাইরের কাজে বেরোনোর সময়েই বেশ করে ফেলা যায়। হোটেলে থাকলে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বা অ্যাপার্টমেন্টে থাকলে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে, কাজে যাওয়ার জন্য গাড়িতে চড়ার আগে, হাতে করে আনা ময়লা ভর্তি ট্র্যাশব্যাগ ঝপ করে ফেলে দেওয়া যায় ডাম্পস্টারে। আবার ময়লা সংগ্রাহক সংস্থার ট্রাক এসে ঘোরার ফেরার যথেষ্ট জায়গা পায়।

যে সব জায়গা বেশ গ্রামীণ যেমন পেন্সিলভ্যানিয়ার মুন টাউনশিপ কিংবা অ্যারক্যানসয়ের বেন্টনভিল কিংবা ক্যান্সাসের সনি, সেসব জায়গায় ময়লা সংগ্রাহক সংস্থার ট্রাক এসে থামে ডাম্পস্টার কুঠুরির সামনে। তারপর ট্রাকের ড্রাইভার ট্রাক থেকে নেমে এসে ডাম্পস্টার রাখা কুঠুরির বন্ধ দরজা খুলে নেন হাট করে। সরিয়ে দেন ডাম্পস্টারের ঢাকনা। তারপর ফের ট্রাকে চড়ে ড্রাইভারের কেবিনের মাথার ওপর থেকে কাঠের নাগরদোলার দোলনা দোলাবার কায়দায় নামিয়ে আনেন একজোড়া লিভার। লিভারগুলো এমন করে নামানো হয় ট্রাকের সামনে যে ট্রাকটা সামনে এগোলেই ডাম্পস্টারের কানার নিচ দিয়ে চলে যায় দুটো লিভার। এই দুটো লিভারকে দেখে মনে হয় যেন মানুষের হাতের কনুই থেকে আঙুলের ডগা অবধি অংশ, হাতের পাতা অনুভূমিক করা রাখা অবস্থায় কিংবা দু হাতের পাতা পরস্পরের মুখোমুখি করে, ভূমির সাথে উল্লম্ব করে রাখা অবস্থায়।

আর বোধ হয় বলতে লাগবে না যে বাচ্চাদের কোলে নেওয়ার মতো করে ডাম্পস্টারটাকে ট্রাকের ড্রাইভার্স কেবিনে উপুড় করে নেন ড্রাইভার তাঁর চালকের আসনে বসেই, কিছু যন্ত্রপাতি নেড়ে। তারপর আবার নাগরদোলার দোলনার কায়দায় নামিয়ে দেন ডাম্পস্টার যথাস্থানে। তারপর আবার ড্রাইভার নেমে এসে বন্ধ করে দেন ড্রাম্পস্টারের ঢাকা আর ড্রাম্পস্টার রাখার কুঠুরির দরজা। ফিরে যান নিজের ট্রাকে।

https://www.youtube.com/watch?v=LTUjiLxzDQs

যেসব জায়গা ঘনবসতি পূর্ণ শহর বা শহরতলি, যেমন লস এঞ্জেলস, সেসব জায়গায় দেখেছি যে ময়লা সংগ্রাহক ট্রাকের ড্রাইভার ডাম্পস্টার কুঠুরির দরজা খোলার পর ট্রাকে ওঠার আগে হিড়হিড় করে ডাম্পস্টারগুলোকে টেনে বার করে আনেন ট্রাকের সামনে। তারপর ট্রাকে চড়ে ময়লা সংগ্রহের বাকি কাজগুলো করে, ট্রাক থেকে নেমে আসেন আর ডাম্পস্টার ঠেলে ঢুকিয়ে দেন কুঠুরিতে। একাধিক ডাম্পস্টার একটা কুঠুরিতে থাকলে এক এক করে টেনে আনেন ডাম্পস্টার আর এক এক করে ঢুকিয়ে দেন কুঠুরিতে। যথেষ্ট জায়গার অভাবেই কাজটা করতে একটু বেশ সময় আর বেশি শ্রম দিতে হয়। এসব ঘন বসতি এলাকায় ট্রাক সরসরি ডাম্পস্টার রাখা কুঠুরিতে ঢুকতে পারে না। ট্রাক ঘোরানোর জায়গার অভাবে।

একেক এলাকায় ময়লা তোলা হয় সপ্তাহের একেক দিনে, একটা এলাকার জন্য দিনটা নির্দিষ্ট। এলাকায় যে সমস্ত বাড়ি থাকে মানে যেগুলো অ্যাপার্টমেন্ট নয়, আলাদা আলাদা বাড়ি, সেগুলোর চাকা লাগানো লম্বাটে প্লাস্টিকের ট্র্যাশ ক্যান সাইডওয়াকে নামানো থাকে ময়লা সংগ্রহের দিনে। সেদিন বিকেলেই বা পরে কোনো দিন দেখা যায় যে বাড়ির বাসিন্দারা কেউ বিকেল বেলায়

হিড়হিড় করে ট্র্যাশ ক্যান সাইডওয়াক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়ির দিকে। গ্যারাজের দরজার পাশে বা গ্যারেজের মধ্যে রাখা থাকে এই ক্যানগুলো। এই ক্যানগুলো থেকে ময়লা নেওয়ার জন্য ময়লা সংগ্রাহক ট্রাকে আরেক ধরণের রোবোটিক আর্ম থাকে। এই রোবোটিক আর্মগুলো ময়লা সংগ্রাহক ট্রাকের ড্রাইভার সিটে বসে এমন করে নাড়াতে পারেন যে আর্মগুলো দুপাশ থেকে ক্যাঁক করে ধরে একেকটা ট্র্যাশ বিন আর ঝপ করে উল্টে নেয় বড় লোহার টাবে। তারপর আবার বিন ঠক করে রেখে দেয় সাইডওয়াকে মানে ফুটপাথে। রোবোটিক আর্মগুলোর ট্র্যাশবিন ধরার কায়দা অনেকটা বাচ্চাদের দুহাতে

গ্লাস বা বোতল ধরে জল বা দুধ খাওয়ার মতো দেখায়। কোনো কোনো ট্রাকে যে লোহার টাবে এইভাবে ময়লা সংগ্রহ করা হয় সেই টাবটা রাখা থাকে ড্রাইভার্স কেবিনের মাথায়, নামানো আর ওঠানো যায় দরকার মতো, নাগরদোলার কায়দায়।

নানান জায়গা থেকে লোহার টাবে নেওয়া ময়লাটা আবার উল্টে নেওয়া হয় তৎক্ষণাৎ ট্রাকের পেছনে আঁটা বড় লম্বাটে একটা ধাতব পাত্রে। সেই পাত্রেই সংগৃহীত ময়লা কাটাই, কুঁচোনো, পেষাই এবং পোড়ানো হয়, ট্রাক চলতে চলতেই, একটা বাড়ির থেকে ময়লা নিয়ে পরের বাড়ির দিকে যাওয়ার সময়েই। তাই ময়লা সংগ্রাহক ট্রাকের থেকে ধোঁয়া বেরোতেও দেখা যায় কখনও কখনও। ট্রাকের যে অংশে এইসব আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ মানে সংগৃহীত ময়লার কাটাই, কুঁচোনো, পেষাই এবং পোড়ানো হয় সেই অংশটা ট্রাকের ড্রাইভার্স কেবিন আর ইঞ্জিন অংশের সঙ্গে জোড়া থাকে। সেই অংশগুলোকে মলের, প্লাজার, কর্পোরেট অনক্লেভের আর হাসপাতালের পার্কিং বা ব্যাক ইয়ার্ডে রাখা থাকতে দেখা যায়। এই সব সংস্থায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরকে প্রত্যেকবার ময়লা ট্র্যাশব্যাগে বা বিনে করে নিয়ে গিয়ে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রে ফেলতে হয় আর যন্ত্রের গায়ে লাগানো নির্দেশিকা পড়ে যন্ত্রকে চালু বা বন্ধ করতে হয় প্রয়োজন মতো। এই যন্ত্রের ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকতে হয় ব্যবহারকারীর নিরাপত্তার ব্যাপারে। যেমন এই যন্ত্র চালু অবস্থায় যন্ত্রটি খুলে তাতে ময়লা ফেলতে বারণ করা থাকে। এই যন্ত্রে প্রক্রিয়াকরণের পর সংগৃহীত আবর্জনার আয়তন কমে যায়। একেই কম্প্যাক্টর বলে।

কোনো কোনো সিটি কাউন্সিল নির্দেশ দেন অধিবাসীদের যে রিসাইক্লিং-এর জন্য কোনো কোনো বিশেষ আবর্জনা অধিবাসীদেরই নিজেদের আলাদা করে আলাদা বাক্সে ফেলতে হবে। ক্যাম্প্যাসের সনি শহরে এমন কোনো নির্দেশ ২০১৩-১৪ সালেও ছিল না অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের জন্য। কিন্তু ক্যাম্প্যাসেরই ওভারল্যান্ড পার্কের মলে যত দোকান ছিল তাদেরকে কাগজের বাক্স আলাদা করে একটা কম্প্যাক্টরে ফেলতে হতো, প্লাস্টিক একটাতে আর কাঁচ আরেকটাতে। পেনসিলভ্যানিয়ার মুন টাউনশিপে সিটি অথোরিটির নির্দেশ ছিল বলে অ্যাপার্টমেন্ট দেখাশোনা করতেন যে সংস্থা তাঁরা জানিয়েছিলেন যে বাসিন্দারা যেন তাঁদের 1 PETE ও 2 PETE প্লাস্টিক ডাম্পস্টারে রাখা আলাদা সবুজ বিনে জমা করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলস কাউন্টির কোথাও এমন কোনো নির্দেশ আছে বলে টের পাই নি। তবে লস এঞ্জেলস কাউন্টিতেই দেখেছি যে কুঁচোনো, বা পোড়ানোর পর আবর্জনার অবশেষ দিয়ে ভরে ফেলা হয় মাটির গহ্বর। হতে পারে এই সব গহ্বর পরিত্যক্ত সোনা বা রুপোর খনির। কারণ যেখানে এই গহ্বরগুলো আছে সেখানে নতুন গহ্বর খুঁড়তে দেখি নি, কিন্তু সেখানে কয়েকটা পরিত্যক্ত সোনা, রুপো, তামার খনি আছে। অবশ্য চালু খনিও আছে কয়েকটা।

ইউনাইটেড স্টেট্স-এর আবর্জনা মুক্ত আবহাওয়ার কথার শুরুতে পশ্চিমের আবর্জনা মুক্ত অভ্যাসের কথা কেন বললাম? বললাম এই জন্য যে পশ্চিমের ছবি, যত পুরোনো সময়েরই কথাই তাতে দেখানো হোক না কেন, তাতে দেখা যায় যে দারুণ রোবোট বানিয়ে ফেলার আগেই পশ্চিমী মানুষ বাড়িতে আবর্জনা রাখার ঘরটা সদরের পাশে রাখতেন শহরের বাড়িগুলোতে, যাতে শহরের আবর্জনা সংগ্রাহকরা সহজে আবর্জনা নিয়ে যেতে পারেন। আর সেই আবর্জনা রাখার ঘরের মাথা ছাওয়া থাকত, দরজা বন্ধ থাকত, যাতে সারা বাড়িতে দূর্গন্ধ না ছড়ায় বা বাড়িতে পা-রাখা মাত্রই আবর্জনার স্তূপ নজরে না পড়ে।

আবর্জনার কথায় আবর্জনা সংগ্রাহক গাড়ি আর তার ড্রাইভারের কথা অনেক হলো। তাহলে একটু ড্রাইভিং-এর কথা হোক। ইউনাইটেড স্টেটসের বড়ো শহর ছাড়া কোথাও খুব সুবিধেজনক পাব্লিক ট্র্যানজিট নেই। পাব্লিক ট্র্যানজিট মানে পাবলিক ট্র্যান্সপোর্ট হলো বাস, মেট্রো, লোকাল ট্রেন, ট্র্যাম এসব দিয়ে তাড়াতাড়ি যখন তখন শহরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াতের ব্যবস্থা। বিশেষত গ্রামে আর মফস্বলে বাস প্রায় নেই বললেই চলে। যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হলো নিজের গাড়ি।

সব্বাইকে নিয়ম মেনে গাড়ি চালাতে হয়। লেনের নিয়ম, লেন চেঞ্জের নিয়ম, সিগন্যালের নিয়ম, মোড় ঘোরার নিয়ম, গতিসীমার নিয়ম ইত্যাদি নানান নিয়ম মনে রেখে গাড়ি চালাতে হয়। এমনকি গাড়ি পার্ক করে রাখারও অনেক নিয়ম আছে। আবার নিয়ম লঙ্ঘন করলে জরিমানা দিতে হয়। তবে জরিমানা দিয়ে নিস্তার পাওয়ার উপায় সীমিত। বারবার জরিমানা হলেও আদালতের দেওয়া শাস্তি পেতে হয়। তাই পথের নিয়ম মানাটাই দস্তুর, নিয়ম ভাঙাটা নয়। গাড়িগুলো হর্নও বাজায় না চট করে। তাই অনেক গাড়ির ভিড়েও শব্দদূষণে গাড়ির হর্নের বিশেষ অবদান নেই।

পথচারীর চলার অধিকারকে মর্যাদা দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশি। গাড়িকে সবসময়েই পথ ছেড়ে দিতে হয় পথচারীর জন্য, সাইকেল আরোহীকেও। সাইকেল আরোহীদের জন্য রাস্তায় আলাদা লেন করা থাকে। লেন না থাকলে সাইকেল চালাতে হয় সাইডওয়াক দিয়ে।

ড্রাইভিং-এর কথা বলতে বলতেই এসে পড়েছে রাস্তার কথা। রাস্তার কথা বলে শেষ করা যাবে না। শহরের মধ্যে সিগন্যাল দেওয়া রাস্তা একরকম। আবার শহরকে ঘিরে বা শহর চিড়ে চলে যাওয়া হাইওয়ের ধরন সম্পূর্ণ আরেকরকম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই জার্মানিতে তৈরি হয়েছিল অটোব্হান। সে রাস্তায় থাকত না সিগন্যালের বাধা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সেনার সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন ডোয়াইট আইসেনহাওয়ার। ষাটের দশকে ইউনাইটেড স্টেট্সের রাষ্ট্রপতি হয়ে আইসেনহাওয়ার নির্মাণ শুরু করেছিলেন ইউনাইটেড স্টেট্সের হাইওয়ে সিস্টেমের। ক্যান্সাসের আবেলিনে আইসেনহাওয়ারের জন্মভিটার কাছে আই সেভেনটির একটা অংশকে চিহ্নিত করা আছে হাইওয়ের প্রাচীনতম অংশ হিসেবে।

হাইওয়েগুলোর নানান রকমফের আছে। কয়েকটা হলো ইন্টারস্টেট হাইওয়ে। কয়েকটা ফেডেরাল হাইওয়ে। তা বাদে আছে স্টেট হাইওয়ে আর কাউন্টি রোড। ইন্টারস্টেট হাইওয়ের যেগুলো পুব থেকে পশ্চিমে গেছে সেগুলোকে সব জোড় সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। সংখ্যা বাড়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। আবার উত্তর-দক্ষিণের ইন্টারস্টেট হাইওয়েগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিজোড় সংখ্যা দিয়ে। সেগুলো পশ্চিম থেকে পুবে ক্রমশ বাড়ে। তাছাড়া একটা শহরকে ঘিরে থাকা ইন্টারস্টেট হাইওয়ে যদি সম্পূর্ণ বৃত্ত হয় তো তবে তা তিন অঙ্কের সংখ্যা হয়, যার শতক স্থানে জোড় সংখ্যা থাকে। যদি বৃত্ত সম্পূর্ণ না হয় তবে তিন অঙ্কের সংখ্যার শতক স্থানে থাকে বিজোড় সংখ্যা।

কাজের কথা অনেক হল, আবার চাট্টি বাজে কথা বলি। ইউনাইটেড স্টেটস ফেরত বন্ধুর সাথে মস্করা করতে হলে কথা প্রায়ই বলি, ‘‘কী পাওয়া যায় আমেরিকায়, ঐ তো আদিদাসের ব্যাগ আর হাগেনদাসের আইসক্রিম! না পাওয়া যায় বোঁদে না বালুসাই।’’ এই সবটাই কিন্তু বন্ধুর সাথে নেহাৎ ঠাট্টা, ইউনাইটেড স্টেটস্ দেশটাকে অশ্রদ্ধা করে বলা নয়।

কিন্তু এই বাজে কথার মধ্যেই কেউ কেউ নিশ্চয় চিনে ফেলেছে অ্যাডিডাস ব্র্যান্ড আর Häagen-Dazs (এইজেন ড্যাস বা হাগেন ডাস) ব্র্যান্ড দুটোকে। এরকম সব ব্র্যান্ডেড জিনিসের জন্য মানুষজন বেশ উতলা এবং মুগ্ধ সে দেশে। কোনো আঠের বছর বয়সীর নজর এড়ায় না অশীতিপরের গায়ে লেপ্টে থাকা সানেল ঝোলাটি। তেমনই একটা কোচ ব্যাগ কাঁধে নিলে যেন গাম্ভীর্য বাড়ে মেয়েদের, সব বয়সী মেয়েদের। মজার কথা হলো এই যে যে কোচ কোম্পানির বিশেষ কাপড়ের ব্যাগের জন্য ইউনাইটেড স্টেট্সের নানান বয়সী মহিলাদের মনে এত কদর সেই কাপড় দিয়ে কেষ্টোপুরের রিকশাওয়ালা রিকশার হুড বানিয়েছে! রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘এই কাপড় পেলেন কোথায়?’’ তিনি বললেন, ‘‘কারখানায়। কাপড়টা বড়ো ভালো না?’’

তাছাড়া আজকাল সব্বাই মাইকেল কহ্‌রস্ ব্যাগের জন্য মরিয়া। কোচ আর মাইকেল কহ্‌রস্ ব্র্যান্ডের জুতোও বেশ প্রসিদ্ধ। তা বাদে রয়েছে গুচি, গেস, গ্যাপ। এগুলো জনসাধারণের ব্র্যান্ড, তা বাদে আছে হলিউডের রোডিও ড্রাইভ জুড়ে সারবদ্ধ ডিজাইনারদের আস্তানা।

সেসব আস্তানায় যেতে গেলে ডিজাইনারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে। সেখানে যেমন শাহরুখ খানের ব্যবহৃত দোলচে-গাবানা আছে, তেমনই আছে বারাক ওবামার ডিজাইনার বিজন-এর দোকান। সানেল, গুচি, গেস তো আছেই। আছে ডায়র। আবার ডায়রে ডিজাইনারের চাকরি ছেড়ে নিজের ব্র্যান্ড বানিয়েছিলেন যে সেন্ট আইভস্ তাঁর শোরুমও। সেন্ট আইভস্কে ফ্যাশন দুনিয়ার আভাঁ-গার্দ বলা হয়।

তার মানে কী ইউনাইটেড স্টেটসের পথে ঘাটে সব্বাই ব্র্যান্ডেড জিনিস ব্যবহার করে? হ্যাঁ বটে, না-ও বটে। কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সেখানে ধোপদুরস্ত স্যুট পরা মানুষ আর দেওয়ালে লাগানোর রঙের ছোপ লাগা ওভার-অল পরা মানুষ এক টেবিলে মুখোমুখি বসে চা খেতে পারে। প্রেসিডেন্টও কোকাকোলা খায়, সাবওয়েতে রাত কাটানো পথবাসীও তাই। কলের জল এত শুদ্ধ যে সব্বাই খেতে পারে, সব্বাই খায়।

শুদ্ধ বলতে মনে পড়ল। পেন্সিলভ্যানিয়ার পিটস্বার্গ শহরটা দুটো নদীর মিলনস্থলের দ্বীপগুলো জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে। একটা নদীর নাম অ্যালেঘেনি, আরেকটার নাম মনোগাহেলা। অ্যালেঘেনি শুধু নদীর নাম নয়, পাহাড়ের নাম, জঙ্গলের নাম, এমনকি পিটস্বার্গ শহরটা যে কাউন্টিতে তারও নাম। সে যা হোক অ্যালেঘেনি আর মনোগাহেলা মিশে গিয়ে বয়ে গেছে ওহায়ো নদী হয়ে, যেটা আবার মিসিসিপি নদীতে মিশেছে। যেখানে ওহায়ো নদীর শুরু তার কাছেই এক পাহাড়ের মাথায় চড়া যায় ইনক্লাইন নামের রেলগাড়ি চেপে। ইনক্লাইন হলো পাহাড়ের ঢাল বরাবর পাতা রেললাইন। তার গা বেয়ে গুড়গুড় করে ওঠে আর নামে বাক্সের মতো গাড়ি, এক খাড়া ঢাল বেয়ে।

এই ইনক্লাইনটা এখন পেন্সিলভ্যানিয়ার পিটস্বার্গ শহরের পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণগুলোর একটা। কিন্তু এই রেললাইনটা আসলে ছিল পাহাড়ের কয়লা খনির আনাচ-কানাচ থেকে তুলে আনা কয়লার খন্ড আর তাল এক তলা থেকে আরেকতলায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য! কয়লাখনি বন্ধ হয়ে যেতে, পরিত্যক্ত খনির মাটির স্তূপে গাছ পোঁতা হয়েছে। এখন আর ইনক্লাইনের গ্রীষ্মকালের সবুজঘেরা ছবি দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না যে অর্ধশতক আগেও জায়গাটা ভয়ানক বিশ্রী, খাবলানো খোঁদলওয়ালা পোড়ো কয়লাখনি ছিল।

চোখ জুড়োনো সবুজ দেখা যায় হাইওয়ের দুমুখো ট্রাফিকের বিভাজিকাতেও। প্রায় এক হাইওয়ে পরিমাণ এলাকা নিয়ে বিভাজিকাগুলো তৈরি করা হয় কোথাও কোথাও, যেমনটা লেখা থাকে আর্বান ফরেস্ট্রি ম্যানুয়ালে, ঠিক তেমনটিই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় অ্যাভেনিউ প্ল্যান্টেশনের ব্যবস্থা! পেন্সিলভ্যানিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে এই বিশাল বিভাজিকাগুলি ভর্তি গাছে। গ্রীষ্মকালে এগুলো দেখায় ঘনবনের মতো। শুধু এই বনগুলো নয়, পাড়ায় পাড়ায় যতটুকু বন থাকে, সেখানেই হোয়াইট টেল হরিণেরা দল বেধে বাস করে। গ্রীষ্মের সন্ধেবেলা প্যাটিওতে পা-ছড়িয়ে বসে থাকলেই দেখা যায় হরিণ বা হরিণ পরিবার খসখস করে ঘাস খাচ্ছে কয়েক হাত দূরে। আবার শীতকালে জঙ্গলে গাছের সব পাতা ঝরে যায়, ঘাস বরফে ঢেকে যায় বলে, হরিণেরা হানা দেয় পাড়ার সেই সব বাড়িতে যেগুলোর লন থেকে বরফ সাফ করে রাখা থাকে। ভারি মজা লাগে ক্রিসমাসের সময় এই দেখে যে আলো-আঁটা লোহার ফ্রেমের হরিণের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সত্যিকারের হোয়াইট টেইল!

ক্যান্সাস আর টেক্সাসে হরিণ ছাড়াও দেখা মেলে খরগোশের। কাঠবেড়ালিরা বেশ বড়োসড়ো মাপের হয়। তারা মুখের সামনে দু'পা জড়ো করে নমস্কার করার ভঙ্গিতে কুপকুপ করে খেতে থাকে। সে ইউনাইটেড স্টেট্সের প্রেসিডেন্টের আপিস আর বাড়ি হোয়াইট হাউস হলেও তাই, আবার ইস্কুলের উঠোন হলেও তাই। এক দুপুরে দেখি, একটা কুপারস্ হক সোঁ করে মাটিতে নেমে এসে উড়ে গেল ছাদের ওপর। নখে তার গাঁথা একটা কাঠবেড়ালি। হয়ত আরও দু-চারটে কাঠবেড়ালির সাথে নখে আঁটা কাঠবেড়ালিও, একটু আগেও, ঐ মেপল গাছের নিচে মেপলের বীজ খাচ্ছিল কুপকুপিয়ে...

পাহাড়ের কান্না মেঘনা নদী

মীম নোশিন নাওয়াল খান

ভারতে অনেক পার্বত্য অঞ্চল আছে। সেসব জায়গায় অনেক পাহাড়। হিমালয় পর্বতমালার নাম তো নিশ্চয়ই জানো? হিমালয় অনেকগুলো নদীর মা।

কিন্তু সব নদী হিমালয়ের মেয়ে নয়। যেমন ধরো মেঘনা নদী। মেঘনা নদীর জন্ম কীভাবে জানো?

ভারতের আসামে রয়েছে লুসাই পাহাড়। খুব সুন্দর সেই পাহাড়। অনেক অনেকদিন আগের কথা। একদিন লুসাই পাহাড়ের সাথে আকাশের খুব ঝগড়া হল। আকাশ বলল, সে পাহাড়ের চেয়ে বড়। তার গায়ে অনেক মেঘ ভেসে বেড়ায়, পাখি উড়ে যায়, সূর্য ওঠে, চাঁদ-তারাদের খেলা হয়। তাই সে-ই বেশি সুন্দর।

আর পাহাড় বলল, মোটেই না। আমিই বেশি সুন্দর। আমি কত উঁচু, কী বিশাল, আমার সৌন্দর্য উছলে পড়ে।

এই নিয়ে আকাশ আর পাহাড়ের ঝগড়া লেগেছিল। লুসাই ছিল খুব অভিমানী মেয়ে। ঝগড়া করতে করতে সে কেঁদে ফেলল।

সে তো বিরাট পাহাড়। তাহলে তার চোখের পানি কতখানি হবে ভাবো? তার চোখের পানি গড়িয়ে তার গাল বেয়ে সমতল ভূমিতে নেমে এল। এভাবে তার কান্নায় তৈরি হল একটা নদী। সেই নদীর নাম "বরাক।"

লুসাই পাহাড় কান্না থামাল না। কাঁদতেই থাকল। তার চোখের পানিও গড়িয়ে আরো দূরে যেতে থাকল। তাই বরাক নদী ছুটতে ছুটতে চলে এল আসামের শেরপুরে। এখানে এসে আবার নদী চলার পথে বাধা পেল। তাই দুই ভাগ হয়ে আবার চলতে লাগল। এই দুটো ভাগ হচ্ছে সুরমা আর কুশিয়ারা।

সুরমা আর কুশিয়ারা কুলকুল করে বইতে বইতে ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে এল। সিলেট দিয়ে তারা বাংলাদেশে ঢুকে পড়ল। তারপর সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলার সীমান্তে এসে তারা আবার একসঙ্গে হয়ে গেল।

তখন বাংলাদেশের মানুষ দ্বিধায় পড়ে গেল। একসাথে হয়ে যাওয়া নদীটাকে তারা কী নামে ডাকবে? সুরমা না কুশিয়ারা? তাই তারা ঠিক করল, নদীটার একটা নতুন নাম দেবে। নদীটার নতুন নাম দেয়া হল "কালনি।"

লুসাই পাহাড় তো কেঁদেই চলেছে। তাই কালনি নদী, মানে পাহাড়ের চোখের পানি গড়াতেই লাগল। বইতে বইতে সে এল ভৈরব বাজারের কাছে। এখানে এসে কালনির সঙ্গে দেখা হল পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের। তারা দুজন একসঙ্গে হয়ে একটা নদী তৈরি করল।

ব্যস! বাংলাদেশের মানুষগুলো আবার দ্বিধায় পড়ল। এই নদীটাকে কী নামে ডাকা যায়? তখন তারা নদীটার নাম দিল "মেঘনা।"

মেঘনা নদী এঁকেবেঁকে চলতে লাগল। দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে সে চাঁদপুরের কাছে পদ্মা নদীতে গিয়ে মিশল। এই যে দুটো নদী মিশে গেল, এই জায়গাটা আবার ইলিশ মাছের খুব পছন্দ হল। প্রতিবছর সমুদ্র থেকে ইলিশ মাছ মেঘনা নদীতে আসে ডিম পাড়তে। কেন জানো? কারণ মেঘনা খুব লক্ষ্মী নদী। সে কাউকে বকা দেয় না। তাই ইলিশ মাছ এখানেই নিরাপদ আশ্রই খুঁজে নিল। সেজন্যই মেঘনার ইলিশ সবার খুব প্রিয়।

কিন্তু মেঘনা তো থেমে থাকতে পারল না। লুসাই পাহাড় যে কেঁদেই যাচ্ছে। সে আরো দক্ষিণে চলতে লাগল। নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ভোলা দ্বীপের মধ্যে দিয়ে সে চলতে লাগল। এরপর সে চার ভাগে ভাগ হয়ে চারটা পথে চলতে লাগল। তেঁতুলিয়া, শাহবাজপুর, সন্দ্বীপ ও হাতিয়া- এই চারটা জায়গার মোহনা দিয়ে মেঘনা সোজা আছড়ে পড়ল সাগরের বুকে।

যতক্ষণে সে সাগরে গিয়ে মিশেছে, ততক্ষণে সে অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে। তার দৈর্ঘ্য ১৫৬ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩৪০০ মিটার। লুসাই পাহাড়ের চোখের পানি মেঘনা হয়ে উঠল বাংলাদেশের গভীর এবং প্রশস্ততম নদী। সুরমাসহ তার দৈর্ঘ্য হয়ে গেল ৬৫০ মাইল!

সুরমা

মেঘনা নদী সবার খুব প্রিয় হয়ে উঠল। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে মেঘনা নদীর উপর মেঘনা-গোমতী সেতু তৈরি করা হল। মেঘনা হয়ে উঠল এ দেশের অন্যতম প্রধান নদী। জেলেরা তার বুকে নৌকা ভাসাল, কবি-সাহিত্যিকরা তাকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করলেন। মেঘনা হয়ে উঠল সবার আদরের মেয়ে।

কিন্তু মজার কথা কী জানো? সেই যে অনেক অনেকদিন আগে লুসাই পাহাড় কাঁদতে শুরু করেছিল, সে কিন্তু এখনও কান্না থামায়নি। সে এখনও কেঁদেই যাচ্ছে। আর তার চোখের পানি এই বরাক নদী হয়ে মেঘনা নদীর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশছে। মেঘনা নদীর বুকে যে পানি টলমল করে, সেটাই লুসাই পাহাড়ের কান্না। পাহাড়ের কান্না সবার প্রিয় নদী মেঘনা হয়ে বয়ে চলেছে নিরন্তর। লুসাই পাহাড়ের কান্না কবে থামবে, কেউ জানে না। কিন্তু সবাই চায়, পাহাড়টা কাঁদতেই থাকুক। কেন জানো? কারণ মেঘনা নদীকে সবাই খুব ভালোবাসে যে!

কানাডার এক জলার ধারের মাটিতে কয়েকদিন ধরে পড়েছিল অসুস্থ বিশাল এক বল্ড ঈগল। সিসাজনিত বিষে আক্রান্ত ঈগলটিকে মাসখানেক ধরে চিকিৎসা করে সুস্থ করে আবার আকাশে তার নিজের সাম্রাজ্যে ফিরিয়ে দিয়েছিল ব্রুকফিল্ডের কবিকুইড ওয়াল্ডলাইফ রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টারের কর্মীরা। জানিয়েছেন ***অরিন্দম দেবনাথ***

আরে ওটা কী? জলকাদা মাখামাখি হয়ে অনেক দূরে কিছু একটা পড়ে আছে না জলার ধারে? চমকে গেলেন কানাডার, নোভা স্কোটিয়া (Nova Scotia) প্রদেশের পিকটো কাউন্টির *(Pictou County)* বাসিন্দা পিট মারিনার। একটু কাছে গিয়ে দেখলেন আরে সত্যিই তো, মনে হচ্ছে একটা বড় পাখি পড়ে আছে মুখ থুবড়ে!

পিট মারিনার এগিয়ে চললেন পাখিটার দিকে। তাঁর সাড়া পেতে উড়ে গেল পাখিটা। তারপর ফুট পঁচাত্তর মত দূরত্ব মাটি ঘেঁষে উড়তে না উড়তে মুখ থুবড়ে কাদা মাটিতে পড়ল সে।

না। মারিনারের কোন ভুল হয় নি। ওটা একটা বল্ড ঈগল। দীর্ঘদিন ধরে পশুকল্যাণ কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার সুবাদে মারিনার বুঝতে পারলেন ঈগলটা অসুস্থ। মারিনার আবার এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে, ঈগলটা আবার খানিক উড়ে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল মাটির ওপর। পূর্ণ বয়স্ক বিশাল ঈগলটাকে যে এভাবে ধরা যাবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল মারিনারের কাছে। ফোন করলেন এক বন্ধু পশু চিকিৎসককে।

চিকিৎসক বন্ধুটি বললেন, “পাখিটাকে ধরে ওটাকে চিকিৎসা করতে হবে।”

“ধরব কী করে?” মারিনার বললেন, “ওটা তো সামনে গেলে উড়ে যাচ্ছে। আর খানিকটা উড়ে গেলে তো ও সামনের জলাতে গিয়ে পড়বে, তখন তো আর ধরতেও পারব না।”

“তা হলে ওটাকে গুলি করে অজ্ঞান করে ধরতে হবে।”

এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। রাত নেমে গেলে আর কিছুই করা যাবে না। বললেই তো আর অজ্ঞান করার গুলি বন্দুক জোগাড় করা যায় না! পশুপ্রেমি মারিনারের কাছে পাখিটাকে ধরাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠল।

চিকিৎসক বন্ধুটি বললেন, “একটা কাজ কর। একটা কম্বল জোগাড় করে পাখিটার ওপর ছুঁড়ে ফেল। তা হলে ওটা আর উড়তে পারবে না। তারপর ওটাকে কম্বল জড়িয়ে রাখ। ঈগলটাকে দু’একবার ওড়াতে পারলে ওটা ক্লান্ত হয়ে আর উড়তে নাও পারে। তারপর দেখ চেষ্টা করে ধরতে পার কি না।”

মারিনারের বাড়ি কাছেই। তিনি একটা কম্বল নিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। তারপর ঈগলটার কাছে যেতে পাখিটা দু একবার ডানা ঝাপটাল ঠিকই কিন্তু আর উড়তে পারল না। ওড়ার ক্ষমতা হারিয়েছে পাখিটা। কয়েকবারের চেষ্টায় মারিনার পাখিটাকে কম্বল বন্দী করলেন। তারপর পাখিটাকে দুহাতে তুলে বাড়ি নিয়ে এলেন। একটা বড় খাঁচা ছিল মারিনারের বাড়িতে। চিকিৎসক বন্ধুর উপদেশ মত ঈগলটাকে কম্বলে মুড়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মারিনার খাঁচাটার কাছে গিয়ে দরজা খুলে কম্বলটাকে সরাতে ঈগলটা খাঁচার মধ্যে উঠে বসল।মারিনার আর দেরি না করে খাঁচাসুদ্ধু ঈগলটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন ব্রুকফিল্ডের কবিকুইড ওয়াল্ডলাইফ রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টারে (Cobequid Wildlife Rehabilitation Centre)।

ঈগলটাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টারের ডাক্তার ও কর্মীরা। এই সেন্টারে অনেক ঈগলকে আনা হয় চিকিৎসার জন্যে, কিন্তু এত বড় ঈগল আগে কোনদিন আসেনি। ছ’কেজি চারশো গ্রাম ঈগলটার! এই মুহূর্তে আরও সাতটা ঈগলের চিকিৎসা চলছে এই রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টারে। কিন্তু এই ঈগলটার তুলনায় সেগুলো এক একটা লিলিপুট।

ঈগলটাকে নিয়ে যাওয়া হল এক্স-রে রুমে। সাধারণত এক্স-রে করার আগে পশুপাখিকে অজ্ঞান করে নিতে হয়। কিন্তু ঈগলটা এত নিস্তেজ ছিল যে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হল না। এক্স-রে করে কিছু পাওয়া গেল না। কোন হাড়গোড় ভাঙেনি। কোন গুলি বা আঘাতের চিহ্নও নেই। ঈগলটার শরীরটা একদম ঠাণ্ডা মেরে শক্ত হয়ে গেছে। রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টারের কর্মীরা দেখলন ঈগলটার পা দুটো উকুনে ভর্তি। নখগুলো কালো হয়ে গেছে। সম্ভবত পাখিটা বেশ কয়েকদিন ধরে ওই কাদা মাটিতে পড়েছিল।

পাখিটার শরীর গরম করার জন্যে পাখিটাকে হিট-ল্যাম্পের তলায় রাখা হল। তারপর

পাখিটার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে পাঠান হল পরীক্ষাকেন্দ্রে।

অসুস্থতার কারণ জানা গেল অচিরেই। রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টারের ডাক্তার যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঠিক। পাখিটার রক্তে অতিমাত্রায় সীসা মিশে রয়েছে। সীসা যে কোন প্রাণীর জন্যে একধরনের স্লো-পয়জন , সেঁকো বিষ। শরীরে প্রবেশ করলে সমস্ত শরীরকে অসাড় করে ধীরে ধীরে সারা শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে দেবে। ফল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

প্রত্যেক বছর এই সেন্টারে চিকিৎসা করাতে যত জন্তুজানোয়ার আনা হয়, তার প্রায় পঁচিশ শতাংশের শরীরে পাওয়া যায় সীসা। সেটা, হয় বন্দুকের সীসার ছড়রা গুলি অথবা জন্তুজানোয়ার গুলো এমন কিছু খেয়েছিল যার শরীরে সীসা ঢুকেছিল।

পাখিদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সীসার উৎস মাছ। মাছ ধরতে গিয়ে যে বঁড়শির ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সীসা থাকে। আর উত্তর আমেরিকার ঈগলদের প্রিয় শিকার মাছ। মাছ ধরতে গিয়ে অনেক মাছ শিকারির বঁড়শি, সুতো ছিঁড়ে চলে যায় বড় বড় মাছের পেটে, আর সেই মাছ একসময় ভেসে ওঠে জলের ওপর। ঈগলের সহজ শিকার হয়ে ওঠে জলের ওপর ভেসে ওঠা মাছ।

আবার শিকারির সীসার গুলি খেয়ে মৃত জন্তুর মাংস অনেক সময় ঈগলের খাদ্যে পরিণত হয়। আর ঈগল এমন একটা পাখি যার শরীরে সামান্য সীসা ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টারের কর্মীরা এক ধরনের রাসায়নিক ধীরে ধীরে ঈগলের শরীরে প্রবেশ করাতে লাগল। এই রাসায়নিকের কাজটাই হল শরীরের রক্ত বা কোষে মিশে থাকা সীসাকে কিডনিতে নিয়ে ফেলা। তারপর কিডনি থেকে ওই সীসার বিষ মূত্রের সাথে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়।

রাসায়নিকটা খুব দ্রুত কাজ করল ঈগলটার শরীরে। পাখিটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। কিছুদিন পর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল সম্পূর্ণ সীসা মুক্ত হয়েছে ঈগলটা।

এবার শুরু ঈগলটাকে আকাশে ওড়ানোর পালা। এতদিন ধরে চিকিৎসা চলার ফলে ঈগলটা খানিক কাহিল হয়ে পরেছিল। ছোট খাঁচা থেকে একটা বিশাল হলঘরের মত খাঁচায় সরানো হল ঈগলটাকে। কয়েকদিন চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকার পর বিশাল দুই ডানা মেলে হলঘরের মধ্যে উড়তে শুরু করল ঈগলটা। কদিন ধরে বড় খাঁচার মধ্যে দাপিয়ে বেড়ানোর পর ঈগলটাকে ছোট

খাঁচায় ভরে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল জঙ্গলে। খাঁচার দরজা খুলে দিলে, ঈগলটা বেরিয়ে এসে রাজকীয় ভঙ্গিতে জেট প্লেনের গতিতে আকাশে উঠে মেঘের দেশে মিলিয়ে গেল। এবার ওর নিজের সাম্রাজ্য নির্বাচন করে সেখানে রাজত্ব করার পালা।

বারাকপুর মডার্ন স্কুলের আপার কেজির ছাত্র পাঁচ বছরের **অভিরাজ দেবনাথ** শুনিয়েছে একটা

লাল কাকের গল্প

সেই ভোরবেলা ঠোঁট দিয়ে জানালার কাচে ঠক ঠক আওয়াজ তুলে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল পাখিটা। এখন আবার সামনের রাস্তার ইলেকট্রিক তারে বসে তারস্বরে ডেকে চলেছে কা কা করে। কাঁহাতক আর সহ্য হয়। হুশ হুশ করে কাকটাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে ছুটে এল টুকু-
"জান বাবা কাকটা আমাকে থ্যাঙ্কইউ ওয়াদা করছে।"
"মানে!"
"আমি একটা গ্রেপস হনুমান মন্ত্র পড়ে কাকটাকে খেতে দিয়েছিলাম।হনুমান মন্ত্র পরা গ্রেপসটা খেয়ে কাকটা এত শক্তিশালী হয়ে গেছিল যে উড়তে উড়তে কাকটা একদম আউটার স্পেসে পৌঁছে গেছিল।

"আউটার স্পেসে ঘুরতে ঘুরতে কাকটার এলিয়েনেদের সাথে মোলাকাত হয়ে গেল। এলিয়েনরা কাকটাকে ওদের ফুটবলের মতো গোল ইউ এফ ওতে তুলে নিল।এলিয়েনদের দেখতে ছিল অনেকটা ক্যাটারপিলারের মত। কাকটা তো অনেক ক্যাটারপিলার দেখছে তাই ওর একটুও ভয় লাগল না। এলিয়েনদের কাছে একটা গ্যাজেট ছিল। গ্যাজেটটা কাকের সামনে রেখে দিল এলিয়েনরা। ওমনি কাকের ভাষা বুঝতে পারল এলিয়েনরা, আর এলিয়েনদের কথাও কাকের কানে কা কা হয়ে পৌঁছতে লাগলো। কাক এলিয়েনদের ফ্রেন্ড হয়ে গেল।"
এলিয়েনরা কাকটাকে বলল "কাক বন্ধু তুমি কি আমাদের তারার দেশ দেখতে চাও?"
কাকটা বলল, "জরুর দেখতে চাই।"
এলিয়েনরা কাকটাকে বলল, "আমাদের তারার দেশে যেতে তো অনেক সময় লাগবে, তুমি এই মেডিসিনটা খেয়ে নাও তাহলে তোমার আর খিদে পাবে না আর আমাদের তারার দেশে না পৌঁছন পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবে।"
বলে একটা লাল রঙের ছোট জেমসের মত ট্যাবলেট কাকটাকে খেতে দিল। কাকটার খুব আনন্দ হল, ওকে আর ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজতে হবে না। এই কাকটা যেই আমগাছটার ডালে বাসা বানিয়ে থাকত, সেখানে মাঝে মাঝেই অন্য কয়েকটা কাক এসে ওর বাসায় রাখা খাবার চুরি করে নিয়ে যেত। কাকটার দুঃখের অন্ত ছিল না।
লাল বড়িটা খাবার পর কাকটার এত ঘুম পেয়ে গেল যে ও মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কাকটার ঘুম ভাঙতে দেখে একটা লাল শক্ত বিছানায় ও শুয়ে আছে। বিছানাটা খুব ঠাণ্ডা। অনেক অনেক বিগ বিগ লাল ক্যাটারপিলার ওকে ঘিরে রেখেছে। এত বড় ক্যাটারপিলার আগে কখনো দেখেনি কাকটা। কাকটা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

ওমনি সামনে রাখা সেই এউ এফ ওর গ্যাজেট থেকে কাকের স্বরে আওয়াজ উঠল, "স্বাগতম দূর সবুজ গ্রহের বন্ধু। তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে।"

কাকটা বলে উঠল "খুব শীত করছে।"

একটা বিশাল বড় ক্যাটারপিলার এসে কাকটাকে ছুঁয়ে দিল। কাকটার রং লাল হয়ে উঠল আর ঠাণ্ডাও ভেগে গেল।

কাকটা ডানা মেলে উড়তে লাগল। উড়তে উড়তে সামনের একটা গাছে গিয়ে বসল। সেই গাছটা দেখতে বিলকুল আমগাছের মতো, কিন্তু লাল রঙের আর বরফের মতো শক্ত আর ঠাণ্ডা । কাকটা যেদিকে দেখে সে দিকেই সব লাল আর লাল।

কাকটার খুব খিদে পেয়ে গেছিল। গ্যাজেটের সামনে উড়ে এসে কাকটা কা কা বলে ডেকে উঠল।

ওমনি অনেকগুলো লাল ক্যাটারপিলার এসে হাজির হল, "বল সবুজ গ্রহের বন্ধু।"

"আমার খুব খিদে পেয়েছে।" কা কা করে বলে উঠল লাল হয়ে ওঠা কাক।

লাল বরফের পাত্রে টিকটিকি লজেন্সের মতো একটা ছোট লাল রঙের ট্যাবলেট নিয়ে এল একটা ক্যাটারপিলার। খাবার দেখেই কাক রেগে গেল, "আমি আর ওই লাল ট্যাবলেট খাব না, আমাকে বিস্কুট দাও, মাংস দাও..."

সেই বিশাল বড় ক্যাটারপিলার, যেটা কাকের গায়ে হাত বুলিয়ে লাল করে দিয়েছিল, সে এসে বলল, "আমাদের লাল তারায় অন্য কোন খাবার পাওয়া যায় না। এখানে কেউ মরে না আবার কোন কিছু জন্মায়ও না। তাই আমাদের কোন খাবার প্রয়োজন হয় না। খাবার ইচ্ছে হলে আমরা ওই লাল বড়ি একটা খেয়েনি। লাল তারায় আমার কয়েকজন ছাড়া আর সবই জমে বরফ হয়ে আছে।"

কাক রেগে গিয়ে বলল "আমি থাকতে চাই না তোমাদের লাল আইস প্ল্যানেটে। আমার সবুজ গ্রহই ভাল। আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

ক্যাটারপিলারটা বলল, "তাই হবে সবুজ গ্রহের বন্ধু। তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসাটা খুব কঠিন। তোমাদের গ্রহ এখান থেকে অনেক আলোক পথ দূরে। আমাদের তারাটাও তোমাদের গ্রহের মত সবুজ ছিল। একদিন অন্য একটা তারা এসে ধাক্কা দিল আমাদের তারায়। ওই প্রচণ্ড ধাক্কায় সব জমে লাল বরফ হয়ে উঠল। আমরা কিছু ক্যাটারপিলার যারা মহাকাশযানে চেপে মহাবিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তারই শুধু বেঁচে গেলাম। চল বন্ধু তোমাকে তোমার সবুজ গ্রহে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

ক্যাটারপিলারের পেছন পেছন কাকও উড়তে উড়তে খোলা দরজা দিয়ে ইউ এফ ওর ভেতর গিয়ে ঢুকল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ইউ এফ ওর জানালা দিয়ে কাক দেখতে পেল লাল তারাটা ক্রমেই ছোট হয়ে মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

ক্যাটারপিলারটা একটা ছোট লাল বড়ি এগিয়ে দিল কাকের দিকে,"বন্ধু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।"

কাকের ঘুম ভাঙতে দেখে, ক্যাটারপিলার ওর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কাককে নড়াচড়া করতে দেখে বলল, "বন্ধু তোমার সবুজ গ্রহ এসে গেছে, বিদায়" বলে ইউ এফ ওর দরজা খুলে দিল।

কাকটা উড়তে উড়তে নেমে এস বসলো ওর বাসাওয়ালা আমগাছে। যেই না বসেছে ওমনি অনেক গুলো কাক কা কা করে চিৎকার করে ওকে কামড়াতে এল। কাকটা প্রাণ বাঁচাতে উড়ে এসে বসলো আমাদের ব্যালকানিতে। কা কা চিৎকার শুনে ব্যালকানিতে গিয়ে দেখি আরে এটা ত আমার বন্ধু কাক। কিন্তু লাল হয়ে গেল কী করে?

কাকটা কা কা করে খুব কান্নাকাটি করছিল। আমি তখন ওকে একটা গ্রেপস এনে হনুমান মন্ত্র পড়ে খেতে দিলাম। গ্রেপসটা খাওয়ার পরই কাকের রঙটা ম্যাজিকের মতো লাল থেকে কালো হয়ে গেল। ভাবছ তো আমি কী করে এত কিছু জানলাম?

বলব না!

শ্রুতিলিখন করেছেন – অরিন্দম দেবনাথ

ধাঁধা

ফের একবার সত্যবাদি মিথ্যেবাদি কেস।

১। সে দ্বীপের লোক হয় সত্যবাদি নয় মিথ্যেবাদি। মাঝামাঝি কিছু নয়। সেখান থেকে ঘুরে ফিরে গিয়ে এক টুরিস্ট তার ভাইপোকে গল্প করল, "দ্বীপে নেমেই এক দ্বীপবাসীর সঙ্গে দেখা। সে লোক একগাল হেসে বলে , 'আমি একজন মিথ্যেবাদি।'"
তা বল দেখি টুরিস্ট সত্যি বলেছে না মিথ্যে বলেছে?

২। আসলে যা ঘটেছিল তা হল, দ্বীপে নেমেই তার সঙ্গে তিনজন দ্বীপবাসীর দেখা হয়েছিল। তাকে দেখেই তাদের একজন দাঁত বের করে হেসে বলে, "আমরা সবাই মিথ্যেবাদি।" অমনি তাদের আরেকজন বলে, "আমাদের মধ্যে কেবল একজন সত্যবাদি।"

৩। শুরুতে টি শেষে টি মধ্যে টি, মধ্যে টি নেই। কী বল দেখি?

৪।
ল্যাজে বিষ ইংরিজি পিত্তি,
মাথায় চেপেছে ক্ষ্যাপা পাবলিক,
মাঝে আছি আমি, যদি খুঁজে পাও,
ল্যাজামুড়ো নিয়ে তুমি যেথা যাও
সংযোগ সাথে চলে ঠিকঠিক

৫। সকালে আকাশে ওড়ে, দুপুরে চানা খায়, সন্ধেবেলা পা ছড়িয়ে কাঁদে আর রাত্রে গাছে ঝোলে? কোন জন্তু জানো?

ড্রুডল

কীসের ছবি হতে পারে এটাঃ

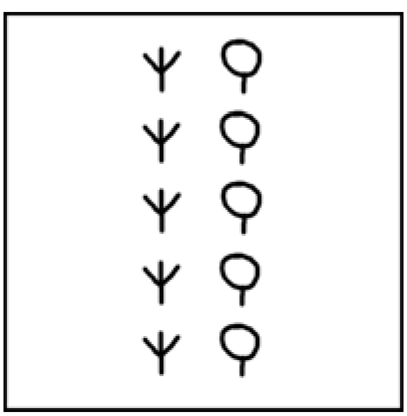

অবিশ্বাস্য

ব্যাঙের ছাতা মানেই কি বিচ্ছিরি নাকি? তাদের মধ্যেও স্বর্গীয় রূপের সন্ধান মেলে। এই দেখ আধ ডজন স্বর্গীয় অবিশ্বাস্য মাশরুম। আরো আছে। ইচ্ছে হলে খুঁজে নিওঃ

কীসের ফটো

এরা কীসের ফটো বল দেখি

দেশলাইকাঠির খেল

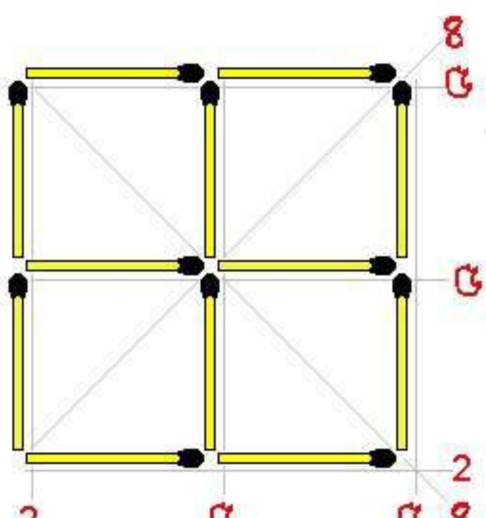

সঙ্গের ছবিটার প্রত্যেক কর্ণ , রো ও কলাম ধরে ধরে দেশলাইকাঠির কালো মাথা গুনলে তুমি ছবিতে দেখা সংখ্যাগুলো পাচ্ছ।
এবারে কাঠিগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে প্রত্যেক রো-তে ৪ টে করে কালো মাথা, প্রত্যেক কলামে ৪ টে করে কালো মাথা আর প্রত্যেক কর্ণে ৫টা করে কালো মাথা থাকে। তোমার সমাধান কিন্তু একেবারে এইরকমই একটা বর্গাকার ছবি হতে হবে।

গত সংখ্যার উত্তরঃ

প্রথম ধাঁধাঃ ১৫ আর ১৬ পাতা সাধারণত একই পাতার এপিঠ ওপিঠ হয়। অতএব তাদের মধ্যে কিছু রাখা যাবে না।
দ্বিতীয় ধাঁধাঃ রোমান নিউমেরাল ব্যবহার করেছে সে। তাতে ৫০০ মানে =**D**, ৫ মানে=**V** ১০০ মানে= **C** । এইবার ভেবে দেখ।
চতুর্থ ধাঁধাঃ ডানদিকে। (আবাঁদিকে হলে দরজা দেখা যেত)
পঞ্চম ধাঁধাঃ ৪৫ (১০ জন বাংলা জানে না, ২০ জন হিন্দি জানে না, ২৫ জন ইংরিজি জানে না। তাহলে তিনটে ভাষাই জানে না এমন লোকের সংখ্যা সবচেয়ে অধিকপক্ষে ৫৫ জন হবে। তাহলে তিনতে ভাষাই জানে এমন কর্মীর সংখ্যা কমপক্ষে ৪৫।)

ড্রুডল ১-স্ট্যাচু অব লিবার্টির মাথার কাছ দিয়ে সূর্য চলে যাচ্ছে। ২। ক্রুজ শিপ ওপর থেকে দেখা

কীসের ফোটোঃ হাকার্ল। আইসল্যান্ডের এই জনপ্রিয় খাবার আসলে তিনমাস ধরে পচানো কাঁচা হাঙরের মাংস। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধওয়ালা এ খাবার বড় বড় টুকরোয় যেমন বেচা হয়, তেমনই আবার ছোটো ছোটো কাঠির মাথায় ছোটো টুকরো গেঁথে মাংসের ললিপপ হিসেবেও বিক্রি করা হয়।
মগজ ধোলাই
১) কলকাতা ডার্বি(মোহন-ইস্ট দ্বৈরথ) ২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ
৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভানুসিংহের পদাবলী ৪) ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, শঙ্খ ঘোষ ৫) লেডিকেনি(ইনি লেডি ক্যানিং)

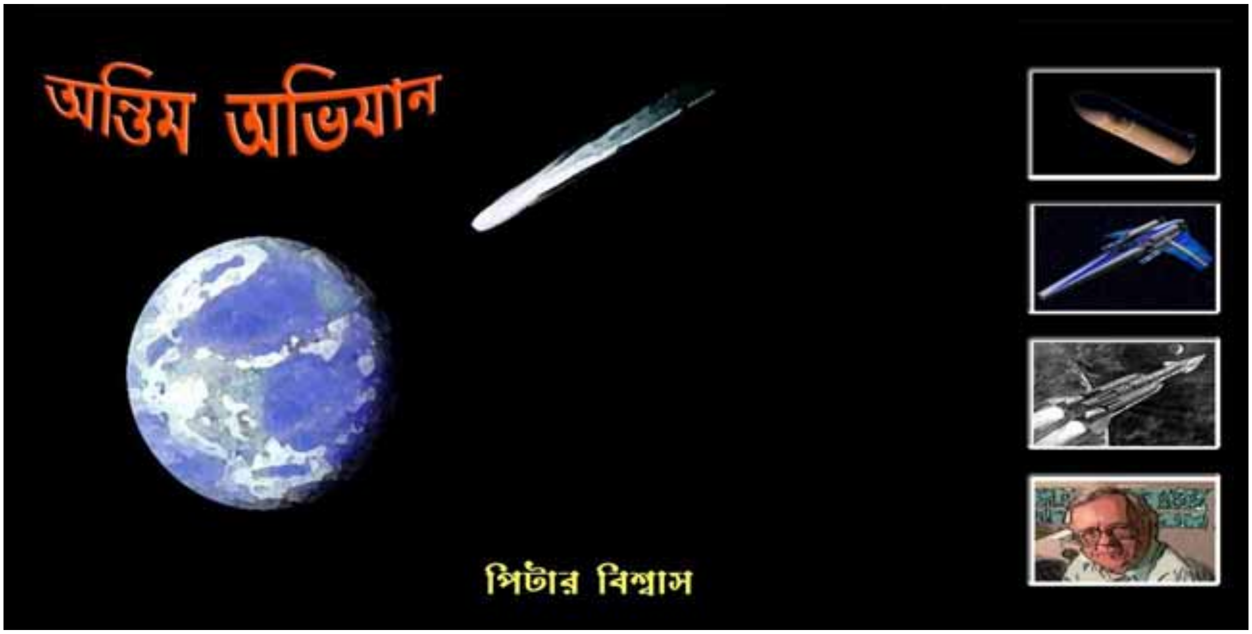

ব্যস্ত এই এয়ারওয়ে নয়াদিল্লি থেকে বের হয়ে এসে যশপাল গবেষণাকেন্দ্রের ক্যাম্পাসের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে মধ্যভারতের দিকে। ভাসমান গাড়িগুলো অন্ধকার বাতাস কেটে তিরবেগে ছুটে যায় তার বুক চিরে। তাদের উন্নত ন্যাভিগেশান এখন পৃথিবীকে ফের ফিরিয়ে দিয়েছে তার রাতের প্রাকৃতিক অন্ধকার। ২০৮৮ সালের প্রকৃতিসংরক্ষণ আইনের ১৮৫ তম ধারা, কিছু নির্দিষ্ট এলাকা বাদে রাতের প্রাকৃতিক আলো আঁধারিকে ফিরিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর বাকি সমস্ত অঞ্চলে। মাটির ওপর থেকে সভ্যতার কৃত্রিম চিহ্নদের সরিয়ে ফেলবার কাজও এখন প্রায় শেষ। পৃথিবী ফের ফিরে গেছে তার গাছপালায় ছাওয়া আদিম স্বর্গের রূপটাতে।

আকাশে ঘন মেঘ ছিল। তার অন্ধকারের আড়ালে, মূল এয়ারওয়ে ছেড়ে যশপাল গবেষণাকেন্দ্রকে ঘিরে থাকা জাতীয় উদ্যানের মাটির কাছাকাছি ভাসতে থাকা ছোটো যানটা পথচারী যানদের স্ক্যানারে ধরা পড়লেও সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি বিশেষ। জায়গাটা ভারী সুন্দর। দিনে বা রাতে তার বন্য সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য মাঝেমাঝেই কোন ভাবুক মানুষ সেখানে যান থামিয়ে একটু সময় কাটিয়ে যান।

ছোটো যানটার তিনজন আরোহী তাদের একজনের হাতে ধরা পর্দাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। সেখানে ধূসর পটভূমিকায় একটা ছোটো সাংকেতিক শব্দের পাশে একটা উজ্জ্বল লাল আলোর বিন্দু দপদপ করছিল।

"অবশেষে! পোকাটা তাহলে এখানেই--" সেদিকে চোখ স্থির রেখে যানের চালক কথা বলে উঠল।

"তাহলে আমার অনুমানটাই শেষপর্যন্ত ঠিক হল গ্রোভার," যানের যাত্রীদুজনের মধ্যে একজন চাপা গলায় দ্বিতীয়জনকে বলল, "যশপাল ইনস্টিটিউট থেকেই তাহলে-"

"নিজের পিঠ চাপড়ানোর কাজটা অন্য সময়ের জন্য তুলে রাখ জালাল," গ্রোভারের জবাবে উত্তেজনার ছোঁয়া ছিল, "হাতে সময় বেশি নেই। যে আইডেন্টিফিকেশান নম্বরের কমিউনিকেটর থেকেই প্রোগ্রামটা বুদ্ধের মস্তিষ্কে গিয়েছে সেটা যে এখনো এই ইনস্টিটিউটেই রয়েছে সেটা আমাদের সৌভাগ্য। এবার বাকি রইল কমিউনিকেটারটা যাকে ইস্যু করা হয়েছে, তার খবর বের করা।"

বলতেবলতেই তার হাতে একটা অস্ত্র উঠে এসেছে। সেটাকে একবার পরীক্ষা করে নিয়ে ফের পোশাকের মধ্যে রেখে দিয়ে সে বলল, "চল। এদের রিসেপশনের টার্মিনাল থেকে-"

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই যানের চালক তাকে মাটির বুকে নামিয়ে এনেছে। তারপর সামনের বাক্স থেকে দুটো অস্ত্র তুলে নিয়ে তার একটা বাড়িয়ে ধরেছে জালালের দিকে।

সেটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ফের ফিরিয়ে দিল জালাল। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলা করে যাচ্ছিল, "রিসেপশানের টার্মিনালের দখল নিলে কোন না কোন বিপদসঙ্কেত বাজবেই। তারপর বেশিক্ষণ সময় পাব না আমরা। ইঁদুরটাকে ধরবে কেমন করে?"

"ভয় পাচ্ছ জালাল?" গ্রোভারের ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি খেলে যাচ্ছিল, "এটা একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তিনতিনটে ব্লাস্টারের সামনে কিছু বইপোকা-"

"ভুল গ্রোভার। ভুলে যেও না, প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত গবেষণা যশপালের প্রধান কাজ। এদের নিরাপত্তাবিভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী হবার কথা কিন্তু," জালাল হাসছিল, "টের পেয়ে গেলে একটা আধাসামরিক রক্ষিবাহিনীর সামনে দশ মিনিটও টিকব না আমরা।"

"ওই দশমিনিটের মধ্যেই যা করবার-"

"সেটা বিপজ্জনক হবে।"

"বিপজ্জনক জেনেই তো এ পেশায় এসেছি আমরা জালাল। এই মিশনের গুরুত্ব আমাদের প্রাণের চেয়ে-"

"অনেক বেশি," মৃদু হাসল জালাল, "আর ঠিক সেইজন্যই ব্যর্থ চেষ্টা করে নাহক প্রাণটা দেবার বদলে মিশনটাকে সফল করবার জন্য একটু বুদ্ধি ব্যবহার করাটাই ভালো নয় কি? মনে হয় তাতে অ্যাডমিরাল লালপিওতে খুশিই হবেন।"

লালপিওতের নামটা গ্রোভারের উত্তেজনায় একটু রাশ টানল বোধ হয়। একটু থেমে থেকে সে বলল, "কীভাবে করতে চাইছ কাজটা?"

"বলছি। হ্যাকিং আমার পেশা ছিল তা জানো বোধ হয়। আমার দক্ষতায় যথেষ্ট ভরসা না থাকলে অ্যাডমিরাল লালপিওতে আমাকে পার্থিব জেল থেকে বের করে নিয়ে মঙ্গল উপনিবেশের তথ্য উপদেষ্টার পদে বসাতেন না। আর এ অভিযানটাতেও তোমার সঙ্গে আমায় পাঠাতেন না। চেয়ারটা ছাড়ো। আমায় টার্মিনালে বসতে

দাও। এ পথে আসবার আগে, ছেলেবেলায় যখন সরকারি প্রোগ্রামারের চাকরি করতাম তখন যশপালের ডেটাবেস তৈরির টিম-এ ছিলাম। ও ডেটাবেসের হাড়হদ্দ আমার জানা।”

অন্ধকারে নিঃশব্দে আসন বদলাবদলি করে যানের গণকের টার্মিনালে এসে বসল জালাল। পর্দার সামনে তার আঙুলের নড়াচড়ার নির্দেশে গড়ে উঠছিল একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম। কয়েকমিনিটের মধ্যে রাতের অন্ধকার বেয়ে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা গবেষণাকেন্দ্রের তথ্যকেন্দ্রের গণকের মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে ভেসে গেল তার তৈরি একটা জীবাণুপ্রোগ্রাম—

--তাদের সামনের পর্দায় ভেসে উঠছিল একটা তরুণ মুখ।তার একপাশে তার সম্পূর্ণ পরিচয়—তার রুম নম্বর—

“যাওয়া যাক এবার।”

“আর কয়েকমিনিট গ্রোভার।” বলতেবলতেই তথ্যকেন্দ্রের অন্য একটা ফোল্ডারের ঠিকানায় আঙুল ছোঁয়াল জালাল। সেখানে ভেসে ওঠা তিনজন কর্মীর পরিচয়তথ্যগুলো একত্র করে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে।

তারপর পর্দার দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় নির্দেশ দিল, “প্রোগ্রাম সংকেত গামা ২৭৬৫।”

কিছু নির্দেশ ফুটে উঠেছে পর্দায়। স্ক্যানারের নিচে নিজের হাতটা রেখে সেগুলো ধরে ধরে জালাল বলে চলেছে তখন—“নাম হেইন্স অ্যাকোরা। বয়স সাতচল্লিশ। পেশা সাফাইকর্মী-”

“আমি তৈরি। এবারে তোমার হাতটা এখানে রাখ গ্রোভার,” বলতেবলতেই উঠে দাঁড়িয়ে গ্রোভারকে স্ক্যানারের সামনে এগিয়ে দিল জালাল। মৃদু গলায় সে তখন বলে চলেছে গ্রোভার নামে মানুষটার নতুন পরিচয়—নাম রঞ্জিত পল। পেশা সাফাইকর্মী---”

খানিক বাদে যানটা থেকে নেমে আসা তিনজন মানুষ পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল ইনস্টিটিউটের প্রধান দরজায়। একে একে তিনটে হাত তারা মেলে ধরল প্রহরী গণকের লেন্সের তলায়।

“রাত্রির শিফটে স্বাগত সাফাইকর্মী অ্যাকোরা, পল ও চ্যাং,” গণকের যান্ত্রিক, সুরেলা গলা কথা বলে উঠল এবার, “সাফাইয়ের এলাকা বলুন।”

“রিসার্চ স্কলার হোস্টেল, চতুর্থ তল,” গ্রোভার মৃদু গলায় জবাব দিল।

******

“সাড়ে আঠাশ ডিগ্রি উত্তর—পঁচানব্বই ডিগ্রি পূর্ব—” তার স্বপ্নে বারংবার ঝনঝন করে শব্দদুটো বেজে উঠছিল। একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা বেলুনে উড়ে চলেছে সে। তার সঙ্গে আরো কেউ একজন আছে। পায়ের তলায় গুম গুম শব্দ তুলে ছুটে যাওয়া পাহাড়ি নদীটার ভেতরের একটা দ্বীপের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে সে স্থানাঙ্কদুটো আবৃত্তি করে চলেছিল বারবার।

ছুটন্ত বেলুনের তলার দোলনায় দাঁড়িয়ে ভিজে হাওয়ার ঝাপটা লাগছিল তার চোখেমুখে। পেছনদিকে ঘুরে মানুষটার দিকে একবার তাকাল সে। তার মুখটা ধোঁয়ায় ঢাকা। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে। হঠাৎ করে কোন এক ভুলে যাওয়া শৈশবে ফিরে গেছে তার শরীর। তার ভয় লাগছিল, উত্তেজনা হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। বেলুনটা নামছে এবার তিরবেগে ছুটে চলেছে দীপটার ওপরে মাথা জাগিয়ে থাকা একটা গুহার অন্ধকার মুখ লক্ষ করে—

“সাড়ে আঠাশ ডিগ্রি উত্তর—পঁচানব্বই ডিগ্রি পূর্ব—” ফের একবার বলে উঠল ধোঁয়ায় মুখ ঢাকা মানুষটা।

এইবার চমকে উঠল ক্রিস। তার মনে পড়ে গেছে। সুইফট টাট্‌ল্‌ এর আঘাতবিন্দুর স্থানাঙ্ক এরা! কিন্তু –এ কে?

--ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটা গভীর নির্জন গুহার মেঝেতে হাঁটছে সে। তার একপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অন্ধকার পাতালনদীটার জল ছলছল শব্দ তুলছিল।তার সামনে অন্ধকার মেঝের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে– ওটা কী? ওর পরিচয় সে জানে–কিন্তু–

--ঘন্টি বেজে উঠেছে–বিপদজ্ঞাপক ঘন্টা–প্রক্সিমিটি সেনসর সাক্ষাত মৃত্যুর উপস্থিতি টের পেয়ে মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে হঠাৎ। গুহার নৈঃশব্দ খানখান হয়ে যাচ্ছিল সেই শব্দে–তাকে ঘিরে ভেঙেচূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল গুহার অন্ধকার–হারিয়ে যাচ্ছে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা চির চেনা অথচ একদম অচেনা সেই মানুষটা–তুমি–আ-আপনি কে–”

ঘন্টার শব্দটা একটানা বেজে যাচ্ছিল তার কানের কাছে। চোখ মেলে হালকা আলোয় চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল ক্রিস। অনেকটা উঁচুতে সুনীলের বিছানাটা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। পাশে টেবিলের ওপর থেকে তার বাজারটা শব্দ তুলছিল একটানা। ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে রাত তিনটে বেজে চার। এত রাতে–ভিজিটর? কে এল তার কাছে?

ক্রমশ

রাতুল আকাশকে নিয়ে সিংহের পিঠে চেপে বসল। সিংহ বলল, "চেপে ধরে বসো।" তারপর ডানা ঝাপটে শূন্যে ডিগবাজির মত খেয়ে উড়তে শুরু করল। রাতুল একদিকে ধরে রেখেছিল আকাশকে। আরেকদিকে সিংহের ঘাড়। যখন সিংহ মাটি থেকে শূন্যে ওঠে তখন ভয়ে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রাতুল প্রথমে ভয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলেও পরে যখন সে চোখ খুলল তখন বিস্ময়ে তার ভয় দূর হয়ে গেল। এক জায়গায় কয়েকটি মায়া হরিণ উড়ে বেড়াচ্ছে। তার পাশেই নাম না জানা সাদা, নীল ও হলুদ বর্ণের কয়েকটি প্রাণী খেলছে উড়ে উড়ে। নিচে দেখা গেল এক জায়গায় নামছে ঝরনা তাতে পানির রঙ গাঢ় নীল।

রাতুল বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখছিল তখন হঠাৎ করেই সিংহ খুব দ্রুতবেগে নেমে যেতে লাগল। আবার রাতুল চোখ বন্ধ করল ভয়ে। একটি হলুদ বনের ঝোঁপের পাশে এসে নামল সিংহ। নেমে বলল, "সামনে একটু গেলেই পাবে পীযূষ নদ। ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের নিয়ে যাই সেখানে। কিন্তু মেছো কুমিরকে আমি বড্ড ভয় পাই।"

রাতুল সিংহের পিঠ থেকে নেমে বলল, "তুমি আমাদের জন্য যা করেছ তাই অনেক। আমরা এখন একাই যেতে পারব। তোমাকে ধন্যবাদ।"

সিংহ হাসিমুখে বলল, 'তোমাদেরও ধন্যবাদ। বিদায়।"

সে বাতাসে একটি ডিগবাজি খেয়ে উড়ে চলে গেল। রাতুল তখন হাতের লাঠিটা নিয়ে আকাশকে ধরে হাটতে লাগল সামনে। প্রায় দশ পনের পা যাওয়ার পর সে দেখতে পেল ছোট একটি নদী একেবেকে চলে গেছে। নদীর স্বচ্ছ জলরাশি দেখে রাতুল দ্রুত এগোতে লাগল। নদীতে পৌছে সে দেখতে পেল পাড়ে বসে আছে এক বিশাল কুমির।

এর আকার এত বড় যে সিংহটাকেও একবারে খেয়ে ফেলতে পারবে মনে হচ্ছে। রাতুল ভয় পেল কারণ তার সাথে লাঠিটা ছাড়া আর কোন অস্ত্রও নেই।

কুমির হয়ত তাদের দেখেছিল। তাই বিকট স্বরে "হালুম! হালুম!" করে গর্জন করে উঠল। হালুম বাঘের ডাক কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে এই মেছো কুমিরের বুলি হালুম। রাতুল জাদুর বইটি বের করল। প্রথম পাতা উল্টাতেই দেখল সেখানে এখন লেখা আছেঃ

সৎ সাহস সব অজেয়কে জয় করার ক্ষমতা রাখে।

আর কিছু নেই। রাতুল আরেক পেজে যেতে চাইল কিন্তু আর কোন পেজ খুলল না। অগত্যা সে তার হাতের লাঠিটি নিয়েই অগ্রসর হল। এসময় আরেকটু হলে কুমির তার উপরেই লাফিয়ে পড়েছিল প্রায়। রাতুল খুব দ্রুত সরে যাওয়াতে বেঁচে গেল। লাফিয়ে পড়ে কুমির একটু ধাতস্থ হচ্ছিল। কারণ সে হয়ত ভাবেনি রাতুল এত তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারবে। এই সুযোগে রাতুল তার হাতের লাঠিটি দিয়ে দিল কুমিরের মাথায় এক ঘা।

অবাক কান্ড! এতেই কুমিরের মাথা চ্যাপ্টা হয়ে গেল। বিস্ময়ে রাতুল তাকাল তার লাঠির দিকে। তখন তার মনে পড়ে গেল এ তো সাধারণ কোন লাঠি না। জাদুর লাঠি।

কুমির যখন ছটফট করছে মাথায় বাড়ি খেয়ে তখন অন্যদিকে আকাশ প্রায় অজ্ঞান হয়ে বালিতে পড়ে গেছে। রাতুলের চোখ গেল আকাশের দিকে। সে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে পীযূষ নদের একেবারে কাছে নিয়ে এল। তারপর দু হাত দিয়ে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে আকাশের মুখে ছিটিয়ে দিল প্রথমে। তারপর আবার একইভাবে পানি তুলে খাইয়ে দিল আকাশকে। এই পানি পান করার মিনিটখানেকের মধ্যে আকাশ সতেজ হয়ে উঠল।

রাতুল যে কুমিরটাকে মেরেছে তা দেখেছিল এক মোচওয়ালা হাতি। সে অবাক হয়ে এগিয়ে এল। কারণ শক্তিধর মেছো কুমিরটার জ্বালায় সবাই অস্থির ছিল।

এগিয়ে এসে বলল, "শাবাস! তুমি দেখি মেছোটাকে মেরে ফেলেছ! দারুণ করেছ!"

রাতুল এবং আকাশ দুজনই অবাক হয়েছিল হাতির মোচ দেখে এবং তার কথা শুনে। এখানে বোধহয় সবাই কথা বলতে পারে। মোচওয়ালা হাতি বলল, "এর জ্বালায় আমরা এই নদে পানি খেতে পারতাম না। যেতে হত অনেকদূর। আজ থেকে তোমার জন্য আমরা এখান থেকেই পানি খেতে পারব। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা হাতিদের পক্ষ থেকে তোমাকে সংবর্ধনা দেব। তোমরা চলো আমার সাথে।"

রাতুল জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

মোচওয়ালা হাতি বলল, "আমাদের এলাকায়। তোমাদের খুব ভালো লাগবে। মেয়র ইলেকশনের কারণে এখন আমাদের এলাকা খুব গরম।"

মিনিট দুয়েক হাতির সাথে হেটে রাতুল ও আকাশ হাতিদের এলাকায় পৌছে গেল। সেখানে নানা সাইজের ও রঙের হাতি। তবে হাতিরা মূলত এখানে তিন প্রকার। মোচওয়ালা, শূঁড়হীন ও লেজহীন।

মোচওয়ালা হাতিদের সবার মোচ। বাচ্চা থেকে বুড়ো এমনকী মহিলা হাতিদেরও মোচ।

শুঁড়হীন হাতিদের শুঁড় নেই। শুঁড়ের জায়গায় খাড়া নাক। আর লেজহীন হাতিদের লেজ নেই। তারা মশা মাছি তাড়ায় কী দিয়ে কে জানে! অথবা হয়ত এখানে কোন মশা মাছি নেই।

রাতুলদের সাথে প্রথম পরিচিত হওয়া মোচওয়ালা হাতিটি হাতিদের সবাইকে বলল, "এই মানুষ মেছোটাকে মেরে ফেলেছে। আমাদের এখন ওর ভয়ে থাকতে হবে না।" তারপর সে বর্ণনা দিল রাতুল কীভাবে বীরের মত মেছো কুমিরটাকে মেরেছে। সমস্ত হাতিপাড়া মেছো কুমিরের মৃত্যুতে আনন্দে নেচে উঠল।

হাতিদের মেয়র ইলেকশনে তিনজন প্রার্থী দাড়িয়েছেন। একজন মোচওয়ালাদের পক্ষ থেকে, একজন শুঁড়হীনদের পক্ষ থেকে এবং আরেকজন লেজহীনদের পক্ষ থেকে। এরা তিনজনই ভোট পাবেন। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

রাতুল শুনল কয়েকজন মুরুব্বি হাতি গল্প করছেন। একজন মোচওয়ালা, একজন শুঁড়হীন এবং আরেকজন লেজহীন। লেজহীন মুরুব্বী হাতি বলছেন মোচওয়ালাকে, "এই যে তোমাদের একজন দাঁড়াল, এ কী

আর কোন প্রতীক পেল না? মানুষ প্রতীকে ওকে কেউ ভোট দেবে? এই প্রতীকই ওকে ডুবাবে। এই আমি বলে দিলাম।”

মোচওয়ালা বললেন, “তা যা বলেছ। মানুষ প্রতীকে ইলেকশন করা খুব রিস্কি। এই সেবার মনে নেই আমরা যখন ইস্কুলে পড়ি তখন শুঁড়হীনদের একজন দাঁড়াল মানুষের বাচ্চা প্রতীকে। কী বেইজ্জতিই না হয়েছিল সেবার। মোটে তিনটা ভোট পড়েছিল তার বাক্সে। লজ্জা লজ্জা!”

শুঁড়হীন বললেন, “আমি এই ব্যাপারটা বুঝি না। মানুষ প্রতীকে দাঁড়ালে কী হয়? আমরা তো হাতি দেখে ভোট দেব, প্রতীক দেখে ভোট দেয়া কি ঠিক? ভোটের আগে যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে তা হল যাকে ভোট দিচ্ছি সে কেমন হাতি। ব্যস।”

মোচওয়ালা বললেন, “কিন্তু ভাই শুঁড়হীন আম পাবলিক তো আর তা বুঝবে না। তারা প্রতীক কি সেটা খুব গুরুত্ব দেয়।”

রাতুল দেখল হাতিপাড়ার চারপাশে উৎসব উৎসব ভাব। এখানে সেখানে হাতিদের জটলা। সেখানে নির্বাচনী প্রচার চলছে।

রাতুলদের সাথে প্রথম পরিচিত হওয়া মোচওয়ালা হাতিটি রাতুলকে বলল, “ওই যে দেখতে পাচ্ছ একদল হাতি একজন গাট্টাগোট্টা হাতিকে ঘিরে দাড়িয়ে কথা শুনছে। উনি মোচওয়ালাদের পক্ষে এবার মেয়র ইলেকশন লড়ছেন। তার প্রতীক মানুষ বলে বেশ সমালোচনা হয়েছে। কারণ মানুষদের পলিটিশিয়ানগুলো খুব ভালো হয় না। তবে তুমি যেভাবে বীরের মত মেছোটাকে মেরেছ তাতে মানুষদের ভাবমূর্তি অনেক উন্নত হয়েছে হাতিপাড়ায়। তাতে মানুষ প্রতীক নিয়ে লাভই হয়ে গেল ওঁর।”

নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন মোচওয়ালা মেয়র প্রার্থী। কিন্তু তবুও তিনি রাতুলদের সাথে দেখা করলেন। মেছোটাকে মারার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, “তোমরা আমাদের অনেক উপকার করেছ। মানুষদের প্রতি সব সময়ই আমার বিশ্বাস ছিল। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সে বিশ্বাসের দাম দিলে তুমি। তোমার এই কাজের জন্য আমার ভোট অনেক বেড়ে গেল। তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমাদের হাতিপাড়ায় তুমি যতদিন ইচ্ছা থাকো। হাতিপাড়ার যে উপকার তুমি করেছ তাতে হাতিদের তুমি সব বিপদে আপদে পাশে পাবে।”

শুঁড়হীনদের মেয়র প্রার্থী এবং লেজহীনদের মেয়র প্রার্থীও একই রকম কথা বললেন। হাতিপাড়ায় বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে আজব আজব জিনিস এবং হাতিদের কর্মকান্ড দেখার পর রাতুলের মনে হল সেই জাদুর বইয়ের কথা। এজন্য অবশ্য কৃতিত্ব দেয়া যায় আকাশকে। হাতিপাড়ায় এসে সে নিশ্চুপে রাতুলের সাথে ছিল। অবাক বিস্ময়ে দেখছিল বিভিন্ন রঙ ও ধরনের হাতি এবং তাদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ। হাতিদের একটা পুরনো বইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে রাতুলকে বলল, “ঐ দেখো, মোচওয়ালা এক হাতির বাচ্চা বই পড়ে হু হু করে হাসছে!”

এই বইয়ের কথাতেই রাতুলের মনে পড়ল জাদুর বইয়ের কথা। সে তখন দ্রুত ব্যাগ থেকে জাদুর বইটি বের করল। বইয়ের কভারের রঙ তখন বদলে হয়ে গেছে গোলাপি এবং সোনালী হলুদ মিশ্রিত। প্রথম পাতা খুলতেই সেখানে লেখা দেখা গেলঃ

কালো জাদুকর কোবিলাই জাদু রাজ্যে জনপ্রিয় কোন ব্যক্তি না হলেও তাকে প্রায় সবাই ভয় পায়। কোবিলাই জাদু সম্রাট নিকোলাই পুত্র হারিরিকে কোথায় বন্দি করে রেখেছে তা খুঁজে বের করো।

আর কিছু লেখা নেই। রাতুল বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। কীভাবে বের করা যায় কোথায় হারিরিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে? তাদের সাথে প্রথম পরিচিত হওয়া সেই মোচওয়ালা হাতিটি খুঁজতে খুঁজতে একসময় তাদের দেখতে পেয়ে বলল, “তোমরা এখানে! আর আমি খুঁজে খুঁজে অস্থির। আমাদের মহান জাদুকর তোমাদের দেখতে চেয়েছেন। তিনি হাতিপাড়ার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। আধ্যাত্মিক ধ্যানের মাধ্যমে বেঁচে আছেন শত শত বছর ধরে। চলো, তোমাদের তার গুহায় নিয়ে যাবার আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।”

আকাশ প্রশ্ন করে বসল, "এই জাদুকর কি কালো জাদুকর কোবিলাই?"

মোচওয়ালা হাতি যেন কিছুটা অবাক হল। সে তার মোচ নেড়ে বলল, "কোবিলাই! তার কথা তোমরা কীভাবে জানলে? আর ইনি কোবিলাই হবেন কীভাবে! ইনি তো আমাদের মতোই হাতি। আর কোবিলাই হল ভয়ংকর এক জাদুমানব।"

আকাশ জিজ্ঞেস করল, "জাদুমানব! সেটা আবার কী?"

মোচওয়ালা বলল, "এই জাদুরাজ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুমানবেরা। তারাই মূলত বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এরা মানুষের মত দেখতে হলেও মানুষ না।"

রাতুল জিজ্ঞেস করল, "আর কোবিলাই?"

মোচওয়ালা বলল, "সে অনেক কথা। কোবিলাই এর ভাই নিকোলাই ছিলেন জাদুসম্রাট। তিনি এই জাদু রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন অনেকদিন। তারপর তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। ধারণা করা হয় এতে তার ভাই কোবিলাই এর হাত আছে। নিয়ম অনুযায়ী এখন নিকোলাই এর পুত্র হারিরি সম্রাট হবার কথা। কিন্তু কোবিলাই কালো জাদুর প্রভাবে মন্ত্রীপরিষদকে বশ করে নিজেই সম্রাট হতে চাচ্ছে। জাদু রাজ্যের প্রাণীরা তাকে পছন্দ না করলেও ভয় পায়। সুতরাং প্রতিবাদ করার সাহস নেই কারো। সজারুরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল। তাই তাদের কাটা তুলে নিয়ে কালো জাদুর মাধ্যমে পাথরে পরিণত করে রেখেছে কোবিলাই। সেই সজারুদের কাটা দিয়ে এখন দাঁত খিলাল করে গন্ডারেরা।"

একটু থেমে মোচওয়ালা বলল, "সেসব নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। সব জায়গায় কোবিলাই এর গুপ্তচরেরা ওঁত পেতে আছে। এসব বাদ দিয়ে চলো জাদুকরের সাথে দেখা করবে। ওঁর মত জ্ঞানী ব্যক্তি জাদু রাজ্যে খুব কমই আছেন।"

রাতুল এবং আকাশ মোচওয়ালার সাথে উজ্জ্বল নীল রঙের পানিতে পূর্ণ একটি ডোবার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে চলল সেই মহান জ্ঞানী জাদুকর হাতির গুহায়। তারা দেখতে পেল কয়েকটি বেগুনি ও হলুদ ডোরাকাটা মাছ ডাঙায় বসে রোদ পোহাচ্ছে। তাদের চারটি ঠ্যাঙের মধ্যে দুটি ভাঁজ করে রাখা। মাছগুলোর মুখ গম্ভীর এবং বাদামী চোখদুটিতে ব্যাপক কৌতুহল। তারা কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল রাতুল এবং আকাশকে।

দশম অধ্যায়

রাতুল এবং আকাশ মোচওয়ালা হাতিটার সাথে গুহায় প্রবেশ করল। গুহাটি ছিল সামান্য অন্ধকার। গুহার ভেতর একটু যাওয়ার পর দেখা গেল জ্বলন্ত আগুনের সামনে খয়েরি দাড়িযুক্ত বৃদ্ধ একটি হাতি বসে আছে। সে হাতির মোচ, শুঁড় এবং লেজও আছে। বাড়তি হিসেবে লম্বা খয়েরি দাড়ি।

রাতুল এবং আকাশকে দেখেই বৃদ্ধ হাতি মুখ তুলে তাকালেন। তার চোখ দুটো গভীর কালো। মোচওয়ালা হাতি রাতুলকে দেখিয়ে বলল, "এই ছেলেটাই মেছোটাকে মেরেছে।"

বৃদ্ধ হাতি শুঁড় দিয়ে বসার ইশারা করলেন। তারা অগ্নিকুন্ডের সামনে বসে পড়ল। অগ্নিকুন্ডের অন্যপাশে বৃদ্ধ হাতি এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রাতুলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমি তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম। কোবিলাইকে ধ্বংসের যুদ্ধ শুরু করার জন্য তোমাকেই দরকার ছিল। জাদুরাজ্যের ভাগ্যে এমনি লেখা আছে। তবে কোবিলাইকে ধ্বংস করা সহজ হবে না। সে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। কালো জাদুর জাল বিস্তার করে সে সমগ্র জাদু রাজ্যকে গ্রাস করার স্বপ্ন দেখছে। তোমার সাথে কি নিকোলাই পুত্র হারিরির দেখা হয়েছে?"

রাতুল বলল, "হ্যা। সে আমাকে তার সম্পর্কে বলেছে। কিন্তু আমি জানি না তাকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে।"

বৃদ্ধ শুঁড় দিয়ে তার দাড়ি নেড়ে বললেন, "তুমি জানতে চাও?"

রাতুল বলল, "হ্যাঁ। তাহলে আমি তাকে উদ্ধার করতে যেতে পারব।"

বৃদ্ধ হাতি একটু হাসলেন। তাতে তার দাড়ি ঢাকা মুখ একটু নড়ে উঠল। তিনি চোখ বন্ধ করে কীসব দুর্বোধ্য বাক্য কয়েকবার বলে ফুঁ দিলেন আগুনে। তাতে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। সে আগুনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধ হাতি শুঁড় দিয়ে দাড়ি নাড়তে নাড়তে বললেন, "আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কোবিলাই তার জাদুর জাল বিস্তার করে ফেলেছে সমস্ত জাদু রাজ্যে। সন্ধ্যার পর কালো জাদুর জাদুকরদের শক্তি বেড়ে যায়। তাই আমি হারিরিকে কোথায় রাখা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি না। ইদানীং সন্ধ্যার পর পর আমার জাদুশক্তি কালো জাদুর প্রভাবে কমে আসে। তুমি কাল সকালে এখানে চলে এস।"

এই কথায় রাতুল কিছুটা নিরাশ হল। আকাশ জিজ্ঞেস করল, "কোবিলাই কি আমাদের দেখতে পাবে?"

বৃদ্ধ হাতি শুঁড় নেড়ে বললেন, "সে এতক্ষণে নিশ্চিত তোমাদের জাদুরাজ্যে আসার খবর পেয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর হয়ত খুঁজতে বের হবে। তাই সাবধানে থেকো।"

তিনি মোচওয়ালা হাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এদের নিয়ে চলে যাও। দেখো কোন অসুবিধা যেন না হয়।"

মোচওয়ালা হাতি বলল, "ঠিক আছে। কাল সকালে আমি আবার নিয়ে আসব। আপনার কিছু কি লাগবে?" বৃদ্ধ হাতি বললেন, "না। আমি এখন ধ্যানে বসব।"

তিনি চোখ বন্ধ করলেন। রাতুল দেখতে পেল তার মুখে হাসি হাসি ভাব। হয়ত এই হাতির মুখই এরকম। দেখলেই মনে হয় হেসে ফেলবে এখন।

রাতুল ও আকাশকে নিয়ে যখন মোচওয়ালা গুহা থেকে বের হল তখন বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সন্ধ্যায় এখানে আলো কমে আসে এবং পাতলা নীল বর্ণের আলো ছড়িয়ে পড়ে। গুহায় প্রবেশের সময়কালের সেই ঝকঝকে আলো আর এখন নেই। আকাশের রঙও এখন কালচে নীল।

আকাশ উপরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখানে আকাশের রঙ কি রাতে এরকম হয়ে যায়?"

মোচওয়ালা হাতি হাঁটতে হাঁটতে বলল, "প্রথমে থাকে কালচে নীল, তারপর হয় কালচে বেগুনী, তারপর কালচে হলুদ। একেকটা রঙ দেখে বোঝা যায় রাত্রির গভীরতা। কালচে বেগুনি হলে বুঝতে হবে গভীর রাত। কালচে কমলা হলে শেষরাত। ভোরের দিকে হয় লালচে আভাযুক্ত। আর সকালে হয় টকটকে লাল।"

রাতুল বলে উঠল, "দারুন তো!"

তারা কথা বলতে বলতে চলে এসেছিল হাতিপাড়ায়। হাতিপাড়ার তখন বাদ্যের তালে তালে নাচছে কয়েকটা হাতি। তারা একটা বড় অগ্নিকুন্ড ঘিরে নাচছে। কয়েকজন হাতি বসে গান গাইছে-

জাদুতে জাদুতে মাখামাখি সখা
জাদুতে আমার বাস
জাদুর পরশ মাখিয়া শরীরে
গহীন সর্বনাশ
জাদুর আঁখিতে পরশ তোমারি
রইল পড়িয়া জল
জাদুতে জাদুতে মিলেমিশে হল
তোমার অমৃত গরল

মুরুব্বি হাতিরা দূরে বসে দুলে দুলে গান শুনছে এবং নাচ দেখছে। গান এবং নাচের সাথে খাবার দাবারও চলছে বেশ। সতেজ কলাগাছের স্তূপ রাখা স্থানে স্থানে। যার ইচ্ছে দু'একটি কলাগাছ নিয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে সটান চালান করে দিচ্ছে পেটে। কেউ কেউ গান শুনতে শুনতে এবং নাচ দেখতে দেখতে আপন মনে গুনগুনিয়ে আস্তে আস্তে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে কলাগাছ।

মোচওয়ালা হাতিটা বলল, "রাতে আমাদের এখানে নিয়মিত নাচ গান হয়। তোমরা বসে দেখতে পারো। আর ঘুম পেলে ঘুমাতে পারবে ঐ গুহায়। ওখানে তোমাদের জন্য জায়গা করে রাখা আছে।"

মোচওয়ালা তার শুঁড় দিয়ে একটি গুহা দেখিয়ে দিল। রাতুল এবং আকাশ এগিয়ে গিয়ে দেখল গুহাটা ঝকঝকে পরিষ্কার। সুন্দর আগুনের মশাল জ্বলছে একপাশে। দুটি বিছানাও পাতা আছে। আর আরেকটি দারুণ কাপড়ের উপর রাখা আছে নানা বর্ণ, রঙ ও আকার-আকৃতির ফল। ফলগুলো এতই পাকা যে সুমিষ্ট গন্ধ নাকে আসছে যেন।

রাতুল কিছু বলার আগেই আকাশ ফলগুলোর উপর হামলে পড়ল। প্রথমবারের সেই ফলের ঘটনার পর রাতুল ঠিক করেছিল কোন কিছু কাউকে না জিজ্ঞেস করে খাবে না। কিন্তু আকাশ জিজ্ঞেসের তোয়াক্কা না করেই একটি আপেলাকৃতির ফলে দুটি কামড় বসিয়ে বলল, “দারুণ!”

রাতুল মোচওয়ালা হাতিকে বলল, “এগুলো খাওয়া যাবে?”

মোচওয়ালা হাতি বলল, “অবশ্যই। এগুলো তোমাদের জন্য বিশেষভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা ফল খাই না।”

রাতুলেরও ক্ষুধা পেয়েছিল। তাই সে আর কিছু না বলে বসে পড়ল এবং খেতে শুরু করল। আকাশ ঠিকই বলেছে। ফলগুলোর স্বাদ দারুণ। একটার চেয়ে যেন অন্যটা আরো দারুণ। প্রায় সবকটিই চেখে দেখল তারা দুজন। ততক্ষণে পেট ভর্তি হয়ে গেছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে এবং অত্যধিক ফলাহারের কারণে দুজনেরই হাই উঠল। মোচওয়ালা হাতি বলল, “তোমরা এখন বিশ্রাম করো। আমি যাই। কোন দরকার পড়লে আমাদের ডাকলেই পাবে। আর আমরা খুব ভোরে উঠে যাই। এখন আবার নির্বাচনের সময় বলে আরো তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। সুতরাং, সকালে তোমাদের ঘুম ভাঙলে দেখা হবে।”

মোচওয়ালা চলে যাবার পর রাতুল আকাশকে বলল, “কী রে সবগুলো তো খেয়ে ফেললি। এরা তো আমাদের পেটুক ভাববে।”

আকাশ বলল, “আমি কি একা খেয়েছি? মাত্র তো কয়েকটা খেলাম। তাতেই পেট ভরে গেল।”

সে আবার হাই তুলে তার জন্য করা বিছানায় গিয়ে বলল, “কালকের প্ল্যান কী?”

রাতুল নিজের বিছানায় গিয়ে বলল, “কাল জাদুকর হাতির কাছে গিয়ে দেখব হারিরি কোথায় আছে। তারপর ভেবে দেখব কী করা যায়।”

তাদের দুজনেরই খুব ঘুম পাচ্ছিল। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন অবস্থা হল যে রাতুলের মনে হচ্ছিল চোখের পাতা দুটো পাহাড়ের সমান ভারী। সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার এক মিনিট আগে অবশ্য আকাশ ঘুমিয়ে গেছে। রাতুল যখন ঘুমায় আকাশ তখন ঘুমে নাক ডাকছে।

তারা কতক্ষণ ঘুমাল ঠিক নেই। রাতুলের ঘুম ভাঙল একটা ফিসফিস শব্দে। ঘুম থেকে উঠে সে শুনতে পেল কে যেন বলছে, “এই ছেলে, এই”

রাতুল চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। গুহার মুখ দিয়ে বেগুনী আলো আসছে। অর্থাৎ এখন গভীর রাত।

রাতুল আবার শুনল ফিসফিস কণ্ঠ, "এই ছেলে, এই যে আমি।"

রাতুল এবার শব্দ লক্ষ করে তাকাল। গুহার মেঝেতে একটা ইঁদুরের মত প্রাণী। তার মুখের আকৃতি মানুষের মুখের মত। চোখ দুটি মুখের তুলনায় অনেক বড়। কানদুটি গোলাকৃতির। পিছনে বাদুড়ের ডানার মত ডানা। সে দু পায়ে ভর দিয়ে এবং বাকি দু পা সামনে নিয়ে দাড়িয়ে রাতুলকে ডাকছে।

রাতুল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

সেই কিম্ভূতকিমাকার ছোট প্রাণী বলল, "আমি কে তা দিয়ে তোমার কাজ নেই। কতক্ষণ ধরে ডাকছি। এমন মোষের মত ঘুমালে হবে? এটা কী তোমার মানুষের দেশ পেয়েছ?"

রাতুল জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

ছোট প্রাণী বলল, "আবার সেই প্রশ্ন! বলি তোমার ঘটে কি বুদ্ধি নেই? এভাবে নিশ্চিন্তে যে ঘুমিয়ে পড়লে, এটা জানো না জাদুরাজ্যে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই? এটা তোমাকে নিকোলাই এর ছেলে বলে দেয়নি?"

রাতুল ভয় পেয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

ছোট প্রাণী খসখসে কণ্ঠে বলল, "কী আর হবে। হতে যাচ্ছিল আর কী! এই যে হাতিরা কোবিলাই এর হয়ে কাজ করে। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে ধরিয়ে দেয়ার জন্য জাদুর ফল খাইয়ে দিয়েছে। আমি সব দেখেছি। কিন্তু এসে তোমাকে বলার সাহস পাচ্ছিলাম না। হাতিরা ঘুমিয়েছে তাই বলতে এলাম। পালাও এখান থেকে। নাহলে কোবিলাই এর হাতে ধরা পড়বে। আর কোবিলাই তোমাদের মেরে রাস্তায় ঝুলিয়ে শুঁটকি বানাবে।"

রাতুল তাকাল আকাশের দিকে। আকাশ তখন আরেক কোণে তার বিছানায় নাক ডাকছে। ছোট প্রাণীটি বলল, "ওদিকে তাকিয়ে কী দেখছ? তোমার সাথের ঐ ছেলেটাও তো হাতির মত। এদের বরং হাতিদের সাথেই রেখে যাও। হাতিতে হাতিতে হাতাহাতি হোক। দেখ কীরকম নাক ডাকছে!"

রাতুল প্রাণীটিকে অগ্রাহ্য করে আকাশকে ডেকে তুলল। আকাশ চোখ কচলে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

রাতুল বলল, "বিপদ। আমাদের পালাতে হবে।"

সে তার ব্যাগ এবং জাদুর লাঠিটা হাতে নিল। ছোট প্রাণীটা ততক্ষণে দৌড়ে বাইরে চলে গেছে। রাতুল এবং আকাশ বাইরে বের হল।

আকাশ জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু হাতিরা...?"

সে প্রশ্ন শেষ করার আগেই রাতুল বলল, "ওরা আমাদের কোবিলাই এর হাতে ধরিয়ে দিতে চায়। এখান থেকে তাই আমাদের পালাতে হবে।"

আকাশ তখন কালচে বেগুনী। আবছা বেগুনী আলো আছে চারপাশে। সে আলোতে রাতুল এবং আকাশ চলল হাতিপাড়াকে পিছনে ফেলে। হাতিরা তখন ঘুমোচ্ছে। সমস্ত হাতিপাড়ায় তখন রাতের নির্জনতা ভেদ করে কোরাসে চলছে নাকডাকার শব্দ।

অধ্যায় এগারো

গুহা থেকে বেরিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে এগুতে লাগল রাতুল ও আকাশ। আবছা আলোতে চারপাশটা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। উত্তেজনার বশে সে তার জাদুর বইটি খুলে দেখতে ভুলে গেল। তার মনে ছিল তখন একটাই চিন্তা, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে। তা না হলে হাতিদের কাছে ধরা পড়তে হবে এবং হাতিরা পাঠিয়ে দেবে কালো জাদুকর কোবিলাই এর কাছে। কিছুদূর যাওয়ার পর কান্নার শব্দ এল রাতুলের কানে। যেন কাছেই কেউ কাঁদছে। সে কান্নার শব্দ লক্ষ করে তাকিয়ে দেখতে পেল একটি গাছের নিচে বসে অদ্ভুত সুরে কাঁদছে বিড়ালের মত একটি প্রাণী। প্রাণীটির সবকিছুই বিড়ালের মত। তবে পিঠের ডানা দুটি এবং মাথার উপরে আঁকা বাঁকা শিংগুলোই শুধু আলাদা।

আকাশ রাতুলের কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, “এটা মায়াবিড়াল। এরা রাতে মায়াবী সুরে কাঁদে।”

রাতুল জিজ্ঞেস করল, “তুই জানলি কীভাবে?”

আকাশ বলল, “আমার বাবা বলেছেন।”

রাতুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তোর বাবা? তিনি কী করে জানলেন?”

তখনই আকাশ তার বাবা সম্পর্কে প্রথম কিছু বলল রাতুলকে। সে বলল, “আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বাবা আমাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প বলতেন। এখানে এসে অদ্ভুত জিনিসগুলো দেখে তাই আমার বেশি অবাক লেগেছিল। কারণ বাবা এগুলোর গল্পই করেছিলেন। যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন বাবা হারিয়ে যান। তার কী হয়েছিল তা কেউ আমাকে বলেননি। শুধু একজন চাচার কাছ থেকে জেনেছিলাম তিনি ছিলেন এক জাদুকর।”

রাতুল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। তাহলে এই জাদু রাজ্যে আকাশের আগমনের ব্যাপারটিও পূর্বপরিকল্পিত!

ইতিমধ্যে মায়াবিড়ালের কান্না আরো বেড়েছে। এমন মায়াবী কান্নার শব্দ রাতুল বা আকাশ দুজনের কেউই এর আগে কখনো শোনেনি।

রাতুল জিজ্ঞেস করল, “এই মায়াবিড়াল কী করে জানিস?”

আকাশ বলল, “সেটা ভুলে গেছি। খুব ছোটকালে শোনা গল্প। তবে এটা মনে আছে মায়া বিড়াল রাতে মায়াবী সুরে কাঁদে।”

রাতুল মায়াবিড়ালের দিকে এগিয়ে গেল। বিড়াল তখনো আপনমনে কেঁদে চলেছে।

রাতুল জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?”

মায়াবিড়াল তার মায়াময় চোখ মেলে রাতুলের দিকে তাকাল। তারপর কিন্নরকণ্ঠে বলল, “আমি কাঁদি জাদু জগতের দুঃখে। আমি কাঁদি নিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকা সময়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। আমার কান্নার হেতু তুমি কি বুঝিবে? আমার কান্না আমার একান্ত কিছু বিষাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আমার কান্নাই এই উদ্ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল সময়ের মধ্যে আমার বিষণ্ণ বসবাস।”

রাতুল আকাশের দিকে তাকাল। তারা দুজনের কেউই এই কথাটির অর্থ বুঝতে পারল না। আকাশ জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পারবে?”

মায়াবিড়াল বলল, “আমি জানি তোমরা কী বলতে চাইছ। এই হাতিপাড়া থেকে কীভাবে বের হবে এইতো? ঐ সোজা পথ ধরে চলতে থাকো। জীবন থেকে মুক্তি পেতে হাতিরা এ পথেই যায়।”

মায়াবিড়াল ইশারায় পথ দেখাল। তারপর সে আগের মতই কান্না শুরু করল। মায়াবী সুরে করুণ কান্না। যে কান্না শুনলে মনে হয়, বহু দিনের, বহু বেদনার স্মৃতিতে জরাজীর্ণ হৃদয় থেকে উৎসারিত শৈল্পিক বিষাদের গান।

রাতুল এবং আকাশ মায়া বিড়ালের দেখানো পথে হাটতে শুরু করল। মাথার উপরে আকাশের রঙ বদলে যেতে শুরু করেছে। কালচে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে আকাশ। চারিদিকে আবছা আলোর রঙ বদলে গেল। এ এক অদ্ভুত, বিস্ময়কর সৌন্দর্য। রাতুল এবং আকাশ রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। একটু পর হাতিপাড়ার হাতিরা হয়ত জেগে উঠবে।

আকাশের রঙ যখন হালকা কমলা হতে শুরু করেছে তখন তারা পৌঁছে গেল এক বিশাল উপত্যকায়। সারি সারি ছোট পাহাড়ের নিচে বিস্তীর্ণ মাঠ। আলো অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হয়ে ওঠায় দেখা গেল সে বিস্তীর্ণ মাঠের স্থানে স্থানে পড়ে আছে বিরাট বিরাট কী সব বস্তু।

আকাশ জিজ্ঞেস করল, “এগুলো কী?”

রাতুলও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। যদিও আকার আকৃতিতে মনে হচ্ছিল খুব চেনা চেনা।

তারা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল তার ঠিক পাশ থেকেই একটা গম্ভীর কণ্ঠ শ্লেষ্মা জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠল, “এরা হাতি।”

ভয়ে পেয়ে লাফিয়ে সরে গেল তারা দুজন। এখানে যে কেউ আছে তা তারা লক্ষই করেনি। একটা হাতি বসে আছে। শুঁড়হীন হাতি।

রাতুল তার হাতের জাদুর লাঠিটি সাবধানতার জন্য সামনে ধরে বলল, "ঐ জায়গায় ওসব বস্তু হাতি?"

শুঁড়হীন হাতিটি আগের মতই বলল, "হ্যাঁ। এটা হাতিদের শ্মশান। জান না হাতিরা মৃত্যুর আগে বুঝতে পারে? এবং তারপর নিজে নিজেই হেঁটে আসে এখানে। এসে নীরবে অপেক্ষা করে মহান মৃত্যুর।"

আকাশ বলল, "তুমি কি মৃত্যুর অপেক্ষা করছ?"

হাতিটি বলল, "হ্যাঁ। তা বলতে পার। তবে আমার মৃত্যুর সময় আসেনি। কিন্তু আমি মরতে চাই। তাই এখানে এসে বসে থাকি। শশ্মানের নিস্তব্ধতা আমাকে বড় টানে।"

হাতিটি একটু থেমে গিয়ে বলল, "কিন্তু তোমরা এখানে কেন? কাল তো দেখলাম তোমাদের হাতিপাড়ায়।"

রাতুল বলল, "আমরা জানতে পেরেছি হাতিরা আমাদেরকে কালো জাদুকর কোবিলাই এর কাছে ধরিয়ে দেবে। তাই পালিয়ে এসেছি।"

এই কথা শুনে হাতিটির চোখ যেন দপ করে জ্বলে উঠল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "সব মিথ্যে কথা। হাতিরা কখনো প্রতারণা করে না। কে তোমাদের এই কথা বলেছে?"

রাতুল বলল সেই অদ্ভুত ছোট প্রাণীটার কথা।

হাতি বলল, "এ তো সেই মিথ্যেবাদী প্রতারক। তোমরা কি তঞ্চকের নাম শোনোনি? এই প্রাণী হল সেই তঞ্চক। যে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণা করে মজা পায়। সে তোমাদের মিথ্যা বলেছে।"

রাতুল বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। হাতিটার কথা কি বিশ্বাস করা যায়? তখন তার মনে পড়ল জাদুর বইটির কথা। সে দ্রুত ব্যাগ থেকে বই বের করল। বইয়ের রঙ তখন কমলা রঙের। প্রথম পাতা খুলতেই লেখা দেখা গেলঃ

তঞ্চক থেকে সাবধান। এরা মজা করার জন্য মিথ্যা বলে সবাইকে বিপদে ফেলে।

এই লেখার উপরে সেই ছোট প্রাণীটির ছবি। এবার আর হাতিটিকে বিশ্বাস করতে কোন বাধা রইল না। হাতিটি বলল, "তোমরা চলো আমার সাথে হাতিপাড়ায়। হাতিরা সকালে তোমাদের দেখতে না পেলে হুলস্থুল বেধে যাবে। অতিথিদের ব্যাপারে হাতিরা খুব সচেতন। এছাড়া যে কোবিলাই এর ভয়ে এখানে এসেছ, সেই কোবিলাই এর ড্রাগনেরা তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাতিপাড়ায় ড্রাগনেরা ঢুকতে সাহস করবে না।"

রাতুল কিছুটা লজ্জিত হল। এভাবে হাতিদের অবিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। অন্তত জাদুর বইটা একবার দেখা উচিত ছিল।

হাতিটি বলতে লাগল, "চলো, আর জাদুর লাঠিটা সাবধানে ধরে রেখো। পথে কোবিলাই এর ড্রাগনদের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে।"

হাতির সাথে আবার রাতুল এবং আকাশ ফিরতে লাগল হাতিপাড়ায়। তখন আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। যেতে যেতে হাতিটা বলতে লাগল, "আজ ভেবেছিলাম লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব। কিন্তু তোমাদের জন্য পারলাম না।"

তারা যখন হাতিপাড়ায় পৌছল ততক্ষণে হাতিরা ঘুম থেকে উঠেছে। এই বিষণ্ণ হাতির সাথে রাতুলদের দেখে অন্য হাতিরা বেশ অবাক হল। বিষণ্ণ হাতি তখন বলল, "আমি আগেই বলেছিলাম সব তঞ্চক শালাদের মেরে ফেলতে। আজ এরা এই তঞ্চকের কারণে হাতিদের ভুল বুঝে চলে যেত। আমি শশ্মান থেকে তাদের নিয়ে এসেছি।"

তঞ্চকের এই ঘটনায় হাতিরা ক্ষুব্ধ হল। রাতুল যখন মেছো কুমিরটাকে মেরেছিল তখন যে মোচওয়ালা হাতি দেখেছিল অর্থাৎ তাদের সেই প্রথম হাতি বন্ধু সে এসে বলল, "তঞ্চকটাকে আমি ধরেছি। শুঁড়ওয়ালা মেয়র প্রার্থীর হাতে তুলে দিয়েছি বিচারের জন্য।"

বিষণ্ন হাতিটা যেন বিরক্ত হল। "এসবে কিছু হবে না, আমার কথা যতদিন শোনা না হবে ততদিন কিছুই হবে না" এইসব বিড়বিড় করতে করতে সে চলে গেল। রাতুল তখন মোচওয়ালা হাতিটাকে বলল, "এই হাতির ব্যাপারটা কী?"

মোচওয়ালা বলল, "তঞ্চক জাদু রাজ্যের এক প্রতারক প্রাণী। কিন্তু কথিত আছে বড় এক জাদুকরকে একদিন বাঁচিয়েছিল এক তঞ্চক। তাই সে জাদুকর বলে গেছেন কেউ যেন কোন তঞ্চক হত্যা না করে। তঞ্চক যারা হত্যা করবে তাদের উপর নেমে আসবে ভয়ংকর বিপদ। এই গল্প প্রচলিত আছে জাদু রাজ্যে। ফলে কখনো কোন তঞ্চক হত্যা করা হয় না। কিন্তু এই হাতি বলে এসব গালগল্পে বিশ্বাস করে লাভ নেই। তঞ্চক একটি বিষাক্ত প্রাণী যারা মিথ্যার মাধ্যমে সমস্ত জাদু রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।"

মোচওয়ালা বলে চলল, "কিন্তু তার কথা এলাকার নেতারা শোনেননি। তঞ্চক হত্যা করে এলাকায় বিপদ ডেকে আনার ঝুঁকি তারা নিতে চাননি। এছাড়া আরো ভিন্ন ভিন্ন কারণে এলাকার নেতাদের সাথে তার মতের বিরোধ ছিল। সে নিজেকে মনে করে দার্শনিক। মতবিরোধের কারণে সে একা একা থাকে।"

এই সময়ে আরেকটি মোচওয়ালা হাতি এসে জানাল, "তঞ্চক পালিয়েছে। শুঁড়ওয়ালা মেয়রপ্রার্থীকে মিথ্যা বলে বিভ্রান্ত করে সে চলে গেছে।"

অন্যকে মিথ্যা বলে বিভ্রান্ত করার এক জাদুকরী ক্ষমতা যেন আছে এই প্রাণীটির। কিছুক্ষণ হাতিপাড়ায় চলল তঞ্চক খোঁজাখোঁজি। তারপর পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে রাতুল মোচওয়ালা হাতিটিকে বলল, "তাহলে এবার আমাদের জাদুকরের গুহায় নিয়ে চলো। জাদুকরের সাথে কথা বলে হারিরির অবস্থান জানাটা সবচেয়ে জরুরি।"

মোচওয়ালা হাতি রাতুল এবং আকাশকে নিয়ে চলল জাদুকরের গুহার দিকে। যেতে খুব বেশি সময় লাগল না। তারা পৌছে দেখতে পেল গুহার অবস্থা অন্যদিনের মতই। গুহার ভেতরে বৃদ্ধ জাদুকর হাতি আগুনের সামনে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রাতুল, আকাশ এবং মোচওয়ালা হাতিটা প্রবেশ করে তার সামনে আসার পর তিনি চোখ খুলে তাকালেন। তার গভীর চাউনি দিয়ে রাতুলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুঁড় দিয়ে দাড়ি নাড়তে নাড়তে বললেন, "আজ হবে। একটু আগে আমি নিজেই দেখেছি। বস তোমরা।"

রাতুলরা বসে পড়ার পর তিনি বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলেন আগুনে। আগুন লাফিয়ে জ্বলে উঠল। বৃদ্ধ হাতি রাতুলকে বললেন, "এবার তোমার জাদুর বইটি এ আগুনে ফেলে দাও!"

রাতুল এ কথায় চমকে উঠল। জাদুর বই আগুনে ফেলে দিতে হবে কেন? সে ইতস্তত করছিল। তখন বৃদ্ধ হাতি বলে উঠলেন, "ভয় পেও না। বইটি তুমি ফেরত পাবে। তবে এই জাদুর আগুনে পুড়ে যাবার পর সে পুস্তক অন্য পুস্তকে পরিণত হবে। তখন সেখানে তুমি দেখতে পাবে হারিরি কোথায়। এটাই নিয়ম।"

রাতুল বিশ্বাস করল বৃদ্ধ জাদুকর হাতিটির কথা। সে তার ব্যাগ থেকে জাদুর বইটি বের করে ফেলে দিল আগুনে। দাউ দাউ করে জ্বলল আগুন। সে আগুনে জাদুর বই পুড়ে অন্য আরেকটি বইয়ে পরিণত হল এর ছাই থেকে। আগুন নিভে গেল।

বৃদ্ধ হাতি বললেন, "এবার তুমি বইটি নিয়ে খুলে দেখ। হারিরির অবস্থান জানতে পারবে। তবে মনে রেখো এই বই স্পর্শ করার সাথে সাথে কোবিলাই তোমার অবস্থান জেনে যাবে। সুতরাং, বইটি খুলে হারিরির অবস্থান জেনে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে উদ্ধার করতে হবে। যত দেরি হবে বিপদ তত বাড়বে।"

রাতুল কাঁপা কাঁপা হাতে বইটি হাতে নিল। ছাইরঙা বই। বইটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই কাছে কোথাও গুহার বাইরে বজ্রপাতের বিকট শব্দ হল।

বৃদ্ধ হাতি বললেন, "ড্রাগনেরা চলে আসছে। তোমরা পালাও।"

রাতুল বইটি ব্যাগে ভরে নিল। হাতের জাদুর লাঠিটি শক্ত করে ধরে সে আকাশ এবং মোচওয়ালা হাতির সাথে বের হল বাইরে। বের হয়েই দেখল আকাশে কালো কালো মেঘের সারি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

তারা দৌড়ে কিছুদূর যাওয়ার পরেই প্রথম ড্রাগনের দেখা পেল। মুখে লেলিহান আগুনের শিখাযুক্ত ড্রাগন। ড্রাগনেরা বিকট ডানায় ভর করে উন্মত্ত অসুরের মত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর।

রাতুলের উপরেই এল প্রথম আঘাত। তবে সে নিজেকে সামলে নিয়ে জাদুর লাঠিটি দিয়ে ড্রাগনের পা বরাবর আঘাত করতে পেরেছিল। জাদুর লাঠির শক্তি অনেক। ড্রাগনের পা পুড়ে গিয়েছিল সে আঘাতে।

মোচওয়ালা হাতির উপর আঘাত করেছিল একটি ড্রাগন। হাতি তাকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে এমন জোরের সাথে ছুঁড়ে ফেলেছিল যে একটা ছোট টিলার মাথাটা উড়ে গেল। রাতুলের প্রথম আঘাত খেয়ে পা হারিয়েছিল যে ড্রাগন সে আবার আক্রমন করল রাতুলকে। এবার রাতুল ড্রাগনটার মাথা বরাবর জাদুর লাঠি দিয়ে আঘাত করতে পেরেছিল। লেলিহান দপদপে আগুনের শিখাযুক্ত মুখসহ ড্রাগনের মাথাটি সে আঘাতে বিচূর্ণ হয়ে যায়।

রাতুল এবং মোচওয়ালা হাতি যখন দুটি ড্রাগন মেরে ফেলল তখন তৃতীয় ড্রাগনটি আকাশকে দু পায়ে ধরে নিয়ে উড়াল দিল। রাতুল এবং হাতি দেখতে পেল আকাশকে নিয়ে যাচ্ছে ড্রাগন। রাতুল অসহায়ের মত হাতিকে জিজ্ঞেস করল, "এখন কী হবে?"

হাতি তখন খুব দ্রুত চিন্তা করে বলল, "বিজলী মাছের পিঠের চড়ে এর পিছু নাও।"

পাশের ডোবার পাশে হলুদ নীল খয়েরি ডোরাকাটা কয়েকটি মাছ তাদের লড়াই দেখছিল। সে মাছগুলো চার পা এবং পিঠে দুই ডানা। রাতুল এদের কাছে গিয়ে বলল, "তোমাদের কেউ আমাকে সাহায্য করবে ড্রাগনটার হাত থেকে আমার বন্ধুকে বাঁচাতে?"

একটি মাছ এগিয়ে এল। রাতুল চেপে বসল এর পিঠে। তারপর প্রচন্ড দ্রুতগতিতে সে মাছ ছুটল ড্রাগনকে ধাওয়া করে। জাদু রাজ্যে বিজলী মাছের উড়ার গতির অনেক সুনাম। মাছ রাতুলকে নিয়ে উড়ে চলল। প্রচন্ড বাতাসের তোড় উপেক্ষা করে। এদিকে ড্রাগন দেখতে পেল রাতুল আসছে বিজলী মাছের পিঠে চড়ে। সে তখন তার মুখ থেকে আগুনের গোলা ছুঁড়ে দিতে লাগল রাতুল ও বিজলী মাছের দিকে। কিন্তু বিজলী মাছ যেমন দ্রুতগতিতে উড়তে পারে তেমন রাখতে জানে ভারসাম্য। তাই আগুনের গোলাগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলল ড্রাগনটার দিকে। একটা আগুনের গোলা প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়েছিল তাদের।

ড্রাগনের লেজের কাছাকাছি পৌছে বিজলী মাছ দারুণ এক ডাইভ দিল আর তার সাথে সাথে রাতুল তার হাতের জাদুর লাঠিটি দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিল ড্রাগনটার লেজে। বিস্ফোরিত আগুনের সাথে খসে গেল ড্রাগনের লেজ। বিদঘুটে এক চিৎকার করে উঠল ড্রাগন। সে তার ভয়াবহ লাল চোখ মেলে ফিরে তাকাল রাতুলের দিকে। কিন্তু রাতুল তখন জাদুর লাঠি হাতে গতিশীল বিজলী মাছের পিঠে চেপে অসীম সাহসী। মাছ তখন আরেকটি ডাইভ দিয়ে এগিয়ে গেল। রাতুল দ্বিতীয়বার আঘাত করল ড্রাগনটিকে। এবার মাথায়। মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হবার সাথে সাথে ড্রাগন তার পা দিয়ে ধরা আকাশকেও ছেড়ে দিল।

দ্রুতবেগে নিচে পতিত হচ্ছিল আকাশ। বিজলী মাছ আরেকটি বিরাট ডাইভ দিয়ে ছুটল নিচে আকাশকে ধরে ফেলতে। সে হয়ত ধরে ফেলত। কিন্তু তার আর দরকার হল না। আরেকটি বিজলী মাছ যে লড়াই দেখতে এসেছিল সে তার আগেই আকাশকে লুফে নিয়েছিল। আকাশও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পেরে চেপে বসল বিজলী মাছের পিঠে।

দুটি বিজলী মাছ আকাশ এবং রাতুলকে পিঠে নিয়ে উপরে উঠে কয়েকটি ডাইভ দিল এমনিতেই। এ মনে হয় তাদের আনন্দ উদযাপন। তারপর নেমে গেল মাটিতে। সেখানে অপেক্ষায় ছিল মোচওয়ালা হাতি। মেছো কুমিরটাকে মারতে দেখেই সে রাতুলকে বীর ধরে নিয়েছিল। ড্রাগনদের বিরুদ্ধে জেতার পর এবার সে রাতুলকে মহাবীরের আসনে বসিয়ে দিল। রাতুলেরও আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল বহুগুণে।

অধ্যায় বারো

রাতুল, আকাশ এবং মোচওয়ালা হাতি ড্রাগনদের সাথে যুদ্ধের পর হাতিপাড়ার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল এমন সময় সাঁই সাঁই করে ছুটে এল এক ঈগলটানা রথ। চারটা বিরাটাকার ঈগল পাখি রথ টেনে নিয়ে এসেছে। তাদের মুখে লাগাম। লাগামের অন্য প্রান্ত হাতে চালকের আসনে বসে আছেন রাতুলদের হেডস্যার তোবারক আলী।

ঈগলগুলো এসে মাটিতে দাঁড়াল। তোবারক আলী তার মাথার হ্যাট বা হাতে খুলে রাতুল, আকাশ এবং হাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী খবর তোমাদের?"

রাতুল এবং আকাশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। হেডস্যারকে এখানে এভাবে দেখবে তারা কখনো ভাবেনি। তোবারক আলী রথ থেকে নেমে রাতুলদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা জাদু সম্রাট নিকোলাই পুত্র হারিরির খোঁজ পেয়েছ?"

রাতুল বলল, "জি স্যার। জাদুর বইয়ে আছে।"

তোবারক আলী বললেন, "তাহলে আর দেরি কেন? বই থেকে ওর অবস্থান জেনে নাও। এরপর উঠে এস রথে। নষ্ট করার মত সময় নেই।"

রাতুল তার ব্যাগ থেকে বইটি বের করল। ছাই রঙা বই। প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই দেখা গেল একটি ম্যাপ। ম্যাপের একদিকে লাল রঙের তীর চিহ্ন দেয়া। সেখানে একটা পাহাড়ের ছবি। নাম দেয়া আছে বিন্ধ্র পর্বত।

জাদু রাজ্যের জায়গাগুলোর সাথে রাতুল পরিচিত না। তাই সে তোবারক আলীকে ম্যাপটি দেখাল। তিনি দেখে বললেন, 'হুম! বিন্ধ্র পর্বত এর গুহায় লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে যাওয়া এক ভয়ংকর ব্যাপার। কিন্তু তবুও আমাদের সেখানে যেতে হবে।"

ক্রমশ

পারিশ্রমিক

কৌশিক ভট্টাচার্য

বাড়ির কলাগাছকে করে হাজার সাধাসাধি
বছর শেষে জুটলো কলা -- একটি ছোট কাঁদি!
সারাবছর ফালতু খাটা, উঠলে ওঠে শোক!
কদলী-গাছ বললে হেসে, "ভাবলি এটা j o k e ?
কোম্পানি যা দিচ্ছে তোকে তার চেয়ে কি কম বা?
মাইনে বল, কলা-ই বল -- সমান! অষ্টরম্ভা!!"

(এই ছড়াটি Roald Dahl এর A Little Nut -Tree অবলম্বনে লেখা । Dahl এর লেখায় গাছটি বাদামের। ইংরেজিতে "Nuts to you" র অনুবাদ হয় "তোমার জন্য অষ্টরম্ভা "। Dahl এর লেখায় মাইনে বা কোম্পানি নিয়েও কোনো কথা নেই, তা আমার সংযোজন।)

রামটাম টাগ্গার

টি এস এলিয়ট
অনুবাদ আবু হোসেন

ভারী বিচিত্র মার্জার এই
রামটাম টাগ্গার
মুরগি সাধলে বুনো হাঁস খেতে
শখ বেড়ে ওঠে তার
বাংলো বাড়িতে নিয়ে গেলে ফ্ল্যাট
খুঁজবেই থাবা দাপিয়ে
ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলে বাংলোর শোকে
ডাকবে শহর কাঁপিয়ে

নেংটি ধরতে বললে লাফিয়ে
ধেড়ে এনে দেবে পাকড়ে
ধেড়ের পেছনে ছেড়ে দিলে ফিরে
আসবে নেংটি আঁকড়ে

হ্যাঁ হ্যাঁ বিচিত্র মার্জার
এই রামটাম টাগ্গার
তোয়াক্কা নেই মালিকের শত
অনুরোধ আজ্ঞার
মর্জিমাফিক কর্ম
সেইটেই তার ধর্ম
আহা রামটাম টাগ্গার

রামটাম টাগ্ গার ব্যাটা ভারী
বিরক্তিকর ভাই রে
ভেতরে রাখলে তক্ষুণি সোজা
বের হতে চায় বাইরে
বাড়িতে ঢুকলে তক্ষুণি তার
বাইরে যাবার ইচ্ছে
সদাই দেখবে ভুল দরজায়
আরামে হাজিরা দিচ্ছে

ড্রয়ারে সেঁধিয়ে যখনতখন
আরামে জগত ভুলবে
ডালা টেনে তালা মেরে দাও যদি
কাঁদুনে রাগিনী তুলবে

হ্যাঁ হ্যাঁ বিচিত্র মার্জার
এই রামটাম টাগ্গার
তোয়াক্কা নেই মালিকের শত
অনুনয় আজ্ঞার
মর্জিমাফিক কর্ম

সেইটেই তার ধর্ম
আহা রামটাম টাগ্গার

রামটাম টাগ্ গার বিধাতার
বেজায় আজব সৃষ্টি
অবাধ্যতাই প্রিয় হবি তার
চোখে বিপ্লবী দৃষ্টি

মাছ দিলে দাবি করে মহাভোজ
যেন সে বাড়ির কর্তা
মাছ না থাকলে হাঙ্গার স্ট্রাইক
খায় না চিকেন ভর্তা
ননী ছানা দিলে শুঁকে চলে যায়
ঠেকায় না তাতে মুখ তার
নিজে চুরি করে কিছু পেলে পরে
সেই খেয়ে ভারী সুখ তার

শেলফের তাকে ছানাটুকু তুলে
রেখে দিয়ে গেলে বাইরে
খানিক বাদেই এসে দেখ ছানা
আর তো সেখানে নাই রে

এমনিতে মহা গম্ভীর জ্ঞানী
কোলে ওঠা তার সয় না
ছুঁতসুতো নিয়ে বস যদি কোলে
ঝাঁপ দিতে দেরি হয় না।
মহাগোলমালে মহাসুখে থাকে
শান্তি? সে তার সয় না।

হ্যাঁ হ্যাঁ
বিচিত্র মার্জার
এই রামটাম টাগ্গার
তোয়াক্কা সেতো করে না মোটেই
মালিকের আজ্ঞার
মর্জিমাফিক কর্ম
সেইটেই তার ধর্ম
আহা রামটাম টাগ্গার

আয় বিষ্টি চমৎকার

রতনতনু ঘাটী

বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে
পাগলা হাতির মাথা নড়ে!
আয় ঝমঝম করমচা
আকাশ পরির সঙ্গে যা!
বরণ করব ধান দিয়ে
আজ যেন ঠিক কার বিয়ে?
বিয়েবাড়ির বেজায় ধুম
এইটুকুতে ঘুমনাঘুম?
মাথায় বাঁধলি লাল ফিতে
বিষ্টি দানায় রং দিতে?
ঘুম ঘুম ঘুম ঘুমপরি
আয় না দু'জন গান ধরি।
গানের ভিতর অন্তরা
দু'জন বুঝি বোন তোরা?
একলা ছিলি দু'জন হলি
একটা কথা তোকেই বলি।
ঝম ঝম ঝম ঝমৎকার
আয় বিষ্টি চমৎকার!

তরুণটি

তরুণকুমার সরখেল

।।১।।

তরুণ থাকে না কারও
সাতে আর পাঁচে,
ঝামেলা এড়িয়ে চলে
দেখি না থাকতে তার
আনাচে কানাচে।

।।২।।

তরুণ ছেলেটা ভালো
থাকে হাসি মুখে,
ভালো লোক ভালোবাসে
খেটে খাওয়া মানুষের
ছবি তার বুকে।

।।৩।।

তরুণ হবে না বুড়ো
নামে সে তরুণ,
তবু তার মুখখানি
কবিতায় মিলে দিতে
হয়েছে করুণ।

।।৪।।

সবুজ অবুঝ হয়ে
মিঠে রোদ মেখে
তরুণ চলেছে ঐ
কুয়াশা মাখানো ঘাসে
পদচিহ্ন এঁকে।

।।৫।।

সহজে থামে না তরুণ
মানে না সে হার,
বর্ষার প্লাবনে নদী
(জল নেই, শুধু বালি)
করে পারাপার।

।।৬।।

তরুণ নামটি শুনে
হবে না অবাক,
কাজে কারবারে বুড়ো,
পেরিয়েছে জীবনের
ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক।

।।৭।।

ছড়া লিখে মুখে ফোটে
অনাবিল হাসি,
তরুণ গ্রামের ছেলে
আমডিহা-নডিহার
পুরুলিয়াবাসী।

।।৮।।

তার কথা আর নয়
এখানেই থামি
নামেতে তরুণ হলেও
সেই তরুণ
নই কিন্তু আমি।

নতুন দিনের বার্তা

রওশন মতীন

মনটা আমার উড়ু উড়ু
আকাশ ছুঁতে চায়,
মন যে আমার যায় হারিয়ে
সবুজ শ্যামল গাঁয়।

পুব-আকাশে আবির রাঙা
লাল আগুনের টিপ,
সেই আলোতে হাসছে দ্যাখ
সবুজ শ্যামল দ্বীপ।

নতুন দিনের সূর্যটা যে
ছড়ায় সোনার হাসি,
দিনগুলো হোক সুখের বাগান
গোলাপ রাশি রাশি।

সেই বাগানে খেলব সবাই
গাঁথব সুখে মালা,
জীবন গড়ার শপথ নেব
দিন বদলের পালা।

মেঘবৃষ্টি

প্রসেনজিত

হঠাৎ করে ঈশানকোণে
ছোট্ট একটা মেঘ
ছড়াতে থাকে আকাশ জুড়ে
হাওয়ার বাড়ে বেগ।
সেই হাওয়াতে ভর করে মেঘ
ছড়ায় আকাশ জুড়ে
নিকষ কালো মেঘেরা সব
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
একটু আগেও সুয্যিমামা
ভরিয়ে ছিল আলো
আলোর দাপট কমিয়ে দিয়ে
আকাশ এখন কালো।
এমনি করেই বৃষ্টি নামে
কখনও ভীষণ জোরে
কখনও বা সেই হাওয়াতেই
মেঘগুলো যায় উড়ে।
এইরকমেই আসা যাওয়ার
চলতে থাকে খেলা
কখনও আলো কখনও আঁধার
কাটবে সারাবেলা।

মনের কথা

প্রিন্স মাহমুদ হাসান

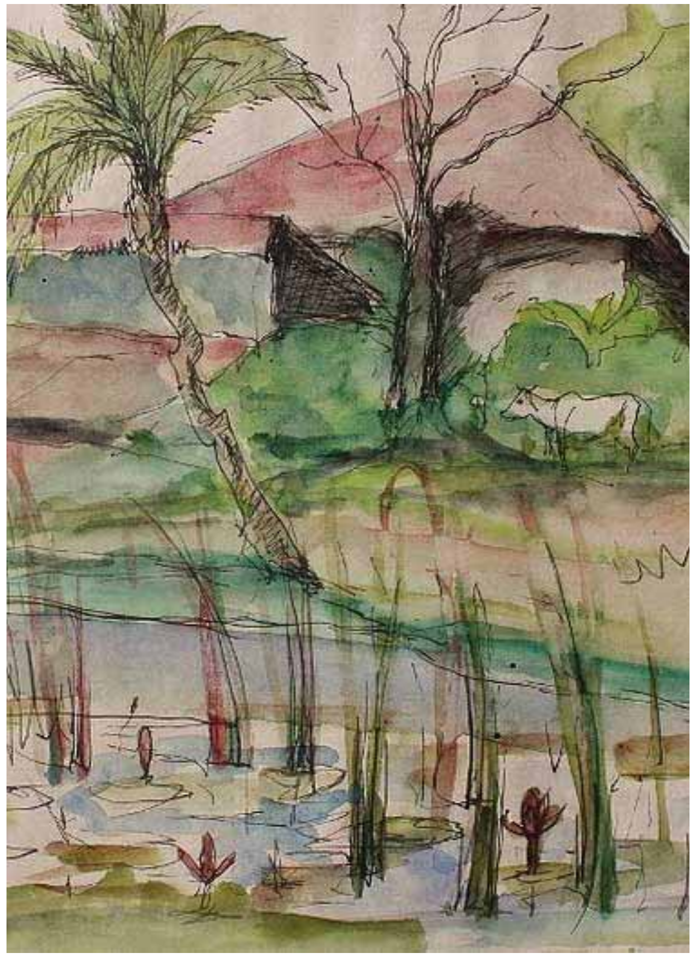

পড়ার টেবিল হিজিবিজি
লাগে না আর ভালো,
ভালো লাগে বাঁশবাগানে
জোনাকিদের আলো।
ভালো লাগে মাঠের ফড়িং
ভালো লাগে নদী,
কেমন হবে নদীর জলের
মাছ হয়ে যাই যদি?
কেমন হবে পাঠশালাটা
যদি গো হয় মাঠে,
ইচ্ছে হলেই খেলব আমি
ইচ্ছে হলেই পাঠে।
মায়ের শাসন চাই না আমি
চাই না শাসন বাবার,
চাই না খেতে গ্লাস ভরা দুধ
ডিমও সাথে আবার।
মনের কথা বলেই দিলাম
আসল কথা বাকি,
আমি হলাম ভালো ছেলে
দেই না পড়া ফাঁকি।

বৃষ্টির ছড়া

আহাদ আলী মোল্লা

বৃষ্টি যেন বাজায় নূপুর
সকাল-দুপুর
টাপুর টুপুর
টুপ,
লম্ফ মারে ডোবায় ব্যাঙ
ড্যাঙর ড্যাঙ
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
ঘুপ-
এসব দেখে খুকুর ঠোঁটে
হাসি ফোটে
রয় না মোটে
চুপ।

অমিতাভ প্রামাণিক

মহাভারতের যুগে ছিল কোনও পাদ্রী?
প্রশ্ন শুনেই গেল ঘাবড়িয়ে মাদ্রী।
তাই দেখে অ্যায়সান খচে গেল পান্ডু!
এত পাপ! করা সম্ভব নয় u n d o !
দু'চারটে জবাফুল গুঁজে নিয়ে টিকি মে
গটগট পায়ে হেঁটে চলে গেল সিকিমে।

এই দেখে মুশকিলে পড়ে গেল শকুনি
দুর্যোধনকে ডেকে কষে দিল বকুনি।
দুর্যু কি বোঝে তার কথা একবর্ণ?
ভাইকে তলব করে, কোথায় রে কর্ণ?
কর্ণ রান্নাঘরে, সাথে একলব্য
চুরি করে খাচ্ছিল খাঁটি ঘৃত, গব্য।
হঠাৎ হাজির সেথা ব্যাটা দুঃশাসনে
হাত ফস্কাল আর পা পড়ল বাসনে।
উপায় না পেয়ে তাই ডেকে দুঃশলাকে
কর্ণ প্রশ্ন করে, খেয়ে গেছে কলা কে?
ভীমসেন ঘুরছিল হস্তিনাপার্কে
শুনে বলে, কলা খায় হনুমান, আর কে!
হনু ক্ষেপে ব্যোম, বলে, অ্যাতো আস্পর্দ্ধা!

আমাকে চোর বলিস, আমি তোর বড়দা!
ফের যদি অভিযোগ শুনি এই বান্দার
নামে, এক চড়ে তোকে পাঠাবোই গান্ধার।
ভীমকে সাপোর্ট দিতে সহদেবে-নকুলে
এসে দেখে শত্রুরা বেড়ে গেছে গোকুলে।
তবুও তার ল্যাজ ধরে যেই দিল বিশ টান
দ্যাখে, হনু কোথা? এ তো সিকিমের খ্রিস্টান!

ছড়ার নাম মোয়া-ভারত

ছুটি

সামসুন্নাহার ফারুক

স্কুল ছুটি হলে
যাব মামাবাড়ি,
খেলা খেলা সারাবেলা
মজা কাড়ি কাড়ি।
ভাপা পুলি রসপিঠা
ক্ষীরের পায়েস,
মিঠে রোদে খাব বসে
করব আয়েশ।
পিকনিক, রসচুরি
আরও কত খেলা,
খেলে খেলে সারাদিন
কেটে যাবে বেলা।

ভাষা

অংশুমান দাশ

আমার ভাষা বাংলা ভাষা
তোমার ভাষা চৈনিক,
তোমরা যাকে সৈন্য বল
আমরা বলি সৈনিক।
আমার বাবার কাবাব প্রিয়
মায়ের কিন্তু পান্তা,
কোনটা আমার মাতৃভাষা
প্রশ্নটা নয় সস্তা।
কিষান যেমন ফসল ফলায়
তেমনি ফলায় চাষায়,
সবার গর্ব অটুট থাকুক
সবার মাতৃভাষায়।

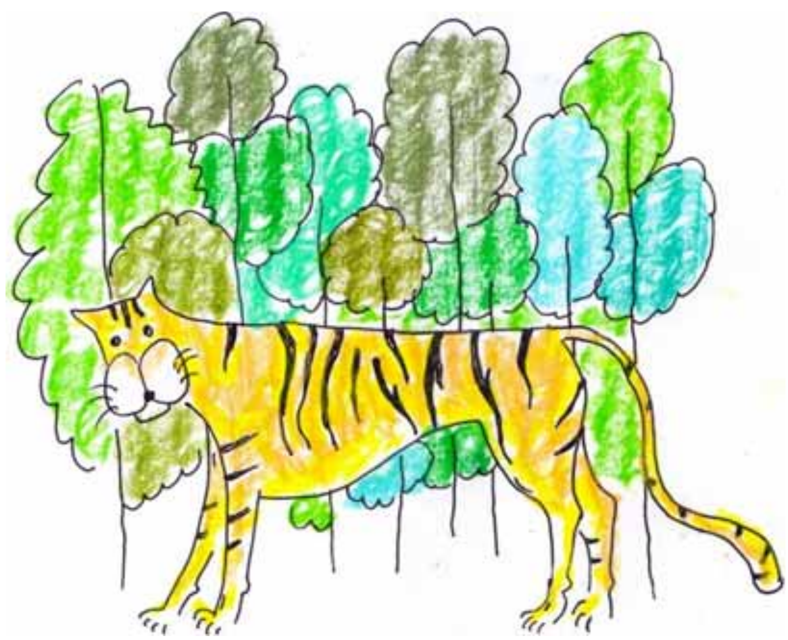

আলাদা ভূগোল

অংশুমান দাশ

এপারের বীজ উড়ে যায়
ওই পারে সুন্দরীগাছে,
এই দেশে বসন্ত এলে
ওই দেশে প্রজাপতি নাচে।
নদী, জল এপার ওপার
মাছেদের ভিসা নেই কোনও,
বাঘেদের ডোরাকাটা গায়ে
কেউ ছাপ মারেনি কখনও।
যে লতাটি ভারতের দিকে
ভরে ওঠে বাংলার ফুলে,
একটাই সুন্দরবন
ছিঁড়ে ফেলা আলাদা ভূগোলে।

ছবিঃ অংশুমান

কে বড়ো, কে ছোটো

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

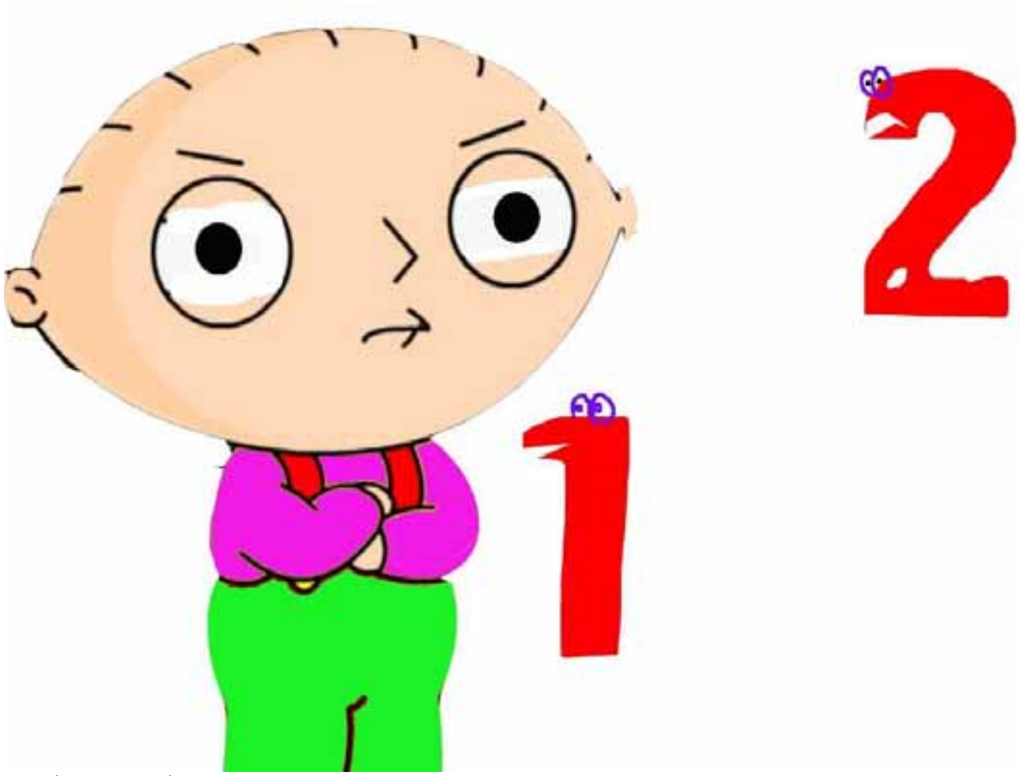

একে দুইয়ে ঝগড়াটা লেগেছে বেজায়,
এক বলে আমি বড়ো, দুই বলে নয়।
এককের তকমাটা আমারই তো ভাই,
এক বলে, হিসেবেতে বড়ো আমি তাই।
দুই বলে কমতিটা আমার কোথায়,
সহজে বোঝাতে তুমি পার কি আমায়?
মৌলিক সংখ্যাতে আমি তো প্রথম,
তবে কেন বড়ো নই বল দেখি সোম?
ঝগড়াটা ভালো করে জমেছে যখন,
মঞ্চেতে তিনভায়া আসেন তখন।
হেসে বলে ঝগড়াটা মিছিমিছি কর,
দু'জনেই মেনে নাও আমিই তো বড়ো।
বিজোড়ের মৌলিকে আগে আগে চলি,
আরও কথা আছে শোন, চুপি চুপি বলি।
পুরুষ সংখ্যা বলে আমাকেই জানে,
প্রথমেতে বসে আছি সকলেই মানে।
তিনের বাক্য শুনে রেগে বলে দুই,
জোড়েতে প্রথম আমি ভুলে গেলি তুই?
দু'জনের ঝগড়াতে এক বলে হেসে,
পূর্ণ সংখ্যা হলে প্রথমে কে বসে?
কে যে বড়ো, কে যে ছোটো বল দেখি ভাই,
চটপট তোমাদের উত্তর চাই।

বাঁধন ছাড়া

উত্তীয় কোলে

সুয্যিমামা দিচ্ছে হামা
পশ্চিমের ওই কোণে,
বিদায় বেলার সময় খেলার
সরছে ক্ষণে ক্ষণে।
আয় রে তোরা বন্দি মোরা
খেলবি নাকি রাতে?
চাঁদের কুলে বাঁধন ভুলে
থাকব বুড়ির সাথে।

স্বপ্ন লয়ে বেতাল হয়ে
যাব তারার দেশে,
চোখ ধাঁধিয়ে মন মাতিয়ে
সাজব পরির বেশে।
ঊষা হলে মায়ের কোলে
ফিরব চুপি চুপি,
যতই জেদে রাখুক বেঁধে
দেবই মাকে টুপি।

রোগী: স্যার, আপনার মলম কাজ করছে না।
ডাক্তার: মলম ঠিকঠাক লাগিয়েছেন তো?
রোগী: হ্যাঁ স্যার। ঘরের চৌকাঠে লাগিয়েছি।
ডাক্তার: চৌকাঠে কেন?
রোগী: আপনিই তো স্যার বললেন, যে জায়গায় ব্যথা পেয়েছি সে জায়গায় লাগাতে।

রোগী: স্যার আমার ওজন কমাতে চাই!
ডাক্তার: সকালে দুটো রুটি, দুপুরে হাফপ্লেট ভাত ও রাতে একটা রুটি খাবেন।
রোগী: স্যার, এগুলো কি খাওয়ার আগে খাবো না পরে খাবো?

রোগী: আমার ভীষণ পেট ব্যথা!
ডাক্তার: আপনার পায়খানা কেমন?
রোগী: গরীব মানুষের পায়খানা আর কেমন হবে স্যার ! তিন পাশে বেড়া, আর সামনে ছেঁড়া চটের পর্দা।

ডাক্তার: আপনি তো সেরেই উঠছেন! এত চিন্তা কীসের?
রোগী: স্যার, আমি যে গাড়ীর সাথে এ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম তার পিছনে লেখা ছিলো, আবার দেখা হবে।

ডাক্তার: এক্স-রে তে দেখলাম আপনার পেটে অনেক গুলো চামচ, কেন বলুন তো?
রোগী: আপনিই তো বলেছেন প্রত্যেকদিন দু'চামচ করে খেতে।

ডাক্তার: আমার Prescription Follow করছেন তো?
রোগী: ওটা Follow করলে আমি মরেই যেতাম!
ডাক্তার: কেন?
রোগী: ওটা যে চার তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল।

সংহিতা

কয়েকদিনের মধ্যেই দলে আমার অবস্থান বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। শ'খানেক লোকের একটা দলের দায়িত্ব দেয়া হল আমাকে। যদিও আমার ওপরে গফুর খান রয়েছে, তবু যে সম্মান আমি পেলাম তা জীবনে কখনো পাবো বলে আশা করিনি। একটু সময় বের করে আমি এইসব খবর জানিয়ে বাবা আর আজিমাকে লম্বা চিঠি লিখে ফেললাম। জানতাম আমার উন্নতির খবরে তারা সবচেয়ে বেশি খুশি হবে।

শিবিরের রোজ সকালটা আমার শুরু হত চিতুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নতুন আসা সেনাদের মহলা দেখে। দিন শেষ হত লড়াইয়ের মাঠে অস্ত্রশস্ত্রের মকশো করে। সেখানে আমি আমার সুনামটা নিয়মিতই ধরে রাখতাম। নেমাওয়ারের এই একটা মাস ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়।

দেখতে দেখতে দশেরা এসে গেল। মহা ধুমধামে মা দুর্গার আরাধনা শেষ করে সৈন্যদের সাজিয়ে গুণতিকরে ফেলা হল। দেখা গেল পাঁচ হাজার সুশিক্ষিত যোদ্ধা আর কিছু কম পটু তলোয়ারবাজ নিয়ে মোট আট হাজার সৈন্য একত্র হয়েছে। সবাই তখন দেশে লুটপাটের অভিযান চালাবার জন্য তৈরি। ঠিক করা হল নর্মদা পার হয়ে গোটা দলটা দু ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য ফিরিঙ্গিদের সৈন্য আমাদের তাড়া করবেই। তাদের হাত এড়িয়ে কৃষ্ণা নদী পার হয়ে দাক্ষিণাত্যের একেবারে গভীরে ঢুকে যাবে আমাদের দলবল।

পুরো বাহিনীটাই শিবির ভেঙে রওনা হয়ে গেল একদিন সকালে। নর্মদায় নৌকোর ব্যবস্থা করে রাখা ছিল তাইতে করে সেদিনই দুপুরের মধ্যে নর্মদা পার হয়ে দক্ষিণ পারে হিন্দিয়া শহরের কাছে আমরা প্রথম ঘাঁটি গাড়লাম।

এইখান থেকে দল দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। চিতুর দলের সঙ্গে আমি চললাম পশ্চিমমুখো, তাপি নদীর দিকে। তাপির অববাহিকা ধরে আমরা গিয়ে ঢুকবো নাগপুরের রাজার এলাকায়।তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই চুক্তি করা আছে, তিনি আমাদের কোন বাধা দেবেন না। বিনিময়ে আমরাও তাঁর রাজত্বে কোন লুটপাট করব না বলে কথা দেয়া হয়ছে।

অন্যদলটা যাবে পুব মুখে। তার নেতা ভিখু সৈয়দ। দলে চিতুর ঠিক পরেই তার স্থান। তারা নর্মদার পাশবরাবর গিয়ে নাগপুরের বড় রাস্তা ধরবে।

আমাদের দলটা খুব তাড়াতাড়ি চলছিল। টাকাপয়সার অবস্থা সবারই বেশ খারাপ। শিগগির ঠিকঠাক এলাকায় ঢুকে লুটপাট শুরু করতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে। আমাদের খোঁজারুরা খবর এনেছিল, ফ্রেজার নামে এক ইংরেজ সেনাপতি তিনশো সেনা নিয়ে পনেরো ক্রোশ দূরে বসে আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। কথাটাতে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। কয়েক হাজার ঘোড়সওয়ারের একটা দলকে মাত্র তিনশো লোক এত দূর থেকে এসে আক্রমণ করবে সেটা মোটেই ভাবা যায় না।

কিন্তু বাস্তবে তাই হল। সাহেবের সাহসের বহর আমরা আন্দাজ করতে পারিনি। সেদিন সকালবেলা একটা গ্রামের কাছে এসে আমাদের দলটা রান্নাখাওয়া শুরু করেছে এমন সময় লাল কোট পরা সৈন্যদের দলটা আমাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছে দুমদাম গোলাগুলি ছুঁড়তে শুরু করল। তাতে লোকজন দেখি বেজায় ভয় পেয়ে এলোমেলো ছুটছে। একবার যদি ঘুরে দাঁড়াতাম আমরা তাহলে সেই তিনশোটা লোক এক ফুঁয়ে উড়ে যেতো আমাদের সামনে। সে চেষ্টাও আমি করেছিলাম। কিন্তু আমার একশোটা লোক ছাড়া আর কাউকে সঙ্গে পেলাম না। বাধ্য হয়ে আমাদেরও পেছন ফিরে পালাতে হল। দূর থেকে দেখলাম, আমাদের গোটা ঘাঁটিটা তারা এসে দখল করল। উনুনে

উনুনে রান্না হতে থাকা খাবার তো তারা পেয়েছিলই, সেইসঙ্গে আমাদের দলের অধিকাংশ লোক দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে খালি হাতেই ঘোড়ায় চড়ে পালাবার ফলে অনেক দামি জিনিসপত্রও পেয়ে গেছিল তারা। ভাগ্য ভালো যে ইংরেজদের দলটা তত বড় ছিল না। নইলে সেদিন আমাদের দলটার আর অস্তিত্ব থাকত না। দিনতিনেক পরে আবার যখ সব একত্র হলাম তখন দেখা গেল সাকুল্যে একশো লোক মারা গেছে আমাদের। বাকি দলটা এবার ফের একত্র হয়ে এগিয়ে চললাম।

জঙ্গলের পথ ধরে চলতে চলতে অবশেষে আমরা এলিচপুরের কাছাকাছি এসে পৌঁছোলাম একদিন। রাস্তাটায় আমি আগেও এসেছি সেই শুরফুনের ঘটনাটার সময়। সেই রাস্তা ধরেই ওয়ারদা নদীর কাছ দিয়ে এসে আমাদের দল নিজামের রাজত্বে ঢুকল। তারপর একদিনে পঁচিশ ক্রোশ রাস্তা পার হয়ে এসে পৌঁছোল চিতুর প্রথম নিশানা অমরাবতীতে। আগে যখন এখানে এসেছি তখনও শহরটা সমৃদ্ধ ছিল। এখন দেখলাম আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

আমাদের বন্যার মত ধেয়ে আসতে দেখে পথের পাশে প্রত্যেকটা গ্রাম ছেড়ে লোকজন পালিয়ে যাচ্ছিল। ফাঁকা গ্রামগুলো লুটপাট করে বেশ ভালোরকম রোজগার হচ্ছিল আমাদের। আমি ছিলাম একেবারে সামনের দলে। আমার পেছনে ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা তখন বেড়ে পাঁচশো হয়েছে। গফুর খানের বোধ হয় সে দিনটা আমার ওপর একটু ঈর্ষা হয়ে থাকবে। তাকে সেদিন চিতুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হচ্ছিল। আমার সঙ্গে চিতু বেশ কিছু লোক পাঠিয়ে দিচ্ছিলো যাতে আগে আগে গিয়ে অমরাবতী শহরটা ঘিরে ফেলি। আর মূল দলটাকে নিয়ে চিতুরা পেছনপেছন আসছিল।

আমার দলটা একপাল পঙ্গপালের মত ধেয়ে যাচ্ছিল অমরাবতী শহরের দিকে। ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে দেখছিলাম, হাজার হাজার লোক চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালাচ্ছে। একেকটা গ্রামে ঢুকে দেখা যাচ্ছিল, গোটা গ্রাম খালি। শুধু কিছু লোক সোনাদানা, টাকাপয়সা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য। তাদের একটাই ভিক্ষা, গ্রাম যেন জ্বালিয়ে না দিয়ে যাই। আমার তাতে আপত্তি ছিল না বিশেষ। কিন্তু এগোতে এগোতে পেছনে আকাশ বেয়ে ওঠা ধোঁয়ার কুন্ডলি দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, পেছনে আসা চিতুর মূল দলটার বুকে আমার মত অত দয়ামায়া নেই।

বিকেল বিকেল অমরাবতী পৌঁছে দেখি, যে সামান্য কজন সৈন্য শহর পাহারা দেবার জন্য রাখা ছিল তারা আমাদের আসবার খবর পেয়েই দল বেঁধে পালিয়ে গেছে। পাহারাহীন শহরে আমি আমার দল নিয়ে বিজয়ীর মত এসে ঢুকলাম। এর আগে যখন এখানে চোরের মত এসে ঢুকেছিলাম তখনকার সঙ্গে এই আসায় কত তফাৎ!

শহরের বাজার এলাকায় এসে প্রথমেই তার মূল রাস্তার ডুপাশে পাহারা বসিয়ে দেয়া হল।এখানেই এখানকার সব বড় বড় ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি। তারপর, বাজারের মাঝখানে চক এলাকায় পৌঁছে আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। সেখানে শহরের গণ্যমান্য লোকেরা গালচে বিছিয়ে আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। তবে দু'পক্ষের কেউই যেহেতু খোশগল্প করবার জন্য সেখানে আসিনি তাই সৌজন্যমূলক কথাবার্তায় কেউই বিশেষ সময় নষ্ট করলাম না।

লোকগুলো আমায় প্রস্তাব দিল যেন এক লখ টাকা নজরানা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এ নিয়ে খানিক টালবাহানা করবার পর আমি বললাম, "এসব বাজে কথা রেখে এইবার কাজের কথা শুনুন। মাত্র এক লাখ টাকা দিয়ে চিতুকে খুশি করে ফেলবেন এই যদি আপনাদের ধারণা হয় তাহলে আপনারা খুব বড় ভুল করছেন। পিন্ডারিরা যেখান দিয়ে যায় সে জায়গার কী দশা হয় যদি দেখতে চান তো একটা উঁচু বাড়ির মাথায় উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন একবার আমাদের আসবার পথে গ্রামগুলোর কী দশা করা হয়েছে। চিতুর মূল বাহিনী আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে এসে পৌঁছোবে। তার আগেই আপনারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করে নিন, কী করবেন। আপনাদের প্রস্তাবে যদি চিতুকে খুশি করতে না পারেন তাহলে আপনাদের যা আছে সে সব তো যাবেই, সেইসঙ্গে আপনাদের ঘরের বউ-মেয়েরাও নিরাপদে থাকবে না। তখন আমরা এইখানেই ক'দিন থেকে গিয়ে আপনাদের প্রত্যেকের অন্দরমহলের খবরাখবর নেব, কী বলেন?" এই বলে আমার তলোয়ারটাকে আমি মাটিতে শুইয়ে রেখে বললাম, "যান। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলুন। ওই গাছের ছায়াটা এই তলোয়ার অবধি পৌঁছোন পর্যন্ত আপনারা সময় পাবেন। তার মধ্যে আমাদের খুশি করবার মত কোন প্রস্তাব নিয়ে আসতে না পারলে, আপনাদের বাড়িগুলো তো কাছাকাছি রইলই, আমরা সেগুলোর খবর নিতে শুরু করব।"

আমাদের দলের লোকজন খুশি হয়ে বলে, ‘‘দারুণ বলেছেন মীর সাহেব, কিন্তু খবরাখবরটা এক্ষুণিই নিতে শুরু করতে দোষ কী? এই কিপ্টে সাহুকারগুলো আমাদের মানইজ্জত বাঁচাবার মত প্রস্তাব দিতে পারবেই না।’’

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ‘‘একটু ধৈর্য ধর। দেখা যাক না কী বলে এরা। ততক্ষণ কোন গন্ডগোল কোরো না।’’

গাছের ছায়াটা যখন তলোয়ারটাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে, আর আমার লোকেরাও অধৈর্য হয়ে ছটফটানি জুড়েছে তখন সাহুকারদের দলটা ফের এসে হাজির হল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে মোটা সর্দারমতো একজন সামনে এগিয়ে এসে বলে, ‘‘আসুন মীরসাহেব, বসুন। বসে কথা বলা যাক। তাড়াহুড়োয় ব্যবসার কথাবার্তা ভালো করে হয় নাকি?’’

উত্তর আমি বললাম, ‘‘উঁহু , বসা টসা নয়। আপনাদের যা বলবার তা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনব। আমার লোকজন কেমন ছটফট করছে দেখতে পাচ্ছেন তো! আপনারা ভালো কিছু না শোনাতে পারলে কিন্তু এদের আমি আর বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারব না। আপনাদের কথায় এরা যদি খুশি না হয় তাহলে আপনাদের জীবনের জিম্মা আর আমার নয় এই কথাটা বলে দিলাম।’’

সাহুকারদের সর্দার বলে, ‘‘তাহলে মীরসাহেব, আপনি আমার সঙ্গে একটু দূরে চলুন। যা বলবার আপনাকে আলাদাভাবে বলি। ভয় পাবেন না। সাহুকার কখনো ছুরিটুরি মারে না।’’

আমি হেসে বললাম, ‘‘ভয় আর পাবো কাকে? চলুন, কী বলবেন বলে ফেলুন তাড়াতাড়ি। আপনাদের দোকানটকান আর বাড়িগুলো দেখে লোভ সামলে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে আমাদের,’’ এই বলে দলের অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘‘এই মহাশয়দের ততক্ষণ তোমরা একটু দেখেশুনে রেখো হে। আমি কথাটা শুনে আসি গিয়ে।’’

খানিক দূরে গিয়ে সাহুকার আমায় বলে, ‘‘শুনুন,আপনার দলটা তো মূল দলের আগে আসা খোঁজারু দল। আমরা শুধু এই খোঁজারু দলটাকে এক লাখ টাকা দিচ্ছি। তার মধ্যে দশ হাজার যাবে আপনার একার ভাগে। এই নিয়ে খুশি হয়ে যান। ভাঙচূর কিছু করবেন না। মূল দলটা এসে পৌঁছোলে আমরা তাদের সঙ্গে নতুন করে বোঝাপড়া করে নেব। টাকাটা নিয়ে আপনারা সামনে এগিয়ে গিয়ে রাতটা কোন একটা গ্রামে কাটান।’’

প্রস্তাবটা আমার মনে ধরল। চিতু এখান থেকে যত টাকা তুলবে বলে ঠিক করেছে সেটা সে যেনতেনপ্রকারেণ তুলে নেবেই। আমরা তাহলে আমাদের ভাগটা ছাড়ি কেন। আমাদের হিস্যা থেকে তাকেও তো এক তৃতীয়াংশ আমরা দেবই। বললাম, ‘‘ঠিক আছে। কিন্তু আমরা এখান থেকে উপস্থিত কোথাও যাচ্ছি না। পঁচিশ ক্রোশ ঘোড়া চালিয়ে এসেছি। আমাদের একটু বিশ্রামও তো দরকার নাকি?’’

‘‘ঠিক আছে। থাকুন তাহলে। টাকা তৈরি আছে। আপনার দলকে গিয়ে বোঝান এবারে। মারপিট করলে এরা যা পাবে, তার চেয়ে মিষ্টি কথায় অনেক বেশি টাকা পেয়ে যাবে।’’

দলের মধ্যে ফরে এসে সব খুলে বলতে সবাই বেজায় খুশি হয়ে হই হই করতে শুরু করে দিল।

টাকাটা এরা নিশ্চয় আগে থেকেই জোগাড় করে রেখেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখি বড় বড় টাকার বস্তা নিয়ে লোকজন সার বেঁধে আমাদের দিকে আসছে। পিন্ডারিদের একেকটা দল তাদের সর্দারের নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রত্যেক পিন্ডারি পেল একশো টাকা, আর তাদের সর্দাররা পেল হাজার টাকা করে।

সবার টাকা নেয়া হয়ে গেলে সাহুকার বলে, ‘‘আপনি আপনার টাকা নিলেন না মীর সাহেব?’’

বললাম, ‘‘সে আমি পরে আপনার কাছ থেকে বুঝে নেব।’’

পীর খান দেখি খুব খুশি হয়েছে। বলে, ‘‘একদিনে, একটা লোকও নিকেশ না করেই হাজার টাকা চলে এলো, মীরসাহেব, এ দেখছি আমাদের পেশার চেয়ে অনেক ভালো কাজ!’’

তাকে ঠোঁটে আঙুল রেখে বললাম, ‘‘চুপ। আমাদের গোপন কথা নিয়ে একটা কথাও নয় এখানে। এখন যাও। খেয়াল রাখো আমাদের লোকজন যেন কোন ঝামেলা না বাধায় এখানে।’’

সে হাসিমুখে মাথা নেড়ে চলে যেতে সাহুকারদের দলটা এসে আমায় ঘিরে বসল। বলে, ''চিতু সর্দার কত চাইবেন বলে আপনার মনে হয় মীরসাহেব?''

বললাম, ''সে আমি বলতে পারবো না,তবে টাকাপয়সা নিয়ে বেশি কষাকষি না করাই ভালো। পিন্ডারিরা আবার বেশি কথার মানুষ নয়। সোজাসুজি হাত চালিয়ে দেবে রেগে উঠলে। লোকজনকে কষ্ট দেবার করবার ব্যাপারে এরা বেজায় দক্ষ কিনা!''

শুনে, গোটা দলটা দেখি বেশ ভালোরকম চমকে উঠেছে। বুঝলাম ঠিক জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছি। ব্যাপারটাকে একটু বিস্তারিত করয়ার জন্য বললাম, ''এই যেমন ধরুন কোড়ার ঘা। আপনাদের ওই নরম পিঠগুলোর থেকে খাবলাখাবলা মাংস উঠে যাবে এক এক ঘায়ে—কিংবা ধরুন আঙুলের তলায় দড়ি বেঁধে ফুলে ওঠা আঙুলের মাথায় লাঠি দিয়ে পেটানো। অনেকে আবার আছে, থলের মধ্যে নানান বাজে জিনিস ভরে মাথার ওপর পরিয়ে দিয়ে তারপর পেটানো চালু করে। তবে সেসব হল বদমাশ সাহুকারদের জন্য। আপনারা তো আর সেরকম লোক নন, তাই বলছিলাম--''

এইবারে তারা আমায় ধরে একেবারে ঝুলোঝুলি শুরু করে দিল। বলে, "মীর সাহেব, একটা আন্দাজ অন্তত দিন, কত পেলে চিতু খুশি হয়ে যাবে। তাঁর সঙ্গে তো হাজারপাঁচেক লোক আছে বলে শুনেছি।''

বললাম, ''উঁহু। লোক আছে দশ হাজারের কাছাকাছি। সে তো একটু পরে গোটা দলটা এসে পৌঁছোলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। আমার মনে হয় চিতুর জন্য এক লাখ, তার তিন প্রধান সেনাপতি গফুর খান, হীরু আর রাজনের জন্য পঞ্চাশ হাজার করে, প্রত্যেক সর্দারের জন্য এক হাজার আর প্রত্যেক পিন্ডারিকে একশো করে দিলেই চলবে। কী? ঠিক বলছি তো?''

''হে ভগবান! সে তো প্রায় আট লাখ টাকা হয়ে যাবে। মরে যাব হুজুর। বিলকুল মরে যাব আমরা।''

''না না, মরবেন কেন? আমরা তো জানি অমরাবতী হায়দরাবাদের চেয়েও বেশি বড়লোকের জায়গা। টাকা তো এখানে শুনি লাখে নয়, কোটিতে হিসেব করা হয়। সেই নেমাওয়ার ছেড়ে বের হবার পর থেকে রোজগারপাতি হয়নি কিছুই, তার ওপর এতটা পথ পেরিয়ে চিতু তেতেপুড়ে আসবে! আমার মনে হয়, এইসব কথা তাকে শোনালে সে দশ হাজার লোক শহরে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বাড়ি ঢুকে যাচাই করিয়ে নেবে সত্যিসত্যি আপনাদের কাছে কত টাকা আছে। তার চেয়ে শুরুতেই একটা ভালোমত নজরানার প্রস্তাব দিয়ে দিন, চিতুর মেজাজ শরিফ হয়ে যাবে। তাতে আপনাদেরই লাভ।''

সর্দার তার দলের দিকে ফিরে বলল, ''মীর সাহেব কথাটা ঠিকই বলেছেন। আমাদের মা মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে হলে ওঁর কথাটা শোনাই ভালো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এত টাকা--''

বুঝলাম, একটু দর কষাকষি করবে এরা। মুখে বললাম, ''বেশ, বেশ। এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছেন। এইবারে শুনুন। চিতু খুব মানী মানুষ। তার সেনাপতিরাও তাই। আপনারা তাড়াতাড়ি পান আতর টাতর দিয়ে একটা থালা সাজিয়ে ফেলুন। আর হ্যাঁ, কটা ভালো শাল আনিয়ে নিন। চিতু এসে পৌঁছোনো মাত্র তাকে খাতির করে বসিয়ে পান, আতর দিয়ে, কাঁধে শাল জড়িয়ে অভ্যর্থনা করে সামনে নজরানা সাজিয়ে দেবেন। দেখবেন দশ লাখের জায়গায় আট লাখ টাকা দিয়েই পার পেয়ে যাবেন। শহরটাও বেঁচে যাবে।''

''নিশ্চয়,নিশ্চয় মীর সাহেব।আপনি না থাকলে আজ আমরা কী যে করতাম-''

''ওহো, আরেকটা কথা। চিতু এলে তার সামনে মুখ গোমড়া করে থাকবেন না যেন। বেশ হাসিখুশি একটা ভাব দেখাবেন, যেন সে এসে পায়ের ধুলো দেয়ায় আপনারা কৃতার্থ হয়ে গেছেন। যতক্ষণ না ভয় পাবার কোন কারণ দেখা দিচ্ছে ততক্ষণ ভয় প্রকাশ করবেন না।''

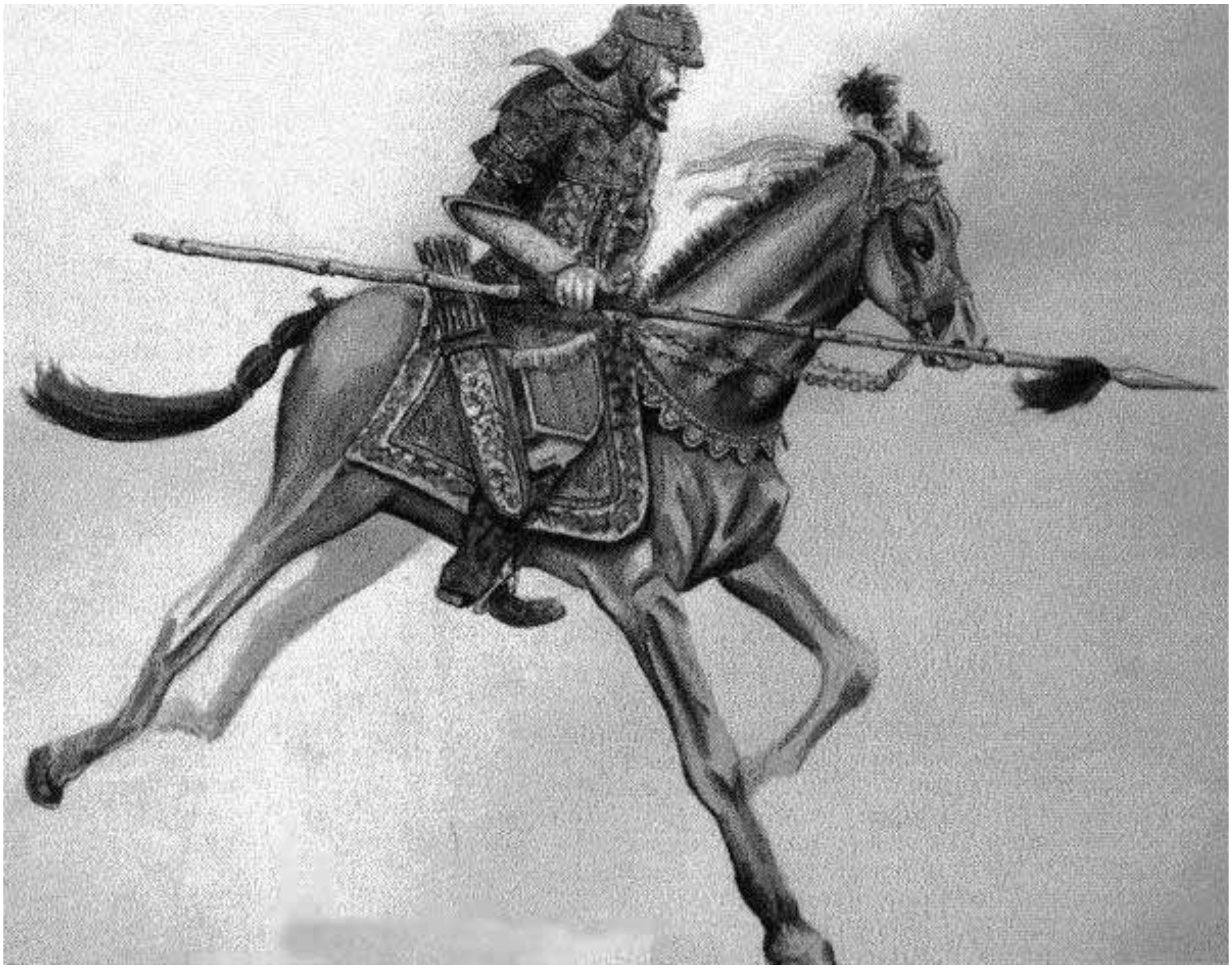

বলতে বলতেই একসাথে অনেক ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর গাদাবন্দুকের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ আসতে বুঝলাম চিতুরা পৌঁছে গেছে। সাহুকারদের দেখি এত বোঝানো সত্ত্বেও ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। ঠকঠক করে কাঁপছে সবাই। একটু পরেই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চিতু ঢুকতে সাহুকারদের দলটাকে নিয়ে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। সর্দার সাহুকার চিতুর ঘোড়ার জিনে কপাল ঠেকিয়ে বলল, ''আসুন হুজুর। আরাম করুন। আপনার নজরানা তৈরি আছে।''

আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই একই কথা বলে উঠতেই চিতু দেখি কান খাড়া করেছে। বলে, ''চেনা গলা মনে হচ্ছে? কোন শয়তান রে?''

বললাম, ''আমি, আমীর আলি হুজুর। আপনার দাসানুদাস।''

''সে কী হে মীরসাহেব? তুমি কি সাহুকার বনে গেলে নাকি? ব্যাপারটা কী?''

''না হুজুর। আমি এদের সঙ্গে মিলেমিশে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। এরা ভারি ভয় পেয়েছিল হুজুর। আমি এদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করেছি।''

''বেশ , বেশ। তা, সব তৈরি তো?''

''তৈরি হুজুর,'' সব সাহুকার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

সর্দার সাহুকার এইবারে চিতুকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে কাছের একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে উজ্জ্বল আলো জ্বালানো একটা ঘরের ভেতর সাদা চাদর পাতা ছিল। তার ওপর রাখা একটা মসনদের ওপর বসানো হল চিতুকে। খাতির পেয়ে চিতুর ভয়ানক মুখটায় দেখি বেশ খুশি খুশি ভাব জেগেছে। পাশ ফিরে রাজনকে বলে, ''লোকগুলো তো বেশ ভদ্র দেখছি। আমি তো এরকম খাতরদারি পাব ভাবিই নি। কী বলো?''

সে মাথা নেড়ে বলে, ‘‘আমিও ভাবিনি। ভবেছিলাম বেশ একটা যুদ্ধটুদ্ধ করে শহরে এসে ঢুকব। এ নিশ্চয় আমীর আলির হাতযশ।’’

‘‘হ্যাঁ, তাই হবে। নাহলে এই জন্তুগুলো যার যার বাড়ির দোর বন্ধ করে বসে থাকত এতক্ষণে। আমাদের গিয়ে টেনে টেনে বের করতে হত সব। তা ঠিক আছে। এখন দেখা যাক এরা কী বলে!’’

সর্দার সাহুকার অমনি আমাকে একটা গুঁতো দিয়ে বলে, ‘‘চিতুকে যদি আমাদের প্রস্তাবে রাজি করাতে পারেন তাহলে আরো পাঁচশো টাকা পাবেন আপনি—না না, ওটা হাজারই ধরে নিন।’’

‘‘গাধার বাচ্চাগুলো তোমার সঙ্গে কী এত গুজুর ফুসুর করছে আমীর আলি? কথা বলে না কেন?’’ চিতুর গর্জন ভেসে এল হঠাৎ।

আমি বললাম, ‘‘খোদাবন্দ, আপনার সামনে ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না এরা। আপনার উপযুক্ত নজরানাই এরা দেবে, কিন্তু আপনার প্রতাপ দেখে মুখ ফুটে সে বিষয়ে কিছু বলবার ক্ষমতা এদের চলে গেছে। এরা আমায় অনুরোধ করছিলো এদের হয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে।’’

চিতুর মুখে একটা ঠান্ডা হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে খুশি হয়েছে সে বোঝা যাচ্ছিল। বলে, ‘‘কবুল, কবুল। এখন নজরানা পেশ করা হোক। দেখি অমরাবতীর সাহুকারের নজরানা কেমন হয়।’’

পনেরোটা ভেলভেটের ঢাকনা দেয়া থালা এনে নামিয়ে দেয়া হল চিতুর সামনে। ঢাকনা সরিয়ে দেখা গেল তার মধ্যে চারটেয় বোঝাই করা আছে খেজুর, মনক্কা, কাজু, পেস্তা আর নানাজাতের মিষ্টি। বাকি থালাগুলোতে অজস্র দামি দামি দেশি আর বিলিতি কাপড়ের স্তূপ। একেবারে রাজার নজরানা যাকে বলে। চিতু তো দেখে ভারি খুশি। আমি সর্দার সাহুকারকে একটা ঠেলা দিয়ে বললাম, ‘‘এইবারে মেজাজটা শরিফ হয়েছে। শাল আর আশরফিগুলো কোথায়?’’

সাহুকার একজন কাজের লোকের হাত থেকে শাল নিয়ে তার ওপরে পাঁচটা আশরফি রেখে তাই নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে তিনবার কুর্নিশ করে শালটা মেলে ধরল। চিতু তার থেকে আশরফিগুলো তুলে নিতে শালটা তার কাঁধে জড়িয়ে দিয়ে পিছিয়ে এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল সাহুকার।

গফুর খানের দিকে ফিরে চিতু এইবার বলে, ‘‘লোকগুলোর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখছি। মানীর মান রাখতে জানে। তবে, আমায় খাতির করলেও তোমাদের তো কিছুই দিল না হে!’’

‘‘না প্রভু। ভুলিনি,’’ বলতে বলতে ফের একবার এগিয়ে গিয়ে সাহুকার তিন সেনাপতির কাঁধেও শাল জড়িয়ে দিল তাড়াতাড়ি।

চিতু এইবার হাঁক দিল, ‘‘এবারে ঘরটা তাড়াতাড়ি ফাঁকা করে দাও হে। এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে এইবারে কাজের কথা বলা যাক। সেসব ঠিকভাবে মিটলে তখন খাওয়াদাওয়ার কথা ভাবা যাবে।’’

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোকেরা ঘর ছেড়ে চলে গেল। সাহুকারের দল এবার দেখি বাজপাখির মুখে পায়রার মত কাঁপছে। চিতু তাদের আঙুল নেড়ে ডাকল, ‘‘এইও, কাছে এসে আমাদের সঙ্গে বস। কথা বলা যাক।’’

তারা এসে বসলে চিতু ফের বলল, ‘‘দেখো হে, আমার টাকা চাই। সেই নিতেই আসা। লোক আমরা সুবিধের নই। বাঁচতে চাইলে আমাদের খুশি করে দাও। চলে যাব। নইলে তোমাদের কপালে দুঃখ আছে। এইবার বল, কত দেবে বলে ঠিক করলে?’’

সর্দার সাহুকার বলল, ‘‘খোদাবন্দ, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু সাধ্যে কুলিয়েছে তা আপনাকে দেবার জন্য তৈরি করেই রাখা আছে। এই তালিকাটায় সেইসব লেখা আছে। যদি দয়া করে একবার দেখেন!’’ এই বলে ফার্সি ভাষায় লেখা একটা লম্বা কাগজ সে চিতুর হাতে তুলে দিল।

চিতু মাথা নেড়ে বলে ‘‘আরে আমি কি মুন্সি নাকি যে ওসব অংবং পড়ে ফেলব? ওসব আমার আসে না। এই তোরা কেউ পড়তে পারবি কী লিখেছে?’’ অমনি তার চারপাশ থেকে দলের সবাই মাথা নেড়ে বলে তারা কেউই পড়তে জানে না।

‘‘একজন মুন্সিকে কি খবর দেব হুজুর?’’ এই বলে এক সাহুকার খুব বিনয়ের সঙ্গে চিতুর দিকে তাকাচ্ছিল। আমি তখন এগিয়ে এসে বললাম, ‘‘যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি লেখাটা পড়ে শোনাতে পারি।’’

চিতু অবাক হয়ে বলে, ‘‘সেকী? তুমি দেখছি সিপাহীর পাশাপাশি কেরানির কাজও জানো, অ্যাঁ?পড়ো পড়ো।’’

কাগজটা হাতে নিয়ে তাতে চোখ বুলিয়ে আমি বললাম, ‘‘লিখছে,মহান চিতুর আগমনসংবাদ পাইয়া আমরা অমরাবতীর ব্যবসায়ীগণ সাধ্যমত নিম্নলিখিত তালিকা মুতাবেক যথাসম্ভব ধনসম্পদ আহরণ করিয়া হুজুরের সমীপে নজর বাবদ প্রস্তুত করিতেছি।’’

‘‘আরে ওসব ছেড়ে কাজের কথাটা বল দেখি তাড়াতাড়ি। আমার এখন ক্ষিধে পাচ্ছে। এনাদের বাড়ির মেয়েদের রান্না খাবার জন্য সেই কখন থেকে অপেক্ষায় আছি আমি!’’ চিতু অধৈর্য গলায় তাড়া দিচ্ছিল।

শুনে সাহুকার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, ‘‘খাবার তৈরি আছে প্রভু। তবে আমাদের হিন্দুদের সাদামাটা রান্না আপনাদের মুখে মোটেই স্বাদের ঠেকবে না। তাই সেরা বাবুর্চিদের এনে আপনাদের খাবার তৈরি করে রাখা হয়েছে।’’

চিতু হুংকার দিয়ে উঠল, ‘‘চোপ। অনুমতি ছাড়া একটাও কথা নয়।’’ সাহুকার তাড়াতাড়ি চুপ করে গেল। এইবার তালিকাটা নিয়ে আমি পড়তে শুরু করলাম-

‘‘আপনার জন্য পঞ্চাশ হাজার নগদ।’’

চিরুর ভুরু কুঁচকে উঠল। বলে, ‘‘শুধু এই?’’

‘‘আজ্ঞে না হুজুর , আরো আছে,’’ বলে আমি ফের পড়তে লাগলাম, ‘‘পনেরো হাজার টাকার দামি পাথর, আর দশ হাজার টাকা মূল্যের তিন থালা ভর্তি শাল ও বেনারসী জরির কাপড় প্রভুর মহলের জন্য। সব মিলিয়ে পঁচাত্তর হাজার টাকা। প্রত্যেক সেনাপতির জন্য দশ হাজার করে নগদ টাকা, পাঁচ হাজার টাকার দামি পাথর ও পাঁচ হাজার টাকার দামি কাপড়, সব মিলিয়ে প্রত্যেকের কুড়ি হাজার টাকা।’’

‘‘বলে যাও, বলে যাও--’’ চিতু উৎসাহ দিচ্ছিল।

‘‘ত্রিশজন সর্দারের প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা করে মোট ত্রিশ হাজার টাকা।’’

‘‘ভালো। আর?’’

‘‘প্রত্যেক সৈনিকের জন্য পঞ্চাশ টাকা করে। শুনেছি সব মিলিয়ে চার হাজার অতিথি এসেছেন। এছাড়া যতদিন শহরে থাকবেন ততদিন প্রভুদের খাওয়াদাওয়া, থাকা, ঘোড়ার দানা সবকিছুর খরচ শহরবাসী বহন করবে। সব মিলিয়ে এই হল এঁদের প্রস্তাব। প্রভু কী বলেন?’’

‘‘প্রস্তাব তো ভালোই। কিন্তু হিসেবে ভুল আছে একটু। সর্দার আমাদের দলে পঞ্চাশজন, তাই না গফুর খান? তাছাড়া সৈন্যও তো আছে মোট পাঁচ হাজার। কী? তাইতো?’’

কথাটা অবশ্য সর্বৈব মিথ্যে। কিন্তু সে কথা বলে লাভ নেই কোন, উলটে লোকসান। কাজেই আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘‘আমি তো সে কথা এঁদের আগেই বলেছিলাম খোদাবন্দ।’’

‘‘ঠিক আছে। হিসেবটা তাহলে নতুন করে কষে দেখ তো, ঠিক কত পাচ্ছি?’’

আমি হিসেবটিসেব করে বললাম, ‘‘আজ্ঞে, তিন লাখ পঁচাশি হাজার।’’

‘‘হুম। গফুর খান, ঘোড়াগুলোর নাল সব পাল্টাতে হবে, তাই না। ওই বাবদ আরো পনেরো হাজার ধরে দাও হে মীরসাহেব! সব মিলিয়ে চার লাখ হয়ে যাবে তাহলে। আর শোন হে সবাই। যত তাড়াতাড়ি পারো টাকাটা এনে ধরে দাও নইলে আমাদের হাত লাগাতে হলে আবার--’’

সাহুকাররা নিজেদের মধ্যে খানিক আলাপ আলোচনা করবার পর সর্দার সাহুকার উঠে হাত জোড় করে বলে ‘‘আমরা রাজি হুজুর।। টাকা আসছে।’’

‘‘ভালো। এইবার খাবারের জোগাড় করো হে। আর শোন, সব সর্দারকে কাল সকালে এই বাড়িতে এসে তাদের ভাগের টাকা আর যার যার দলের পিন্ডারিদের নিয়ে যেতে।’’

সবাই ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছি এমন সময় চিতু আমায় ডাকল, ‘‘এসো হে, আজ তুমি আমার সঙ্গে খাবে।’’

খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ভালোই করা হয়েছিলো। সে'সব সেরে তামাক টানতে টানতে চিতু জিজ্ঞাসা করল, ''এসব করলে কেমন করে?''

আমি তখন সব কথা ভেঙে বললাম। শুধু আমার হিস্যার পরিমাণটা আর তাকে বললাম না। বললে তার অর্ধেকটা চিতু নিঃসন্দেহে বাগিয়ে নিত আমার থেকে। সব কথা শুনে চিতু হেসে বলে, ''মীর সাহেব তোমার বুদ্ধিতে আমি পঁচাত্তর হাজার টাকা পেলাম, আর বাকি টাকা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আরো পঁচিশ হাজার তো পাবই। একুনে হল গিয়ে এক লাখ। শুরুটা মন্দ নয় , কী বলো? তা এসব করবার জন্য পেলে কত?''

''বেশি নয় হুজুর। সেনাপতিদের সমান ভাগ চাইতেই পারতাম, কিন্তু সেসব কিছু করিনি। আমি পেয়েছি পাঁচ হাজার।আমি খুশি।''

''উঁহু। বড্ডো কমে খুশি হয়েছো হে মীরসাহেব। এর পর থেকে কথাটা খেয়াল রেখো। যতটা পারবে নিজের জন্য তুলে নেবে। যাই হোক, এখন থেকে খোঁজারু দলটা সবসময় তুমিই আগে আগে নিয়ে চলবে। গফুর খান একটু বিরক্ত হবে। কিন্তু সে আমি সামলে নেবো। ভালো সেপাই বটে লোকটা, কিন্তু মাথামোটা। লোক মেরে আর আগুন জ্বালিয়ে কাজ উদ্ধার করতে চায় কেবল। তার বদলে একটু বুদ্ধি করে মিষ্টি কথায় যে ওর থেকে অনেক বেশি টাকা আদায় করা যায় সে কথা ওর মাথায় ঢুকলে তো!''

আমি মাথা নিচু করে বললাম, ''আপনার জয় হোক হুজুর। এই বান্দা আপনাকে যথাসাধ্য সেবা করবে।''

চিতুর কাছ থেকে বাইরে এসে দেখি সাহুকাররা দল বেঁধে বসে টাকা গুণে চলেছে। আমায় দেখে তারা খুব খুশি। তক্ষুণি আমার বিকেলের সেই দশ হাজার টাকা মিটিয়ে দিতে চাইছিল তারা। সঙ্গে আরো হাজার টাকা অত্তিরিক্ত। আমি বললাম, ''টাকা নয়, আমার পাওনা টাকা আমায় সোনায় দাও। নিতে সুবিধে হবে। শুধু দু একশো টাকা খুচরো দিও পথখরচের জন্য।''

তারা এক কথায় রাজি। একটুক্ষণের মধ্যেই সোনা এসে গেল। ঘোড়ার জিনের মধ্যে সেলাই করা থলেতে সেই সোনা ভরে নিয়ে আমি ফিরে গেলাম।

ডেরায় ফিরতে সব শুনে পীর খান বলে, ''এইরকম চললে যখন বাড়ি ফিরব ততদিনে একশোটা ঠগি অভিযানের টাকা সঙ্গে নিয়ে ফিরব মনে হচ্ছে মীর সাহেব। আমার আর মোতিরামের আরো কিছু রোজগার হয়েছে জানো তো? আমরা তো তোমার কাছেপিঠেই ঘুরঘুর করি। তাই তোমায় তাদের প্রস্তাবে রাজি করাবার জন্য বিকেলবেলা ঘুষ হিসেবে আমাদের আরো কিছু টাকা দিয়েছে সাহুকাররা।ব্যাটারা ভেবেছে আমরাও দলের সর্দার বুঝি।''

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ''একটু ভালো করে লড়াইটড়াই করো, ঘোড়াগুলোকে ভালো অবস্থায় রাখ, দেখবে চিতুর নজরে একবার পড়ে গেলে সত্যি সত্যি সর্দার হতেও দেরি হবে না বিশেষ।''

সকালে সাহুকাররা টাকাপয়সা সব নিয়ে এলে সেসব সুষ্ঠুভাবে ভাগযোগ করে দেবার পর আমরা ফের শহর ছেড়ে রওনা হয়ে গেলাম। সাহুকারদের ভালো ব্যবহারের জন্য চিতু তাদের কথা দিয়ে এলো যে ভবিষ্যতে আর কখনো আমরা অমরাবতীকে বিরক্ত করব না। সেই কথা চিতু রেখেওছিল। তাছাড়া এই অভিযানের পর অমরাবতীতে সৈন্যের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয় রাজসরকারের থেকে। সেটাও চিতুর কথা রাখবার আরেকটা কারণ হতে পারে।

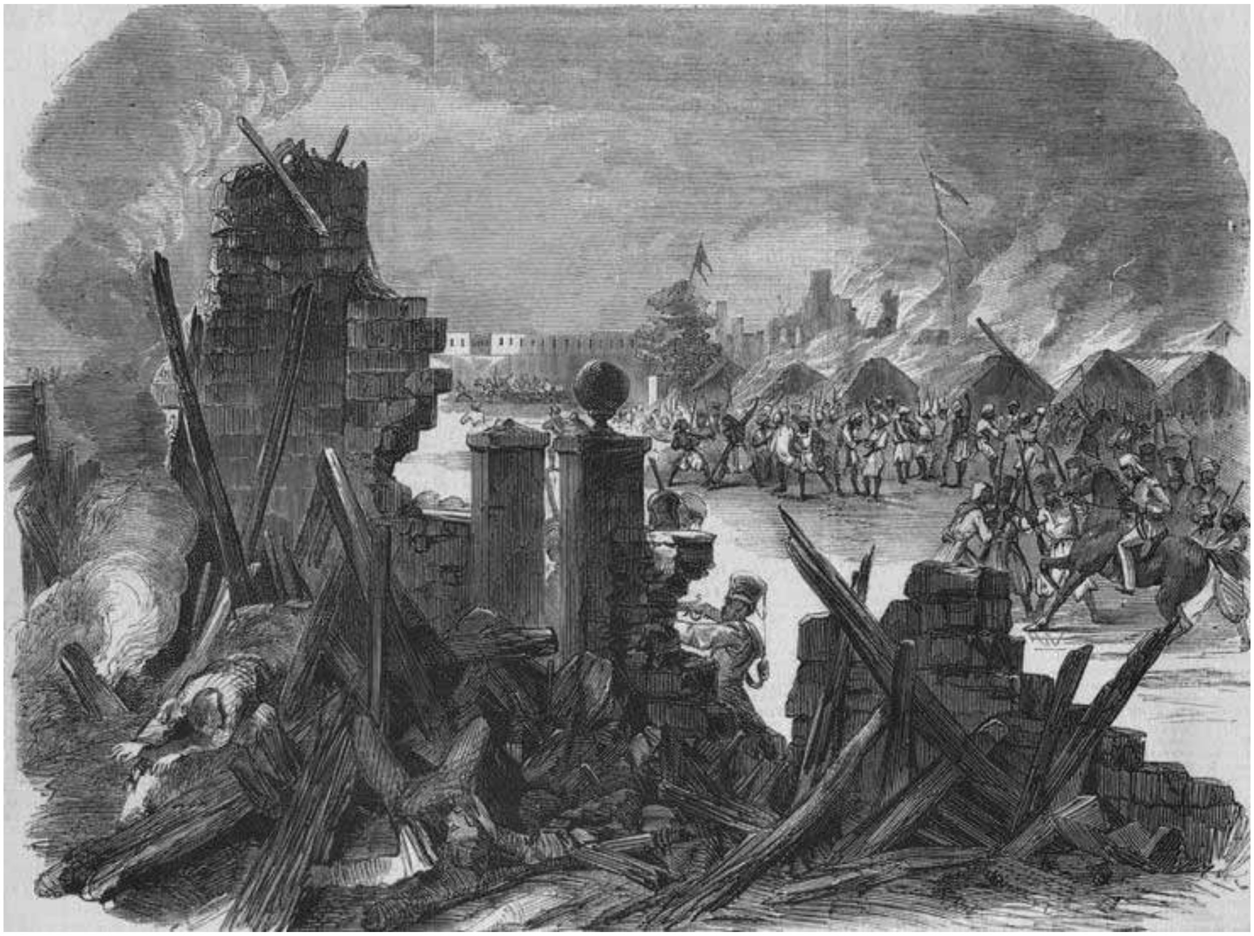

এবার ফের শুরু হল আমার খোঁজারু দলটাকে নিয়ে ঝড়ের বেগে সামনে ছুটে যাওয়া। পথে যেসব গ্রাম পাওয়া যাচ্ছিল সেগুলো যথেচ্ছ লুটপাট করে সঙ্গের মালবাহী উটের পিঠে লুটের মাল চাপিয়ে ফের ছুটতাম আমরা। পেছনের মূল দলটা এসে সেসব জায়গায় বিশেষ কিছু না পেয়ে গ্রামকে গ্রাম জ্বালাতে জ্বালাতে আসত।

পথে করিঞ্জা শহরে একটু বাধা এসেছিল। সেখানে ছোট একটা সৈন্যের দল রুখে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সামনে। তাদের মেরে তাড়াতে বেশি সময় লাগল না। তারপর শহরটাকে শিক্ষা দেবার জন্য পিন্ডারিদের লেলিয়ে দেয়া হল। সে এক মর্মবিদারী দৃশ্য। গোটা এলাকাটা দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর তার মধ্যে দিয়ে একযোগে অনেক লোকের মরণ চিৎকার ভেসে আসছে , আর তার সঙ্গে সঙ্গে পিন্ডারিদের উৎকট উল্লাসের শব্দ। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল আমার মেয়েদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদের শব্দ শুনে। আমরা ঠগিরা এইরকম নারকীয় কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু এদের বাধা দিতে যাওয়াও আত্মহত্যারই সামিল হত সেই মুহূর্তে। তাই আমি আর আমার ঠগি বন্ধুরা ছোট একটা দল করে আমাদের ঘাঁটিতে বসে বসে সেই ধ্বংসলীলা দেখছিলাম, এমন সময় একেবারে কাছাকাছি একটা বাচ্চা মেয়ের চিৎকারের শব্দ শুনে বাইরে বের হয়ে এলাম আমি। দেখি গফুর খান একটা কমবয়েসি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। তার মুখটা চকচক করছিলো। আমায় দেখে সে চেঁচিয়ে বলে, ‘‘মীর সাহেব, এই দেখ কেমন শিকার পেয়েছি দেখেছ? একেবারে বেহেস্তের পরীর মত রূপ। তাই না? এর বোকা মা টা বাধা দিতে গিয়েছিল। তলোয়ারের একটা খোঁচায় সেটাকে নিকেশ করে দিয়েছি হা হা। কীগো মেয়ে, গফুর খানকে পছন্দ না?’’

গফুর খান সাবধান ছিল না। তাকে আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু তলোয়ারটা অর্ধেক বের করেও আমি ফের সেটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। মনেমনে আমি তার শাস্তির কথা তখন ভেবে নিয়েছি। লাভ নেই জেনেও বেশ কয়েকবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমি যাতে মেয়েটাকে সে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে শুধু আমার মুখের ওপর হাসল খানিকটা, তারপর মেয়েটাকে টানতে টানতে ফের নিয়ে চলে গেল।

বেচারি মেয়েটা ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে ছিল। সেদিনের পরে তার সমাজ আর তাকে ছুঁয়েও দেখত না। কিন্তু সে অসম্মানের হাত থেকে সে বেঁচে গিয়েছিল সেদিন। পরদিন সকালে গফুর খান আমায় হাসতে হাসতে বলেছিল, মেয়েটা নাকি তার কোমর থেকে ছুরিটা টানতে গেছিল নিজের বুকেই বসাবে বলে। মেয়েটার হয়ে সে কাজটা গফুর খানই করে দিয়েছে। "মেয়েটার খাটুনি বাঁচিয়ে দিলাম,কী বলো," এই বলে সে আমার দিকে তাকিয়ে ফের হেসেছিল খানিকক্ষণ।

সেদিন গোটা রাতটাই সেই শহরের মা-মেয়েদের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে থেকেছিলো। গোটা রাতটা ধরেই আমি বারবার ভেবেছিলাম এই নরপিশাচদের সঙ্গ ছেড়ে ফিরে যাব নিজের বাড়িতে। কিন্তু তারপরেই মনে হয়েছিল, পেছনদিকে গ্রামশহরের লোকজন এখন পিন্ডারিদের ওপর ভয়ানক রেগে রয়েছে। কয়েকটা লোককে একত্রে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় করে ফিরতে দেখলে তাদের তারা পিন্ডারি বলে ধরে নেবে। প্রাণে বাঁচবার আশা থাকবে না আর তাহলে। সেই ভয়ের পাশাপাশি আবার ছিল নতুন নতুন অভিযানের উন্মাদনা। কাজেই চিতুর দল ছেড়ে চলে যাওয়া আর হল না আমাদের।

সকালে সেই দুর্ভাগা শহরের ছাই পেছনে ফেলে আমরা ফের এগিয়ে চললাম। কিছুদূর এসে মুংলুর শহর ছাড়িয়ে হঠাৎ দেখি আমার প্রথম শিকারটা করেছিলাম যেখানে সেই জায়গাটার পাশ দিয়ে চলেছি। নদীটার ধারে হালকা ঝোপঝাড়। তার মধ্যে একটা সামান্য উঁচু হয়ে থাকা জায়গার দিকে ইশারায় একবার দেখালো পীর খান। ওইখানে আমার মারা সেই সাহুকারের ভিলটা রয়েছে।

সে জায়গা ছাড়িয়ে আমরা একেবারে বেসিম-এ এসে থামলাম। ভয় হচ্ছিল এখানেও না ফের না গতরাতের মত তান্ডব শুরু করে পিন্ডারিরা। কিন্তু দেখা গেল এখান তারা বেশি লাফঝাঁপ করল না আর। এ শহরে লোকজন আগে থেকেই বেশ মোটা একটা নজরানা তৈরি রেখেছিল বলে কোন সমস্যা তৈরি হয়নি আর।

এখান থেকে বের হয়ে পাঁচদিনের রাস্তা পার হয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছোলাম গোদাবরী নদীর ধারে নান্দের-এ। ভেবেছিলাম, এখানকার রইস লোকজন আগে থেকে খবর পেয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু পৌঁছে অবাক হয়ে দেখি তারা আমাদের কোন খবরই জানে না। শহরে পাহারা টাহারাও বিশেষ ছিল না। সৈন্য যে কজন ছিল তারা আমাদের আসতেই পালিয়ে গিয়ে একটা পুরনো দুর্গে ঢুকে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে বসে ছিল। সেদিকে এগোলেই ভেতর থেকে তারা গাদাবন্দুক দিয়ে দু একটা গুলি ছুঁড়ছিল শুধু। আমরা তাদের বিরক্ত না করে শহর থেকে যতটা পারা যায় টাকাপয়সা তুলে নেবার কাজে লাগলাম।

চেষ্টাচরিত্র করে সেখান থেকে প্রায় লাখ দেড়েক টাকা ওঠানো গেল। আমার নিজের রোজগার হল হাজারতিনেক টাকা আর কিছু দামি পাথর। শহরটার বিশেষ ক্ষতি আমরা করলাম না। আসলে ক্ষতি করতে চাইলেও সেটা সহজ হত না। তার প্রত্যেকটা বাড়িরই দেয়াল ছিল পাথরের তৈরি। তবে শহরটা বেঁচে গেলেও শহরতলির লোকজনের কিন্তু ঘরবাড়ি পুড়ল অনেক। বিশেষ করা তাঁতীদের বাড়ি। এ অঞ্চলের তাঁতের কাজ খুব বিখ্যাত। ফলে তাঁতীদের ওপরেই আমাদের নজরটা বেশি করে পড়েছিল। তাতে ফলও হল খুব ভালো। পরদিন দলের অর্ধেকের বেশি লোক দেখা গেল নতুন পাগড়ি আর কোমরবন্ধ পরে ঘোরাফেরা করছে।

নদী পাড় হতে গিয়ে দেখা গেল মাত্র একখানা নৌকো রয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল কাছেই গুঙ্গা খের বলে একটা জায়গায় নৌকোটৌকো পাওয়া যাবে। সেখানে গিয়ে নৌকোয় করে লুটের মালপত্র ওপারে পাঠিয়ে লোকজন যার যার ঘোড়া নিয়ে জল পেরিয়ে উল্টোপাড়ে গিয়ে উঠল। সেখানে যে শহরটা তার শখানেক লোক মিলে আমাদের বাধা দেবার জোর চেষ্টা করে হার মানল। তাতে আমাদের কয়েকটা লোক মারা গেল। আমার পায়েও একটা বুলেট লাগতে আমি আর সে শহরের লুটপাটে অংশ নিতে পারিনি। তবে মোতিরাম আর পীর খান অবশ্য ভালোই জিনিসপত্র জুটিয়ে এনেছিল। সেখান থেকে বের হয়ে একে একে বিদর, ভালকি লুট করে আমরা পৌঁছোলাম হুমনাবাদে। হুমনাবাদ লুট করবার পর আমি শ'তিনেক লোকের একটা দল নিয়ে কয়েক ক্রোশ দূরের কুলিয়ানি শহরে গিয়ে উঠলাম। জায়গাটা সমৃদ্ধিতে একেবারে দ্বিতীয় অমরাবতী। কিন্তু সেখানকার সাহুকাররা সব আগে থেকেই খবর পেয়ে শহরের দুর্গে গিয়ে লুকিয়েছে। ফলে বড় শিকারগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলেও বাকি শহরটা লুটপাট করে একদিন পরে আমি আবার মূল দলে ফিরে এলাম। এখান থেকে একটা গিরিখাত ধরে পাহাড় পেরিয়ে চিঞ্চোলি গ্রাম লুট করে আমরা সটান দক্ষিণ দিকে ছুটলাম। পথে ছোট ছোট অনেক জনপদ লুটতে লুটতে

অবশেষে আমরা এসে পৌঁছোলাম কৃষ্ণা নদীর পাড়ে। ঠিক হল এখানে কদিন বিশ্রাম নেয়া হবে। দলের সবার হাতেই তখন মোটারকম টাকাপয়সা জমেছে। অতএব খাঁটি পিন্ডারি কায়দায় আনন্দ-ফুর্তি চলল কদিন ধরে। এলাকার যত নাচনেওয়ালি ছিল সবগুলোকে ধরে এনে নাচগান,খানাপিনা চলল কদিন। তাদের ওপর আমরা কোন অত্যাচার করিনি অবশ্য। উলটে আমরা ফের রওনা হবার সময় মোটা পুরস্কার পেয়ে তারা সবাই খানিক আফশোসই করল আমাদের সঙ্গে যেতে পারছে না বলে।

এই কয়েকদিন থেমে যাওয়াটা চিতুর একটা বড় ভুল হয়েছিল। আমাদের আসবার খবর তখন হাওয়ার আগে ছড়াচ্ছে। কাজেই গুলবর্গা পৌঁছে দেখি সেখানে বড়োসড়ো একটা সৈন্যদল আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছে। ফলে সে এলাকার শোলাপুর বারসি আর ওয়াইরাগ শহরের আশা ছেড়ে আমাদের ভীর, পৈথান আর ঔরঙ্গাবাদের দিকে এগিয়ে যেতে হল।

তবে আমি কিন্তু ভীর আর ওয়াইরাগের আশা পুরোপুরি ছাড়িনি তখনো। চিতুকে গিয়ে বললাম, একটা ছোট দল আমায় দিতে। গফুর খানের তাতে বেজায় আপত্তি থাকলেও চিতু আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। শ তিনেক লোকের একটা দল জুটে গেল আমার। তাদের নিয়ে আলুন্দ শহরের কাছে মূল দলটাকে ছেড়ে তোলাজপুরের দিকে ছুটলাম। তোলাজপুর এমনিতে বিশেষ ধনী শহর নয়। কিন্তু সেখানকার ভবানীমন্দির বেশ নামকরা তীর্থস্থান। তার ব্রাহ্মণ পুরুতদের হাতে সোনাদানার লেখাজোখা নেই। কিন্তু আমার দলের বেশির ভাগই হিন্দু। মন্দিরে তারা প্রাণ থাকতেও হাত দেবে না। ফলে সেযাত্রা শহর থেকে হাজারকয়েক টাকার বন্দোবস্ত করেই ফিরতে হল আমাদের।

আমাদের পরের লক্ষ্য ছিল ওয়াইরাগ। এইখানে ভাগ্য আমাদের সহায় হল।ওই সময় একদল মারাঠি সৈনিক কাছাকাছিই কোথাও ছিল। আমরা শহরের কাছে আসতে আমাদের তারা সেই মারাঠি সৈনিকের দল বলে ধরে নিয়ে আদর অরে ডেকে নিয়ে গেল শহরের ভেতরে। লুটপাট করে বেশ ভালোরকম টাকাপয়সা জুটল আমাদের এখান থেকে। আমার ইচ্ছে ছিল এখানেও একটু আলাপ আলোচনা করে টাকাপয়সার জোগাড় করব। কিন্তু সময়ের অভাবে সে আর করা গেল না। কারণ, শহরে ঢোকবার পরে খবর জোগাড় করে দেখা গেল, সেই মারাঠা সৈনিকের দলটা তখন বারসিতে বসে আছে। এই বারসি হয়েই ফিরব ঠিক করে রেখেছিলাম। কাজেই সেটা আর হবে না। পুরেনদা হয়েও ফেরা যেত, কিন্তু সেখানে নিজামের একদল সৈন্য রয়েছে তখন। কাজেই সে পথও বন্ধ। ফিরে যাবার একটামাত্র পথ ছিল। যে পথে এসেছি সেই পথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফের তোলাজপুর ফিরে গিয়ে মূল দলটার পেছন ধরা। কাজেই ওয়াইরাগে আলাপ আলোচনা করে টাকা আদায়ের সময় ছিল না আমার। তবে হ্যাঁ, লুটপাট করলেও শহরের লোকজন সহযোগিতা করবার ফলে খুনখারাপি বা আগুন টাগুন লাগাবার দরকার পড়েনি। কাজকর্ম শেষ করে ঘন্টাকয়েক বিশ্রাম করে নিয়ে আমরা ফের দৌড় শুরু করলাম তোলাজপুরের দিকে। অন্যেরা সবাই ঘোড়াদের দৌড় করাবার জন্য আফিং খাইয়ে দিয়েছিল এক দলা করে। আমার ঘোড়াটা অবশ্য তেজি ছিল খুব। তাকে সে সব করাবার কোন দরকার পড়েনি।

তোলাজপুর পৌঁছে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা ভীর-এ পৌঁছে মূল দলটার নাগাল ধরে নিলাম। সেখানে চিতুর খোলা দরবারে গিয়ে আমার ওয়াইরাগ লুটের ভাগ হিসেবে তাকে নগদে আর দামি পাথরে দশ দশ বিশ হাজার টাকার নজরানা দিয়ে পুরস্কার হিসেবে পেলাম একটা রাজসিক পোশাক আর চিতুর আস্তাবল থেকে একটা দামি ঘোড়া।

ক্রমশ

সীমান্তের অন্তরালে

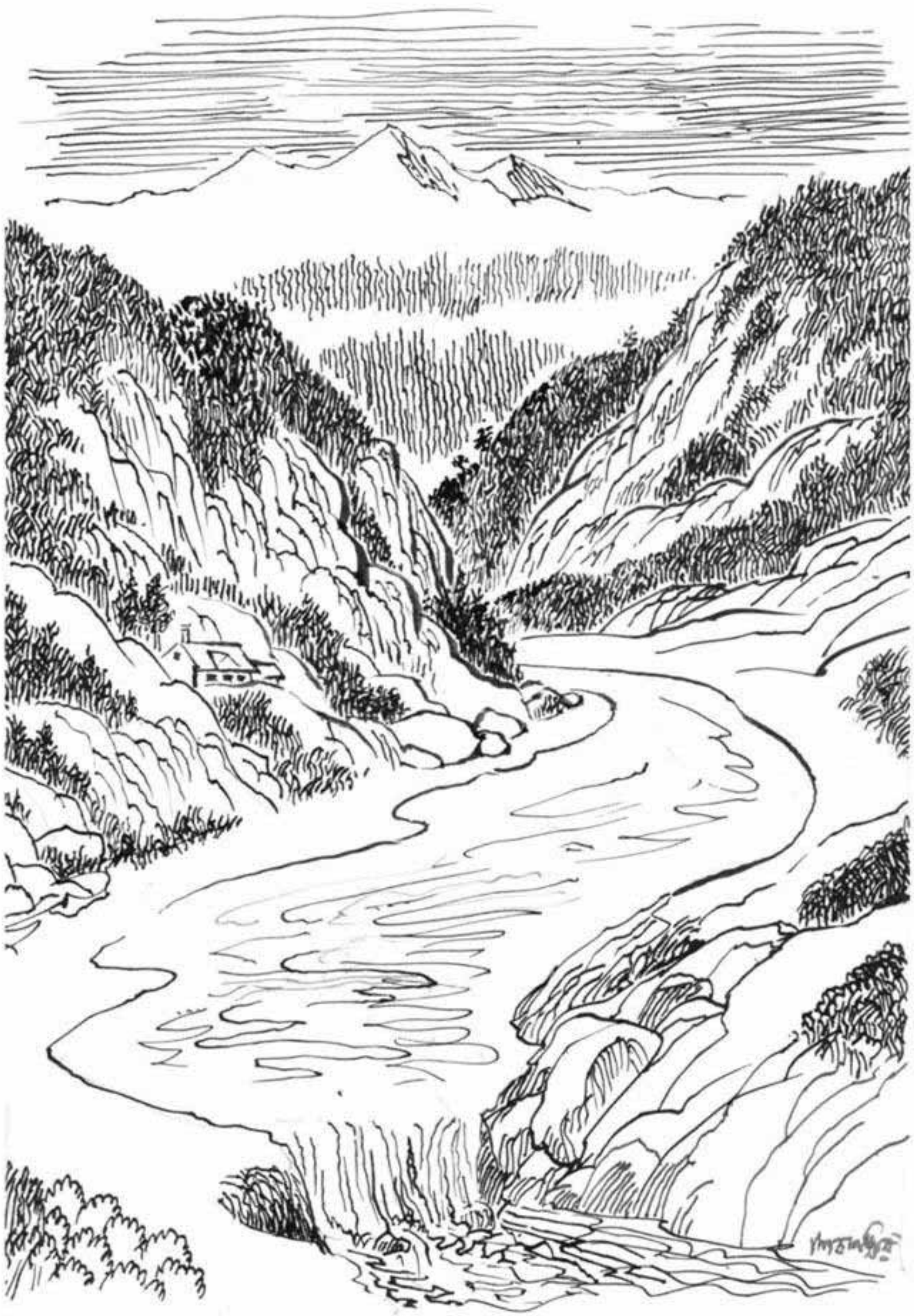

সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন ও সম্পাদনা—শ্রীমতী স্বপ্না লাহিড়ী

মনে মনে এই রকম আকাশ পাতাল চিন্তা করছি, এমন সময় হঠাৎ কড়াক শব্দে একটা রাইফেলের ফায়ার হল কুরাম নদীর ওপারে থাল গ্রামের বিপরীত দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আর একটি ফায়ার। আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে চেয়ারে আর বসে থাকা চলল না। উঠে দাঁড়ালাম নদীর ওপারে কী হচ্ছে দেখবার জন্যে। অত দূর থেকে কী হচ্ছে কিছুই দেখা গেল না, কারণ আকাশ সেদিন ধূলায় ভরা, ওপারের পাহাড়গুলো পর্যন্ত ঝাপসা আর অস্পষ্ট। সেই মুহূর্তেই কড়কড় শব্দে অজস্র ফায়ার শুনতে পেলাম আর সেই সঙ্গে দ্রিম দ্রিম শব্দে দামামা বেজে উঠল থাল গ্রামের মালেকের (উপজাতীয় প্রধান) বাড়ির ছাদে। হতভম্ব হয়ে গেলাম রাইফেল আর দামামার শব্দ শুনে। ব্যাপারখানা কী হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম না। খাসাদার (ইংরাজ সরকারের মাইনে করা উপজাতীয় রক্ষি) ইব্রাহিম খাঁ কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে এই ধাঁধার সমাধান করে দিল যে, “কাবুলখেল ওয়াজিরি উপজাতির লস্কর থাল গ্রামের কুরম উপজাতীয়দের আক্রমণ করেছে। মালেকের দামামা বাজিয়ে গ্রামবাসিদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে আর তাদের আহ্বান করা হচ্ছে হাতিয়ার নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে। আমাকেও যেতে হবে।” প্রশ্ন করার আগেই ইব্রাহিম খাঁ ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেল। সে কুরম উপজাতীয় ও থাল গ্রামের বাসিন্দা।

অনুসন্ধানকারী সশস্ত্র কন্সটাবিউলারি ও মিলিশিয়া বাহিনির চোখে ধূলা দিয়ে কাবুলখেল ওয়াজিরি দল যে কোথাও লুকিয়ে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কাবুলখেল উপজাতীয় লস্কর ইংরাজ সরকারের মিলিশিয়া ও কন্সটিবিউলারির সঙ্গে মহড়া নিয়ে সে সময় নিজেদের শক্তি অপচয় করতে চায়নি কারণ তাদের লক্ষ ছিল থাল গ্রামের কুরম উপজাতি।

দ্রিম দ্রিম দ্রিম – মালেকের বাড়ির মিনার থেকে দামামা বেজে চলেছে। গ্রামের পুরুষ বাসিন্দারা, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলেই ছুটে চলেছে কুরাম নদীর তীরে। সহস্র রাইফেল গর্জে উঠল কুরাম নদীর এপার থেকে কাবুলখেল উপজাতীর ক্ষণপূর্বের গুলিবর্ষণের উত্তরে। কাবুলখেল ও কুরাম উভয় উপজাতিই আজ রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে এক ঘাসে ভরা জমিটার অধিকার কায়েম করতে বদ্ধপরিকর।

দামামার দ্রিম দ্রিম শব্দ থেমে গেছে কিন্তু রাইফেলের গর্জন অব্যাহত। রাতের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের নির্ঘোষ কিছুটা শ্লথ হয়ে এলো। তারপর সব চুপচাপ। অন্ধকারের জন্য নদীর এপার থেকে অন্য পারে তখন আর কিছুই দেখা যায় না। মনে হল যেন সে রাতটার জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখল দু’পক্ষই।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। সেই মুহূর্তেই অজস্র হাউই বাজি দু’দিক থেকে উঠে স্বল্প পরিসর নদীর তীর আলোয় ঝলমল করে তুলল, আর সেই ক্ষণিক আলোর সুবিধা নিয়ে আবার দু’দিকের রাইফেল কড় কড় শব্দে ডেকে উঠল। পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত এই ভাবেই অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকল।

পরদিন একটা সরকারি কাজে আমাকে থাল গ্রামে যেতে হয়েছিল। গত রাতের যুদ্ধের কোনোরকম উত্তেজনা বা আতঙ্ক গ্রামে দেখা গেল না। গ্রামবাসীদের সাধারণ জীবনযাত্রার কোনোরকম ফের বদল দেখতে পেলাম না। গ্রামের ব্যবসায়ীরা, যারা বেশির ভাগই হিন্দু, প্রতিদিনের মতোই আফগান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কেনাবেচা করছে আফগানী পণ্য, যেমন পার্সিয়ান ও বোখারা কার্পেট, ভেড়ার ছালের কোট বা পোস্তিন এবং হিং প্রভৃতি। মুদ্রা বিনিময়ের প্রভূত লাভজনক ব্যবসায়ও প্রতি দিনের মতোই থালের হিন্দুরা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মেয়েরা কুরাম নদী থেকে জল আনছে কলসি ভর্তি করে। গ্রামের রেস্তোরাঁগুলিতে তীব্র স্বরে গ্রামাফোন বেজে চলেছে আর আফগান খদ্দেররা মাথা নেড়ে নেড়ে সেই গান উপভোগ করছে, সবুজ চা আর মাংসের রোস্ট খেয়ে রেস্তোরাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। রাখাল বালকেরা কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে অথবা কোমরে রিভলবার বেঁধে ভেড়ার পাল নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের বাইরে মাঠের দিকে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এমন স্বাভাবিকভাবে চলছে, যেন যুদ্ধটা একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। একটি ছোট্ট কাপড়ের দোকানের সামনে জনাপাঁচেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাদের দেখে থাল গ্রামের লোক বলে মনে হল না । তাদের পায়ে ঘাসের তৈরি চপ্পল। থাল গ্রামের বাসিন্দাদের গায়ে খানিকটা আধুনিক সভ্যতার হাওয়া কিছুটা লেগেছে বলে তারা চামড়ার চপ্পল পরে। এই নবাগতদের দিকে একটু অবাক হয়ে আমাকে তাকাতে দেখে আমার পাখতুন দেহরক্ষী নজীব গুল বলল, “আপনি ঠিকই ধরেছেন, এই লোকগুলি থাল গ্রামের বাসিন্দা নয় , এরা কাবুলখেল উপজাতি। গত রাতের যুদ্ধে এদের দলের যারা মারা গেছে, তাদের জন্য কফিনের কাপড় কিনতে এখানে এসেছে। কাবুলখেলদের গ্রামে কোনও কাপড়ের দোকান নেই। সেই সঙ্গে নজীব গুলও এ কথাও বুঝিয়ে দিল যে , যদিও ওরা শত্রুপক্ষের লোক কিন্তু ওরা

এ'সময় নিরস্ত্র, ওদের মাথার চুলটিও কেউ স্পর্শ করবে না থাল গ্রামে। নিরস্ত্র পাখতুন শত্রুকে পাখতুনরা আঘাত করে না, এটা হল পাখতুনদের অলিখিত আইন।

দিনটা কেটে গেলো শান্তিতে। ভাবলাম ঝড়ের অবসান ঘটেছে, রাতে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারব। কিন্তু অদৃষ্টে তা আর হল না, সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কুরাম নদীর দু'পার থেকেই রাইফেল গর্জে উঠল। গোটা রাত রাইফেলের গর্জন চলল অবিরাম এবং পর পর তিন রাত ধরে অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটল না। ইতিমধ্যে থালের কুরাম উপজাতীয় পাখতুনরা বোধহয় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। চতুর্থ দিন সকালবেলা তারা রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ বন্ধ করল না। মরিয়া হয়ে দিনের আলোতেই কুরাম নদী পার করে ছোট পাহাড়টির চূড়া দখল করে নিল আর পিছন থেকে নিজেদের দলের কভারিং ফায়ারের আওতায় চূড়ার ওপর একটি সাঙ্গড় (পাথরের দেয়াল)গড়ে তুলল ঘণ্টাদুয়েক এর মধ্যে। তারপর সাঙ্গড় থেকে গুলিবর্ষণ করে সেই জমিটির দখল নেওয়া থাল গ্রামবাসীদের পক্ষে মোটেই কঠিন হল না।

থালবাসিরা যুদ্ধে জয়ী হল কিছুকালের জন্য মাত্র, কারণ পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া পাখতুনদের স্বভাববিরুদ্ধ। এই অপঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব কতদিন ধরে চলবে কে জানে, সেই সবুজ ঘাসে ভরা জমিটার রক্ত তৃষ্ণা কখনো মিটবে কি না তাও কে জানে।

পাখতুনরা ইংরাজের সঙ্গে দীর্ঘকালিন যুদ্ধে যদিও কখনও জয়লাভ করতে পারেনি, কিন্তু পরাজয়ও স্বীকার করেনি। ইংরাজদের পাখতুনিস্থান থেকে বিতাড়িত করতে না পারলেও তাদের নিরুদ্বেগে রাজত্বও করতে দেয়নি তারা। প্রথম অ্যাংলো আফগান যুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত ইংরাজকে তারা ঘাত প্রতিঘাতে সর্বক্ষণ অস্থির ও সংকটময় অবস্থার মধ্যে রেখেছিল।

১০

১৮৫১ সালের থাল অঞ্চলে যুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই উত্তর সোয়াট উপত্যকার রানিজাই উপজাতির একটি দল লস্কর একদিন মালকান্দের কাছে একটি ব্রিটিশ রক্ষিদলকে আক্রমণ করে পরাস্ত করল। তাদের এলাকায় ব্রিটিশদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করাতে এই উপজাতির আক্রোশ দিন দিন পুঞ্জীভূত হয়ে ফেটে পড়েছিল সেদিন। দুর্ঘটনার খবর পেশাওয়ারে পৌঁছন মাত্রই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যার ক্যাম্বেলের অধীনে দু'হাজার সোলজার ও অফিসারের এক বাহিনী গঠন করে পাঠানো হল সোয়াট উপত্যকায়। ব্রিটিশ বাহিনী যে অত তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হবে, রানিজাই উপজাতীয় পাখতূনরা সেটা ধারণা করতে পারেনি। কাজেই তারা তখনই স্যার ক্যাম্বেলের গোলন্দাজ, অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রানিজাই উপজাতির নায়করা দেখলেন যে সে অবস্থায় স্যার ক্যাম্বেলের ফৌজের মোকাবেলা করার চেষ্টা করলে তাঁরা ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর কোনও রকম ক্ষতিসাধন তো করতে পারবেনই না , উপরন্তু ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর হাতে তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তাঁরা স্যার ক্যাম্বেলের কাছে দূত পাঠালেন। প্রস্তাব করলেন যে স্যার ক্যাম্বেল যদি সোয়াট উপত্যকা থেকে নিজের সৈন্যসামন্ত অপসারণ করেন , তাহলে তাঁরা ইংরাজ সরকারের বশ্যতা স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ অর্থদণ্ড দেবেন। এতে, বিনাযুদ্ধে রানিজাই উপত্যকাকে পদানত করতে পারলেন মনে করে স্যার ক্যাম্বেল খুশি হলেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ফেরত নিয়ে গেলেন পেশাওয়ারে।

এই ঘটনার মাস দুই পরেই পেশাওয়ারে সংবাদ এল যে চারসাদ্দার উপকণ্ঠে কয়েকটি ব্রিটিশ ঘাঁটি আক্রমণ করে দখল করেছে উৎমনখেল উপজাতি। স্যার ক্যাম্বেলের সৈন্যবাহিনী সোয়াট উপত্যকা থেকে ফেরার পর তখনও অটুট অবস্থাতেই ছিল। তিনি সেই বাহিনী নিয়ে আবার পাড়ি দিলেন চারসাদ্দার দিকে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনী প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ করে ঘাটিগুলি পুণরুদ্ধার করল আর ব্রিটিশ শক্তিকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতার জন্য উৎমন খেল উপজাতি পাখতুনদের গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে দিলেন স্যার ক্যাম্বেল, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার উদ্দেশে।

উৎমনখেলদের সাময়িক ভাবে দমন করে স্যার ক্যাম্বেল তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেন পেশাওয়ারে। সেখানে পৌঁছেই তিনি খবর পেলেন যে সোয়াটের রানিজাই উপজাতীয় নেতারা তাঁদের প্রতিশ্রুত

অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা ইতিমধ্যে সাড়ে চার হাজার লোক নিয়ে একটি লস্করও গঠন করেছেন, যদিও সেই লস্করের কাছে কোনও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। শুধুমাত্র তরওয়াল আর কিছু গাদা বন্দুক নিয়েই রানিজাই পাখতুনরা দেশের ওপর নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে।

রানিজাইদের দুটি মজবুত ঘাঁটি সাখাকোট ও দরগাই গ্রাম অবরোধ করলেন স্যার ক্যাম্বেল। রানিজাইরা এ দুটি গ্রামের দক্ষিণে পাথর দিয়ে সাঙ্গড়ের সারি গড়ে তুলেছিল ইংরাজি ফৌজের আক্রমণ রোধ করার জন্য। উপজাতীয় যোদ্ধারা এই সব সাঙ্গড়ের আড়ালে আক্রমণকারী ব্রিটিশ সৈন্যের মোকাবেলা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ব্রিটিশ গোলন্দাজ সৈন্যের কামানের গোলায় সাঙ্গড়গুলি তাসের ঘরের মতই লুটিয়ে পড়ল। একের পর এক পাখতুন যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকে পিষে গেল কামানের গোলায়। তারপর আরম্ভ হল সাখাকোট ও দরগাই গ্রামের ওপর ব্রিটিশ পদাতিক সৈন্যের আক্রমণ। গ্রামদুটি রক্ষার জন্য রানিজাইরা প্রভূত সাহস আর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করল। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি আর অলিগলিতে তারা ব্রিটিশ সৈন্যকে বাধা দান করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করল , কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরাজ বাহিনীরই জয় হল। এই যুদ্ধের প্রামাণিক বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে ব্রিটিশ সৈন্যের হতাহতর সংখ্যাও প্রচুর ছিল এই যুদ্ধে।

এরপর আরও কয়েকটি পাখতুন উপজাতির সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ হয়ে গেল ১৮৫২ সালে। উত্তরে ইউসুফজাই এবং সোমান্দ, মধ্য পাখতুনিস্থানে আদমখেল এবং দক্ষিনে শিরানি উপজাতি প্রায় একই সময় তাদের এলাকার মধ্যে ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে ঘাঁটির রক্ষিদলসমূহকে পর্যুদস্ত করল। ফলে অতিরিক্ত কয়েকটি বিশেষ বাহিনী গঠন করে পাঠালেন ইংরাজ সরকার আক্রমণকারী উপজাতিগুলিকে দমন করার জন্য। এগুলির মধ্যে ইউসুফজাইদের উত্থানটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। কর্নেল ম্যাকসন পাঁচ হাজার সৈন্যের এক ব্রিটিশ ফৌজ কয়েকমাস ধরে যুদ্ধ করে ইউসুফজাইদের পরাস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে কর্নেল ম্যাকসন ইউসুফজাইদের গ্রামগুলি ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন।

১৮৫১ সালে থাল এর দক্ষিণে যে'সব ওয়াজিরি উপজাতি ব্রিটিশের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল তারা ১৮৫৪ সালে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মাঝে দীর্ঘ চার বছর সময় তাদের কতকটা চুপচাপ থাকতে হয়েছিল কারণ ইংরাজ ফৌজ তাদের গ্রামগুলি সমস্ত ধ্বংস করে দেওয়ায় তারা স্ত্রীলোক শিশুদের নিয়ে বনে, জঙ্গলে , গুহায় বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। অনাহারে, অর্ধাহারে, নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তাদের দিন কাটাতে হয়েছিল। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি তারা সহজেই পেতে পারত বহিরাগত দখলকারি ইংরাজের কাছে নতি স্বীকার করে, কিন্তু তা তারা করেনি।

রশীদ খান তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কুদরৎ খানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন একদিন। কুদরৎ খান রশীদের মতই লম্বা চওড়া জোয়ান মানুষ, পেশীবহুল শরীর, মাথায় বাবরি কাটা চুল, গায়ের রং ফিকে গোলাপি, সুন্দর চেহারা। রশীদের এর সঙ্গে কুদরৎ খানের কয়েকটা বিষয়ে খুবই অমিল। রশীদ খানের চোখের দৃষ্টি স্থির, কুদরৎ খানের চঞ্চল। রশীদ অত্যন্ত ধীর ও স্থীর প্রকৃতির লোক, কুদরৎএর প্রকৃতি অস্থির। রশীদ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, কুদরৎ এর দৌড় মোল্লাদের মাদ্রাসা র্প্যন্ত। রশীদ হুইস্কির বোতল সঙ্গে না নিয়ে কোথাও রাত কাটান না, কুদরৎ মাদক দ্রব্য স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। রাইফেল, রিভলবার তৈরি করতে ঐ অঞ্চলে তাঁর জুড়ি ছিল না। কুদরৎ খানের হাতের তৈরি লি এনফিল্ড ও বি,এস,এ রাইফেলের এবং ওয়েব্লি স্কট রিভলবারের হুবহু কপি দেখে আমি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে সেগুলি বিলাতের আধুনিক কারখানায় তৈরি নয়। আগেই বলেছি কুদরৎ খান ও তাঁর স্ত্রী সলমা থাকেন মান্দুরির কাছে আমাদিশামা গ্রামে। তিনি পেওয়াড় গিরিসঙ্কটের মুখে শালোজান গ্রামের মেয়ে।

পারাচিনার থেকে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে শালোজান গ্রামের মাঝখান দিয়ে পেওয়াড় গিরিসংকট পর্যন্ত।তারপর সেটা পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে কাছেই ডুরান্ড লাইনের ওপর ইংরাজ সরকারের সামরিক পোস্ট খারলাচিতে শেষ হয়েছে। পেওয়াড় দিয়ে আফগানিস্তানে যাতায়াত করতে গেলে শালোজান গ্রামের সঙ্গে পরিচয় না হয়ে উপায় নেই। শালোজানের আখরোট ,আপেল, আঙ্গুর যেমন প্রসিদ্ধ , তেমনই ঐ গ্রামের রমণীদের সৌন্দর্যও গোটা পাখতুনিস্থানে বিখ্যাত। তবে কবির নারী সৌন্দর্যের উপমা ' দ্বিজরাজ মুখি, মৃগরাজ কটি, গজরাজ বিনিন্দিত মন্দ গতি'র সঙ্গে ঠিক মেলে না। এদের গতিটা গজরাজের মন্দগতির মত মোটেই না ,বরং হরিণের সঙ্গে মিল

আছে। শোনা যায় যে আফগান নৃপতি ও সভাসদদের পক্ষে অন্তত একটি করে শালোজান কন্যা বিবাহ করা অনিবার্য প্রথা। তবে এ গ্রামের মেয়ে বিয়ে করা অত্যন্ত ব্যায়সাপেক্ষ। মেয়ের সমান ওজন খাঁটি রুপোর আফগানি টাকা কন্যাপণ হিসেবে দিতে হয়, কাজেই আমির ওমরাহ ধরনের লোক ছাড়া সাধারনের নাগালের বাইরে। এহেন গ্রামের মেয়েকে অতি সাধারণ আর্থিক অবস্থার লোক কুদরৎ খান কী করে বিয়ে করে আনল তার ইতিহাস আছে আমি আগেই বলেছি।

থাল এর উত্তর পশ্চিমে প্রায় ষাঠ মাইল রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছতে হয় পারাচিনারের(আদি নাম তূতকাই) মালভূমিতে। ছয় হাজার ফুট পাহাড়ের মাথায় ষোল মাইল লম্বা ও বারো মাইল চওড়া সমতলভূমির মাঝখানে ছোট্ট উপজাতীয় গ্রাম। গ্রামটির পশ্চিমে প্রায় আধ মাইল দূরে পারাচিনারের ব্রিটিশ দুর্গ। দুর্গরক্ষি সৈন্য এক ব্যাটলিয়ান কুরাম মিলিশিয়ার সিপাই। দুর্গের পূর্ব দিকে কিছু দূরে বড় বড় বাংলোয় থাকেন কুরামের পলিটিকাল এজেন্ট, কুরাম মিলিশিয়ার ব্রিটিশ অফিসাররা ও অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিকাল অফিসার। পারাচিনারকে ঘিরে রেখেছে উত্তর আর উত্তর পশ্চিম দিকে সুউচ্চ পর্বত শ্রেণি। পারাচিনার মালভূমিতে প্রচুর সবুজ গাছপালা, কিন্তু উত্তর ও উত্তর পশ্চিমের পাহাড়গুলি রুক্ষ ও কর্কশ।

থাল পারাচিনার সড়কটি সাধারণত দিনের বেলায় যাতায়াতের পক্ষে নিরাপদ বলেই জানা ছিল, অবশ্য মাঝে মাঝে উপজাতীয় স্নাইপিং বা ছোটখাটো হামলা যে না হত তা নয়, তবে তেমন ঘটনাকে সে দেশে স্বাভাবিক বলেই সকলে মনে করে। কিন্তু দুদিন পূর্বে মান্দুরি থেকে থালে ফেরার পথে যে ঘটনাটি হয়েছিল তার জন্য আমি একটু সন্ত্রস্ত বোধ করছিলাম। বন্ধু রশীদ খান তখনও পেশাওয়ার থেকে ফিরে আসেননি যে তাঁকে অনুরোধ করব আমার সঙ্গে যেতে, অথচ পারাচিনার যাওয়া আমার একান্তই প্রয়োজন চাকরির খাতিরে। ভেবেচিন্তে কুদরৎ খাঁ এর কাছে বার্তা পাঠালাম আমার সঙ্গে পারাচিনার যাবার অনুরোধ জানিয়ে।

কুদরৎ খাঁ ও আমার দেহরক্ষী নাজিব গুলকে সঙ্গে নিয়ে পারাচিনার যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় কুরামের পলিটিকাল এজেন্টের কাছে থাল ব্রিগেড হেডকোয়ার্টর্সে খবর এল যে বহু সংখ্যক সশস্ত্র ওয়াজিরি উপজাতিদের কুরাম উপত্যকার মধ্যে চলাচল করতে দেখা গিয়েছে। সেই জন্য থাল পারাচিনার সড়ক ছাপরিতে বন্ধ করে দেওয়া হবে বেলা একটার সময়। ওই সময়ের পর সেদিন কোনও যানবাহন কে ছাপরি গেট অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না, কারণ তাতে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর।

কুদরৎ খাঁ ও নাজিব গুলকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম বেলা বারটা নাগাদ। ছাপরি থাল থেকে মাত্র ছয় সাত মাইল দূর, পাহাড়ি রাস্তা হলেও মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যে ছাপরি পৌঁছে যাবার কথা। কাজেই নিশ্চিন্ত ছিলাম যে রাস্তা বন্ধ হবার আগেই আমরা ছাপরি পেরিয়ে যাব। ছাপরি গেটে পৌঁছতে আর মাইল দেড় রাস্তা বাকি, পাহাড়ের গায়ে ছাপরির মিলিশিয়া পোষ্ট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমন সময় কড়াং শব্দ করে আমার গাড়ির টাইরডটা খুলে গেল। গাড়ি থামিয়ে গাড়ির তলায় ঢুকলাম মেরামত করার প্রয়াশে। কুদরৎ খাঁ ও নাজিব গুল নিজেদের রাইফেল নিয়ে গাড়ির দু'পাশে দাঁড়িয়ে পাহারায় রত হল। কয়েকবার টানাটানি করে টাই রডটাকে তার সকেটের ভিতর ফিট করলাম কিন্তু প্রত্যেকবারই গাড়ি চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে বেরিয়ে যায়! এমনি করে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট করলাম ,শেষে কুদরৎ খাঁ নিজের রাইফেলটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এবার আপনি পাহারাদারের ভূমিকা নিন,আমি একবার দেখি গাড়িটাকে চালু করতে পারি কি না। এসব কাজ এঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা হয় না। মিস্ত্রিরাই পারে।"

কুদরৎ খাঁ সুদক্ষ কারিগর , আধঘণ্টার মধ্যেই ঠুকে পিটে টাই রডটা লাগিয়ে গাড়িটা চালু করে দিল। ছাপরিতে গিয়ে পৌঁছলাম বেলা চারটের পর। রাস্তা তখন বন্ধ, আর গেটের ওপর কড়া পাহারা। মিলিশিয়ার সিপাইরা কিছুতেই গেট খুলতে রাজি হল না। মিলিশিয়া পোস্ট থেকে পারাচিনারে অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিকাল অফিসার খাঁ বাহাদুর নক্সবন্দ খাঁকে টেলিফোনে অনুরোধ করলাম আমাকে ছাপরি পার হবার অনুমতি দিতে। খাঁ বাহাদুর সাহেব রাজি হলেন না। জানালেন, যেহেতু সে দিনকার পরিস্থিতিতে তিনি আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারবেন না, কাজেই ছাপরি গেট পার হবার অনুমতি দিতে তিনি অক্ষম।

কী করা যায় ভেবে কোনও কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। তখন থালে ফিরবার পথও কম বিপদজনক নয়। সন্ধ্যার পর থেকে স্বাভাবিক অবস্থাতেও ব্রিটিশ কেল্লার দেয়ালের বাইরে উপজাতীয়দের রাজত্ব চলে। কুদরৎ খাঁর পরামর্শ চাইলাম। কুদরৎ খাঁ বলল, "শোন সাহেব, ছাপরির বন্ধ গেটকে ফাঁকি দিয়ে পারাচিনার যাওয়া খুবই সহজ। গাড়িটাকে মাইল আড়াই পিছিয়ে নিয়ে গেলে একটা অস্থায়ী সেতুর কাছাকাছি পৌঁছোন যাবে। সেই সেতু দিয়ে কুরাম নদী পার হয়ে 'নো ম্যানস ল্যান্ডের' ভিতর দিয়ে একটি কাঁচা রাস্তা চলে গেছে মান্দুরির ওপারে। মান্দুরিতে আর একটি অস্থায়ী সেতু আছে, সেই সেতু পেরিয়ে এপারে এসে এই রাস্তায় উঠতে পারা যাবে। তারপর ছাপরির বন্ধ গেটের তোয়াক্কা রাখতে হবে না।"

'নো ম্যানস ল্যান্ড' এর ভিতর দিয়ে চোদ্দ মাইল কাঁচা রাস্তা পার করার প্রস্তাবে মনটা ভীষণ দমে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম ওই রাস্তায় কোনও বিপদ আছে কি না। আমার প্রশ্ন শুনে কুদরৎ খাঁ ও নাজিব গুল দু'জনেই হেসে উঠল। কুদরৎ খাঁ বলল, "বিপদ কোথায় নেই? মানুষের ছায়ার মতই বিপদ তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সর্বদা, বিপদের মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়েই তাকে পরাস্ত করা যায়।"

উপায়ান্তর না দেখে কুদরৎ খাঁর পরামর্শ অনুযায়ী গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে অস্থায়ী সেতুটি পার করে নো ম্যানস ল্যান্ডের ভিতর দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝে কাঁচা সড়কটি দিয়ে এগোতে লাগলাম। রাস্তাটি খুবই খারাপ ও মোটরকার চলার পক্ষে অনুপযোগী। গাড়িটা হোঁচট খেতে খেতে ঘণ্টায় মাত্র দশ মাইল গতিতে চলছিল। সূর্য তখন ডুবু ডুবু করছে, সেই সময় একটা মোড় ঘুরতেই দেখি সামনে প্রায় একশ গজ দূরে একটি টিলার ওপর জনা ত্রিশ উপজাতীয় লোক তাদের রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে, লক্ষ আমাদের গাড়ি। সেই দলের দলপতি তাঁর টাট্টু ঘোড়াটি ছুটিয়ে রাস্তার ওপর গাড়ির সামনে থামলেন, আর রিভলভার তাগ করে হুঙ্কার ছাড়লেন 'ওয়াদারেগা' অর্থাৎ থামো।

আমার তো হার্ট ফেল হবার যোগাড়। মনে হল সাক্ষাৎ যমরাজের অনুচর আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে গেছে। আমি গাড়ি থামিয়ে দিলাম। দলপতি প্রশ্ন করলেন "তা চোকে"(তুমি ক)? উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম,কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। সেই সময় কুদরৎ খাঁ গাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার করে দলপতিকে লক্ষ করে বলল "তা মালিক সাব দে" (তুমি কী মালিক সাহেব)?

কুদরৎ খাঁর গলার স্বর চিনতে পেরে মালিক সাহেব রিভলবার খাপে পুরে টাট্টু ঘোড়া থেকে নামলেন। ইতিমধ্যে কুদরৎ খাঁ গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল ও দলপতির করমর্দন করে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ আরম্ভ করে দিল। কয়েক মিনিট পরে দলপতি আমার দিকে এগিয়ে এসে 'স্তুড়িমাসে' বলে সাদর সম্ভাষণ করে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমিও তাঁর করমর্দন করে প্রত্যাভিবাদন করলাম 'খোয়ারমাসে' বলে। দলপতি বললেন যে, কুদরৎ খাঁ সঙ্গে থাকার জন্য আমার প্রাণটা সে যাত্রা বেঁচে গেল। সাবধান করে দিলেন সাদ্দা ফোর্টের পাশ দিয়ে যাবার সময় যেন খুব সতর্ক থাকি, কেননা ফোর্টের কাছে বঙ্গশ, বিলন্দখেল ও পাড়া উপজাতীয়দের খুব বড় একটা দল জমায়েত হয়ে আছে। দলপতির সঙ্গে আমরা সকলে করমর্দন করে পুণরায় যাত্রা আরম্ভ করলাম।

সাদ্দা ফোর্টে পৌঁছবার আগেই হাল্কা হাল্কা তুষারপাত আরম্ভ হয়েছিল এবং সম্ভবত সেই জন্যই সাদ্দায় জমায়েত উপজাতীয় দল সড়কের ওপর বিশেষ নজর রাখেনি। কাজেই আমরা নির্বিঘ্নে ওই বিপদজনক স্থান পার হয়ে গেলাম। কিন্তু আরও একটা ক্ষুদ্রতর বিপদ অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য পথে। পারাচিনার পৌঁছতে তখনও মাইল তিনেক রাস্তা বাকি, তুষারপাত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে আর রাস্তার ওপর এত বরফ জমে গেছে যে গাড়ি আর স্টিয়ারিং এর বশে চলতে চাইছে না, বরফের ওপর স্কিড করে যত্র তত্র চলে বেড়াচ্ছে। কয়েকশ গজ পথ এমনিভাবে রাস্তার এপাশে ওপাশে চলে গাড়ির চাকা বরফের ভিতর একেবারে বসে গেল। অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিয়ে যতই গাড়িটাকে আগে বাড়াবার চেষ্টা করি ততই গাড়ি বরফের মধ্যে ডুবে যায়। শেষ পর্যন্ত গাড়িটাকে সেইখানেই ফেলে রেখে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ঝরতে থাকা বরফের ওপর দিয়ে হাঁটাও এক দুরূহ কাজ। একে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তখন হাত পা প্রায় অসাড়, তার ওপর বরফের ভিতর পা ডুবে যাচ্ছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। কোনও রকমে যখন পারাচিনার পৌঁছলাম তখন রাত একটা একটা বেজে গেছে। সে সময়ে আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতেন পারাচিনারে। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে আমি সন্ধ্যা নাগাত সেখানে পৌঁছব। কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত আমি না পৌঁছনোয় তিনি খাঁ বাহাদুর নক্সবন্দ খাঁ সাহেবের কাছে লোক পাঠালেন, তিনি কোনও খবর দিতে পারেন

কিনা জানবার জন্য। খাঁ বাহাদুর সাহেব বলে পাঠালেন যে যেহেতু তিনি আমাকে ছাপরি গেট অতিক্রম করার অনুমতি দেননি, আর তিনি খবর নিয়ে জেনেছেন যে আমি থালেও ফেরত যাইনি , তখন ধরে নিতে হবে যে আমি উপজাতীয় লস্করের হাতে নিহত হয়েছি। তিনি আশ্বাস দিলেন যে পরের দিন তিনি সার্চ পার্টি পাঠাবেন আমার মৃতদেহ তল্লাশের চেষ্টায়। খাঁ বাহাদুর সাহেব আমাকে তাঁর খাতা থেকে একেবারে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন। তা, আমি সশরীরে উপস্থিত হওয়ায় আমার ক্রন্দনরতা স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সরকারি কাজ সারা করে পরদিন বিকেল বেলায় আমার থালে ফিরে যাবার কথা , কিন্তু আমি আটক হয়ে পড়লাম। সেই রাতে আমরা সাদ্দা ফোর্ট অতিক্রম করার পর উপজাতীয় লস্কর ফোর্ট আক্রমণ ও দুর্গরক্ষিদের পরাস্ত করে ফোর্টে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কোহাট থেকে ব্রিটিশ আর্মর্ড কলম এসে রাস্তা বিপদমুক্ত না করা পর্যন্ত থাল-পারাচিনার রাস্তা সরকারি হুকুমে সর্বসাধারণের ও বিশেষ করে সরকারি চাকুরেদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১১

বন্ধু রশীদ খানকে বললাম, আচ্ছা রশীদ বল তো তুমি নিজেকে পাখতূন আর এই দেশটাকে পাখতূনিস্তান বলে আখ্যাত কর কেন? ইতিহাসে পাখতূন বলে কোনও জাতির বা ভূগোলে পাখতূনিস্তান বলে কোনও দেশের উল্লেখ আছে বলে তো মনে পড়ে না। এ অঞ্চলটা তো ইন্ডিয়ার নর্থ- ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স। রশীদ খান মুর্গির ঠ্যাং চর্বণ করছিলেন একমনে। কয়েক মিনিট কোনও উত্তর দিলেন না। মুর্গির ঠ্যাং চিবানো শেষ করে আমার দিকে মুর্গি কারির বোল এগিয়ে দিয়ে বললেন, "মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড ,আমাদের দেশ ও দেশবাসিদের সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের বহর নিতান্তই অল্প দেখছি। এখনই তো ইতিহাস ও ভূগোল এর নজির দেখাচ্ছিলে ,অথচ আমাদের দেশের অর্থাৎ আফগানিস্তানের ইতিহাস তুমি কতটুকুই বা জানো। এ দেশটা ইন্ডিয়ার অংশ নয় আর আমরাও ইন্ডিয়ান নই। আমরা আফগান কিন্তু নিজেদের আফগান বলে পরিচয় দেবার অধিকার থেকে ইংরাজ আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে। তাই বলে আমরা নিজেদের ইন্ডিয়ান বলে মেনে নিতে পারি না। আফগানিস্তানের জনসাধারণের ভাষা 'পস্তো' বা 'পাখতো'। তাই আমরা নিজেদের দেশটাকে অর্থাৎ আফগানিস্তানের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলকে বলি 'পাখতূনিস্তান', ও নিজেদের বলি পাখতূন। আমাদের দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে জানতে হলে আফগানিস্তানের ইতিহাস কিছুটা ওয়াকিফহাল হওয়া দরকার তোমার।"

আমাদের মধ্যে আপ সম্বোধন থেকে তুম এ কখন এসে গেছি জানতেই পারি নি।মনে পড়ে গেল Sir. William Barton তাঁর "India's North West Frontier" বইটিতে লিখেছেন "The Afgan border land is central Asian in characteristic. No apology is needed for again stressing an outstanding fact too easily forgotten ".

আফগানিস্তান একটি রহস্যময় কিন্তু মনোমুগ্ধকর দেশ এবং এ দেশের বাসিন্দারা অত্যন্ত যুদ্ধ প্রিয় ও প্রভূত গুণসম্পন্ন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে অনেকগুলি গুণ পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয় বিদেশিদের কাছে। আফগানিস্তানের সহজাত সীমানা উত্তরে অক্ষ নদী (অক্সাস)থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে সিন্ধু নদ পর্যন্ত প্রসারিত। এই বিস্তারিত ভূমি সবটাই প্রকৃত পক্ষে আফগানিস্তান। কিন্তু ইংরাজ দেশের অর্ধেকটা অপহরণ করে ইন্ডিয়ার সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে নাম দিয়েছে ইন্ডিয়ার 'নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স।'

আফগানিস্তানের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আরম্ভ হল আহমদ শাহ আবদালির সময় থেকে। তিনিই প্রথম দুরানি রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৪৭ সালে। এর আগে পশ্চিম আফগানিস্তান ছিল পারস্যের (অধুনা ইরান) অধিকারে, এবং বাদবাকি দেশটা বিভিন্ন উপজাতীয় সরদাররা নিজ নিজ এলাকার মধ্যে শাসন করতেন। আহমদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তিমুর শাহ সিংহাসনে বসেন ও দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য চালান। গোল বাধল ১৭৯৩ সালে তিমুর শাহের মৃত্যুর পর। তাঁর পুত্র সংখ্যা ছিল গোটা কুড়ির ওপর। সিংহাসন দখল করার জন্য তাদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ বেধে গেল। এক রাজপুত্র সিংহাসন দখল করে বসতে না বসতে আর একজন তাকে তাড়িয়ে নিজে

রাজা হয়ে বসে। এমনি চলল কিছুদিন। শেষে শাহ শুজা নামে এক রাজপুত্রকে হারিয়ে মোহমুদজাই উপজাতীয় সর্দার দোস্ত মোহম্মদ ১৮১০ সালে সিংহাসনারূঢ় হলেন।

শাহ শুজা হিন্দুস্থানে পালিয়ে গিয়ে ইংরাজের আশ্রয় নিলেন। দোস্ত মোহম্মদ বিচক্ষণ শাসক ছিলেন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে। তিনি ব্রিটিশের অর্থ সাহায্যে শাহ শুজার সিংহাসন পুণরুদ্ধারের চেষ্টায় দু'দুটি অভিযান নিস্ফল করে দেন।

সে সময় ইংরাজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসার করে চলেছে। কথিত আছে ওদিকে রুশ সম্রাট জারও নাকি নিজের দক্ষিণ সীমান্তের বাইরে পা বাড়াবার মতলব আঁটছিলেন। একই সময়ে পারস্যের (অধুনা ইরান) শাহ এর দরবারে রুশ সম্রাটের প্রভাব ছিল প্রচুর। সেই প্রভাবের সুযোগ নিয়ে রুশ এর রাজদূত শাহকে প্ররোচিত করলেন আফগানিস্তানের হিরাট অঞ্চল আক্রমণ করার জন্য। পারস্যে ব্রিটিশ রাজদূত স্যর হেনরি এলিস শাহকে এ বিষয়ে নিরস্ত করতে না পেরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাইকাউন্ট পামরস্টোনকে ব্যপারটা জানালেন এক বার্তা পাঠিয়ে, মন্তব্য করলেন যে পারস্যের হিরাট দখল প্রকৃত পক্ষে হিরাটের ওপর রাশিয়ার অধিকারই কায়েম হবে ও সেক্ষেত্রে ক্রমে গোটা আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করা রুশ সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

সেরূপ অবস্থা ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে ও ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হতে পারে। ভারতের ইংরাজ গভর্নর জেনারেল পারস্যের শাহকে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখলেন যে, পারস্যের হিরাট অভিযান ইংরাজ সমর্থন করে না এবং ঘোর অসন্তুষ্টির চোখে দেখে। সে প্রতিবাদে কোনও কাজ হল না। হিরাট আক্রমণের জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল।

দোস্ত মোহম্মদ খবরটা পেয়ে বিচলিত হলেন কারণ তিনি জনপ্রিয় শাসক হলেও দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। শক্তিশালী বহির্শত্রুর হিরাট অভিযানের ফলে দেশের ভিতরের শত্রুরাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দোস্ত মোহম্মদকে বিপদে ফেলতে পারে সে আশঙ্কা ছিল। তিনি ভারতের ইংরাজ গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের কাছে দূত পাঠিয়ে আসন্ন হিরাট আক্রমণ প্রতিহত করতে ও শিখ রাজা রণজিৎ সিং এর কবল থেকে পেশাওয়ার পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন (আগে পেশাওয়ার ছিল আফগান নৃপতির শীতকালীন রাজধানী)। লর্ড অকল্যান্ড স্যর অ্যালেকজান্ডার বার্নসকে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠালেন আফগানিস্তানে দোস্ত মোহম্মদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ দোস্ত মহম্মদকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দানের প্রস্তাবটা একেবারে এড়িয়ে গেলেন। অকল্যান্ডের নির্দেশমত স্যর বার্নস কতকগুলি নিছক বাণিজ্যিক ও সিন্ধুনদের অববাহিকার উৎকর্ষ সাধনের বিষয়ে প্রস্তাব দিলেন। দোস্ত মোহম্মদ এসব অবান্তর আলোচনায় মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তিনি স্পষ্ট জানতে চাইলেন যে ইংরাজ তাঁকে ইপ্সিত সাহায্য দেবেন কি না এবং জানিয়ে দিলেন যে ইংরাজের কাছে সাহায্য না পেলে তিনি রাশিয়ার দ্বারস্থ হবেন। স্যর বার্নস অতঃপর চাটিবাটি গুটিয়ে ফিরে গেলেন হিন্দুস্থানে, কারণ দোস্ত মোহম্মদকে সেরূপ কোনও প্রতিশ্রুতি দেবার অধিকার তাঁর ছিল না।

মনে হয় স্যর বার্নসকে আফগানিস্তানে পাঠাবার আগেই লর্ড অকল্যান্ড নিজের লক্ষ স্থির করে ফেলেছিলেন। অকল্যান্ডের উদ্দেশ্য ছিল দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যূত করে ইংরাজের আশ্রিত ও তল্পিদার শাহ সুজাকে গদিতে বসিয়ে পরোক্ষে আফগানিস্তানের ওপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করা। ইতিমধ্যে শাহসুজা ব্রিটিশের অর্থসাহায্যে নিজের সৈন্যদল গঠন করে দুবার দোস্ত মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলেন ও মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এবার ওকল্যান্ড স্থির করলেন যে সরাসরি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন। প্রথম অ্যাংলো আফগান যুদ্ধ এর সুত্রপাত হল।

১৮৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিশাল ফৌজ এসে জড়ো হল ফিরোজপুরে। ফৌজে ছিল ব্রিটিশ ও ইন্ডিয়ান সৈন্য ষোল হাজারের ওপর। ফৌজের মালপত্র বহনের জন্য সঙ্গে ছিল আটত্রিশ হাজার উট ও ফৌজ এর রসদাদি সরবরাহের ও অন্যান্য কাজের জন্য সাধারণ লোক ছিল ত্রিশ হাজার। এ ছাড়া শাহ সুজার তথাকথিত নিজস্ব ফৌজ ছিল প্রায় সাত হাজার।

হিন্দুস্থান থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করার পথ আছে মাত্র তিনটি। একটি খাইবার পাস হয়ে জালালাবাদ ও কাবুল , দ্বিতীয়টি কুরাম পাস হয়ে গজনি ও তৃতীয়টি বালুচিস্তান হয়ে কান্দাহার। খাইবার পাস অত্যন্ত কঠিন পথ, পেশাওয়ারের পশ্চিমে জামরূদ দুর্গ ও সেখান থেকে তোরখাম পর্যন্ত ৮৫ কিলোমিটারের মত অপ্রশস্ত ও দুর্গম দু'সারি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। পাহাড়ের গায়ে ও পাদদেশে দুর্ধর্ষ আফরিদিদের বাস। মোটের মাথায় ওই পথ দিয়ে যেতে হলে হয় আফরিদি উপজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদিচ্ছা লাভ করতে হয় কিম্বা প্রতিপদে তাদের সঙ্গে লড়াই করে এগোতে হয়।

কুরাম পাস কোহাট থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার পশ্চিমে থাল থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং পেওয়াড়ে শেষ হয়েছে ও তারপর সুতর গর্দন পাস অতিক্রম করে গজনি শহর ও দুর্গ, থাল থেকে কমবেশি দুশ কিলমিটার। বেশির ভাগ পথ কুরাম উপত্যকার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ও থাল থেকে চব্বিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মান্দুরিতে পথ কিছুটা সংকীর্ণ অন্যথা পেওয়াড় পর্যন্ত পথটি বেশ প্রশস্ত।

অবশ্য এ পথেও দু'পাশের পাহাড়ে ও উপত্যকায় দুর্দম ওয়াজিরি উপজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাস।এ পথটি খাইবারের তুলনায় সহজ কিন্তু কুরাম পাস সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান সে সময়ে ইংরাজের ছিল না। ব্রিটিশ সামরিক মহলে স্থির করা হল যে পথ অত্যন্ত দীর্ঘ হলেও সিন্ধুনদ পার করে বালুচিস্তান হয়ে কান্দাহার, ও সেখান থেকে গজনি ও কাবুল এর ওপর চড়াও করা হবে।

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর থেকে রওনা হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফৌজ ও শাহ সুজার তথাকথিত নিজস্ব ফৌজ। সে কী তার জাঁকজমক! সোলজারদের ও অফিসারদের পরনে লাল রঙের টিউনিক, অফিসারদের (বলাবাহুল্য যে অফিসারমাত্রই ছিলেন ইংরাজ) ও গোলন্দাজ সৈনিকদের মাথায় পালিশ করা ঝকমকে শিরস্ত্রাণ, ঘোড়সওয়ার পল্টনের শান দেওয়া বল্লমের ফলক সূর্যের আলোয় এক অপূর্ব শোভা দিচ্ছিল। বাহিনীর অধিনায়কগন ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জন কিন, মেজর জেনারেল কটন, সেল ও উইলশায়ার। শাহ সুজার 'নিজস্ব বাহিনীর' অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সিম্পসন। এছাড়া বাহিনীর সঙ্গে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে ছিলেন স্যর এ্যালেকজান্ডার বার্নস, স্যর উইলিয়াম ম্যাকনাটন্।

বিজয়লক্ষ্মী তখন ইংরাজ বাহিনীর প্রতি সদয়। কয়েকটি ছোটখাট লড়াই করে বালুচিস্তান পার হয়ে ব্রিটিশ বাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করল। ব্রিটিশ বেয়নেটের প্রতাপে গ্রামের পর গ্রাম লুটিয়ে পড়ল, ব্রিটিশ বাহিনী সদর্পে এগিয়ে চলল কান্দাহারের দিকে।

কান্দাহারে আফগান সৈন্যদল পরাজিত হল এবং সেখানেই শাহ সুজার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন ব্রিটিশ সমরনায়করা। সে অনুষ্ঠানে আফগান সর্দাররা কোনও উৎসাহ দেখাল না। ইংরাজ কর্তাদের ধারণা ছিল যে শাহ সুজা আফগানিস্তানে জনপ্রিয় ছিলেন এবং তিনি দেশে প্রবেশ করা মাত্রই সর্দাররা ও জনতা তাঁকে নতজানু হয়ে অভিনন্দন করবে কিন্তু তার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তারপর আমীর (সুলতান) শাহ সুজাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ বাহিনী রাজধানী কাবুলের দিকে রওনা হল।

কাবুলে দোস্ত মোহম্মদ ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন ও আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁকে এক ব্রিটিশ রক্ষিদলের তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। মনে হয় তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ব্রিটিশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু সাহায্য দিতে অসম্মত হলেও তারা যে তাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করবে সে কথা সম্ভবত তিনি ভাবতে পারেননি।

কাবুলে খুব ঘটা করে রাজপোশাক পরে সুন্দর আরবি ঘোড়ায় চড়ে শাহ সুজা প্রবেশ করলেন বালাহিসার রাজপ্রাসাদে এবং সেই সিংহাসনে বসলেন, যে সিংহাসন দোস্ত মোহম্মদ প্রায় উনত্রিশ বছর পূর্বে কেড়ে নিয়েছিলেন। শাহ সুজার এক পাশে স্যর বার্নস ও আর এক পাশে স্যর ম্যাকনাটন ছিলেন ঘোড়ায় চড়ে এবং ব্রিটিশ মিলটারি ব্যান্ড বাজাচ্ছিল হর্ষোল্লাসের সুরে। জেনারেল সেল এক সৈন্যদল নিয়ে চলে গেলেন জালালাবাদ জয় করতে। ব্রিটিশ বাহিনীর একটা বড় অংশ কাবুলে ক্যানটুনমেন্ট নির্মাণ করে জমিয়ে বসল। বিবাহিত অফিসাররা তাঁদের স্ত্রী পরিবার হিন্দুস্থান থেকে কাবুলে আনালেন। পোলো, ঘোড়দৌড়, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা হল ইংরাজদের মনোরঞ্জনের জন্য। তাঁদের জীবন বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল কাবুলে।

দোস্ত মোহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ তাঁর পিতার সঙ্গে শঠতার জন্য ইংরাজের ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। আফগান রমণীদের সঙ্গে ব্রিটিশ অফিসারদের লাম্পট্যপূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে তিনি গোটা আফগানিস্তানের সর্দারদের খেপিয়ে তুললেন, বললেন যে আফগান রমণীদের ধর্ম নষ্ট করে সমগ্র আফগান জাতির মান ইজ্জত ডুবিয়ে দিয়েছে ইংরাজ। গোটা আফগানিস্তানে ইংরাজবিরোধী আগুন জ্বলে উঠল। আফগান সর্দাররা নিজের নিজের লস্কর (ফৌজ) নিয়ে আকবর খাঁর ঝাণ্ডার তলে দাঁড়ালেন ও ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে জেনারেল জন কিন হিন্দুস্থানে ফিরে গিয়েছিলেন ও কাবুলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ছিলেন জেনারেল এলফিনস্টন। তিনি একে বৃদ্ধ, তাঁর বয়স তখন ষাট তার ওপর তাঁর শরীরও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না, কাজেই তাঁর পক্ষে সুস্থভাবে সৈন্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। আফগান্দের প্রবল আক্রমণ ইংরাজ বাহিনী ঠেকাতে পারল না। প্রতিটি যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনী প্রচণ্ড মার খেতে লাগল। বাহিনীর রসদাগার বেহাত হয়ে গেল, স্যর বার্নস খুন হয়ে গেলেন ,বালাহিসার প্রাসাদের মধ্যেই শাহ সুজা সেই হত্যাকাণ্ড নিবারণ করতে পারলেন না।স্যর ম্যাকনাটন আকবর খাঁর পিস্তলের গুলিতে নিহত হলেন ক্যানটনমেন্টের বাইরে। তখন ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে আর কাবুলে টিকে থাকা সম্ভব হল না ,জেনারেল এলফিনস্টন নিজের ফৌজ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করে ইন্ডিয়ার দিকে রওনা হলেন।

সেটা ১৮৪২ সালের জানুয়ারি মাস এবং আফগানিস্তানে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছে, কাবুল ও আশেপাশের ক্ষেত্র বরফে ঢেকে গেছে। জালালাবাদ যাবার রাস্তায় এক ফুট মতন বরফ জমে গেছে। ইতিমধ্যে আফগান উপজাতীয় লস্কর চলমান ফৌজের ওপর হানা দিয়ে অনেক টেন্ট লুট করে নিয়ে গেল। রাতের বেলা টেন্টের অভাবে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে বাধ্য হল অনেকে। রাতে শীতের প্রকোপে অনেক হিন্দুস্থানি সিপাই, গোরা (ইংরাজ)সোলজার ও ফলোয়ার এবং কিছু স্ত্রীলোক মারা পড়ল। অনেকে কম্বল জড়িয়ে বরফের শয্যাতেই শুয়েছিল, সকাল বেলায় দেখা গেল যে তারা ঠাণ্ডায় জমে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। মৃত লোকেদের সেইখানেই ফেলে রেখে বাদবাকি ফৌজ আবার চলল জালালাবাদের দিকে, আশা যে জালালাবাদে পৌঁছতে পারলে সেখানে জেনারেল সেল এর সৈন্যর কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে ও সেখান থেকে খাইবার পাস দিয়ে হিন্দুস্তান পৌঁছতে সময় অনেকটা কম লাগবে। ওদিকে সেই বন্ধুর ও সংকীর্ণ পথের দু'ধারে পাহাড়ের মাথায় আফগান উপজাতীয় লোক তাদের জাজ়য়েল (দূর পাল্লার গাদা রাইফেল)নিয়ে বসে আছে। রাস্তায় অনেক অফিসার ,সোলজার ও সিপাই জাজয়েলের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল। এমনি করে দিনের পর দিন অনাহারে,শীতে ও আক্রমণকারীদের গুলিতে বা তলওয়ারের আঘাতে মরতে লাগল ব্রিটিশ বাহিনীর লোক।

যারা একদিন বাঁচল তারা আবার হাঁটতে আরম্ভ করল ক্ষীণ আশা নিয়ে যে জালালাবাদে পৌঁছতে পারলে প্রাণে বাঁচা হয়ত সম্ভব হবে। পরের দিন সেই একই অবস্থা ,তবুও জীবিত লোকেরা অর্ধমৃত অবস্থায় কঠিন গিরিপথ বেয়ে মৃতদেহের ওপর হোঁচট খেতে খেতে, অনাহারে দুর্বল দেহ নিয়ে এগিয়ে চলল জালালাবাদের দিকে। যখন জালালাবাদে পৌঁছল তখন ফৌজের মাত্র জনাকয়েক জীবিত। যে বাহিনী তিন বছর পূর্বে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল আক্রমণকারী রূপে, মেদিনী কাঁপিয়ে, রণহুঙ্কার দিয়ে, যে বাহিনী গর্বভরে গোটা আফগানিস্তানকে পদানত করেছিল, তার কী বিপর্যয়, কী করুণ আর নিষ্ঠুর পরিণতি!

বিপর্যয়ের খবর পৌঁছল বড় লাটের কাছে। ইংরাজ মহলে কালিমা ছেয়ে গেল। সেই দুঃসংবাদের ওপর আরও একটা দুঃসংবাদ এল, ব্রিটিশ প্রতিনিধি আমির শাহ সুজাও ইতিমধ্যে ইংরাজ বিদ্বেষী আফগানদের হাতে নিহত হয়েছেন।

কিন্তু ইংরাজের অবর্ণনীয় ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজ আফগানিস্তানকে রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে পারে না। ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য আফগানিস্তানে ব্রিটিশের একচ্ছত্র প্রভাব যে কোনও মুল্য দিয়েও কায়েম করতে হবে। ইংরাজ গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা (লর্ড অকল্যান্ড অবসর গ্রহণ করে বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন সেই সময়) হুকুম দিলেন আর একটি শক্তিশালী বাহিনী এক জন বিচক্ষণ জেনারেলের অধীনে আফগানিস্তান পাঠাতে। সে জেনারালের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হবে আফগানিস্তান চূড়ান্ত ভাবে জয় করা ও সেখানে একজন ব্রিটিশ অনুগত সুশাসক রাজা জোগাড় করে তাকে গদিতে বসিয়ে সত্বর ইন্ডিয়াতে ফিরে আসা।

রণ পারদর্শী ও বিচক্ষণ জেনারেল পোলাক এক সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন আফগানিস্তানের দিকে। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সহজ ও সুদীর্ঘ পথে কালক্ষেপ না করে সরাসরি খাইবার পাস দিয়ে এগোলেন এবং সমস্ত বাধা বিঘ্নের সঙ্গে লড়াই করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করলেন।তাঁর বিরাট সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ফৌজ ও তাঁর রণকৌশলে আফগানিস্তান পরাজিত হল চূড়ান্তভাবে। কাবুলে যে বাজারের ভিতর দিয়ে স্যর ম্যাকনাটন এর মৃতদেহ ঘৃণিতভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল আফগানরা সে বাজার কে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। জেনারেল এলফিনস্টনের শোচনীয় পরাজয়ের ও তাঁর বাহিনীর চরম দুর্দশার গ্লানি ও কলঙ্ক মুছে গেল।

কিন্তু গোল বাধল ব্রিটিশের মাপকাঠি অনুযায়ী আফগান রাজা পেতে। ফাহৎ জঙ্গ নামে রাজবংশের একজনকে জেনারেল পোলাক সিংহাসনে বসালেন,কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী ফিরে যাচ্ছে শুনে তিনিও বাহিনীর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কারণ ব্রিটিশ ফৌজের অনুপস্থিতে তাঁর পক্ষে রাজ্য শাসন করা অসম্ভব। অতএব অনন্যোপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত বন্দি দোস্ত মোহম্মদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ১৮৪৪ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকেই বসান হল আফগানিস্তানের সিংহাসনে।

প্রথম এ্যাংলো আফগান যুদ্ধের (১৮৩৮-১৮৪২) অভিজ্ঞতা খতিয়ে ইংরাজ দেখল যে আফগানিস্তানের ওপর একছত্র প্রভাব বজায় রাখতে হলে দক্ষিণপূর্ব আফগান উপজাতি – আফ্রিদি, ওয়াজিরি, মোমান্দ ইত্যাদি ও তাদের গোষ্ঠীগুলিকে আফগানিস্তানের আওতা থেকে সরিয়ে নিজের আয়ত্তে আনা অনিবার্য এবং খাইবার ও কুরাম অঞ্চল তথা গিরিবর্ত্মের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার কায়েম করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাই আরম্ভ হল পররাজ্য অপহরণের কাজ।

আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও আফগানিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করা হল। ব্রিটিশ কর্তারা দক্ষিণপূর্ব আফগানিস্তানে যে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজেদের সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে চলেছিলেন , সে সব এলাকাগুলিতে যে কার শাসন চলছে তা স্থানীয় লোকের কাছে অস্পষ্ট, এমন কি কাবুলে আমিররের কাছেও ছিল অস্পষ্ট। আমীর মনে করলেন যে কতকগুলি ঘাঁটি যদিও ব্রিটিশ এখানে সেখানে তৈরি করছে কিন্তু তথাপি সে এলাকাগুলি কাবুলের শাসনাধীন। ব্রিটিশ কর্তারা জানতেন যে সমগ্র দক্ষিণপূর্ব আফগানিস্তানে তাঁরা কাবুল শাসনযন্ত্রের ছায়াও পড়তে দেবেন না। তবে ইংরাজরা একটা কথা তখনও জানত না যে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা চিরকালই স্বায়ত্ত শাসনে বিশ্বাসী। কাবুলের আমীরের বশ্যতা স্বীকার করত এরা নামে মাত্র,কাজের বেলায় প্রত্যেক উপজাতি বা খণ্ড জাতিগুলির শাসনকার্য চালাত এদের জির্গা (নির্বাচিত সদস্যদের সভা)। প্রত্যেক খণ্ডজাতি ও উপজাতির একজন করে মালেক আছে কিন্তু তারা জির্গার মীমাংসা অমান্য করতে পারে না। ইংরাজের আবির্ভাবে কাবুলের যেটুকু আধিপত্য এদের ওপর ছিল সেটুকুও লোপ পেয়ে গেল।

অবশ্য মূল দেশের সঙ্গে এদের নাড়ির টান ও রক্তের সম্বন্ধ যেতে পারে না। উপরোক্ত সময় থেকে খণ্ডিত দক্ষিন পশ্চিম আফগানিস্তানকে পাখতূনিস্তান ও অধিবাসিদের পাখতূনবলে আখ্যাত করা যেতে পারে।

পাখতূনরা কাবুলের শাসন যদি বা কিছুটা মেনে চলত, ইংরাজের শাসন মোটেই মেনে নিল না। প্রথম অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুদ্ধের সময় থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ দিন পর্যন্ত পাখতূনরা ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। গোটা পাখতূনিস্তান কার্যত নো-ম্যানস ল্যান্ড হয়ে থেকে গেল ব্রিটিশের কাছে।

কিন্তু এই নো ম্যানস ল্যান্ডের গুরুত্ব ছিল অনেক। পাখতূনিস্তান সম্বন্ধে স্যর উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন "As long as the border could remain a no-mans'land ,all was well but if any power to be supreme, that power must neither be Russia nor Afganistan." (The story of the Malakhnd field force by WinstonChurchill).

মাঝে দু'দিনের জন্য আমি কোহাট ক্যান্টুনমেন্টে গিয়েছিলাম। ফিরে সেই রাতেই খাবার টেবিলে বসে বন্ধু রশীদ খাঁ কে বললাম, "রশীদ তোমার ইতিহাসের ঝুলিটা একটু ঝাড়ো। পাখতূনিস্থানের গল্প শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে।"

খাঁ সাহেব স্কচের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "আমাদের দেশের গল্প তো শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ, বলে শেষ করা যায় না তবে যদি তোমার শুনতে ভাল লাগে তাহলে সংক্ষেপে বলে যাব যখনই সময় ও সুবিধা পাব। ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই পাখতূনরা রুখে দাঁড়িয়েছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে।এই থাল অঞ্চলেই ১৮৫১ সালে যুদ্ধ হয়েছিল পাখতূন ও ইংরাজের মধ্যে যার উল্লেখ একদিন করেছি , সে যুদ্ধে ইংরাজ উপজাতীয় লস্করকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল, যদিও যাকে বলে ডিসাইসিভ ব্যাটল যাকে বলে তা হয়নি।

১৮৫৫ সালের প্রথম দিকে থাল এর আশপাশের ওয়াজিরিরা পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি সমূহের ওপর হামলা আরম্ভ করল। এদের সঙ্গে যোগ দিল কোহাট- থাল এর মধ্যবর্তী এলাকার তূরি ও জায়মুখট্ উপজাতি। এদের বারংবার হামলায় ঐ বিস্তৃত অঞ্চলের ব্রিটিশ রক্ষিদল ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল , তোরাওয়াড়ি নামক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বেদখল হয়ে গেল আর অন্যান্য ঘাঁটিগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে উঠল। ইংরাজের যেটুকু ক্ষমতা, প্রভাব ও সম্মান এসব অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল তাও ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল। সংকটাপন্ন ব্রিটিশ রক্ষীদলকে সাহায্য এবং ব্রিটিশ প্রভাব ও সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কোহাটে পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি অতিরিক্ত বাহিনী সমবেত করে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নেভিল চেম্বারলেন এর অধিনায়কত্বে পাঠানো হল অকুস্থলে।

থালের পূর্বদিকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে পথের পাশেই দর্সমন্দ এর ছোট্ট ঘাঁটি আর তার উত্তরে তোরাওয়াড়ি গ্রাম। তোরাওয়াড়িতে দেড়হাজার পাখতূন উপজাতির লস্কর ঐ অঞ্চলের কাছাকাছি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি গুলির ওপর চড়াও হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কর্নেল মোকাটা ও কর্নেল উইলিয়ামস জোয়াকিদের অজান্তে পৌঁছে গেলেন পায়া গ্রামের পাশে দুটি পাহাড়ের চূড়ায়। কিন্তু কর্নেল গার্ডিনারের অভিগমন জোয়াকিরা টের পেয়ে গেল। গার্ডিনার তার নির্দিষ্ট পাহাড়ের চূড়ায় নিজের সৈন্য নিয়ে পৌঁছে দেখলেন যে একটি জোয়াকি লস্কর তার বিপরীত দিকের উচ্চতর পাহাড়ের মাথাটা অধিকার করে বসে আছে। এরকম অবস্থায় আগে জোয়াকি লস্করটিকে ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে স্থানচ্যুত না করতে পারলে লস্করদের ওপর হামলা সফল হবে না।

কর্নেল গার্ডিনার কম্পাসের সাহায্যে জোয়াকিদের অবস্থানসূচক ম্যাপ তৈরি করে পাঠালেন গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে। দূর পাল্লার কামানগুলি গর্জন করে উঠল। গোলার আঘাতে পাহাড়ের চূড়াটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। জোয়াকি লস্কর পশ্চাদপসরণ করল, কিন্তু কর্নেল গার্ডিনার তাঁর পদাতিক সৈন্যসমেত পাহাড়ি চূড়াটি দখল করা মাত্র জোয়াকিরা ফিরে এসে তাঁর সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও তাদের হটিয়ে দিল। দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধে পাহাড়ের চূড়াটি কয়েকবার হাত বদল হবার পর কর্নেল গার্ডিনার দু'দিন পরে চূড়ান্ত ভাবে সেই গুরুত্বপূর্ণ চূড়াটি দখল করে নিলেন। তারপর অপর দুই সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পায়া গ্রাম আক্রমণ করা হল। কর্নেল মোকাটা, গার্ডিনার ও মেজর উইলিয়ামস এর সম্মিলিত শক্তির সামনে দাঁড়াতে না পেরে জোয়াকিরা এক গিরিপথ দিয়ে এলাকার গভীর অন্তর্দেশে গিয়ে নতুন ঘাঁটি স্থাপন করল। জেনারেল কিজ় এর মতলব ছিল জোয়াকিদের তাদের গ্রামে অবরুদ্ধ করা, সেটা সফল হল না।

ক্রমশ

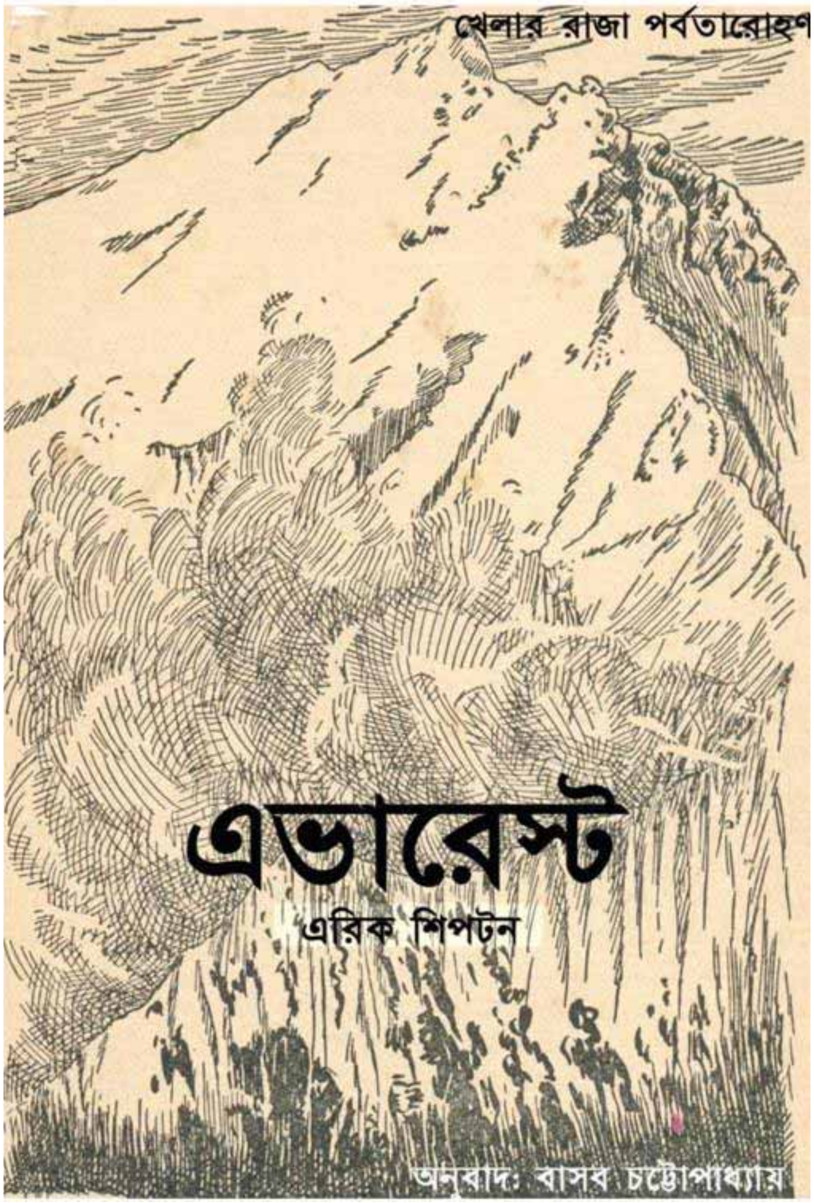

অবশেষে !!

সুইস অভিযাত্রীরা ঘোষণা করলেন শরৎকালের আগে তাঁদের শৃঙ্গ আরোহণের কোন পরিকল্পনা নেই। এই সংবাদে বৃটিশ অভিযাত্রীদের ১৯৫৩ সালের এভারেস্ট অভিযানের প্রস্তুতি চলতে থাকল ধীরগতিতে। ব্রিটিশ অভিযাত্রীরা সুইস অভিযাত্রীদের অগ্রগতি এবং সাফল্যের দিকে নজর রাখলেন। সুইস অভিযানের পরিণামের ওপর নির্ভর করছিল ব্রিটিশ পর্বতারোহীদের পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ অভিযানের অগ্রগতি।

১৯৫৩র অভিযান- - সম্পূর্ণ টিম

ইস অভিযানের ব্যর্থতার সংবাদ ইংল্যান্ডে পৌঁছনোমাত্রই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শুরু হল ব্রিটিশ অভিযানের প্রস্তুতি। অনেক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল অভিযানে ন্যুনতম দশজন আরোহী অংশগ্রহণ করবেন। সঙ্গে থাকবেন ফিজিওলজিস্ট Dr. Plugh এবং চিত্রগ্রাহক Tom Stobart। এছাড়া সঙ্গে থাকবেন কর্নেল H.C.J. Hunt এর মতো পর্বতারোহী, যিনি আল্পস এবং হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ অভিযানের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে থাকার সুবাদে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা থেকে শুরু করে উচ্চমানের পরিকল্পনা সফলতার সাথে বাস্তবায়িত করতে হান্ট এর জুড়ি ছিল না। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শক্তিশালী একটি অভিযাত্রীদল নির্বাচিত হল। নিউজিল্যান্ড থেকে হিলারি এবং Lowe ভারতে এসে ব্রিটিশ দলে যোগ দিলেন। ছিলেন Burdilon এবং Ward, যাঁরা ১৯৫১ সালের এভারেস্ট reconnaissance অভিযানের প্রাক্তন সদস্য। R.C.Ivans, A.Gregory - এর মতো পর্বতারোহী চো ওয়ু অভিযানের অভিজ্ঞতার ঝুলি সঙ্গে নিয়ে যোগ দিলেন। আল্পস অভিযানের বিপুল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অভিযাত্রী W.Noyce এবং গোরখা রেজিমেন্টের প্রধান Major Walie –এর মতো দক্ষ পর্বতারোহী অভিযাত্রীদলকে সমৃদ্ধ করেছিল।

দলের নতুন দুজন পর্বতারোহী G.C.Band এবং

M. Westmacott –এর কথা না বললেই নয়। তাঁদের এই অভিযাত্রীদলে সদস্য হবার যোগ্যতা ছিল দুঃসাহসিক আরোহণ অভিজ্ঞতার রেকর্ড। অভিযানের সাজসরঞ্জামেও ছিল বিশেষত্ব। নির্দিষ্ট এই অভিযানের জন্যই শ্রেষ্ঠ গুণমানের এবং বিশেষ ভাবে নির্মিত হয়েছিল আরোহণ সামগ্রী। বিশেষত ক্লাইম্বিং বুট, ঠান্ডা প্রতিরোধক পোশাক এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহণের যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী সংস্থাগুলি থেকে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছিল।

অভিযানের জন্য দুধরণের ক্লাইম্বিং বুট ক্রয় করা হয়েছিল। একধরণের জুতো ২৩০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় অন্যদিকে অতি উচ্চতায় ব্যবহার করবার জন্য দুটি চামড়ার স্তর বিশিষ্ট জুতো সরবরাহ করা হয়। চামড়ার স্তরদুটির মধ্যের ফাঁকা অংশ ফারের আস্তরণে পূর্ণ। বিশেষত উচ্চ হিমালয়ের তুষার সাম্রাজ্যে ব্যবহারযোগ্য জুতো কঠিন রাবার নির্মিত এবং অপরিবাহী। বায়ুনিরোধক পোশাকগুলি এবং তাঁবুর গুণমান পরীক্ষার জন্য যাওয়া হয়েছিল "ফার্নবোরো রিসার্চ হেড কোয়ার্টার"-এ। বিশেষ কুকার সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল উচ্চ হিমালয়ের তুষার রাজ্যে বরফ গলিয়ে রান্না করার জন্য, যাতে আরোহীদের উষ্ণ খাবার সরবরাহ করা যায়। এছাড়া বিশেষভাবে তৈরি স্লিপিং ব্যাগ, এয়ার ম্যাট্রেস এবং খাদ্যসামগ্রী ১৯৫৩ সালের অনেক আগেই ভারতে প্রেরিত হয়েছিল।

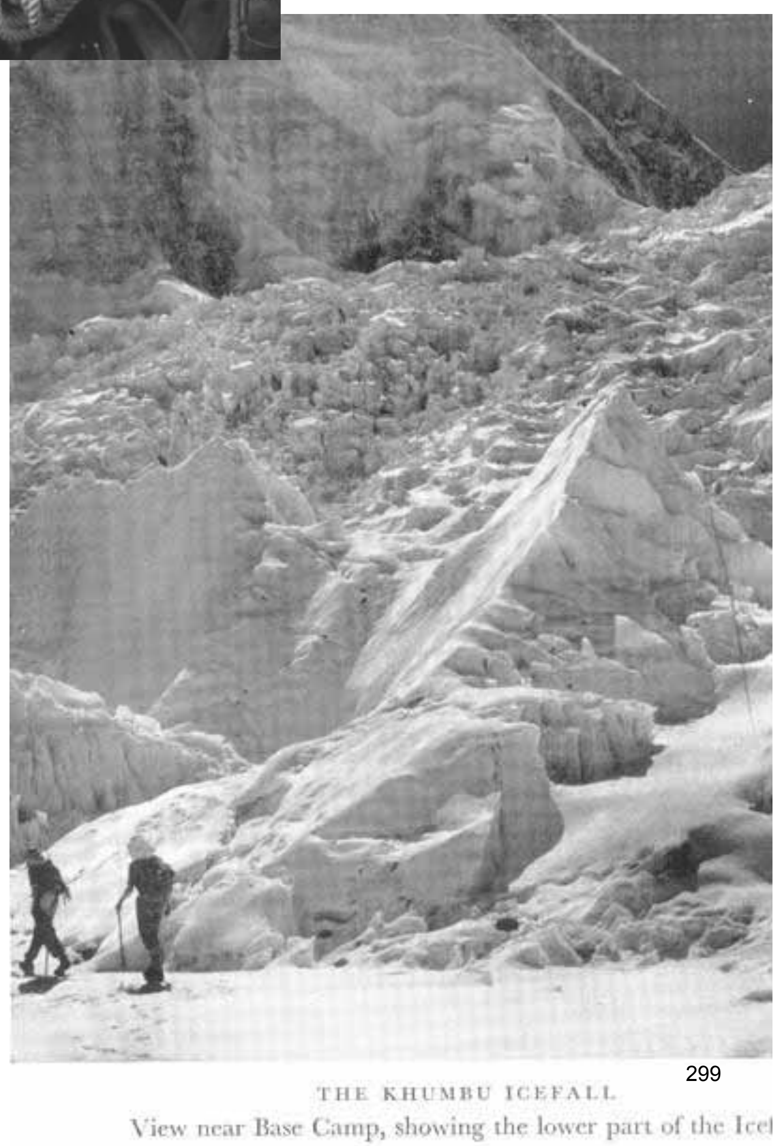

THE KHUMBU ICEFALL

View near Base Camp, showing the lower part of the Icef

তিনধরণের অক্সিজেন ইক্যুইপমেন্ট নেওয়া হয়েছিল আরোহণের সময় ব্যবহারের জন্য । একটি অভিযাত্রীর স্লিপিং ব্যাগের অভ্যন্তরে রাখা থাকত। বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত অক্সিজেন সিলিন্ডারের তুলনায় ওজনও ছিল কম। যেকোন পর্বত অভিযানে আরোহণ সরঞ্জামের ওজন এবং পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও এভারেস্ট অভিযানের সঙ্গে ছিল ১৬০টি সিলিন্ডার, ৩০ সেটের অক্সিজেন যন্ত্রপাতি এবং ৮০ টি ক্যানেস্তারার বাক্স।

অভিযানে মালবাহক ব্যবহারের প্রশ্নে হান্ট গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখমুখি হলেন। দক্ষিণ অথবা উত্তর দিক যেকোন প্রান্ত থেকেই এভারেস্ট অভিযানে ছোট দলে শৃঙ্গারোহণের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। আরোহীদলে থাকবে দুজন সদস্য।

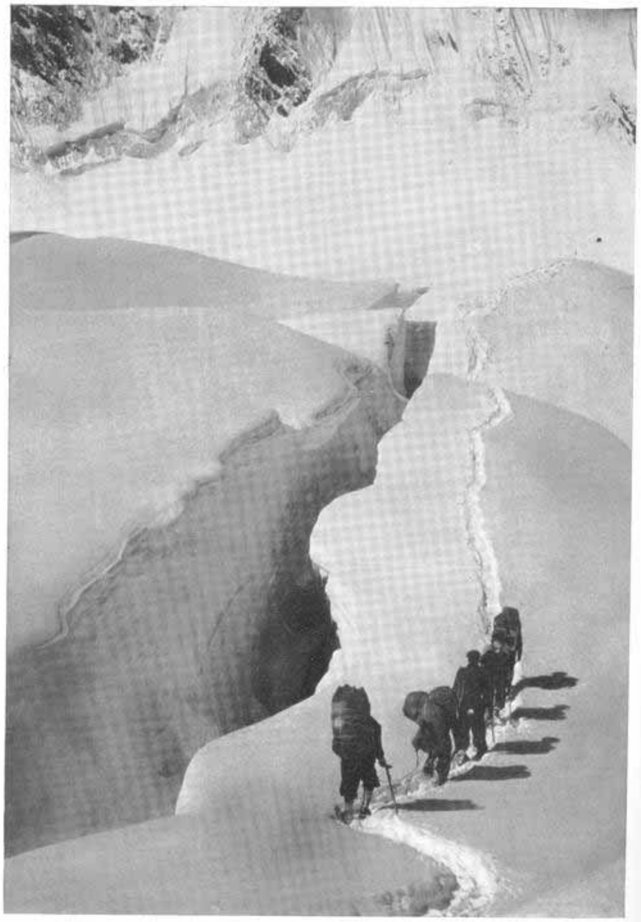

THE WESTERN CWM
Lower part of Western Cwm; Ferry party on its way to Camp IV

অনূকুল আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেলেই যাতে তাঁরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে শৃঙ্গের চূড়ায় এগোনোর অনুমতি পেতে পারেন।

সাফল্যের কথা চিন্তা করে হান্ট উপলব্ধি করলেন পর্বত অভিযানের প্রত্যেক অভিযাত্রীর অগ্রগতি এবং মালবহনের পরিমাণ স্থির করা উচিত আগাম পরিকল্পনা মাফিক। শুধু তাই নয় ব্রিটেন ছাড়বার পূর্বে অভিযানকে তিনটি নির্দিষ্ট পর্বে ভাগ করে নিলেন। প্রথম পর্বে বিপুল খাদ্যসামগ্রী কুম্বু হিমবাহ অতিক্রম করে বেসক্যাম্প থেকে ওয়েস্ট CWM এর শীর্ষে অ্যাডভান্স বেসক্যাম্পে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই আইস ফল অঞ্চলে সহজতম পথ অন্বেষণই সবচেয়ে বড় সমস্যা। হালকা ওজনের ধাতুর তৈরি মই ব্যবহারই সেক্ষেত্রে অন্যতম সমাধান, যেটি ২৫ ফুট পর্যন্ত চওড়া দুটি বরফের দেওয়ালের ফাঁকা অংশে সেতু নির্মাণের উপযোগী।

দ্বিতীয় পর্বের লক্ষ্য সাউথ কলে একটি অস্থায়ী শিবির

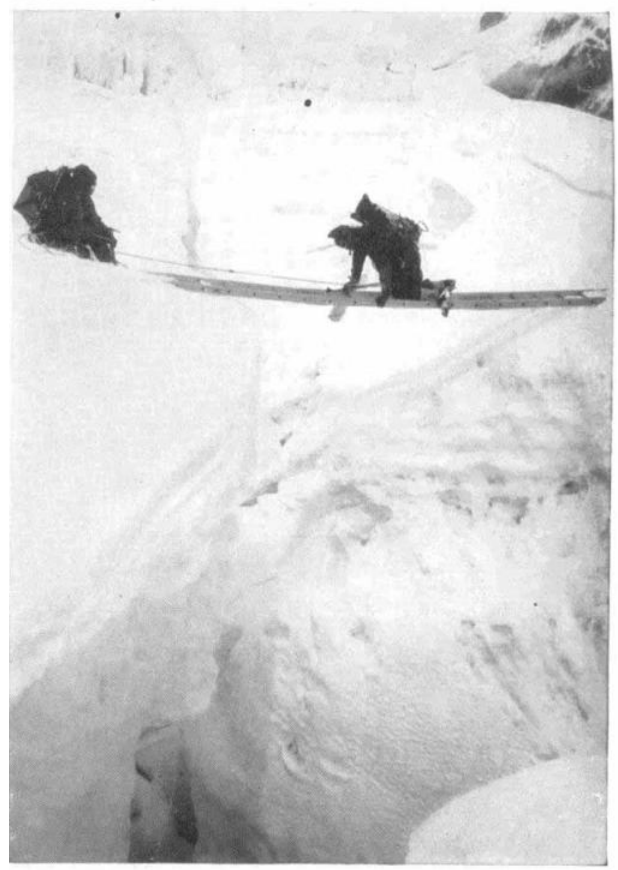

THE WESTERN CWM
Entrance to the Cwm; crossing the 16-foot gap above Camp III

PLATE 23

THE SOUTH COL
The Col from the top of the Geneva Spur (26,000 feet), with Everest hidden in cloud

স্থাপন করে প্রচুর মালবাহককে লোৎসে গাত্র অতিক্রম করে অধিকতর উচ্চতায় পাঠানো। অভিযানে লোৎসে গাত্রে পৌঁছনোর পূর্বেই দুটি অন্তবর্তী শিবির স্থাপন অবশ্যম্ভাবী।

সাউথ কলে শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্য পূর্বপরিকল্পিত। চারদলের সদস্যের মধ্যে ছিলেন দুজন পর্বতারোহী এবং দুজন শেরপা। পরিকল্পনা অনুযায়ী একেকটি দল অ্যাডভান্স বেসক্যাম্প থেকে যাত্রা শুরু করে সাউথ কলে রাত্রি যাপন করবে। এবং প্রয়োজন হলে লোৎসে গাত্রের অন্তর্বতী শিবিরেও রাত্রিবাস করতে হতে পারে। আরোহীর শারীরিক অবস্থা এবং আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করবে সাউথ কল থেকে অধিক উচ্চতায় আরোহণের সম্ভাবনা। শিবির ত্যাগের মুহুর্তে দলটি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ যদি প্রয়োজন হয় দক্ষ দলকে দক্ষিণ পূর্ব রিজ ধরে অধিকতর উচ্চ হিমালয়েও প্রেরণ করা হতে পারে। এই বিক্ষিপ্ত তিনটি পদক্ষেপের মাধ্যমে হান্ট শৃঙ্গের চূড়ায় পৌঁছনোর পরিকল্পনা করলেন।

পরিস্থিতির চাপে উক্ত পরিকল্পনাগুলির হয়তো পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য হল পরিকল্পনাগুলিকে পূঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করা। অভিযানের সাফল্য নির্ভর করবে পূর্ব পরিকল্পনাটি কতটা সতর্কতার সাথে এবং সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়েছে।

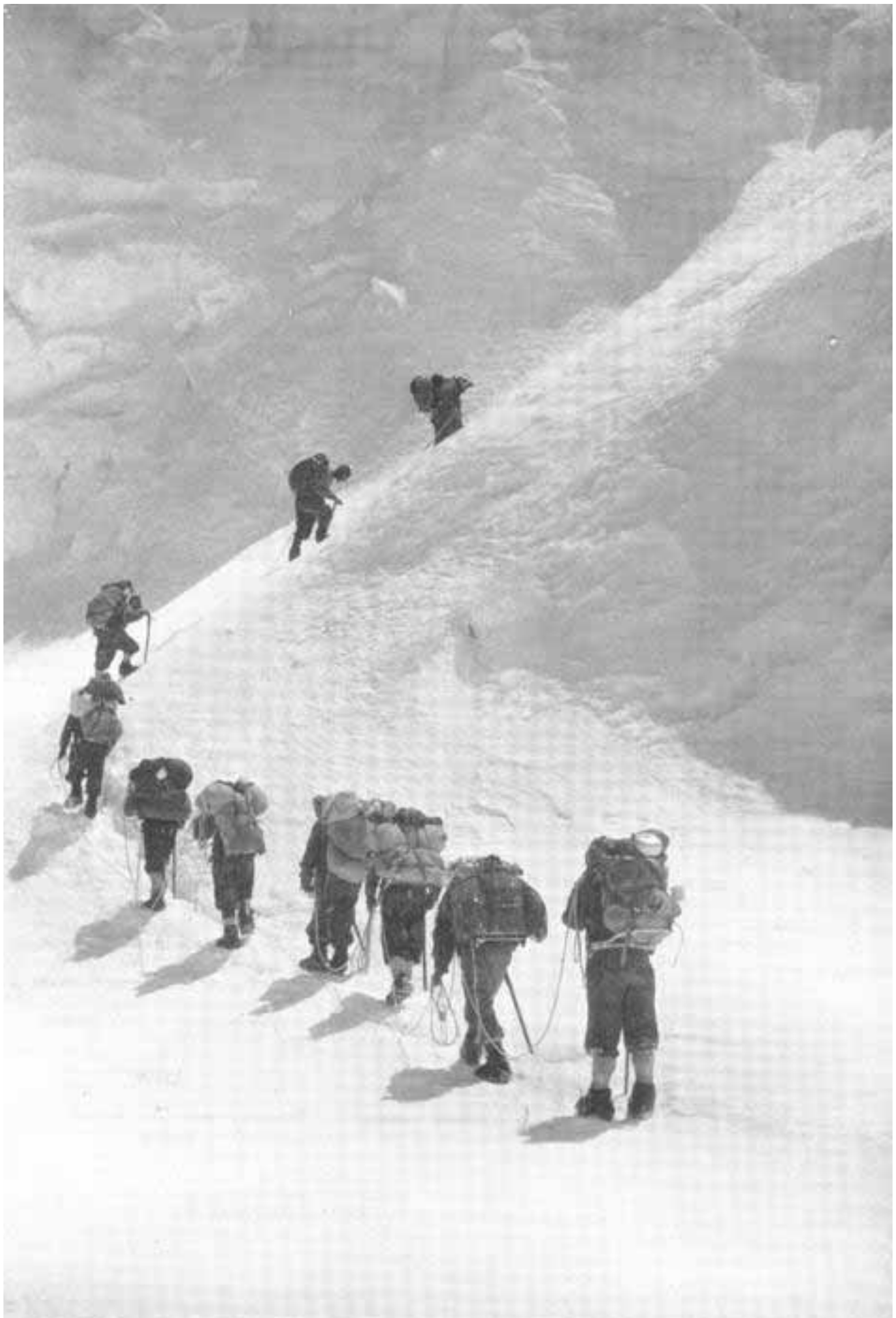

THE LHOTSE FACE

Party at the foot of the Face starting up towards Camp VI

বক জাতক

নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

গরমটাও এবার পড়েছে জাঁকিয়ে। এই ছোট্ট পুকুরে বেচারা মাছেদের অবস্থা বড়োই করুণ।ওদের থাকার জায়গাটা দিনের পর দিন কমছে।আসলে গরমে পুকুরের জল যখন শুকোতে থাকে প্রত্যেক বছরই এই অসুবিধেটা ওদের হয়। কিন্তু কী আর করা যাবে?ওরা তো "ধুত্তোর, এখানে পোষাচ্ছে না" বলে অন্য পুকুর কি নদী খুঁজে নিতে পারে না! জল ছাড়া যে ওদের জীবনই অচল।

এবার মুশকিলটা হয়েছে অন্য জায়গায়।এত গরম পড়েছে যে অন্যান্যবারের থেকেও পুকুরের জল এবার আরো কমেছে। আর এ পুকুর থেকে মাছ কেউ খুব একটা ধরে না বলে মাছেদের বংশ বেশ একটু ফুলে-ফেঁপেই উঠেছে। লোকে বলে চাতকপাখি নাকি আকাশে মেঘ জমার অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকে। তা মাছেরাই বা কম কীসে? ওরাও জলের মধ্যে থেকে আকুল হয়ে আকাশের দিকে তাকায়-আকাশের কোনো কোণায় মেঘের দেখা পাওয়া যায় যদি!

এই পুকুরের ধারে থাকে এক বক। পুকুরে মাছের ঝাঁককে ঘুরতে দেখে ওর ঠোঁট দিয়ে জল গড়ায়। কিন্তু হতভাগা মাছগুলো এমন পাজি, জলের কাছাকাছি গেলেই কী করে টের পায় কে জানে? আর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যে সেঁধোয় তার নাগালই পাওয়া যায় না।

বক একদিন সাত-পাঁচ ভেবে এক ফন্দি বার করল। ভালোমানুষের মতো মুখ করে জলের ধারে গিয়ে ডাকতে লাগল, "মাছভাই ,মাছভাই,শুনতে পাচ্ছো?"

"কে ডাকে রে উপর থেকে?" বলতে বলতে বুড়ো মাছ মুখটা তুলল জলের উপরে, "ও,তুমি! কী ব্যাপার?"

"না, ব্যাপার আর কী? তোমাদের কষ্ট দেখে আমার বড়ো দুঃখ হয় গো!আহা!এইটুকু জলে তোমরা এতজন,কত কষ্ট হয় বল? আর খাবারও তো ঠিকঠাক মেলে না!"

"উঃ! কালে কালে কতই শুনব? মাছেদের কষ্টে নাকি বকের বুক ফাটে দুঃখে! যাও তো এখান থেকে! ফালতু কথা বাড়াতে এস না।" বুড়ো মাছ মুখ ভেঙচে ওঠে।

"আহা,শোন না! সকলকে একরকম ভাব কেন? ওই ওদিকটায়, এখান থেকে একটু দূরে ,একটা বিরাট দিঘি দেখে এলাম।সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তোমাদের কথা। তাই ভাবলাম খবরটা তোমাদের জানাই।তোমাদের ভালোর জন্য বাড়ি বয়ে এসে খবরটা দিলাম,আর তোমরাই কিনা ভুল বুঝলে! জগৎটাই এমন!"

"তা ওখানকার দিঘির গল্প শুনে আমরা কী করবো?আমরা সেখানে যাবো কী করে? আমরা কি ডাঙায় চলতে পারি, না তোমার মতো আকাশে উড়তে পারি?"

"শোনো ভাই,ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আমি কি একটা উপায় না ঠাউরে তোমাদের এই খবরটা দিয়েছি?"

"বল শুনি কী উপায় ঠাউরেছো।" নাছোড়বান্দা বককে মাছেরা শুধোয়।

"উপায়টা খুবই সোজা। তোমাদের একজন একজন করে ঠোঁটে নিয়ে ওই দিঘিতে ছেড়ে আসব।"

"আর একজন একজন করে সাবাড় করবো।এই তাহলে তোমার মতলব বগুলা বাবাজি?" বকের কথা কেড়ে নিয়ে বুড়ো মাছ বলল।

"ছি ছি! এ কী অবিশ্বাস!তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে যদি ওখান থেকে ঘুরিয়ে আনি তবে

বিশ্বাস করবে তো? এইজন্যে বলে কারো ভালো করতে নেই। তোমাদের ভালোর জন্যেই বললাম,আর তার জন্যে কত কথা!" বক নিজের মনে গজগজ করতে থাকে। যেন কতবড়ো অপমান তাকে করেছে মাছেরা।

অন্য মাছেরাও উঁকিঝুঁকি মেরে বক আর দাদুমাছের কথা শুনছিল। সবারই সন্দেহ যে মাছ ধরার জন্য পুকুরের চারপাশে সবসময় ছোঁকছোঁক করে ঘুরে বেড়ায় আজ এমন কী ঘটনা ঘটল যে সে যেচে মাছেদের উপকার করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে?

ঐ পুকুরে ছিল আর এক বুড়ো মাছ। সে আবার ছিল কানা। সে ভাবল, 'আমি কানা বুড়ো, আর কদিনই বা বাঁচব! আমি বরং ঐ বকের সাথে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারখানা আর আমি যদি না ফিরি,তবু তো এরা সব বুঝতেই পারবে আর সেইমতো সাবধান হয়ে যাবে।'

সে অন্য মাছেদের আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে বকের সাথে চলল অভিযানে। বক কিন্তু ভারী চালাক। যতই লোভ হোক না কেন, ঠোঁটে করে মাছটাকে নিয়ে ঐ বড়ো দিঘিতে ছেড়ে দিল। আর চোখ বুজে আগামী দিনের সুখস্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকল।

এদিকে কানা মাছ দিঘিতে ডুব দিয়ে তো বেজায় খুশি। সাঁতার কেটে এদিকে যায় ,ওদিকে যায়-আর শেষ খুঁজে পায় না! ঐ ছোট্ট পুকুরে তার সারাটা জীবন কেটেছে। সেটাকে ডোবা বললেও খুব ভুল হয় না। দিঘি যে এত বড়ো সেটা ওর ধারণারও বাইরে। ভারী ফুর্তি তার এখানে সাঁতার কেটে। আবার বককে সন্দেহ করেছে দেখে লজ্জাও লাগে।

খানিক পরে বকের ডাকে তার সম্বিত ফেরে। আবার বকের ঠোঁটে চেপে বাড়ির পথ ধরা। এবার বকের ঠোঁটে চাপতে আর ভয় লাগে না।

পুকুরে মাছের ঝাঁক খুব ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছিল। ভাবছিল—কানা দাদু বুঝি আর ফিরবেই না। কিন্তু বকের ঠোঁটে কানাদাদুকে দেখে সবার চোখ গোল। কানা মাছ ফিরলে সবাই ওকে ছেঁকে ধরল। সে তো দিঘির বর্ণনা দিয়ে আর থই পায় না!

বক বাবাজি একপায়ে দাঁড়িয়ে চোখ মটকে জিজ্ঞেস করে, "কী হে ,এবার মানলে তো যে আমি লোকটা তত খারাপ না!"

মাছেরা বার বার বলতে থাকে "না না দাদা,আমাদেরই ভুল। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। কিছু মনে কোরো না দাদা।"

"আরে না না। তোমরা কী করে জানবে বল? আমি তো দীক্ষা নিয়েছি। তাই মাছ-টাছ আর খাই না। ফল-মূল খেয়ে আর ঠাকুরের নাম-গান করে দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছে।"

যাই হোক, মাছেরা তৈরি হয় দিঘিতে যাবার জন্যে। প্রথমেই যাবে কানা মাছ। তারপর একে একে আর সব মাছেরা। প্রত্যেকদিন দশ-বারোবার করে বক আসে আর একটা একটা করে মাছ নিয়ে উড়ে যায়। এই পরোপকারে বকের কোনো ক্লান্তি নেই। দেখতে দেখতে বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। পুকুর এখন মাছশূন্য। পড়ে আছে কটা গেঁড়ি –গুগলি আর একটা কাঁকড়া।

কাঁকড়া এতদিন পাশ কাটিয়ে এসেছে। বককে কেন যেন তার পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি। মাছেদের বলেওছে সে কথা। কিন্তু ওরা বেচারাকে বকে ধমকে থামিয়ে দিয়েছে। এবার এসেছে তার পালা।

বক এসে গেছে ওকে নিতে। ভারী মোলায়েম গলায় কাঁকড়াকে ডাকে, "এসো ভাই ,আমার ঠোঁটে করে তোমায় নিয়ে যাই।"

"না দাদা,আমার ভয় করে। তার চেয়ে বরং আমি আমার দাঁড়া দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরি,তুমি আমায় নিয়ে চল।"

অগত্যা বককে রাজি হতে হয়। কাঁকড়া তার দুই দাঁড়া দিয়ে শক্ত করে বকের গলা জড়িয়ে ঝুলতে থাকে,বক তাকে নিয়েই ওড়ে। দিঘির ধারে পৌঁছে যায় একটু বাদেই। কিন্তু দিঘির পাড়ে না নেমে বক কাঁকড়াকে

নিয়ে যায় পাশেই বিরাট একটা গাছের একেবারে মগডালে। বকের মতিগতি কাঁকড়ার খুব একটা সুবিধের ঠেকে না। সে বলে, "কী ব্যাপার দাদা,তুমি আমায় এখানে এনে তুললে কেন? ওই তো সামনেই একটা মস্ত বড়ো পুকুর দেখতে পাচ্ছি। ওটাই কী সেই দিঘি?"

বকের হাবভাব এখন অন্যরকম, "এই, কে তোর সাতজন্মের দাদা রে? ওই নীচে তাকিয়ে দেখ,তোর সঙ্গীসাথীদের কী গতি হয়েছে শেষপর্যন্ত। এবার ঐ দলে তুইও ঢুকবি।"বকের মুখে শয়তানি হাসি।

গাছের গোড়ায় মাছের কাঁটার স্তূপ। কাঁকড়ার এতদিন এই আশঙ্কাই ছিল। কিন্তু বকবাবাজি কাঁকড়াকে চেনেনি। কাঁকড়া তার দুই শক্ত দাঁড়া দিয়ে বকের গলাটাকে চাপতে থাকে। সাঁড়াশি চাপে বকের দমবন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়!

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ভাই, তোমাকে এক্ষুণি জলে রেখে আসছি।"

কাঁকড়া মুখে কিছু বলে না, তবে চাপ একটু আলগা করে। বক গা ঝাড়া দিয়ে কাঁকড়াকে নিয়ে উড়ে যায় দিঘির পাড়ে।

জলে নামার আগে কাঁকড়ার একটা ছোট্ট কাজই বাকি ছিল। তার বন্ধুদের সাথে যে প্রতারণা হয়েছে তার প্রতিশোধ নেওয়া। দিঘির ধারে পৌঁছে বক কাকুতিমিনতি করতে থাকে, "এবার ভাই আমার গলাটা ছাড়।"

"মাছেদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যখন ছল করে তাদের মেরে খাচ্ছিলি বদমাশ, তখন তাদের কথা শুনেছিলি? এবার দেখি তোকে বাঁচায় কে?"

কাঁকড়া তার দুই দাঁড়া দিয়ে আরো জোরে চেপে ধরে বকের গলা। তারপর একসময় বকের গলাটা কুট করে কেটে ফেলে ধীরেসুস্থে জলে নেমে যায়।

* * * * * *

বুদ্ধদেব এই গল্প বলে বললেন—"তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? বক মাছেদের ঠকিয়েছিল বলেই ওকে তার ফল পেতে হল। অন্যকে ফাঁদে ফেলতে গেলে শেষপর্যন্ত সেই ফাঁদে নিজেকেও জড়িয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ, অন্যকে ঠকিয়ে কখনো জয়ী হওয়া যায় না।"

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতনু প্রজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়

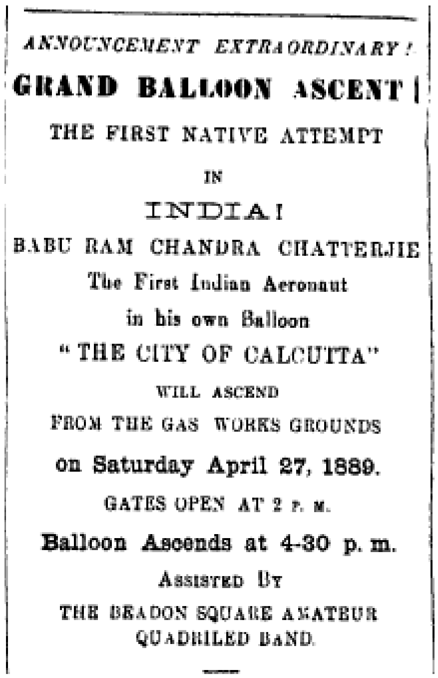
ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY!
GRAND BALLOON ASCENT!
THE FIRST NATIVE ATTEMPT
IN
INDIA!
BABU RAM CHANDRA CHATTERJIE
The First Indian Aeronaut
in his own Balloon
"THE CITY OF CALCUTTA"
WILL ASCEND
FROM THE GAS WORKS GROUNDS
on Saturday April 27, 1889.
GATES OPEN AT 2 P. M.
Balloon Ascends at 4-30 p. m.
ASSISTED BY
THE BEADON SQUARE AMATEUR
QUADRILED BAND.

উনিশ শতকের শেষ দিকে রবি ঠাকুর যখন স্টিমারে চড়ে ভেসে পড়েছেন শিলাইদহের জমিদারি সামলাতে, ঠিক সেই বছর কোলকাতায় এসে পৌঁছলেন জগৎবিদিত বেলুনবিদ্ স্পেন্সার সাহেব। বেলুনে চড়ে আকাশ পরিভ্রমণ করে প্যারাশুটে মাটিতে নেমে আসাই ছিল বিলাত থেকে কোলকাতার মাটিতে আসার উদ্দেশ্য। গ্রীষ্মের এক বিকেলে গিজগিজে দর্শকবৃন্দের অবাক চোখের সামনে দিয়ে এই স্পেন্সার সাহেব হাইড্রোজেন ভর্তি একটি বেলুনে চড়ে আকাশে উঠতে লাগলেন। আর সরলভাবে উঠতে উঠতে এতটাই ওপরে উঠে পড়লেন যে বেলুনটিকে একটি বিন্দুর মত লাগছিল দর্শকদের আর প্যারাশুটটিকে মনে হচ্ছিল একফালি ন্যাকড়া ওই বিন্দু থেকে ঝুলছে!

দর্শকদের মধ্যে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন শিমুলিয়া অঞ্চলের কাঁসারিপাড়ার এক সাহসী বাঙালি। নাম রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন চিৎপুর রোডে নর্মান স্কুলের জিমন্যাষ্টিকের মাস্টার। সেদিন আর পাঁচজন দর্শকের মতই অবাক হয়ে দেখছিলেন পাঁচ ছ'হাজার ফুট ওপরে উঠে সাহেব বেলুনটিকে দোলাচ্ছে! আর তারপর প্যারাশুট ধরে ঝুলে পড়লেন! রামচন্দ্র লক্ষ করলেন দেড়শো ফুটখানেক নেমে যাওয়ার পরে সেই প্যারাশুটের ছাতা খুলে গেল আর সাহেব মাটিতে নেমে এলেন সেই ছাতা ধরে।

কোলকাতায় হইহই রইরই পড়ে গেল এই কেরামতি নিয়ে। এই ঘটনা ভীষণ নাড়া দিল রামচন্দ্রকে। শিষ্যত্ব নিলেন ওই বৃটিশ সাহেবের। পাঁচশো টাকা গুরুদক্ষিণায় এই বেলুনবিদ্যা রপ্ত করলেন রামচন্দ্র। তারপর প্রথম দেশি মানুষ হিসেবে নারকেলডাঙা প্রাঙ্গণে হাজার আটেক জুলজুলে চোখের সামনে একদিন বিকেলে পাঁচটা নাগাদ চড়ে বসলেন বেলুনে। সাদা স্যুট পরিহিত রামবাবু গলায় দূরবীন ঝুলিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে টুপি নাড়াতে নাড়াতে ওপরে উঠতে লাগলেন। বেলুন উড়তে উড়তে একটু বেশিই ওপরে উঠে গেল। উপস্থিত বিজ্ঞানমনস্ক কেউ কেউ গম্ভীরমুখে বললেন রামবাবু আর নামতে পারবেন না ওখান থেকে। জীবন্ত অবস্থায় ওই বায়ুস্তর থেকে নামা অসম্ভব!

দর্শকের মুখ চুণ। সাহসী এই বাঙালি এভাবে হেরে যাবে! অনেকে চোখে দূরবিন রেখেছে। দেখা গেল বেলুনটি ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। কিন্তু প্যারাশুট খুলছে না! এক একবার পাক খেতে খেতে গোঁত্তা খেয়ে পঞ্চাশ-ষাট হাত নেমে আসছে, আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু প্যারাশুট খোলার নাম নেই।

অবশেষে একসময় প্যারাশুট খুলে গেল। দর্শক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আওয়াজ উঠল, 'জয় রামবাবুকী জয়।' আস্তে আস্তে প্যারাশুট নেমে এল। বেলুনে চড়ার আধঘন্টাখানেক পরে সোদপুর থেকে মাইল দুয়েক দূরে নাটাগড় নামক স্থানে অবতরণ করলেন রামবাবু। পরিচিত লোকজন দৌড়ে গিয়ে শরবত খাইয়ে ওঁকে সুস্থির করলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত দেরি করলেন কেন বেলুন থেকে প্যারাস্যুটে লাফাতে?' উনি ঠোঁটে লেগে থাকা শরবত হাত দিয়ে মুছে বললেন, 'আরে ভায়া আর বোলো না, যতবার নামতে যাই মনের

ভেতর কেমন কেমন করে ওঠে। হাত সরিয়ে নিই প্যারাস্যুটের দড়ি থেকে। যখন দেখলাম অনেক বেশিই উঠে গেছি, তখন 'জয় মা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।'

তাঁর এই অবিশ্বাস্য ভ্রমণের কথা ১১ই মে'র 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (সঙ্গে তাঁর বালুন অভিযানের একটা সমসাময়িক উডকাটের ছবি দেয়া হল) এরপর এই বেলুন নিয়ে উনি ভারতের নানা যায়গায় ঘুরে ঘুরে কেরামতি দেখান ও রাজা মহারাজা ও দর্শকদের প্রশংসা পান।

বেলুন খেলার পাশাপাশি ওঁর মাথায় চিড়বিড় করছিল আরো একটি ভাবনা। বললেন, এবারে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। যে সে বাঘ নয়, রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কোত্থেকে একটা বাঘ জোগাড় করে খেল দেখালেন পাথুরেঘাটার রাজবাড়িতে। সাহেবরা খেলা দেখাত লোহার খাঁচায় বাঘের দুপাশে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে যাতে বাঘ বেগড়বাই হলে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। রামবাবু ঠিক করলেন খোলা উঠোনেই দেখাবেন তাঁর কেরামতি। ছোট একটা খাঁচায় বাঘটাকে আনা হল। চড়থাপ্পড় মেরে বেশ বাগে আনলেন বাঘটাকে। খেলা দেখিয়ে দর্শকের হাততালি কুড়িয়ে আবার খাঁচায় পুরে দিলেন বাঘটিকে।

শোনা যায় একসময় উনি হিমালয়ে চলে গেছিলেন সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে। বাকি জীবনটা তপস্যায় কাটিয়ে দিতে। নাটকীয়তা আর ঘটনায় ভরা অসীম সাহসী এই বাঙালির মৃত্যু বড় করুণ। বেলুনে চড়েই সারা ভারতের মানুষের মন জয় করেছেন উনি, আবার এই বেলুনই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় ওঁকে। বেলুনে উড়ে যাওয়া অবস্থায় একটি পাহাড়ে ধাক্কা লাগে তাঁর ও গুরুতর আহত হন। ১৮৯২ এর ৯ই আগষ্ট এই অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় বাঙালি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অরিন্দম দেবনাথ

খেলার জগতটাই ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক ক্রিকেটের কথা। সাবেকি বনেদি ধৈর্যের খেলা পাঁচ দিনের টেস্ট সিরিজ তো প্রায় শেষের মুখে।পঞ্চাশ ওভারের 'ওয়ান ডে'ও ইতিহাস হতে বসেছে। এখন ক্রিকেট কুড়ি ওভারের খেলা। সামনে কি আরও পরিবর্তন আসছে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

দাবা খেলার সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। খবরের কাগজ, বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিওতে প্রায়ই দাবা সম্পর্কিত খবরা খবর থাকে। সাধারনত দাবাকে আমরা বুদ্ধির খেলা বলে জানি। বহু প্রাচীন মস্তিস্কের খেলা দাবাও পেয়ে গেছে একটা নতুন রূপ।

ঠিক কবে দাবা খেলার উদ্ভাবন হয়েছিল সঠিক জানা না গেলও আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষে এই খেলার উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষ থেকে এই খেলা পারস্যদেশ হয়ে ইউরোপে পৌঁছয়। তারপর ছড়িয়ে পরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। কিছু ঐতিহাসিকের মতে দাবার সূচনা হয়েছিল চিন দেশে। আবার কেউ কেউ বলেন মিশরে এই খেলার প্রথম প্রচলন হয়।

বহু বছর ধরে এই খেলা কল্পনাবিলাসীদের সময় কাটানোর মাধ্যম বলে পরিচিত ছিল। ইউরোপিয়ানরা এই সময় কাটানোর ভারতীয় খেলাকে নিয়মকানুনে বেঁধে পুরো দস্তুর খেলার আধুনিক রুপ দেয়। ১৮৫১ সালে লন্ডনে প্রথম দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবং এই প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশদের চমকে দিয়ে অ্যাডলফ অ্যান্ডারসন নামে এক জার্মান দাবাড়ু চেস মাষ্টার খ্যাতি জিতে নেন। ১৮৮৬ সালে প্রথম বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়।

মাত্র কিছু বছর আগে ২০০৩ সালে দাবা খেলার এক নতুন রূপ জন্ম নিল। দাবা খেলার সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী আর এক খেলা বক্সিংএর মিশ্রণে তৈরি হল 'চেস বক্সিং'। ওই বছর

নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম শহরে আইপি রুবিন (Iepe Rubingh) নামে এক বক্সার জিন লাউস

এংকি বিলাল ও আইপি রুবিন

ভেন্সট্রা'র (Jean Louise Veenstra) সাথে, এক হাজার উৎসাহী দর্শকের সামনে বক্সিং লড়ার ফাঁকে ফাঁকে দাবা খেলে জন্ম দিলেন দাবা বক্সিং'এর।

যদিও ১৯৭০ দশকে লন্ডনের শহরতলির একটা বক্সিং ক্লাবে রবিনসন পদবীধারী দুই বক্সার ভাই, বক্সিং করার ফাঁকে ফাঁকে দাবা খেলতেন মস্তিস্ককে ক্ষুরধার করতে। ১৯৭৯ সালে 'মিস্টরি অফ চেস বক্সিং' নামে একটি কুং-ফু মুভি'ও তৈরি হয়েছিল। যদিও কোনটাই ঠিক খেলার রূপ ছিল না।

১৯৯২ সালে প্রকাশিত, এঙ্কি বিলাল (Enki Bilal) নামে এক যুগোস্লাভিয়ান লেখকের কল্পবিজ্ঞানের গ্রাফিক কমিক, ''ফ্রইদ ইকুএতেউর'' (Froid Equateur) দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে, আইপি রুবিন এই চেস বক্সিং নামের নতুন খেলার কথা ভেবেছিলেন।

১১ পর্ব মিলিয়ে মোট ৪৫ মিনিটের খেলা এই চেস বক্সিং। তার মধ্যে ছয় পর্ব দাবার আর পাঁচ পর্ব বক্সিংএর। মাত্র তিন মিনিট করে সময় নির্ধারিত প্রতিপর্বের জন্যে।আর এক মিনিট সময় থাকে প্রতি পর্বের মাঝে বিরতি হিসেবে। দাবার চাল দেবার জন্যে মোট ৯ মিনিট সময় পান এক একজন প্রতিযোগী। খেলা শুরু হয় দাবা দিয়ে, শেষও হয় দাবা দিয়ে। দাবা খেলা ও বক্সিং দুটোই চলে রিঙের ভেতরে। দাবাতে কিস্তি অথবা ঘুঁষি মেরে কুপোকাত - যেকোনো একটা করলেই জিতে যান প্রতিযোগী। সারাসরি কোণটাই না হলে বিচারকের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। সব খেলার মতো এই খেলাতেও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সব চাইতে কঠিন নিয়মটা হল-সময় নষ্ট। অহেতুক সময় নষ্ট করলে শুধুমাত্র হেরে যাওয়া নয়, প্রতিযোগিতা থেকে অযোগ্য বলে নির্বাসন দেওয়া হতে পারে প্রতিযোগীকে।

খেলাটা কিন্তু মোটেই সহজ খেলা নয়। চেয়ারে বসে ঠাণ্ডা মাথায় দাবার চাল দিয়ে পরক্ষণে বক্সিং রিঙে ঘুঁষি ছোঁড়া – এক চরম স্নায়ুর লড়াই।

নতুন খেলার সূচনা করে এঙ্কি বিলাল ক্ষান্ত ছিলেন না। শুরু করলেন এই খেলাটাকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে। বার্লিন শহরে সৃষ্টি হল 'ওয়ার্ল্ড চেস বক্সিং অরগানাইজেশানের'।

ওই একই বছর গ্রিসে 'ডাচ বক্সিং অ্যাসোসিয়েশান' ও 'ওয়ার্ল্ড চেস বক্সিং অরগানাইজেশানের' যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'চেস বক্সিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ'।

কিন্তু এই খেলা সীমিত ছিল সামান্য কিছু বক্সার ও কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে। এই খেলাকে ছড়িয়ে দিতে শুরু হল নতুন কর্মকাণ্ড।

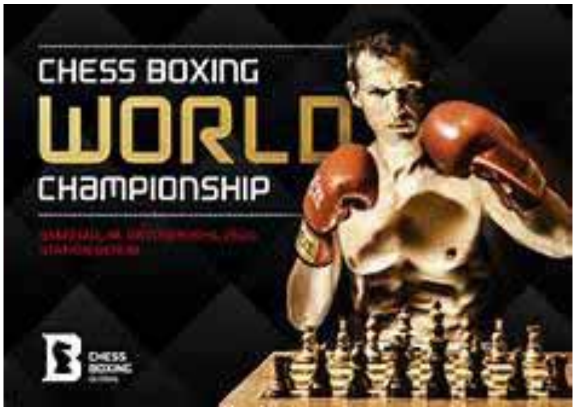

২০০৫ সালে বার্লিন শহরে অনুষ্ঠিত হল প্রথম 'ইউরোপিয়ান চেস বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপ'। ২০০৮ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেডারেশন' 'চেস বক্সিং'এর দাবার অংশকে স্বীকৃতি দিল। ২০১০ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চেস বক্সিং ক্লাব তৈরি হল। ২০১১ সালে, কিকবক্সিং তথা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন মন্টু দাসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে 'চেস বক্সিং অরগানাইজেশান অফ ইন্ডিয়া'র' জন্ম হল। ভারতবর্ষ ঘুরে খেলাটি ছড়িয়ে পড়ল, ইরান ও চায়নাতে।

কিন্তু খেলাটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজন অনেক টাকার। টাকার সংস্থান করতে এগিয়ে এলেন কার্টুনিস্ট এঙ্কি বিলাল। ২০১৩ সালে চেস বক্সিংএর কয়েকটি মোটিফ এঁকে প্যারিসে নিলাম করে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ইউরো মানে প্রায় সওয়া কোটি টাকা তুলে দিলেন 'চেস বক্সিং গ্লোবাল মার্কেটিং' নামে এক সংস্থার হাতে।

২০১৪ সালে যোধপুরে আয়োজিত তৃতীয় ভারতীয় চেস বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২৪৫। ভারতে এই খেলার জনপ্রিয়তার সাক্ষর।

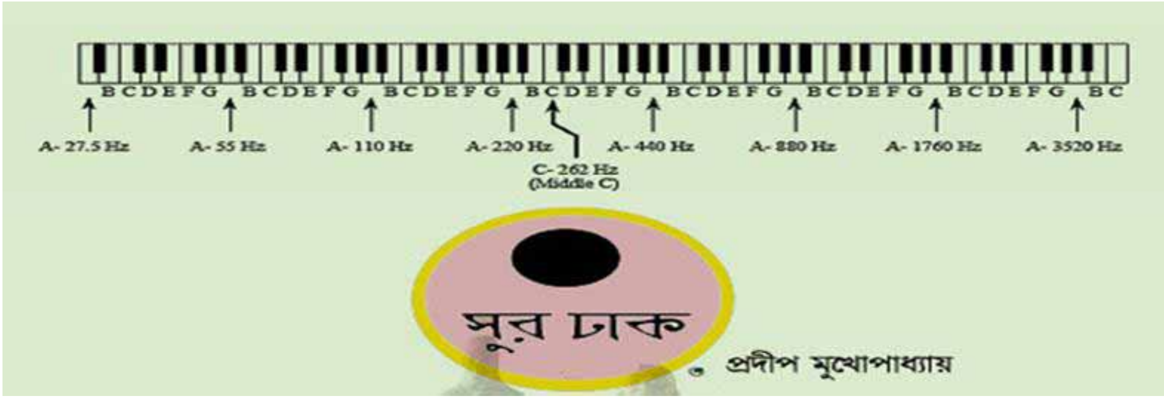

'উৎপাদন' ব্যাপারটা কবিতার ক্ষেত্রে যতটা ভয়ানক, বিজ্ঞানের বেলায়ও ততটাই। চারুশিল্প, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো বটেই। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে কেউ বলেনি - এ মাসের মধ্যে পাঁচটা ভার্জিন অফ্ দ্য রক্স্ (*Vergine_delle_Rocce*) এঁকে ফেলতে হবে, নইলে চাকরি নাই। যতদিন না জ্ঞান, সে বিজ্ঞানের হোক বা সঙ্গীতের, সমাজে মাতব্বরি করার মত জায়গায় এল বৈষয়িকতার হাত ধরে, ততদিন তা স্বাধীনভাবে চলতে পেরেছে নিজের পথে, অমৃতের খোঁজে। এখনকার ব্যতিক্রমী শিল্পী বা বিজ্ঞান-সাধকদের কথা বাদ দিলে *'যেনাহম নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম'* এর মানে হয়ে গেল চাঁদির জুতা যাতে নাই, তা দিয়া কাম নাই! জয়ঢাকের প্রয়াসের সাথে যদিও চাঁদির ব্যাপারটা একেবারেই নেই, তবুও গুঁতো আছে - সময়ের। তাই ধিক্ শতধিক্ এড়াতে সময়মত লিখে ফেলতেই হয় কাঠফাটা রোদেও ভৈরবী।

হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের দশটি ঠাটের আর দুটি নিয়ে আলোচনা করা বাকি। ভৈরবী আর টোড়ী।

শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও উত্তর ভারতীয় রাগ হিসেবে ভৈরবী বোধহয় সবচেয়ে 'বিখ্যাত' রাগ। ভৈরবীর মত এত পরিচিত, এত ব্যবহৃত রাগের তুলনা হতে পারে একমাত্র ইমনের সাথে। ভৈরবী যে কত জনপ্রিয় রাগ, সেটা বোঝা যাবে এবারের লেখার সাথে দেওয়া তালিকা দেখলে আর অডিও লিঙ্ক গুলো শুনলে। এই রাগের সহজ চলনের জন্য বেশীরভাগ শিল্পীই সহজে এই রাগটি পরিবেশন করতে পারেন আর সেটাও এই রাগের জনপ্রিয়তার কারণ খানিকটা। মাটির গন্ধমাখা অত্যন্ত সুরেলা এই রাগটিকে রাগের রাণী বলা হয় অকারণে নয়।
দশটি ঠাটের অন্য জনক রাগগুলির মত ভৈরবীও এই একই নামের ঠাটের জনক রাগ। যে স্বরগুলি এই রাগে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল -
সা ঋ জ্ঞ ম প দ ণ - অর্থাৎ রে গা ধা নি এই চারটি স্বরই কোমল।

তবে দশটি ঠাটের অন্যান্য রাগগুলির তুলনায় ভৈরবীর বৈশিষ্ট্য হল যে গুণীজনের পরিবেশনে এই রাগে স্বরগ্রামের সব কয়টি স্বর লাগলেও রাগরূপ বজায় থাকে। সেই হিসেবে বিবাদী স্বর, প্রয়োগ সাপেক্ষে, এই রাগে অনুপস্থিত। তবে অন্য স্বরগুলি প্রধান রূপে ব্যবহার করলে তখন রাগটিকে বলা হয় মিশ্র ভৈরবী। আবার এই রাগটি সকালের রাগ হলেও অন্য সময়েও পরিবেশন করা চলে। তাই সর্বকালিক রাগ বলা হয় ভৈরবীকে। এখন তো মোটামুটি রেওয়াজই হয়ে গেছে যে বেশীরভাগ শিল্পী অনুষ্ঠানের শেষ করেন এই রাগটির কোন না কোন রূপ পরিবেশন করে। সর্বকালিক হওয়া ছাড়াও এত সহজিয়া ভাবের সুরেলা রাগের পর অন্য কোন রাগ আর নূতন করে রেখাপাত করে না বলেও সবশেষে গাওয়া হয় ভৈরবী। বিলম্বিত খেয়াল বিশেষ গাওয়া না হলেও এই রাগটিতে ধ্রুপদ, ধামার, তারাণা, টপ্পা, ঠুমরী, দাদরা ছাড়াও ভারতীয় সঙ্গীতের অন্য লোকপ্রিয় ধারাগুলি যেমন ভজন, গীত, গজল, কাওয়ালি, নাট্যসঙ্গীত ইত্যাদি সব রকমই পরিবেশিত হয়।

সঙ্গীতের তাত্ত্বিক লেখা ধৈর্য ধরে পড়া, বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তত্ত্বকথা, আরও বিশেষ করে আমার মত *লকীর কে ফকীরের* লেখা, বেশ একটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তবে, 'যব দিল হি টুট গয়া' - নৌশাদ জীর সুরে এই গানটি বা চিত্রগুপ্ত জীর 'তুম হী হো মাতা পিতা তুমহি হো' গানটি গুনগুন করতে করতে পড়লে বোধহয় ভৈরবীর আলোচনাটা ততটা অসহ্য লাগবে না। এই রাগের আধারে তৈরি *'হিট'* গানগুলির মধ্যে কয়েকটি হল তু গঙ্গা কে মৌজ ময় যমুনা কা ধারা, বাবুল মোরা নৈহর ছুটরি যায়, জ্যোত সে জ্যোত জগাতে চলো, লাগা চুনরি মে দাগ, ভোর ভয়ে পনঘট পে, সত্যম শিবম সুন্দরম, চিঙ্গারী কোঈ ভড়কে, ইত্যাদি। যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনেন, তাঁদের

অবশ্য একবার মনে করিয়ে দিলেই মনের কানে শুনতে পাবেন পরভীন সুলতানার সেই বিখ্যাত সাদরা -'ভবানী দয়ানী' অথবা ভীমসেন যোশিজীর 'যো ভজে হরি কো সদা'।

পৌরাণিক উপাখ্যানে আছে শিব ভৈরব হলে পার্বতী হন ভৈরবী। তন্ত্রশাস্ত্রে ভৈরবী-তন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বহুপ্রাচীন বইতে ভৈরবীর উল্লেখ থাকলেও তখনকার আর বর্তমান ভৈরবী রাগের বর্ণনা বিচার করলে বোঝা যায় যে নামটা পুরোনো হলেও বর্তমান কালের ভৈরবীর রূপ বেশ খানিকটাই আলাদা তার আগের রূপের তুলানায়। আগের চেহারায় শুদ্ধ রে থাকার ফলে সেটা বরং এখনকার আসাবরী ঠাটের সাথে মেলে।

আরোহণ - স, ঋ, জ্ঞ, ম, প, দ, ণ, র্স
অবরোহণ - র্স, ণ, দ, প, ম, জ্ঞ, ঋ, স।
জাতি - সম্পূর্ণ- সম্পূর্ণ
বাদী স্বর - ম (ভিন্নমতে প), সম্বাদী স্বর- সা।
পকড় - ণ্ স জ্ঞ ম দ প, জ্ঞ ম জ্ঞ ঋ স।
ম জ্ঞ ঋ জ্ঞ, স ঋ স, দ্ ণ্ স।
মুখ্য অঙ্গ - জ্ঞ স ঋ স, জ্ঞ ম প, দ ম দ ণ র্স, র্ঋ র্স দ প জ্ঞ ম ঋ স।
কোমল ধা (দ) স্বরটি সাবধানে ব্যবহার করতে হয় আসাবরী অঙ্গের ছোঁয়া এড়াতে।

বিশেষত্ব - পা এর পর ঋস লাগাবার আগে পা তে দাঁড়ানো, পা থেকে মা তে যাবার সময় মীড়, আরোহণের সময় জ্ঞ তে যেতে ঋ স্বরের স্পর্শ, পা স্বরে দপমপ আন্দোলন, জ্ঞ স্বরে মৃদু আন্দোলন ইত্যাদি।

ভৈরবীর মিল আছে ঐ একই নামের করণাটকি রাগের সাথে নয়, বরং কর্ণাটকি পদ্ধতির হনুমাতোড়ি বা জনটোড়ি রাগম্ এর সাথে। আরোহণ সা, র১, গ২, ম১, প, ধ১ ন২ র্স, আর অবরোহণ -র্স, ন২, ধ১, প, ম১, গ২, র১, স। সাথের লিঙ্ক-এ হনুমাতোড়ীর আরোহ-অবরোহ শুনে দেখ। ভৈরবীর স্বরস্থানের মিল আছে ডোরিয়ান গ্রীক স্কেল (মোড) এর সাথেও।

দুশো'র বেশী ভৈরবী রাগ আধারিত আধারিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কয়েকটি:

তুমি মোর পাও নাই	*তুমি যেও না এখনি*	সার্থক জনম আমার	*সকরুণ বেণু বাজায়ে*
প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ	*প্রাঙ্গনে মোর শিরীষ*	অয়ি ভুবনমনমোহিনী	*ওকে ধরিলে তো ধরা*
নিশীথে কি কয়ে গেল	*নাই নাই ভয়*	মধুগন্ধে ভরা	*কেন যামিনী না যেতে*
জীবনে পরম লগন	*যখন ভাঙল মিলনমেলা*	হে নূতন দেখা দিক	*হে ক্ষণিকের অতিথি*
এসেছিলে তবু আস নাই	*দূরে কোথায়, দূরে দূরে*	আমি চঞ্চল হে	*বরিষ ধরা মাঝে*

কয়েকটি নজরুল গীতি - বাগিচায় বুলবুলি তুই, মোর ঘুকঘোরে এলে মনোহর, তোমার বুকের ফুলদানিতে, নিশি ভোর হল জাগিয়া, ফুল ফাগুনের এল মরশুম, আনো সাকী সিরাজি, স্বপনে এসেছিল, এ আঁখিজল মোছ পিয়া, সে প্রিয় কেন গো, প্রভাত বীণা তব, কত জনম যাবে তোমার বিরহে, জয় বিগলিত করুণা রূপিনী, হে মাধব হে মাধব, ছি ছি হেরে গেলে শ্যাম।

ভৈরবী রাগ আধারিত হিন্দী ছায়াছবির কিছু গান:

ইন্সাফ কা মন্দির হ্যয়	*নয়া দওর*	তু গঙ্গা কি মওজ	*বৈজু বাওরা*
লগা চুনরী মে দাগ	*দিল হি তো হ্যয়*	দোস্ত দোস্ত না রহা	*সঙ্গম*
জয় বোলো বেঈমান কি	*বেঈমান*	অ্যায় মের দিল কহিঁ অওর	*দাগ*
রামাইয়া বস্তাবইয়া	*শ্রী৪২০*	বোল রাধা বোল সঙ্গম	*সঙ্গম*
যব দিল হি টুট গয়া	*সাহ্জাহাঁন*	কৈসে যাঁউ যমুনা কে তীর	*দেবতা*
বাবুল মোরা, নৈহর ছুটো	*স্ট্রীট সিঙ্গার*	জ্যোত সে জ্যোত	*সন্ত ধ্যানেশ্বর*
আঈ দিওয়ালী	*রতন*	বরসাত মে হম সে মিলে	*বরসাত*
দো হংসো কা জোড়া	*গঙ্গা যমুনা*	মেরা জুতা হ্যয় জাপানী	*শ্রী৪২০*

মেরা এ্যয় দিল বতা	*ঝনক ঝনক পায়েল বাজে*	ক্যায়সে সমঝাঁউ	*সূরজ*
যা রে উড় যা রে পঞ্ছী	*মায়া*	ভোর ভয়ে পনঘট পে	*সত্যম শিবম সুন্দরম*

https://youtu.be/UEfPTjuGJNA এবারের অডিও লিঙ্কের প্রথমেই বসন্ত বাহার ছবির 'ম্যয় পিয়া তেরি তু মানে ইয়া না মানে' গানটিতে পণ্ডিত পান্নালাল ঘোষের বাজানে বাঁশী আছে শুনে দেখ। এরপর আছে যা রে উড় যা রে পঞ্ছী, লগা চুনরী মে দাগ, এ্যয় মেরে দিল কঁহি অওর চল, এসেছিলে তবু আস নাই আর ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না।

https://youtu.be/FT8V-tgLVnk দ্বিতীয় লিঙ্কটায় আছে - ভৈরবীর আরোহন-অবরোহণ, কর্ণাটিক হনুমাতোড়ীর আরোহণ-অবরোহণ, তারপর DAW -সফ্টওয়্যারে বাজানো ভাতখন্ডেজীর ভৈরবী কহি মন মানী(এর স্বরলিপিও দেওয়া আছে)। এরপর রামপুর-সাহসোয়ান ঘরাণার শ্রদ্ধেয় মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেবের টপ্পা, বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের সানাই, শরণ রাণীর সরোদ, পরভীন সুলাতানার বিখ্যাত ভবানী দয়ানী আর ভীমসেন যোশীজীর সেই অবিষ্মরণীয় ভজন যো ভজে হরি কো সদা। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রদ্ধেয় দীপক চৌধুরীর একটি ভৈরবী সরগম দেওয়া আছে তারপর।

প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত প্রতিভা পদ্ম-বিভূষণ কিশোরী আমোনকর ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৭য় চলে গেলেন তাঁর আরাধ্য সুরলোকে। তাঁরই গাওয়া ভৈরবী এবারের অডিও লিঙ্কের শেষ অংশে আমাদের গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো।

'ভৈরবী কহী মন মানী' র পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখণ্ডেজীর স্বরলিপি নীচে দেওয়া হল।

ভৈরবী –ত্রিতাল (মধ্যলয়)

ভৈরবী কহী মন মানী
কোমল সবসুর কর গুণী গাওয়ত
প্রথম পহর কী রাণী হো।

মধ্যম বাদী সুর সমবাদী ভক্তি রস কী খানী
সবকোই গাওয়ত সবকো রিঝাওয়ত
ভৈরবী শাস্ত্র প্রমাণী হো।

স্থায়ী

x				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
														[ঋ]ম	-
														ভৈ	-

ঋ	[ম]জ্ঞ	-	ঋ	সা	-	[ণ]দ	ণ	স	-ঋ	সা	-	-	-	-	-
র	বী	-	ক	হি	-	ম	ন	মা	-	নী	-	-	-	-	-

[দ]ণ	-	ণ	ণ	ণ	ণ	দ	ণ	স	সা	ঋ	ণ •	সা	-	সা	সা
কো	-	ম	ল	স	ব	সু	র	ক	র	গু	নি	গা	-	ওয়	ত

সা	সা	[স]দ	দ	প	প	পদ	-ণ	[ণ]দ	-	প	ম	[ম]জ্ঞ	-	মা	-
প্র	থ	ম	প	হ	র	কী	-	রা	-	ণী	-	হো	-	ভৈ	-

অন্তরা

[ণ]দ	-	দ	দ	দ	-ম	দ	ণ	• স	• স	• স	• স	• স	-	• স	-
ম	-	ধ্য	ম	বা	-	দী	-	সু	র	স	ম	বা	-	দী	-

• [স]ণ	-	ণ	-	• স	• স	• স	-	• • গগ	• • [-ঋ] স	• -ঋ	-	• [-ণ] স	-	[ণ]দ	-প
ভ	ক্	তি	-	র	স	কি	-	খা-	--	-	-	-	-	নী	-

স	স	দ	দ	প	-	প	প	দ	প	দ	ণ	[ণ]দ	-পম	র	জ্ঞ
স	ব	কো	ই	গা	-	ওয়	ত	স	ব	কো	রি	ঝা	-	ওয়	ত

[র]জ্ঞ	-	[প]দ	দ	প	-	দ	• [স]ণ	দ	-মপ	[ম]জ্ঞ	-	প	-	দ	-পম
ভৈ	-	র	বী	শা	স্	ত্র	প্র	মা	-	নী	-	হো	-	ভৈ	-

রাগ ভৈরবীর একটি প্রাচীন চিত্ররূপ

পুরোনো বই

বিশ্বের সেরা গল্প

জানাচ্ছেন পিয়ালি ব্যানার্জি

ছোটবেলায় হাতে পাওয়া একটা বই। কত যত্নে অনুবাদ করা হয়েছে বিশ্বসাহিত্য শুধু ছোটদের কথাই ভেবে। অনুবাদ বললে ভুল হবে। এটি ভাবানুবাদ। করেছেন শ্রী অমরনাথ রায়,নদীয়া কৃষ্ণনগর রায়বাড়ির মানুষ। পূর্ণ প্রকাশন থেকে ১৩৮৪ সালে প্রকাশিত।

বইটিতে,আমেরিকান ফরাসি রুশ ইংরাজ পোলিশ,যুগোশ্লাভিয়ান বিখ্যাত সাহিত্যিকদের দশটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রয়েছে মাত্র ৮০ পাতার মধ্যে ধরা। অবাক লাগে যে শেক্সপীয়ারের ‘মেজার ফর মেজার’ গল্পটির ভাবানুবাদ হয়েছে চার পাতায়। অথচ গোটা গল্পের রস একজন শিশু, বা কিশোর কিশোরীর মনে যথেষ্ট ছাপ রেখে যাবে এমনই বুনন।

সবচেয়ে বড়ো কথা হল,গল্পের শুরুতে প্রতি লেখক এর সম্বন্ধে আট দশ লাইন। আমার মনে হয় এ বই স্কুলে সহায়ক পাঠ হিসেবে সংযোজিত হলে খুব উপকার হবে।

পোলিশ সাহিত্যিক বোলেস্লাভ প্রুস, যুগোশ্লাভিয়ার ইগো আন্দ্রিচ, রাশিয়ার আলেকজান্দার পুশকিন, ফরাসি আলফাঁস দুঁদে, রাশিয়ার লেভ তলস্তয়, নরওয়ের বিয়র্নষ্টার্ন বিয়র্নসন...এইরকম সব তারকাখচিত নাম।

এত সহজ ভাষা,স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ এমন ছোটদের বই আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়।বইটির পুনর্মুদ্রণ হওয়া জরুরি।

শিশির বিশ্বাসের বই

শ্রী শিশির বিশ্বাসের লেখার সঙ্গে জয়ঢাকের পাঠক যথেষ্ট পরিচিত। জয়ঢাকের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তাঁর লেখা গল্প বা উপন্যাস পড়ার সুযোগ পাই আমরা। দীর্ঘদিন ধরে ছোটোদের জন্য লিখে চলেছেন তিনি। আমি নিজে তো শিশিরবাবুর গল্পের বেজায় ভক্ত, পেলেই গোগ্রাসে পড়ে ফেলি। জানি আমার মতো আরও অনেকে আছে যারা তাঁর গল্প পড়তে ভালোবাসে। তাই তাদের জন্য কোথায় কোথায় এবং কোন কোন বইয়ে শিশির বিশ্বাসের লেখা গল্প-উপন্যাস পাওয়া যাবে এই লেখায় সে হদিশ দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

শিশির বিশ্বাসের জন্ম ৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ সনে। চাকরিজীবনে তিনি ছিলেন বি এস এন এল-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিক, এখন অবসর নিয়েছেন। সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি ছাত্রজীবনে, প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মৌচাক' পত্রিকায়। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে ব্যস্ত থাকায় সাহিত্যচর্চায় হয়তো ভাটা পড়েছে মাঝেসাঝে, তবে তা বন্ধ হয়নি কখনও। যখনই সুযোগ হয়েছে তখনই তিনি কলম ধরেছেন ছোটোদের জন্য। আনন্দমেলা, শুকতারা, সন্দেশ, কিশোর ভারতী, শিশুমেলা প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা শতাধিক। 'বিক্রম সেনাপতি' ছদ্মনামেও লিখে থাকেন তিনি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'বাঘবন্দী মন্তর' প্রকাশিত হয়েছিল নিউস্ক্রিপ্ট থেকে, এখন অবশ্য আর পাওয়া যায় না সেটি।

শিশির বিশ্বাসের লেখা অনেক গল্প-উপন্যাসই আন্তর্জালে পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে এখন অবধি জয়ঢাকে তাঁর ১২টি গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। একসঙ্গে সেই একডজন গল্পের হদিস পাওয়া যাবে জয়ঢাকের একটি পাতায়, নিচে তার লিংক দিলাম –

জয়ঢাকে প্রকাশিত শিশির বিশ্বাসের গল্প-উপন্যাস

এছাড়া আন্তর্জালে 'শিশিরবিন্দু' নামে স্বয়ং শিশিরবাবু পরিচালিত একটি ব্লগ সাইট আছে, সেখানে সাজানো আছে আরও অজস্র গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ। সে সাইটের লিংকও রইল নিচে –

শিশিরবিন্দু

এবারে আসি শিশির বিশ্বাসের বইয়ের কথায়। তাঁর লেখা বহু বই আগে প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলিই হয়তো এখন আর পাওয়া যায় না। সেরকম কিছু বইয়ের নামঃ ১। বাঘবন্দী মন্তর, ২। সোনার মোহর, ৩। তুফানবাড়ির তিনমূর্তি, ৪। রোমাঞ্চ সব গল্পেই, ৫। জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ, ৬। দার্জিলিংয়ে হৈ হৈ কাণ্ড, ৭। প্যাঙাদার পিকনিক, ৮। সোনার কাঠি, ৯। মাকুমামা দি গ্রেট, ১০। ভূত পেত্নী রাজপুত্তুর, ১১। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেবেলা।

এখন তাঁর লেখা যে সব বই পাওয়া যায়, এবং তার মধ্যে যেগুলি আমার সংগ্রহে আছে, সে সব বইয়ের খবর দিলাম নিচে। কোন বইয়ে কোন কোন গল্প আছে সে খবরও দেওয়া আছে, তার মধ্যে যে যে গল্প জয়ঢাকে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির নাম হাইপারলিংক করা আছে, নামের ওপর ক্লিক করলেই সটান পৌঁছে যাবে একদম গল্পের পাতায়।

বইঃ আম বাগানের পদ্মগোখরো
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১২
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
দামঃ ৫০ টাকা

এই গল্পসংকলনে আছে **১১**টি গল্পঃ
১। আম বাগানের পদ্মগোখরো, ২। সেই সকালে, ৩। ভানুমতীর ভেলকি, ৪। পাখিওয়ালা, ৫। রন্টুর রোমহর্ষক কাণ্ড, ৬। কুঠিবাড়ির পাগলা হাতি, ৭। রহস্যময় বুনো লতা, ৮। এক জারোয়া মানুষের সঙ্গে, ৯। ভূতের মেলায়, ১০। সাপ, **১১**। ছোটুর ঘুড়ি

বইঃ মৃণ্ময়ী মন্দিরের তোপদার
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৩
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
দামঃ ৬৫ টাকা

এই সংকলনে আছে ৮টি ঐতিহাসিক কাহিনিঃ
১। মহেঞ্জোদরোর মানুষ, ২। একদা দ্বিগঙ্গে নগরে, ৩। রাজপ্রহরী, ৪। হার্মাদের মুখোমুখি, ৫। পুরন্দর, ৬। সেদিন ছত্রভোগে, ৭। শিলালিপি কাহিনি, ৮। মৃণ্ময়ী মন্দিরের তোপদার

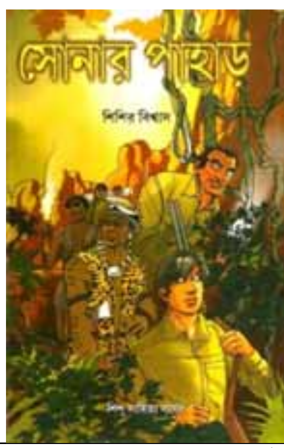

বইঃ সোনার পাহাড়
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৪
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ সীতাংশু ভট্টাচার্য
দামঃ ৬৫ টাকা

আডভেঞ্চার উপন্যাস

বইঃ পাথরের চোখ
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ; প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৬
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ সীতাংশু ভট্টাচার্য
দামঃ ৮০ টাকা

এই গল্পসংকলনে আছে ৯টি গল্পঃ
১। পাথরের চোখ, **২। পুরোনো সিডি, ৩।** অলৌকিক, **৪। ওয়েটিং রুমে আগন্তুক, ৫। আঁধারমারির আতঙ্ক, ৬। রাজাসরাসের শিকার, ৭।** রুদ্রদেব-এর রহস্যময় আংটি, **৮। দীনবন্ধু আর বাদার জঙ্গলে যায় না, ৯। ভূতের চর**

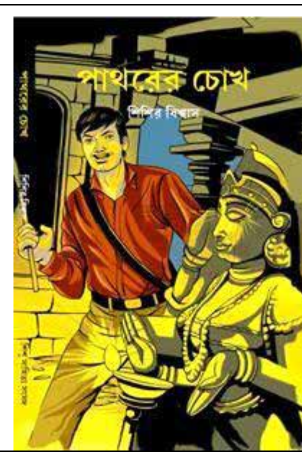

বইঃ হাসির গল্প **১১**

প্রকাশকঃ মলয় প্রকাশনী, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯
প্রথম প্রকাশঃ ১লা বৈশাখ, ১৪১৯
প্রচ্ছদঃ দেবাশিস দেব, অলঙ্করণঃ দিলীপ দাস, প্রদীপ গোস্বামী
দামঃ ৪৫ টাকা

এই গল্পসংকলনে আছে ১১টি হাসির গল্পঃ
১। জুতোর গুঁতো, ২। অদ্ভুতুড়ে ট্রেনযাত্রী, ৩। কালিগঞ্জের প্যাকাটি, ৪। ভজগতির দুর্গতি, ৫। পিসির বাড়ির পুজোয়, ৬। ব্রজ উকিলের ব্যারাম, ৭। ঝানু চোরের গল্প, ৮। লন্ডভন্ড পালা, ৯। প্যাঙাদার পিকনিক, ১০। কেষ্টপুরের কাক আর কাবলু, ১১। মাছ ধরলেন নকুড়মামা

সাদায় কালোয়
প্রকাশকঃ হ য ব র ল
প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০১৪
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য
দামঃ ৯৯ টাকা

এই গল্পসংকলনে আছে শিশির বিশ্বাসের লেখা ৫টি গল্পঃ
১। আইসক্রিমওয়ালা, ২। অলৌকিক, ৩। পাথরের চোখ, ৪। রাজপ্রহরী, ৫। অর্জুন সর্দার

বইঃ টুসি
প্রকাশকঃ শিশুমেলা, ৮১/৩এ রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা ৭০০০৪৭;
প্রথম প্রকাশঃ ৩০শে জানুয়ারি, ২০০২
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ প্রদীপ গোস্বামী
দামঃ ৩০ টাকা

এই গল্পসংকলনে আছে ১৩টি গল্পঃ
১। টুসি, ২। চোরপাখি, ৩। সোনার কাঠি, ৪। খপ করে আর গপ করে, ৫। ভূত ও টুটুন, ৬। বাবুরাম পোখোরা, ৭। মোহনপুরের মাঠে, ৮। সান্তা ক্লজ, ৯। গোরুর গাড়ির মানুষ, ১০। রঘু, ১১। হারজিত, ১২। বাঘবন্দী মন্তর, ১৩। মউলির দুশমন
(বর্তমানে বইটি আউট অফ প্রিন্ট আছে)

আলোচনাঃ তাপস মৌলিক

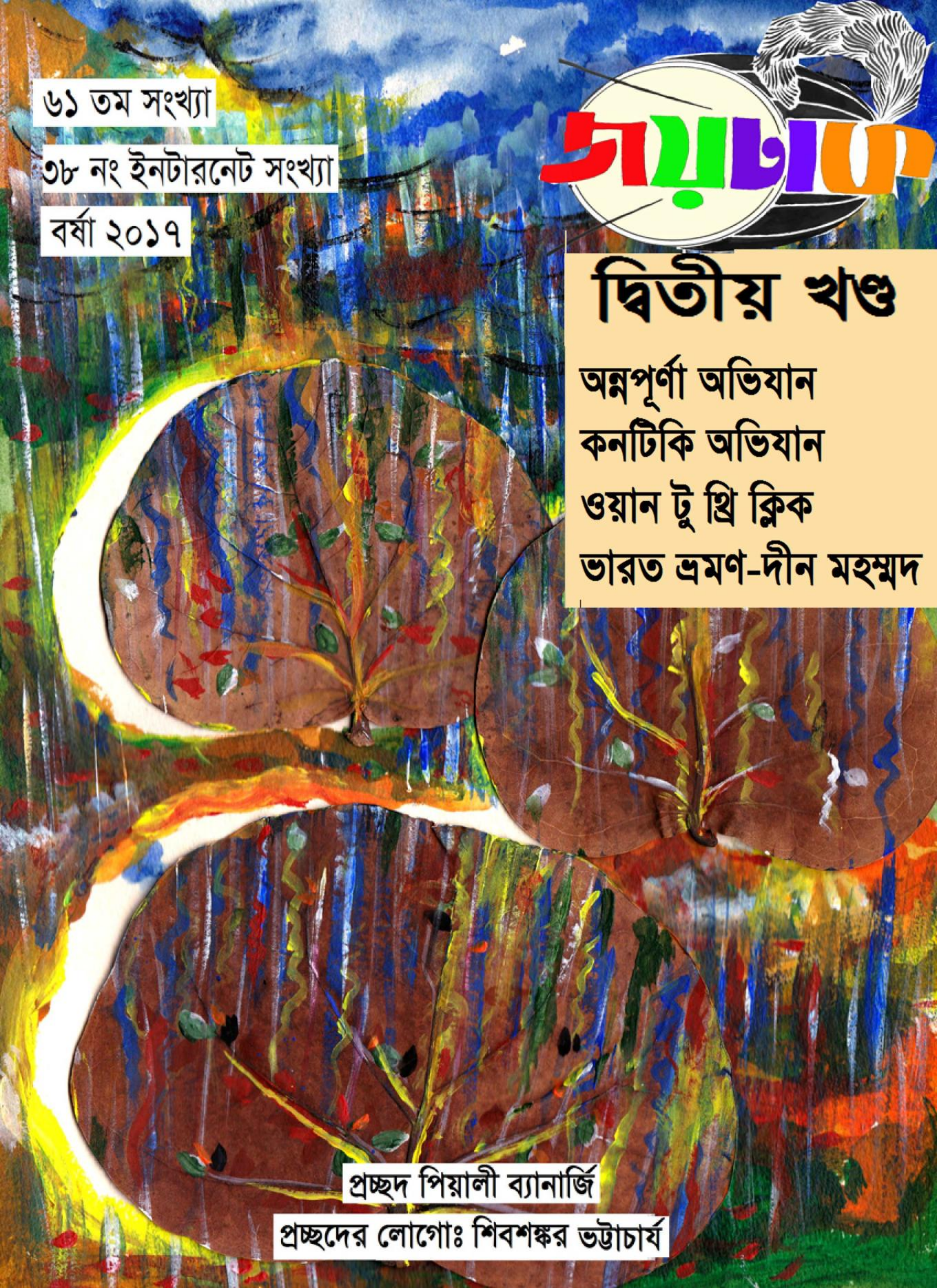

জয়ঢাক

৬১ তম সংখ্যা

৩৮ নং ইনটারনেট সংখ্যা

বর্ষা ২০১৭

দ্বিতীয় খণ্ড

অন্নপূর্ণা অভিযান

কনটিকি অভিযান

ওয়ান টু থ্রি ক্লিক

ভারত ভ্রমণ-দীন মহম্মদ

প্রচ্ছদ পিয়ালী ব্যানার্জি

প্রচ্ছদের লোগোঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

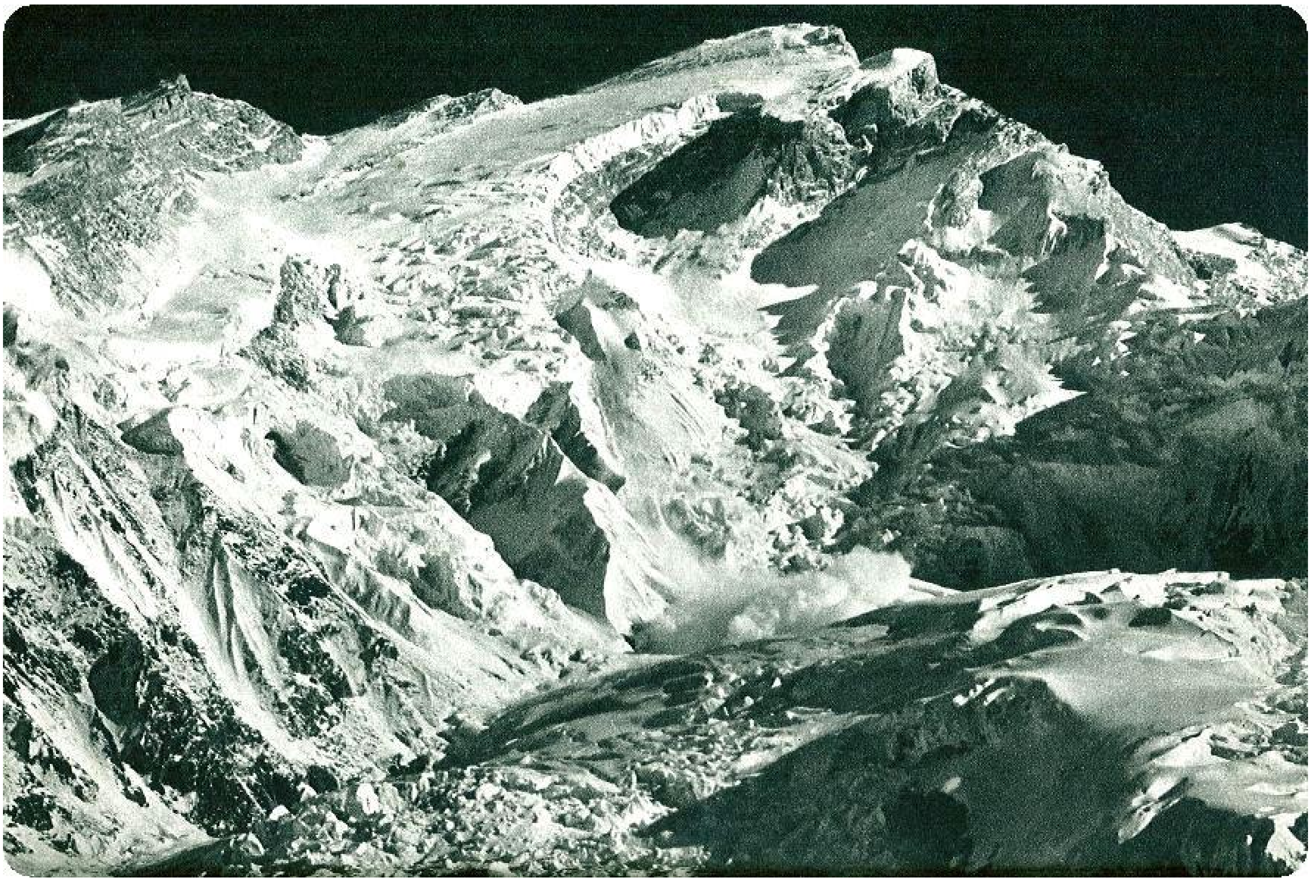

অন্নপূর্ণা

মরিস হারজগ

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

উচ্চতার হিসেবে অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) বিশ্বের ১০ নম্বর পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫০ সালে ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু প্রথম শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করেন মরিস হারজগের নেতৃত্বে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়। জয়ঢাকে ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই অভিযান নিয়ে হারজগের লেখা রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। এবার দ্বাদশ পর্ব।

শীর্ষচিত্রঃ অন্নপূর্ণা উত্তরগাত্র, ফোটোঃ মার্সেল আইজ্যাক

১০

কাস্তে হিমবাহ

সেদিন সন্ধেবেলা বেসক্যাম্পে তুমুল আড্ডা আর খানাপিনা চলল। দু'দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর আরাম মেলায় শরীর ছেড়ে দিয়েছে সকলেরই। শৃঙ্গজয়ের সম্ভাবনা জোরদার হওয়ায় মনটাও দিব্যি ফুরফুরে। মুরগির মাংস রান্না হল, পানীয়ের বোতল খোলা হল। টেরে পরে আপশোশ করেছিল, তার জন্য অপেক্ষা না করায় খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তার কথা যে মনে পড়েনি আমাদের তা নয়, কিন্তু ওই প্রচণ্ড খাটুনির পর বেসক্যাম্পের আরাম আর অঢেল খাবারদাবার দেখে লোভ সামলাতে পারিনি।

যে খানাপিনার কথা বলছি সেটা হয়েছিল ২৪ মে সন্ধেবেলা। তার মাত্র একদিন আগে ২৩ মে ভোরে আমার লেখা চিঠি নিয়ে সরকি তুকুচার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। তুকুচা যেতেই তো তিন- চার দিন লাগার কথা, ফিরতে আরও দিন তিন- চার! দু'দিনের মধ্যে কোন জাদুমন্ত্রে আইজ্যাক আর অডট শেরপা- কুলি- মালপত্র সবসমেত এখানে এসে হাজির হল? জানা গেল, আইজ্যাক নিজেই দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছিল, মিরিস্তি খোলার গিরিখাতে সরকির সঙ্গে তার দেখা হয়। এই দু'দিনের ভেতর ১৬,৭০০ ফিট উচ্চতার এক নম্বর ক্যাম্প থেকে আমরা প্রায় ২১,৭০০ ফিটের তিন নম্বর ক্যাম্প অবধি পৌঁছে গেছি শুনে আইজ্যাক আর অডটও খুব রোমাঞ্চিত হল।

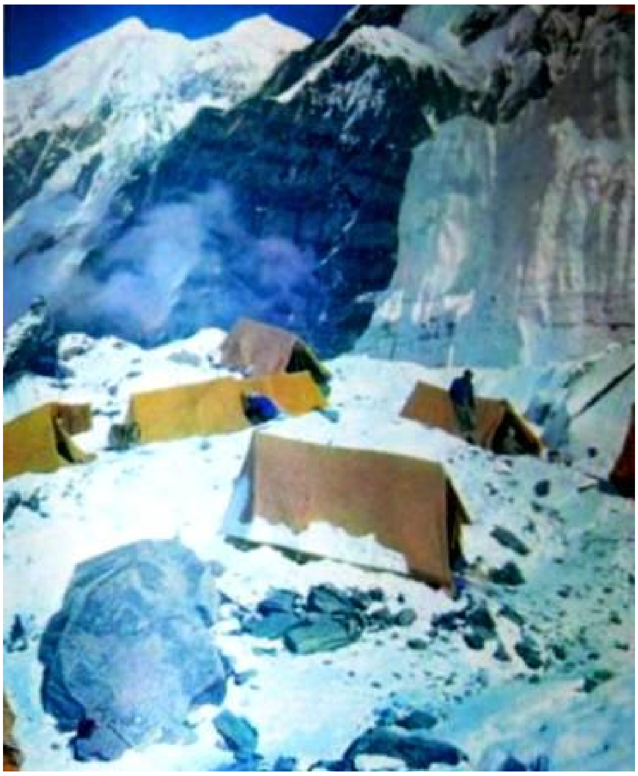

বেস ক্যাম্প

পরদিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। দু'দিনের অত্যাচারের পর শরীর প্রায় অসাড় হয়ে আছে। বাইরে ঝকঝকে আবহাওয়া। আরামদায়ক রোদ পেয়ে ধীরে ধীরে হাত- পায়ের সাড় ফিরল। ঠিক করলাম আজ স্নান করতে হবে। স্নান তো করলামই, দাড়িও কামিয়ে ফেললাম। সাফসুতরো হবার পর বেশ ঝরঝরে লাগল। পায়ে নরম ক্যাম্পিং বুট গলিয়ে অলসভাবে এ তাঁবু সে তাঁবু ঢুঁ মারতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে শৃঙ্গজয়ের পরিকল্পনাটা পরিষ্কারভাবে মনে দানা বেঁধে উঠতে শুরু করল। কঠিন লড়াই সামনে। সবার মনেই এক চিন্তা। হাতে দূরবীন নিয়ে বাইরে ছড়িয়েছিটিয়ে বসে আছে সব, আলোচনা চলছে শৃঙ্গজয়ের রাস্তার সম্ভাব্য সব বিপদআপদ নিয়ে। আমি মনস্থির করেই ফেলেছিলাম, শুধু তুকুচা থেকে সরবরাহের ব্যাপারটা নিয়ে সংশয় ছিল। এ ব্যাপারে নোয়েল যে বেশ আস্থাভাজন তার প্রমাণ মিলল ফের। বোঝা গেল, আমার নির্দেশ পৌঁছোনোর বহু আগেই সে শেরপা- কুলি- রসদ এবং সাজসরঞ্জাম যোগাড় করে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। খুব খানিক হিসেবনিকেশ করে শেষে আশ্বস্ত হলাম। নাঃ, এদিকটা নিয়ে তেমন চিন্তা নেই! ওপরের ক্যাম্পে রসদ সরবরাহের কাজটা এরা মসৃণভাবেই সামলাতে পারবে। মূল অভিযাত্রীরা এখন পাখির চোখের মতো কেবল শৃঙ্গজয়ের ওপর মনঃসংযোগ করতে পারে। তাই ঠিক করলাম, বিকেলবেলা আমি আর রেবুফত ধীরেসুস্থে এক নম্বর ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দেব। সঙ্গে যতটা পারি মালপত্র বয়ে নিয়ে উঠব। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম শৃঙ্গজয় না করে আর বেসক্যাম্পে নামব না এবারে। লুসিয়ান ডেভিসকে এই অভিযান থেকে লেখা আমার শেষ চিঠি লিখতে বসলাম আমি।

অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প

প্রিয় ডেভিস, ২৫ মে, ১৯৫০

শৃঙ্গজয়ের লক্ষে চূড়ান্ত অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তোমায় এই আমার শেষ চিঠি। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে। তুকুচা থেকে তিন- চার দিনের রাস্তা আমাদের এই বেস ক্যাম্প। ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়, কারণ মাঝারি মাপের এক অনুসন্ধানী দল থেকে আমাদের পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অভিযানে রূপান্তরিত করতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। গতকাল আমরা প্রায় ২১,৭০০ ফিট উচ্চতা অবধি উঠেছিলাম। পুরো রাস্তাটাই কঠিন বরফ আর তুষারের ওপর দিয়ে, তবে এ রুটে বিপদের ঝুঁকি তুলনায় কম। আমাদের ক্যাম্পগুলির অবস্থান মোটামুটি এরকম –

অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহের ডান তীরে বেস ক্যাম্প (১৪,৫০০ ফিট)।

উত্তর হিমবাহের হিমপ্রপাতের ওপরে এক নম্বর ক্যাম্প (১৬,৭৫০ ফিট), সেই ডান তীরেই, এক বিশাল তুষারক্ষেত্রের একেবারে কিনারায়।

অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ থেকে সরাসরি নেমে আসা একটা হিমবাহের ওপর এক ছোট্ট চাতালে ১৯,৩৫০ ফিট উচ্চতায় দু'নম্বর ক্যাম্প।

আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের পরিকল্পনা আছে ২১,৭০০ ফিট উচ্চতায় তিন নম্বর ক্যাম্প স্থাপন করব, তারপর কাস্তের মতো দেখতে একটা হিমবাহের ওপর ২৪,৬০০ ফিট উচ্চতায় চার নম্বর ক্যাম্প। চিঠির সঙ্গে আইজ্যাকের আঁকা স্কেচম্যাপটা দেখলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে ***(এই পর্বের শেষে দেখ)***। একটা পাঁচ নম্বর ক্যাম্পও হয়তো বসাতে হতে পারে, ওপরদিকে রুট কীরকম পাই তার ওপর নির্ভর করছে।

আবহাওয়া সকালে দারুণ থাকে, বিকেলের দিকে খারাপ হয়ে আসে, প্রতিদিনই এরকম চলছে। রোজ বিকেলেই তুষারপাত হচ্ছে; বিরক্তিকর ব্যাপার, বিপজ্জনকও বটে, পরদিন চলতে গিয়ে নরম তুষারে ভুসভুস করে পা ডুবে যায়। দলের সবাই সুস্থ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি এক নম্বর ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শৃঙ্গজয়ের জন্য চূড়ান্ত অভিযান চালাব আমরা। সকলেই বেশ আশাবাদী। ওপরের দিকে রাস্তা বেশ কঠিন, ওই অতি- উচ্চতায় এগিয়ে চলাও খুবই পরিশ্রমসাধ্য, তবে একবার চুড়োয় উঠতে পারলে এই প্রচন্ড পরিশ্রম আর কষ্টের কথা কারও মনে থাকবে না। আর বিশদে লিখতে পারছি না, প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে বুঝতেই পারছ। পরিস্থিতি আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আইজ্যাক তোমায় জানাবে।

শুভেচ্ছা,
ইতি মরিস

আমি যখন এই চিঠি লিখছি তখন কোজির নির্দেশে শেরপা আর কুলিরা মিলে বেস ক্যাম্প গোছগাছ করে সুন্দর সাজিয়ে ফেলল। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ঘন মেঘ করে এল, বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। টেরের কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছিল বেশ। সে তো আজ ভোরে দু'জন শেরপা নিয়ে তিন নম্বর ক্যাম্পের দিকে রওনা দিয়েছে, সঙ্গে প্রচুর মালপত্রও আছে… দুটো হাই অল্টিচিউড ইউনিট, কুড়ি পাউন্ড খাবারদাবার। তিন নম্বর ক্যাম্পেই ওদের রাত কাটানোর কথা আজ। বিকেল পাঁচটা নাগাদ যখন রওনা হলাম আমরা তখন বেশ ভারী তুষারপাত চলছে। ওর মধ্যেই তাড়াতাড়ি হেঁটে অন্ধকার হওয়ার আগে এক নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটিয়ে তিনজন ভেতরে সেঁধিয়ে গেলাম। রেবুফতের মুখের চামড়া রোদে একেবারে পুড়ে গেছে, ঠোঁটদুটো ফেটে গিয়ে ফুলে উঠেছে; বেচারার খেতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

বেস ক্যাম্পে মন দিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সম্প্রচার শুনছে এক কুলি

পরদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে ঘুম ভাঙল। চায়ের জন্য স্লিপিং ব্যাগের ভেতর শুয়ে হাঁক পাড়লাম, কিন্তু কারও তেমন তাড়া দেখা গেল না। গজেন্দ্রগমনে বেরোনোর প্রস্তুতি শুরু হল। বাইরে বেরিয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখি আমাদের রুট বরাবর অনেক ওপরে তিনটে ছোট্ট ছোট্ট কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে, গত পরশু যে উচ্চতা অবধি আমরা উঠেছিলাম তার চেয়েও খানিক ওপরে, একটু বাঁদিকে। ওখানেই নিশ্চয় তিন নম্বর ক্যাম্প বসানো হয়েছে তবে। দশটা নাগাদ দু'নম্বর ক্যাম্পের দিকে রওনা দিলাম – রেবুফত আর শেরপা দাওয়াথোন্ডুপ এক দড়িতে; আমি, ল্যাচেনাল আর আং দাওয়া আরেক দড়িতে। এই দাওয়াথোন্ডুপ সম্পর্কে আইজ্যাক আমাদের বারবার সাবধান করে দিয়েছে, তুকুচা থেকে বেস ক্যাম্প আসার সময় এ নাকি প্রচুর মদ্যপান করেছিল।

সূর্যের প্রখর আলোয় সেই বিশাল তুষারক্ষেত্র তখন তেতে উঠেছে, প্রচণ্ড গরম। ল্যাচেনালের চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। দরদর করে ঘামতে ঘামতে যেন একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে চলেছিল সে। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে চোখ তুলে কেমন ভোঁতা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল আর সামান্য অজুহাতেই বসে পড়ছিল। রেবুফতের প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হল, শেষে এমনই অবস্থা দাঁড়াল যে তার রুকস্যাকটা পালা করে অন্যদের বইতে হল। কষ্টেসৃষ্টে শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছিলাম আমরা, সবাইকেই যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। দু'নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছোনোর আগের অন্তিম কয়েকশো গজ ল্যাচেনাল প্রায় টেনেহিঁচড়ে কোনওরকমে শেষ করল। ফুটিফাটা ঠোঁটের ওপর বেচারি দুটো স্টিকিং প্লাস্টার সেঁটে রেখেছে, রোদ থেকে বাঁচাবার জন্য। রোদে পুড়ে ঝামা হয়ে যাওয়া বেগুনী মুখের ওপর সে দুটো হলদেটে প্লাস্টারের টুকরো খুব বেখাপ্পা লাগছিল।

দু'নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি টেরে, পানসি আর আয়লা সবে সেখানে নেমে এসেছে। টেরে প্রচণ্ড উত্তেজিত, "আরে, গতকাল তো আমরা ২২,০০০ ফিট অবধি পৌঁছে গেছিলাম, কিন্তু তোমাদের রেখে আসা তাঁবু বা জিনিসপত্র কিছু তো দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই সব তুষারের নিচে চাপা পড়ে গেছে! যে অবধি উঠেছিলাম সেখানে সমতল জায়গা বলে কোনও ব্যাপারস্যাপার নেই। আইসঅ্যাক্স

দিয়ে বরফ কেটে কেটে তাঁবু ফেলার মতো জায়গা একটা বানিয়েছিলাম তিনজন, সেটাকে সমতল ঠিক বলা যাবে না, আর ওই প্রচণ্ড খাড়াই বরফঢালের একেবারে মধ্যিখানে জায়গাটা। রাত্রে সেই ছোট্ট আস্তানাতেই কাটিয়েছি। বাপ রে বাপ, সে যে কী ভয়ঙ্কর রাত! চারপাশ দিয়ে হুড়মুড় হুড়মুড় করে অনবরত তুষারধ্বস নেমে চলেছে! দু'চোখের পাতা এক করে কার সাধ্যি!"

বর্ণনা আরও বাস্তবানুগ করে তোলার জন্য টেরে মুখে নানারকম আওয়াজ করে বোঝাল ঠিক কীভাবে তাদের দু'পাশে মাত্র কয়েক গজ (টেরে অবশ্য বলেছিল কয়েক ইঞ্চি) দূর দিয়ে তুষারধ্বস নেমে চলেছিল। তারপর বলে চলল, "শেরপা দু'জন তো ভয়েই আধমরা! আমারও ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। এরকম রোমহর্ষক একটা রাত কাটানোর পর নেমে আসা ছাড়া কিছু করার ছিল না। তাই ফিরে এলাম। এখনই এক নম্বর ক্যাম্পে নেমে যাব আমি। সেখানে ভালো করে বিশ্রাম- টিশ্রাম নিয়ে ফের চাঙ্গা হতে হবে।"

"একদম ঠিক," বললাম আমি, "এরকম অভিজ্ঞতার পর সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কোজি, শ্যাজ, অডট আর আইজ্যাক আজ বেস ক্যাম্প থেকে এক নম্বর ক্যাম্পে উঠে আসছে, তুমি সেখানে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পারবে। আরেকটা সুবিধে হল, এক নম্বর ক্যাম্প থেকে ফের এখানে উঠে আসার সময় আরও কিছু মালপত্র বয়ে নিয়ে আসতে পারবে তোমরা। এই লোড ফেরি করার ব্যাপারটা সবসময় আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।"

"আমরা যা কিছু বয়ে নিয়ে গেছিলাম সব ওই ২২,০০০ ফিটে ডাঁই করে এসেছি, তোমরা যে অবধি পৌঁছেছিলে সম্ভবত তার থেকে একটু বাঁদিকে কিছুটা ওপরে, একটা খাড়াই ঢালের মাঝখানে," টেরে বলল; তারপর রুকস্যাক কাঁধে তুলে নিয়ে শেরপাদের হাঁক পেড়ে ডেকে তাদের দিকে কোমরে বেঁধে নেওয়ার জন্য দড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে গভীর দরাজ গলায় আমাদের বিদায় জানিয়ে নেমে গেল।

দু'নম্বর ক্যাম্প ফের চুপচাপ হয়ে গেল। রইলাম শুধু আমি, ল্যাচেনাল, রেবুফত আর দু'জন শেরপা। ল্যাচেনাল আর রেবুফতের শরীর ভালো নেই, তাই মানসিকভাবেও ওরা ঠিক চাঙ্গা অবস্থায় ছিল না। তার ওপর টেরে এইমাত্র বলে গেল তিন নম্বর ক্যাম্প অবধি রাস্তা প্রায় পুরোটাই গভীর নরম তুষারে ঢাকা। আগেরবারের যাত্রায় ল্যাচেনাল আর রেবুফত বুঝেছে ওরকম রাস্তায় পথ তৈরি করে চলা কতটা পরিশ্রমসাধ্য। আমার মনে হল, আরও ওপরে উঠে যদি এই দু'জনকে একদম সুস্থ এবং চাঙ্গা অবস্থায় পেতে হয় তাহলে আগামীকাল ওদের ওপর বেশি চাপাচাপি না করাই ভালো। ওরা যদি এখানে বিশ্রাম নিতে চায় তো নিক। দু'জন শেরপা রয়েছে, তিন নম্বর ক্যাম্প অবধি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাজসরঞ্জাম আর খাবারদাবারও রয়েছে আমাদের সঙ্গে। শেরপা দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে আমি একাই কেন ওপরে উঠি না কাল? উঠে তিন নম্বর ক্যাম্পটা ঠিকঠাক জায়গায় বসানোর কাজটা করি। চাই কি চার নম্বর ক্যাম্পও বসানোর চেষ্টা করতে পারি! আগামীকাল শ্যাজ আর কোজির এই দু'নম্বর ক্যাম্পে উঠে আসার কথা। আমি যদি তিন নম্বর ক্যাম্প কিম্বা তারও ওপরে একদিন বা দু'দিন কাটিয়ে ফের এখানে নেমে আসি, তার মধ্যে ল্যাচেনাল, রেবুফত, শ্যাজ আর কোজি এখান থেকে মালপত্র নিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারবে। আমি ফিরে আসার মধ্যে টেরেও বিশ্রাম- টিশ্রাম নিয়ে চাঙ্গা হয়ে ফের এখানে উঠে আসবে, তখন আমরা দু'জন আবার একদফা ওপরের ক্যাম্পে লোড ফেরি করতে পারব। হাতে সময় খুবই কম। আজ মে মাসের ২৬ তারিখ হয়ে গেল। এখন এভাবে পালা করে একে একে আমাদের ওপরের ক্যাম্পে উঠে যাওয়া উচিত। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে সবকটা ক্যাম্প বসিয়ে ফেলতেও পারব আমরা।

আজ বিকেলে দেখলাম আবহাওয়া ভালোই রইল, অন্যদিনের মতো দুপুর না ঘুরতেই দুর্যোগ ঘনিয়ে এল না। ল্যাচেনাল আর রেবুফত তাঁবুর ভেতর গভীর ঘুমে ডুবে রইল, আমি ধীরেসুস্থে সাজসরঞ্জাম গোছগাছ করে রুকস্যাক বাঁধাছাদা সেরে আগামীকাল ভোরের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

দু'নম্বর শিবির

পরদিন খুব ভোরে দাওয়াথোন্ডুপ আর আংদাওয়াকে ঘুম থেকে ঠেলে তুললাম। ভোরবেলায় তুষার অপেক্ষাকৃত শক্ত জমাটবাঁধা থাকে, চলতে সুবিধে। বেলা বেড়ে গেলেই রোদের তাপে গলে নরম হয়ে যাবে, ভসভস করে পা ঢুকে যাবে। তাই যত সকালে বেরোনো যায় তত ভালো, জমাট তুষারের সুযোগ নিয়ে তাড়াতাড়ি অনেকটা রাস্তা এগিয়ে যাওয়া যাবে। তৈরি হয়ে যখন বেরোলাম তখনও দু'নম্বর ক্যাম্পে রোদ এসে পৌঁছোয়নি। গতকাল টেরেরা যে পথে নেমেছে সেই রাস্তা ধরে বিশাল তুষারের ঢিবিটার কাছে পৌঁছে গেলাম, সামনেই সেই বিপজ্জনক নালা যেটা বেয়ে অনবরত তুষারধ্বস নেমে এই ঢিবি তৈরি হয়েছে। আমার কাছে ক্যামেরা ছিল। ভাবলাম জায়গাটার কিছু ছবি তুলি। দাওয়াথোন্ডুপকে বললাম, তুমি আগে নালাটা পেরোও। নালা পেরিয়ে আইসঅ্যাক্স দিয়ে ধাপ কেটে কেটে ও ঠিকঠাক এগোতে পারে কিনা সেটা দেখাও আমার আরেক উদ্দেশ্য ছিল। ভালোই এগোচ্ছিল দাওয়া, কিন্তু যেখানে ওপর থেকে ফিক্সড রোপ ঝোলানো আছে সেই খাড়া বরফের দেওয়ালটার কাছে পৌঁছে তার জারিজুরি খতম হয়ে গেল। আমাকেই আগে উঠতে হল। মনে পড়ল, টেরে গতকাল একইরকম গল্প বলেছিল। ও যখন পানসি আর আয়লার সঙ্গে এই রুটে ওপরে যায়, পানসি সবার আগে আগে উঠছিল। এই খাড়া দেওয়ালটার সামনে এসে পানসির মুখ শুকিয়ে গেছিল, হাতের আইসঅ্যাক্সটা তুষারে গভীরভাবে গেঁথে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। ভাবটা যেন, এই আমি থামলাম, আর এগোচ্ছি না বাবা! টেরে বলেছিল, 'কী হল পানসি? এগোও! তোমার পালা এবার।' একমুখ হেসে পানসি বলেছিল, 'মাপ করবেন ভীমসাহেব! এ শুধু আপনাদের, মানে সাহেবদের জন্য।' বিশাল লম্বাচওড়া শক্তসমর্থ টেরেকে শেরপারা সব ভীমসাহেব নামে ডাকত।

টেরে পানসিকে আর জোরজবরদস্তি করেনি। আমার দলের দাওয়াথোন্ডুপেরও একই দশা। কিন্তু আমার এবারে ইচ্ছে ছিল সিনে ক্যামেরার সাহায্যে এই ওভারহ্যাং আরোহণটার একটা ভিডিও তুলে রাখার। তাই আংদাওয়াকে বললাম সবার আগে উঠতে। আমাকে পেরিয়ে সামনে যাওয়ার সময় দেখি ও ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু বড়োসাহেবের আদেশ বলে কথা, তাই মুখে কিছু না বলে কতকটা বাধ্য হয়েই সে তৈরি হল। খাড়া দেওয়ালটার ফাটলের ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে একহাতে শক্ত করে দড়ি

ধরে আংদাওয়াকে বিলে করতে করতে অন্যহাতে ক্যামেরা উঁচিয়ে আমি ভিডিও তুলতে শুরু করলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যর্থ হয়ে নেমে এল আংদাওয়া। দড়ির নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও আরেকবার তাকে চেষ্টা করতে বলার সাহস হল না। তাই ওকে সরিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। ফিক্সড রোপের সাহায্য নিয়ে ওঠা এখন যথেষ্ট সহজ দেখলাম, কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই ওভারহ্যাংটার মাথায় পঁচিশ ফিট ওপরে পৌঁছে গেলাম। তারপর দড়ি ধরে বিলে করে করে দাওয়াথোন্ডুপকে তুলে আনলাম। উঠতে খুবই কষ্ট হল দাওয়ার। কঠিন বরফের সটান খাড়া দেওয়াল বেয়েও যে ওঠা যায় সে ধারণাই ওর ছিল না, অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা! বুঝতে পারলাম, পর্বতারোহী হিসেবে ওদের চোখে আমাদের, অর্থাৎ সাহেবদের সম্মান দ্রুত বেড়ে চলেছে! স্টিম ইঞ্জিনের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে দাওয়া ওপরে এসে হাজির হল, কষ্টে পরিশ্রমে ওর মুখটা বেঁকেচুরে গেছে। কী করে দড়ির সাহায্যে বিলে করে আংদাওয়াকে তুলে আনতে হবে সেটা ওকে বুঝিয়ে দিলাম, তারপর আমি ভিডিও তোলার জন্য প্রস্তুত হলাম। এবারে ঠিকঠাকই চলল সব, ভালোই উঠল ভিডিওটা।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর একটু গোছগাছ করে নিয়ে ফের রওনা দিলাম আমরা। কিন্তু সেই খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওঠার কসরত করতে করতে অনেক সময় বয়ে গেছে। সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপর। এতই প্রখর তার তেজ যে পর্বতঢালে জমে থাকা তুষার গলে দইয়ের মতো মাখোমাখো হয়ে আছে, ঠেলে ঠেলে পথ চলা প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ব্যাপার। টেরেদের গতকালের চলার পথের চিহ্নও প্রায় মুছে এসেছে। ওদের রাস্তা অবশ্য এখান থেকে বেঁকে গেছে বাঁদিকে। গতবারের যাত্রায় ২১,৭০০ ফিট উচ্চতায় আমরা যে তাঁবু আর মালপত্র ডাঁই করে গেছিলাম সেগুলো আমায় উদ্ধার করতে হবে, তাই সোজা ওপরের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। একটু পরেই একফালি চাঁদের মতো দেখতে সেই বিশাল বরফের চাঁইটা চিনতে পারলাম। এর গোড়াতেই মালপত্র রেখে নেমে গেছিলাম আমরা। কিছুক্ষণ আইসঅ্যাক্স দিয়ে তুষারের জমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হদিস পাওয়া গেল সে সবের। তুষার সরানো হল। নিচ থেকে বেরোল তাঁবু, সাজসরঞ্জাম আর প্যাক করা খাবারদাবার যা আমি, ল্যাচেনাল আর রেবুফত তিন দিন আগে রেখে গেছিলাম। ঠিকঠাকই আছে সব। তিনজন ভাগাভাগি করে জিনিসগুলো পিঠে তুলে নিয়ে এবার ফের বাঁদিকে এগিয়ে টেরেদের গতকালের রুটটা ধরার চেষ্টা করলাম। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে রাস্তাটা মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, কিন্তু ওইটুকু পেরোতেই প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল। প্রায় কোমর অবধি তুষারে ডুবে যাচ্ছে, আইসঅ্যাক্স দিয়ে তুষার সরিয়ে সরিয়ে নালার মতো পথ তৈরি করে তবেই এগোনো যাচ্ছিল। অবশেষে যখন সে রাস্তায় পৌঁছোলাম, সামনে দেখি এক প্রচণ্ড খাড়াই জমাট বরফের দেওয়াল, সূর্যের আলোয় আয়নার মতো ঝকঝক করছে। ওঠার জন্য দেওয়ালটার গায়ে টেরে যেসব ধাপ কেটেছিল সেসব প্রায় পুরোই গলে গেছে। ফের নতুন করে ধাপ কাটতে হল আমায়। শেরপাদের সুবিধের জন্য ওপরে পৌঁছে একটা বড়ো আইস পিটন গেঁথে তার থেকে লম্বা একটা নাইলনের দড়ি নিচে ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর আরও কয়েক পা ওপরে উঠে ভালোভাবে দাঁড়ালাম যাতে দড়ি ধরে ওদের ঠিকঠাক বিলে করতে পারি। ফিক্সড রোপ ধরে উঠতে ওরা বেশ মজা পেয়ে গেছে। চিৎকার আর হাসিমস্করা করতে করতে, হা হা করে হাসতে হাসতে একে একে দু'জন ওপরে উঠে এল।

অনেক ওপরে উঠে এসেছি। খাড়া খাড়া বরফের দেওয়ালের গলিঘুঁজি আর ভয়ানক চড়াই সব তুষারঢালে আকীর্ণ জায়গাটা এখন আমাদের পায়ের তলায়। মাথা তুলে দেখলাম ওপরে একটা অল্প চড়াই মসৃণ তুষারঢাল যার মাঝখান দিয়ে টেরের দলের পদচিহ্ন চলে গেছে। বাঁদিকে ভয়ঙ্কর খাড়াই অন্নপূর্ণার বিখ্যাত কেন্দ্রীয় বাহিকা বা নালা সোজা মনে হচ্ছে পাতালে নেমে গেছে, যেন ওপরের ঢাল বেয়ে যা কিছু নেমে আসবে সমস্ত গিলে খাওয়ার জন্য প্রকাণ্ড এক হাঁ করে আছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আবহাওয়ায় নীলচে আলোয় ধোয়া চারদিক কেমন অপার্থিব লাগছে। কেন্দ্রীয় বাহিকার ওপারের স্বচ্ছ কঠিন বরফে তৈরি গিরিশিরাগুলি থেকে সূর্যালোক প্রতিসরিত হয়ে রামধনু তৈরি করেছে। গাঢ়

নীল আকাশ, মেঘের কণামাত্র নেই, তরতাজা শুকনো হাওয়ায় আর্দ্রতাও খুব কম। শরীর- মনেও যেন অফুরন্ত শক্তি পাচ্ছি আমি আজ, ঠিকঠাক ভারসাম্যটা যেন এতদিনে খুঁজে পেয়েছি, আরোহণের সময় তেমন কষ্টই হচ্ছে না কোনও। গভীর এক প্রশান্তিতে ভরে আছে মন।

তবে এখনও অনেক রাস্তা বাকি। চারদিকের অত্যুঙ্গ সব শৃঙ্গরাজির যা আকার- আকৃতি, সে তুলনায় নিজেদের মাঝে মাঝে পিঁপড়েদের মতো মনে হয়। উঠেই চলেছে, উঠেই চলেছে, কিন্তু দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তুষারঢালটা ক্রমশ চড়াই হয়ে এল। রোদের তাপে নরম হয়ে যাওয়া তুষারের পক্ষে শরীরের ভার ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে। পা ফেললে মন্ড হয়ে ঢাল বেয়ে কিছুটা নেমে যাচ্ছে, তারপর থিতু হচ্ছে। শেরপা দু'জনের দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোতে হচ্ছিল। দু'পা যেতে না যেতেই দম নেবার জন্য থামতে হচ্ছে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে পেছনের শেরপাদেরও যে একইরকম দমছুট অবস্থা সেটা বুঝতে পারছিলাম। মাঝে মাঝে মাথা তুলে ওপরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম আর কত রাস্তা বাকি। হঠাৎই সেই চতুর্দিকব্যাপী শুভ্র তুষারের মধ্যে একফালি উজ্জ্বল হলুদ রঙ চোখে পড়ল। এ টেরের তাঁবু না হয়েই যায় না! গভীর তুষার ঠেলে ঠেলে মনে হল যেন অনন্তকাল পরে অবশেষে সেখানে উপস্থিত হলাম। এই জায়গাই এখনও অবধি এ রুটে আমাদের স্পর্শ করা সর্বোচ্চ বিন্দু। টেরের রেখে যাওয়া সাজসরঞ্জাম আর রসদপত্র সব তুষারের নিচে চাপা পড়ে গেছিল। তবে সে সমস্ত উদ্ধার করতে বেগ পেতে হল না, একটা বড়ো নাইলনের ব্যাগের ভেতর সব ঢুকিয়ে খুব যত্ন করে বাঁধা ছিল। এতটা ওপরে পৌঁছে গেছি বলে মনে খুব আনন্দ হচ্ছিল আমার, কিন্তু চারপাশ ভালো করে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। এই ঢালের ওপরেই স্থায়ীভাবে তিন নম্বর ক্যাম্প বসানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ডানদিকে গভীর খাদ অতলে নেমে গেছে; বাঁদিকে দৈত্যাকৃতি কিছু বরফের চাঁই ঢাল বেয়ে সাজানো – তারও ওপাশে অন্নপূর্ণার কেন্দ্রীয় বাহিকা; আর আমাদের ওপরে পঞ্চাশ গজ পর থেকে প্রচণ্ড ভাঙাচোরা এক অঞ্চল শুরু হয়েছে। বাঁদিকের বিরাট বিরাট বরফখন্ডের জঙ্গলটার দিকে ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম দুটো চাঁইয়ের মধ্যবর্তী ফাটলগুলি সব নতুন তুষারপাতের ফলে বুজে গেছে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ওখানে কোনও একটা ফাটলের মধ্যেই ক্যাম্প বসালে কেমন হয়? চারপাশ থেকে বেশ সুরক্ষিত থাকা যাবে! আর প্রকাণ্ড সব বরফের চাঁইগুলো ওপর থেকে নেমে আসা কোনও তুষারধ্বস থেকেও আমাদের আড়াল করে রাখবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ঠিক হল, এগিয়ে দেখা যাক সবাই মিলে।

শেরপা দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে সেরকম একটি তুষারে বুজে থাকা ফাটলের কিনারায় উপস্থিত হলাম। শক্ত হাতে দড়ি ধরে রেখে ওরা আমায় বিলে করতে শুরু করল, খুব ধীরে ধীরে আমি ফাটলের ওপর জমে থাকা তুষারে পা দিলাম। প্রথম কয়েক পদক্ষেপ খুবই সন্তর্পণে এগোলাম। আইসঅ্যাক্সের লম্বা ডান্ডাটা সম্পূর্ণ তুষারে গেঁথে ফেলে বুঝলাম বরফ যথেষ্ট জমাট বেঁধেছে। আত্মবিশ্বাস একটু বাড়ল। এবারে এগিয়ে গিয়ে অ্যাক্সের সাহায্যে ওপরের আলগা তুষার সরিয়ে ছোটো এক সমতল চাতালের মতো তৈরি করলাম। তারপর সেখান থেকে চারদিকপানে বেশ কয়েক পা এগিয়ে দেখে নিলাম। ফের কেন্দ্রে ফিরে এসে চাতালটার ওপর দাঁড়িয়ে এবার লাফাতে আরম্ভ করলাম, উদ্দামনৃত্য নাচতে শুরু করলাম। দেখলাম আমার ভার সইতে ফাটলে জমে থাকা তুষারের কোনও অসুবিধেই হল না। ওপরের আলগা নরম তুষারের আস্তরণ সরিয়ে জায়গাটা একটু সমতল করে নিলে আদর্শ এক ক্যাম্প করার জায়গা হবে এখানে, অনায়াসে দুটো তাঁবু মুখোমুখি ফেলা যাবে। এক মিনিটও নষ্ট না করে শেরপা দু'জন সেখানে তাঁবু খাটিয়ে ফেলল, গরম চা তৈরি করে ফেলল। আজকের দিনের জন্য এইই যথেষ্ট! লক্ষ্য ছিল তিন নম্বর ক্যাম্পটা সরিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনও জায়গায় স্থায়ীভাবে বসানোর, সে কাজে আমরা সফল। নিচ থেকে ক্যাম্পটা অবশ্য দেখা যাবে না, বিশাল বিশাল বরফের চাঁইয়ে আড়াল হয়ে গেছে। দূরবীন চোখে লাগিয়ে নিচের ক্যাম্পের ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে এখন, লোক তিনটে বেমালুম ভ্যানিশ হয়ে গেল নাকি?

শেরপারা ক্যাম্প গোছগাছ করে রান্নাবান্নার তোড়জোড় শুরু করল, আমি ততক্ষণে ফাটলটা বরাবর এগিয়ে অন্যপ্রান্তে অন্নপূর্ণার রাক্ষুসে কেন্দ্রীয় বাহিকাটার আরও খানিক কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে এলাম; কারণ আগামীকাল আমাদের ঐ পথেই এগোতে হবে। মনে মনে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম আগামীকালই চার নম্বর ক্যাম্প স্থাপন করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করব। চারপাশের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করার পক্ষে তখনও যথেষ্ট দিনের আলো ছিল। যেদিকে তাকাই সেদিকেই সুউচ্চ সব তুষারশৃঙ্গের মেলা। একদিকে অন্নপূর্ণার সেই ভাঙাচোরা অদ্ভুতদর্শন গিরিশিরা, উত্তর-পশ্চিম উপগিরিশিরা ধরে আমরা যে পথে ওঠার চেষ্টা চালিয়েছিলাম; দূরে সম্রাটের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ধৌলাগিরি; আর উত্তরদিকে অনেক নিচে যতদূর চোখ যায় বিছিয়ে রয়েছে তিব্বতের বিস্তীর্ণ শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চল, এখান থেকে মাত্র বারো- তেরো মাইল দূর হবে!

হিমশীতল একটা জোরালো হাওয়া উঠল, তবে আকাশে কোথাও কোনও সন্দেহজনক মেঘের চিহ্ন নেই। নিশ্চিত থাকা যায় আগামীকাল আবহাওয়া ভালোই থাকবে। আশায় বুক বেঁধে প্রফুল্লচিত্তে তাঁবুতে ঢোকা গেল। আজ আমার একলার জন্য দুর্ধর্ষ একটা তাঁবু, দু- দুটো এয়ার ম্যাট্রেস, দু-দু'খানা স্লিপিং ব্যাগ! খাওয়াদাওয়া সেরে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর পা ঢুকিয়ে হাওয়াবালিশে হেলান দিয়ে রাজাবাদশার মতো বসলাম, শেরপারা চা দিয়ে গেল। চা- পানের পর ডাক্তারসাহেব অডটের কড়া নির্দেশ অনুযায়ী অ্যাসপিরিন আর ঘুমের বড়ি খেয়ে নিলাম। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

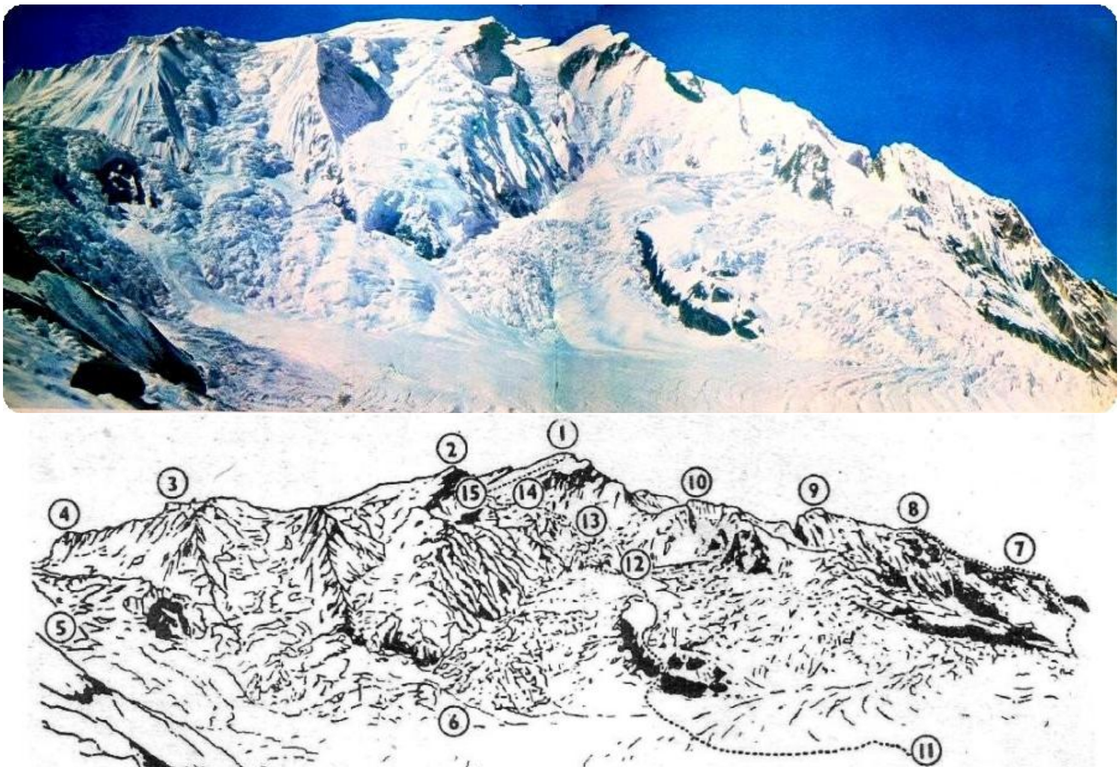

অন্নপূর্ণা পর্বতমালার প্রধান শৃঙ্গ অন্নপূর্ণা একঃ অভিযানের আরোহণের রাস্তা

1. অন্নপূর্ণা এক; ২৬,৪৯৩ ফিট	6. অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহ	10. ভাঙাচোরা উত্তরপশ্চিম গিরিশিরা
2. অন্নপূর্ণা পূর্ব শৃঙ্গ	7. উত্তর- পশ্চিম উপগিরিশিরা পথে	11. এক নম্বর ক্যাম্প; ১৬,৭৫০ ফিট
3. টেবিল আকৃতির একটি শৃঙ্গ	অভিযানের আরোহণের পথ	12. দুই নম্বর ক্যাম্প; ১৯,৩৫০ ফিট
4. একটি কালো রকি পিক	8. উপগিরিশিরার ওপর একটি	13. তিন নম্বর ক্যাম্প; ২১,৬৫০ ফিট
5. অন্নপূর্ণা হিমাল তুষারপ্রাচীরের	অপ্রধান শৃঙ্গ	14. চার নম্বর ক্যাম্প; ২৩,৫৫০ ফিট
পাদদেশ	9. উপগিরিশিরার সর্বোচ্চ বিন্দু	15. পাঁচ নম্বর ক্যাম্প; ২৪,৬০০ ফিট

ব্যবহৃত ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

কন-টিকি অভিযান

(৪)

থর হেয়ারডাল

(অনুবাদঃ ইন্দ্রনাথ)

আগের কথা

থর হেয়ারডেল এসে পৌঁছলেন আমেরিকায়, তার সাগর পাড়ি দেবার তত্ত্ব নিয়ে। এক বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিকের সঙ্গে দেখা করে বললেন তার গবেষণাপত্র পড়ে দেখতে। তিনি পাণ্ডুলিপিটা তো ছুঁয়ে দেখলেনই না উলটে বললেন, এই তত্ত্ব ডাহা ফেল করবে কারণ পেরুর প্রাচীন ইন্ডিয়ানরা নৌকোর ব্যবহার জানতেনই না। তিনি কৌতূকভরে বললেন থর অমন একটা ভেলা বানিয়ে নিজেই সাগর পাড়ি দিন না কেন। প্রিয় বন্ধু নৃতত্ত্ববিদ কার্লকে এসে জানাতে সেও একপ্রকার হেয়ারডেলের তত্ত্বের বিপক্ষেই রায় দিল। থর কিন্তু নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। কার্লকে বললেন তার মনের কথাটা। এবারে সত্যিই ভেলায় চড়ে সাগর পাড়ি দেবেন।

একটি অভিযানের শুরু

বাড়িভাড়া বাকী পড়েছিল এক সপ্তাহের। প্রায় একই সময়ে নরওয়ের ব্যাঙ্কও চিঠি দিয়ে জানালো যে আমি আর ডলার পাবো না। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের কারণে। লোটাকম্বল নিয়ে ব্রুকলিন চলে এলাম। এসে নরওয়ের এক নাবিকের বাড়িতে উঠলাম। খাবার দাবার ভাল, অন্তত আমার পকেটের সঙ্গে মানানসই। বাড়ির দোতলার একটা ছোটো ঘরে ঠাঁই হল। খেতে আসতে হত নীচের বড়ো হল ঘরটায়, সমুদ্রে যাওয়া লোকগুলো আসে যায়। তাদের সাথে খাওয়া। একদল চলে গেলে আরেকদল। একেকটা লোক একেকরকম, ভদ্রতার মাপও একেকজনের একেকরকম, কিন্তু একটা জিনিস সবার ক্ষেত্রেই এক। তারা যখন সমুদ্র নিয়ে কথা বলে, তারা জানে ঠিক কী নিয়ে কথা বলছে তারা! একথা সেকথা থেকেই আমি জেনে ফেললাম, ডাঙা থেকে দূরত্ব

বাড়লেই বা সমুদ্রের গভীরতা বাড়লেই সমুদ্র অশান্ত বা উত্তাল হয় না বা তার ঢেউ বাড়তে থাকে না। উলটে তীরের কাছেই সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝা ভয়াবহ, মাঝসমুদ্রে নয়। ডাঙার কাছাকাছি সামুদ্রিক স্রোতের বা পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউ প্রায়শই অনেক বেশি অশান্ত হতে পারে। সমুদ্রের গভীরে সাধারণত যেটা মোটেই এতটা বেশি হয় না। যে নৌকো তীরের কাছে টিঁকে থাকতে পারে সে মাঝসমুদ্রেও দিব্যি টিঁকে যেতে পারে। আরও জানলাম যে উঁচু ঢেউয়ের ধাক্কায় যখন বড়ো জাহাজের মোটা ইস্পাতের রড সরু তারের মতো বেঁকে তুবড়ে যায় সেখানে ছোট্টো নৌকো দুটো বড়ো ঢেউয়ের মাঝে দিব্যি ভাসতে থাকে, নাচতে নাচতে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসে। যেন একটা সিগাল। আমি সেই সমস্ত নাবিকদের সঙ্গেও কথা বললাম, জাহাজডুবি অভিজ্ঞতার পরেও যারা আবার সমুদ্রে গেছে আর নিরাপদেই ছোটো লঞ্চ বা নৌকোয় মাঝসমুদ্রে ঘুরে এসেছে।

কিন্তু এই লোকগুলোও ভেলার ব্যাপারে কিছুই জানত না। একটা ভেলা, যেটা কখোনোই জাহাজ বা ওইরকম কিছু নয়, যাতে পেরেক ঠোকার বা জাহাজের মতো বুলওয়ার্ক এসবের বালাই নেই। চরম বিপদে ওতে চেপে ভেসে থাকা যায় কেবল, যতক্ষণ না একটা জাহাজ বা নৌকো এসে উদ্ধার করে। ব্যস এটুকু। একটাই লোককে দেখলাম খোলা সমুদ্রে ভেলায় ভেসে থাকার ব্যাপারে বেশ আস্থা। একবার জার্মান টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ ডুবে গেলে সে মাঝ আটলান্টিকে তিন সপ্তাহ একটা ভেলায় ভেসে ছিল।

‘কিন্তু তুমি একটা ভেলাকে চালাতে তো পারবে না’, সে বলে উঠল, ‘বাতাসের টানে ভেলাটা সামনে, পেছনে, পাশাপাশি যেমন ইচ্ছে ভেসে যাবে শুধু।’

লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজে পেতে বার করলাম প্রথম যারা দক্ষিণ আমেরিকার লাগোয়া প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এসে ভিড়েছিল সেইসব ইউরোপিয়ানদের লেখা-জোকা। সেখানে ইন্ডিয়ানদের বালসা কাঠের তৈরী বড়ো বড়ো ভেলার ছবি কিংবা বর্ণনার অভাব ছিল না। এতে চৌকো একটা পাল থাকত, মাঝখানে একটা হাল আর পেছনদিকে একটা দাঁড়। সুতরাং সেটাকে দিব্যি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল নয়া আস্তানায়। যেখানে যেখানে আমার তত্ত্বের ব্যাপারটা লিখে পাঠিয়েছিলাম, শিকাগো বা অন্যান্য শহরে, কোনোখান থেকেই কোনো উত্তর এল না। তার মানে কেউই পড়েনি ওটা।

তো, এক শনিবার, আচমকাই ওয়াটার স্ট্রিটে এক জাহাজির দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। আমায় খুব সসম্ভ্রমে ক্যাপ্টেন বলে সম্বোধন করা হচ্ছিল। কারণ কিছুই না আমি একটা প্রশান্ত মহাসাগরের পাইলট চার্ট কিনেছিলাম। ওটা গুটিয়ে বগলদাবা করে ট্রেন ধরে সোজা অসিনিং। ওখানে আমি শনি রোববারে নরওয়ের এক নবদম্পতির কাছে প্রায়ই যেতাম। ওদের জায়গাটি চমৎকার। আমার বন্ধুটি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল, এখন নিউ ইয়র্কের ফ্রেড ওলসেন জাহাজ কম্পানির অফিস ম্যানেজার।

সুইমিং পুলে নামতেই শহুরে জীবন মাথা থেকে উবে গেল। ওসব কথা বেমালুম ভুলে রইলাম বাকী দুদিন। সাঁতারের পর অ্যামবোর্গ সুস্বাদু পানীয় নিয়ে এলে ওর লনে বসলাম দুজন। চমৎকার রোদ্দুর। আমার তর সইছিল না। ঘাসের ওপর চার্টটা বিছিয়ে উইলহেলমকে জিজ্ঞাসা করলাম, শোনো! তুমি কি মনে করো একটা ভেলায় চেপে পেরু থেকে দক্ষিণ সাগরের দ্বীপ অবধি মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব?

ও থমকে গেল; চার্টের দিকে না তাকিয়ে আমার মুখের দিকেই তাকাল বটে, থমকালও, কিন্তু উত্তর দিল তৎক্ষণাৎ, হ্যাঁ সম্ভব। অমনি খুব হালকা মনে হল নিজেকে, যেন শার্টের মধ্যে বেলুন ছেড়ে দিয়েছি একটা। আমি জানতাম উইলহেলমের কাছে নৌবিদ্যা বা নেভিগেশন ব্যাপারটা, কাজ তো বটেই, বেজায় শখেরও জিনিস। আমার পরিকল্পনাটা ধরে নিল একমুহূর্তেই। তারপরেই আমায় অবাক করে দিয়ে বলল, ভাবনাটা অবশ্য পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, তবে যে এই একটু আগে তুমি বললে, এটা সম্ভব!

“ঠিকই।” সে স্বীকার করে, “কিন্তু এর ব্যর্থতার সম্ভাবনাও কিছু কম নয়। তুমি জীবনে বালসা-ভেলায় চড়োনি, আর আজকে হঠাৎ ভাবছ তাতে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবে! হয়তো ভেঙেই যাবে, সম্ভবত পারবেই না। পেরুর পুরোনো ইন্ডিয়ানরা কয়েক পুরুষ ধরে এটা বানাত, তাদের অভিজ্ঞতা ছিল। হয়তো দশটার মধ্যে একখানা সাগর পাড়ি দিতে পারত, নাহয় একশটাই ধরো, সারা শতাব্দী জুড়ে। তোমার কথা অনুযায়ী, ইনকারা দলে দলে বালসা-ভেলায় চড়ে একসাথে খোলা সমুদ্রে যাত্রা করত। বেশ, তার মানে একটাতে কোনো সমস্যা হলে কাছাকাছি ভেলায় সেই লোকেদের তুলে নেওয়া হতো। কিন্তু মাঝ সমুদ্রে তোমায় কে বাঁচাবে! ধরা যাক, একটা রেডিও নিয়েই গেলে, বিপদ আপদের জন্য, কিন্তু ওই অনন্ত জলরাশির মধ্যে এই এত্তটুকু ভেলা, ডাঙা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে খুঁজে পাওয়া কি মুখের কথা? তোমার কাছে পৌঁছনোর বহু আগেই ঝড় এসে ভেলা থেকে তোমায় ভাসিয়ে নেবে, তোমায় ডুবিয়ে ছাড়বে কয়েকশবার। বরং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না তোমার পাণ্ডুলিপিটা কেউ পড়ে। বার বার চিঠি লেখো ওদের, খোঁচাও, না খোঁচালে কিছুই হবে না।”

“আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমার পয়সাকড়িও প্রায় শেষ।”

“তাহলে আমাদের সাথে এসে থাকো। আর হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার পয়সা নেই, তো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অভিযানের কথা ভাবছ কী করে?”

“লোকজনকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পড়ানোর চেয়ে অভিযানে উৎসাহিত করা অনেক সোজা।”

“কিন্তু কী লাভ হবে তোমার?”

“আমার তত্ত্বের বিপরীতে সবচেয়ে গুরুতর বিরোধী স্বরকে নিকেশ করা যাবে; আর, তাছাড়া, সত্যি বলতে গেলে, বিজ্ঞানজগতও খানিকটা এদিকে নজর দেবে।”

“কিন্তু খারাপ কিছু ঘটে গেলে?”

“তাহলে আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারলাম না।”

“সেক্ষেত্রে তুমি তোমার তত্ত্বটাকেই সবার সামনে ধ্বংস করবে, তাই না?”

“হয়তো। কিন্তু তুমিই বললে কীনা যে দশটায় একটা হয়তো পাড়ি দিয়েছিল, আর সেটা আমাদের অনেক আগেই!”

বাচ্চারা খেলবে বলে বেরিয়ে এসেছিল। তাই সেদিন আর কথা এগোলো না।

যথারীতি পরের সপ্তাহে চার্ট বগলে অসিমিং-এ হাজির হলাম। আর যখন ফিরে আসছি, আমার মানচিত্রে একটা পেন্সিলের দাগ, পেরুর তটভূমি থেকে টুয়ামাটো দ্বীপ অবধি। আমার বন্ধু, ক্যাপ্টেন, আমাকে বোঝানোর বহু চেষ্টা চরিত্তির করে আশা ছেড়ে দিয়েছিল। শেষকালে দুজনে মিলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে স্থির করলাম ভেলার গতিবিধি ও গতিবেগ সংক্রান্ত বিষয়।

“সাতানব্বই দিন।” উইলহেলম বলল, “কিন্তু মনে রেখো এ কেবল কাগজে কলমে, আদর্শ পরিবেশে, দরকারী হাওয়ার অনুকূলে। আর হ্যাঁ তুমি যেমনটি চাইছ ভেলা যদি ঠিক তেমনটিই চলে, তবেই! তুমি চার মাসের জন্য প্রস্তুতি নাও, চাই কী খানিক বেশিও লাগতে পারে।”

“বেশ বেশ।” আমি সোৎসাহে বলি, “চার মাসেরই প্রস্তুতি থাকবে কিন্তু সাতানব্বই দিনেই করা যাক।”

সে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আমার ছোটো ঘরটাকে দ্বিগুন আরামের লাগছিল। বিছানার একপাশে বসে মানচিত্রটা মেলে ধরলাম। ঘরের মধ্যে বিছানা আর আলমারি ছেড়ে বাকী অংশটুকুতেই তো দিব্যি হেঁটে চলে কাটাই। ওহ, ভেলাটা তো এর চেয়ে বড়োই হবে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে শহরের আকাশে তাকালাম, চারপাশের পাঁচিলের মাঝে মাথার ওপরে তারায় ভরা আকাশ। ভেলার ওপরে এমনি একটা ছোট্টো ঘর থাকলে নিশ্চই মাথার ওপরেই আকাশ আর অগনিত তারারাও থাকবে।

নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের কাছে ওয়েস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে সবচেয়ে অভিজাত ক্লাবগুলোর মধ্যে একটা ক্লাব আছে। বাইরে ঝকঝকে পেতলের পাতে লেখা অভিযাত্রী সংঘ, এক্সপ্লোরার্স ক্লাব। ব্যস। বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার জো নেই যে ভেতরে অসাধারণ ব্যাপার স্যাপার ঘটে থাকে। কিন্তু ঢুকে পড়লেই দেখবে এক অদ্ভুত দুনিয়ায় সে প্যারাসুটে করে লাফ দিয়েছে। নিউ ইয়র্কের হাজার হাজার গাড়ি আর বহুতল বাড়ি থেকে অনেক দূরে। যেই পেছনে দরজা বন্ধ হল, নিউ ইয়র্ক শহর নেই, অমনি চারপাশে সিংহশিকারের গল্প, পর্বাতাভিযানের কাহিনী, মেরুজীবনের কথা। যখনই নৈশভোজে দূরদেশের কারো বক্তৃতা শোনার আয়োজন হত অমনি চারপাশে জলহস্তি আর হরিণের ট্রফি, বড়ো শিকারের রাইফেল, হাতির দাঁত, যুদ্ধের দামামা, বর্শা, ভারতীয় কার্পেট, পুতুল, খেলনা জাহাজ, পতাকা, ছবি আর মানচিত্র সব মিলে ভিড় করে আসত।

মার্কুইসাস দ্বীপে ঘুরে আসার পর আমি ওই সংঘের একজন নির্বাচিত ও সক্রিয় সদস্য ছিলাম আর কনিষ্ঠতম সভ্য হবার সুবাদে শহরে থাকাকালীন প্রায় কোনো বক্তৃতাই আমার বাদ যেত না। ফলে নভেম্বরের বর্ষার সন্ধ্যায় আমি যখন ক্লাবে ঢুকলাম ভেতরের দক্ষযজ্ঞ অবস্থা দেখে ঘাবড়ালাম না। মেঝের মাঝখানে একটা রাবারের তৈরী চুপসানো ভেলা। তার সাথে জাহাজী রেশনপত্র আর কলকব্জা। আর অন্যদিকে প্যারাসুট, রাবারের পোষাক, নিরাপত্তা-পোষাক আর মেরু অঞ্চলের দরকারী জিনিসপত্র টেবিল জুড়ে আর দেয়ালেও ঝুলছে; এর সাথে জল শোধন করার বেলুন এবং আরো নানান আশ্চর্য আবিষ্কার রয়েছে এদিক সেদিক। নতুন একজন নির্বাচিত সদস্য, এয়ার মার্শাল কমান্ডের যন্ত্রপাতির দায়িত্বে থাকা কর্নেল হাসকিনের ওপর দায়িত্ব ছিল বক্তৃতা দেওয়ার, এবং একাধিক সামরিক আবিষ্কারের কথা জানানো। তিনি মনে করতেন ভবিষ্যতে উত্তর দক্ষিণ গোলার্ধে সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই সামরিক আবিষ্কারগুলি কাজে লাগানো যাবে।

বক্তৃতার পর তুমুল আলোচনা চলল। নামকরা ড্যানিশ মেরু অভিযাত্রী, লম্বা আর ভারী চেহারার পিটার ফ্রাউসেন, লম্বা দাড়ি নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওনার এই নয়া নয়া আবিষ্কার গুলোর ওপর মোটেও কোনো ভরসা ছিল না। তিনি নিজে একবার গ্রিনল্যান্ডে একটা অভিযানে এস্কিমোদের কায়াক আর ইগলুর বদলে এরকম রাবারের নৌকো আর তাঁবু ব্যবহার করে প্রায় মরতে বসেছিলেন। প্রথমত তুষারঝড়ে প্রায় জমে যাবার জোগাড় হয়েছিল কেননা তাঁবুর চেন ঠান্ডায় এমন জমে গেছিল যে খুলে ভেতরেই ঢুকতে পারেননি। তারপর আরেকবার মাছ ধরবার সময় বঁড়শির হুক লেগে রাবারের ভেলা ফুটো হয়ে স্রেফ ন্যাতানো কাপড়ের মতো ডুবে গিয়েছিল। তিনি আর তার এস্কিমো বন্ধু কোনোক্রমে কাছাকাছি একটা কায়াকে উঠে তীরে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এস্কিমোদের যেসব উপযোগী জিনিস তৈরী করতে শিখিয়েছে, কোনো বুদ্ধিমান মানুষই তার গবেষণাগারে বসে তার থেকে ভালো কোনো জিনিস বানাতে পারবে না।

বক্তৃতার শেষে কর্নেল হাসকিন অবাক করে দেবার মতো একটা প্রস্তাব দিলেন। সক্রিয় সদস্যরা তাদের পরবর্তী অভিযানে সেদিনের প্রদর্শিত জিনিসের যেকোনো একটি নিয়ে যেতে পারেন; শুধু একটাই শর্ত, অভিযান শেষে ফিরে এসে তার গবেষণাগারে জিনিসটা সম্বন্ধে বিস্তারে মতামত জানাতে হবে।

শম্পা গুহমজুমদার

এখন গরমকাল চলছে। গরমকাল ছবি তোলার পক্ষে একদমই উপযুক্ত সময় নয়। সুর্যের প্রখর আলোতে ল্যান্ডস্কেপ ফোটোগ্রাফিতে কোন মিস্ট বা ড্রামা তৈরি হওয়া মুশকিল। ফুলের ছবি অবশ্য তোলা যেতেই পারে। গরমের সময়ে হাতের কাছে অনেক রকমের ফুল ফুটে থাকে। তাই গরমকালেও সকাল ও বিকেলের আলোতে ফুলের ছবি তোলা যেতেই পারে।

একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে সুর্যের আলো যেন সরাসরি ফুলের উপরে এসে না পড়ে। সাদা বা হলুদ ফুল হলে সরাসরি সুর্যের আলোয় তা ওভার-এক্সপোজড হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক ফুল,পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। সেক্ষেত্রে একটুকরো থার্মোকল শিট হাতের কাছে রাখতে হবে।অন্ধকার জায়গাতে এই শিটের সাহায্যে আলো রিফ্লেক্ট করে প্রয়োজন মতন আলোর ব্যবহার করা যেতে পারে।

হয়ত তোমাদের মনে হবে যে ফুলের ছবি তোলা সব থেকে সহজ। নেট দুনিয়াতে প্রতিদিন আমরা অজস্র ফুলের ছবি দেখছি। মোবাইল ফোনে ক্যামেরা থাকাতে ছবি তোলা খুবই সহজ কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু ভাল ছবি তোলা আগের মতনই কঠিন রয়ে গেছে। তাই মামুলি ফুলের ছবি আর্টিস্টিক করতে গেলে তোমাকে ভাবতে হবে। কোনদিক থেকে আলো এসে পড়েছে দেখে নিতে হবে। একটু অন্য অ্যাঙ্গেলেও তুলতে হবে। না হলে তোমার তোলা ফোটোর সঙ্গে আমজনতার তোলা ফোটোর কোন তফাত থাকবে না।

তাই ফুল দেখেই ফটাফট ক্লিক না করে একটু সময় দিয়ে দেখতে হবে। আর অন্য ক্ষেত্রের মতন ফুলের ছবিও ভোরের নরম আলোতে তুললে ভাল হবে। নেচার ফোটোগ্রাফির সময়ে ছোট একটা স্প্রে বোতল সঙ্গে রাখবে। ফুলের উপর একটু জল ছিটিয়ে দিলে তা আরো সুন্দর আর সতেজ দেখাবে

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে ফুলের ছবি অনেক ভাল ওঠে। মেঘলা দিনে কিন্তু ফুলের রঙের বাহার অনেকটাই কমে যায়।

।

তুমি কোন অ্যাঙ্গেলে ফুলটিকে দেখবে এটা ঠিক শেখানো যায় না।এটা তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। ফুলের সঙ্গে কুঁড়ি পাওয়া গেলে সেটি ফুলের সৌন্দর্যে আর একটা মাত্রা যোগ করবে। একসঙ্গে অনেক ফুলের শৈল্পিক ছবিও তোলা যাবে।

এবারে বলি এডিটিং এর কথা। অন্য যে কোন ছবির মত একটু ক্রপ করা বা সফট করলে ছবি দেখতে আরো ভাল লাগে। আগেও তোমাদের বলেছি যে ছবি ঠিকমত উঠলে তবেই তাকে এডিট করে আরো সুন্দর করা যায়। কিন্তু যে ছবি অস্পষ্ট বা আর্টিস্টিক নয় ,তাকে এডিট করে বেশি কিছু ফল হবে না। এখানে আমি দুটি ছবিতে এডিট করে সফট ফোকাস করেছি। কিন্তু ম্যানুয়াল সেটিঙে ক্যামেরা রেখে নিজের ইচ্ছামতন সামনের ফুলটিকে প্রমিনেন্ট ও পেছনে আউট অফ ফোকাস করা যাবে।

একটা কথা সবসময়ে মনে রাখতে হবে যে অরিজিনাল ছবিটি যদি সুন্দর করে তোলা যায়,তবে এডিট না করাই ভাল। শীতকালে নানান ফুলের প্রদর্শনী বা মেলা হয়ে থাকে। তখন অবশ্যই ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ অত ফুল একসঙ্গে পাওয়া সহজ কথা নয়। শীতকালের নরম আলো ও কুয়াশা ফুলের ছবির পক্ষে উপযুক্ত। এখন গরমকালেও আশপাশে ফুটে থাকা ফুলের ছবি তুলে অভ্যাস করে নাও। আশাকরি তা হলে শীতকালে আরো অনেক চিন্তাভাবনা করে ভাল ছবি তুলতে পারবে। ফুল প্রকৃতির এমনই একটা সৃষ্টি যা দেখে মন ভাল হয়ে যায়। তাই পরীক্ষার চাপে বা অন্য কোন কারণে মন খারাপ হলে ক্যামেরাটা নিয়ে ছবি তুলে দেখবে, মন সতেজ লাগছে আর আবার নতুন করে উৎসাহ ফিরে পাচ্ছ।

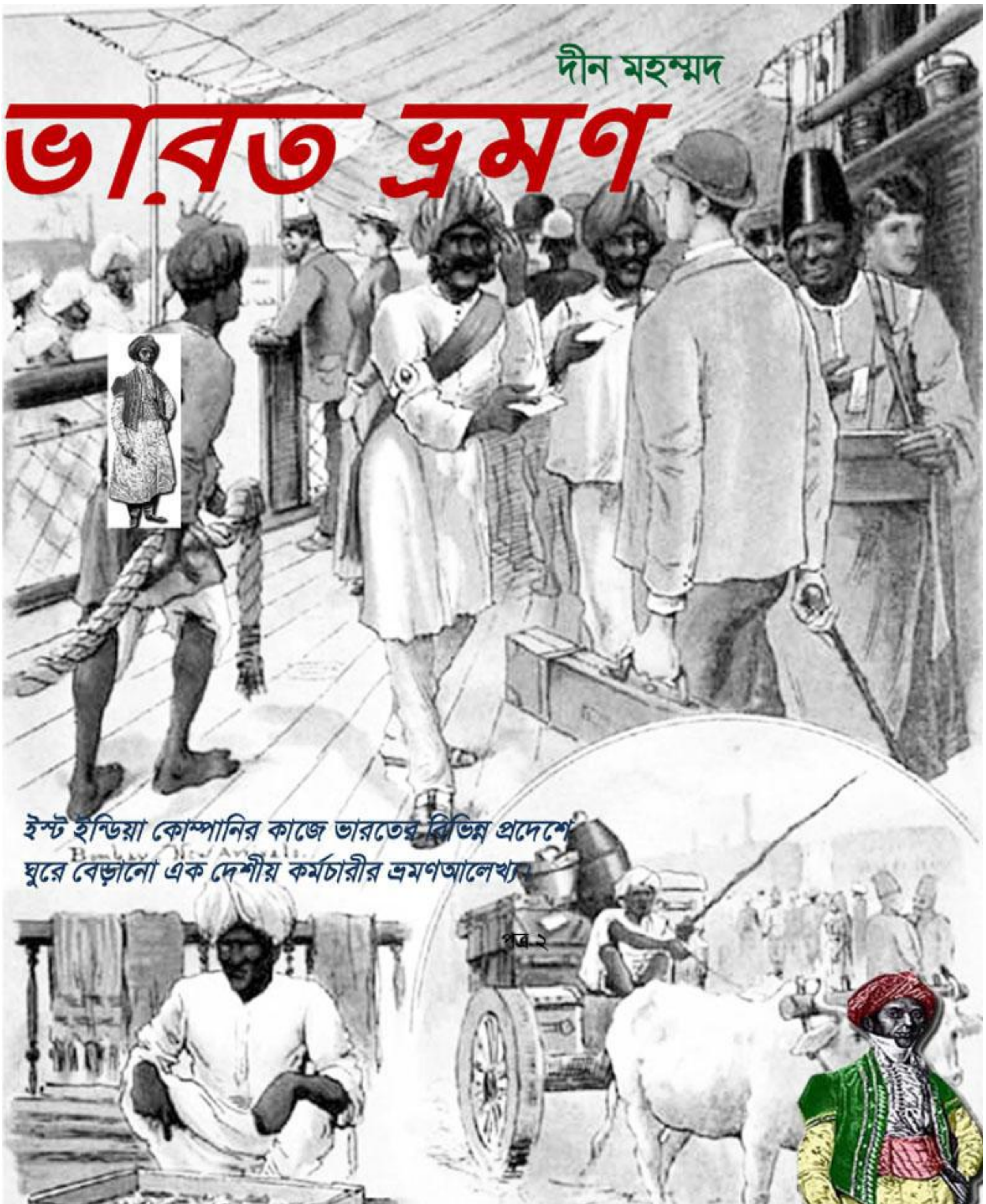
দীন মহম্মদ
ভারত ভ্রমণ
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে
ঘুরে বেড়ানো এক দেশীয় কর্মচারীর ভ্রমণআলেখ্য
পর্ব ২
অনুবাদ: শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৮১ সাল। ক্যাপ্টেন বেকার দ্বিতীয় ব্রিগেডের সেপাইদের সৈনাধ্যক্ষ হলেন। দায়িত্ব নিয়েই লেফটানেন্ট সিম্পসন ও উইলিয়ামসন এবং দু কম্পানি ইউরোপিয়ান সৈন্য আর দু কম্পানি দেশীয় সৈন্য নিয়ে বহরমপুর থেকে কানপুরের দিকে রওনা হলেন দ্বিতীয় ব্রিগেডের সাথে যোগ দেবেন বলে। পদোন্নতি হওয়ার পর তিনি আমাকে বাজার-সরকার নিযুক্ত করেছিলেন। দেনাপুরে (দানাপুর) বিশ্রাম নিতে থামা হল, মাইনে কড়ির মেটানোর ব্যাপারও ছিল। দুজন সেপাই সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল গোল্ডিংগঞ্জ। তখন ওটাই সবচেয়ে সস্তার বাজার ছিল আর আমারও সৈন্যদলের জন্য শস্যদানা সংগ্রহ করতে হত। এর জন্যে আমার সাথে ছিল চারশ সোনার মোহর, আর সেনাসরবরাহের দোকান থেকে জিনিস পাবার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশের কাগজ, সবমিলিয়ে পনেরোশ পাউন্ড স্টার্লিং এর সমান। যাবার পথে হল কী, নদীর পাড়ে তরমুজ খেতে এক সেপাই বেশ কিছু তরমুজ মাড়িয়ে নষ্ট করে ফেলল। জমির মালিক দেখে ফেলেছিল, সে তাকে সাবধান করাতে সেপাইটি খুবই খারাপ ভাষায় তাকে জবাব দিল। ফলে লোকটি তো রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার ওপরে চড়াও হলো আর দুজনে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে গেল। সেই লোকের আশেপাশের পাড়াপড়শি খবর পেয়ে তাদের বন্ধুর সাহায্যে এসে জুটল দলে দলে। সেপাইকে স্রেফ কুপিয়েই মেরে দিল তারা। মাঠে পড়ে রইল সেই সৈন্যের মৃতদেহ। বাকি সৈন্যেরা পালিয়ে গেল, কিন্তু আমাকে ধরে ঘোড়া থেকে নামানো হল, আমি গঙ্গার পাড়েই দাঁড়িয়ে কাঁপছিলাম, কপালে কী আছে ভেবে; ঘোড়া তো গেলই, শেষে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে বহু কষ্টে ওপারে পৌঁছলাম। জামাকাপড় পরে, সঙ্গে অত অত ভারী সোনার মোহর নিয়ে সাঁতার দিতে গিয়ে দারুণ পরিশ্রমে প্রায় অজ্ঞান হবার জোগাড়। আমায় ওরকম দেখে কয়েকজন চাষী সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলো আর সাধ্যমতো যা কিছু সম্ভব সাহায্য করল। রাত নামলে আমি আমার যাত্রাপথের বিপদ ভুলে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলাম। পরদিন নিজেকে একটু সুস্থ লাগলে আমি ওই সহৃদয় মানুষগুলোকে বিদায় জানাতে গেলাম। বিপদের সময় তাদের সহানুভূতির জন্যই আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। গোল্ডিংগঞ্জে পৌঁছে সেখানকার ফৌজদারের হাতে সোনার মোহর আর কাগজপত্র দিয়ে তাকে গোটা ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। শুনে টুনে তিনি বেশ বিচলিতই হলেন। আমাকে আটকে দিলেন যতক্ষণ না সৈন্যদলের জন্য পর্যাপ্ত শস্য কেনা সম্পূর্ণ হয়। তার খানিকটা জলপথে কানপুরে পাঠানো হল। বাকিটা স্থলপথে অনেকগুলি গরুর গাড়ি বোঝাই করে পাঠানো হল। স্থলপথে তাদের সাথে আমিও চললাম, বক্সারে এসে সৈন্যদলের সাথে যোগ দেবার জন্য। যে সেপাইরা আগেই পালিয়ে এসেছিল তাদের কাছে আগেভাগে খবর পেয়ে সকলেই ভেবেছিল মারমুখী জনতার হাতে ওই সেপাইয়ের সাথে আমারও মৃত্যু হয়েছে। তারা আমায় দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এমনকী আমায় সামনে দেখেও তাদের সন্দেহ গেলনা, মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমাকে নয় আমার ভূত দেখছে তারা।

বক্সার থেকে আমরা কানপুরের দিকে রওনা হলাম; পৌঁছতে পৌঁছতে ফেব্রুয়ারির শেষ। পয়লা মার্চ ক্যাপ্টেন বেকার মেজর রবার্টের রেজিমেন্টের সেনাদলের দায়িত্বভার নিলেন এবং এই পদেই তার পদোন্নতি হয়েছিল। তার সুপারিশেই আমাকে ঐ একই সেনাদলের মধ্যে অন্যতম মুখ্য হিসেবে নিযুক্ত করা হল। যমুনার তীরে কাল্পি র কাছাকাছি মারাঠা বিদ্রোহের খবরে সমস্ত সৈন্যদল কর্নেল মরগ্যানের নির্দেশে এবার সেদিকে অগ্রসর হল। আর তারই একটা ছোট অংশ কাছাকাছি এলাকায় খানাতল্লাশি চালাতে লাগল যাতে সাধারণ মানুষের শান্তিভঙ্গকারীদের পাকড়াও করা যায়। তাদের সাথে ছোটোখাটো দু একটা সংঘর্ষের পর আমাদের অস্ত্রে শস্ত্রে ভয় পেয়েই একরকম সকলেই পালিয়ে গেল।

কাল্পিতে কয়েকদিন কাটিয়ে আমরা কানপুর ফিরে গেলাম, তা অবশ্য বেশিদিনের জন্য নয়।

এসময়েই বড়লাট হেস্টিংস মনে করলেন চৈত সিং এর কাছ থেকে পাওনা খাজনার আশু প্রয়োজন, কেননা হায়দার আলির সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের দরকার হয়ে পড়েছিল। এদিকে অপারগই হোক কিম্বা না দেবার ইচ্ছেতেই হোক চৈত সিং এর কাছ থেকে খাজনা আদায় না পেয়ে দু কম্পানি সেনা সহ সিপাহশালার পাঠানো হল রাজাকে বন্দী করবার জন্যে। রাজাকে বন্দি করা হয়েছে এখবর দ্রুত ছড়িয়ে গেল রাজ্য জুড়ে। রাজার সৈন্যরা

গেল খেপে; তারা দলে দলে রামনগরের কাছে নদী পার করে যেখানে রাজাকে বন্দী করা হয়েছে সেই রাজপ্রাসাদের দিকে আসতে থাকল। আমাদের দু কম্পানি সৈন্য যারা প্রাসাদের সুমুখের জমিতে পাহারায় ছিল, অতর্কিতে এই শক্তিশালী সৈন্যদলের স্রোতের কাছে বেবাক কচুকাটা হয়ে গেল। যেন অপ্রতিরোধ্য প্লাবন যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

রাজার সেনাপতিদের একজন, রামজীবন, সেপাইদের সর্দারকে মেরে প্রাসাদে ঢুকে এল; সেইই প্রথম তাকে ঢুকতে বাধা দিয়েছিল। সেনাপতিই বাকি সৈন্যদের পথ করে দিল, যাতে তারা তাদের রাজাকে সুরক্ষিতভাবে প্রাসাদ থেকে বের করে এক বাগানের মধ্য দিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছে দিয়েছিল। নদী থেকে নদীপাড় অনেক উঁচুতে ফলে পাগড়ি খুলে সেটাকে লম্বা করে দড়ির মতো বেঁধে রাজাকে তার সাহায্যে নামানো হল নীচে। নৌকো ছিলই, সেটা অন্যপাড়ে পৌঁছে দিয়েছিল তাকে। রাতের অন্ধকারের আড়ালে গুটিকয় দেহরক্ষী নিয়ে রাজা তারই অন্যতম শক্তিশালী দুর্গ লতিফগড়ে এসে পৌঁছলেন।